ইসলামে সামাজিক সুবিচার

সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ

ইসলামে সামাজিক সুবিচার

মূল : সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ (মিসর)
অনুবাদ : মাওলানা কারামত আলী নিযামী

পরিবেশনায়
এ, এইচ, পি প্রকাশনী
৮/৯ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা – ১১০০
মোব : ০১৭১৬-৫৪২৩৬৯, ০১৮২৫-০৮১৬০৯

প্রকাশক
মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ চৌধুরী

ইসলামিয়া কুরআন মহল
৬৬, প্যারীদাস রোড
ঢাকা – ১১০০
ফোন ঃ ৭১১১৫৫৭

প্রকাশকাল
পঞ্চম সংস্করণ ঃ
ফেব্রুয়ারি ২০১৫

বিনিময় : ৩৮০.০০ (তিনশত আশি) টাকা মাত্র।

বাংলাদেশের সমস্ত ধর্মীয় লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

পেশ কালাম

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

মানবকূল স্বভাবগত রূপে শান্তির পিয়াসী। শান্তিতে থাকার শান্তিতে বসবাস করার সুখ সাচ্ছন্দে জীবন কাটাবার ইচ্ছা তার সহজাত বৃত্তি। তাই এতটুকু শান্তি পাবার জন্য সে ছুটে যায় দিকবিদিক। নাবিক উত্তাল তরঙ্গমালার মুখে পাল তুলে ছেড়ে দেয় নিজ নৌকা। কৃষক রৌদ্রের প্রচন্ড উষ্ণতা উপেক্ষা করে দিন কাটায় উন্মুক্ত মাঠের মাঝে। বৈজ্ঞানিক অভিযান চালায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গ্রহ থেকে গ্রহ লোকের মাঝে। এক কথায় সকল জীবই অধিক শান্তির আশায় বিভিন্ন কর্মময় জগতের মধ্যে নিজ জীবন কাটিয়ে দেয়। দেশ ও সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা আনয়নের খাতিরে মানুষ শান্তি কমিটি গঠন করে, নিজ বাস ভবনের সামনে ঝুলিয়ে দেয় শান্তি নিকেতন শীর্ষক সাইনবোর্ড, ছেলের নাম রাখে শান্তি, সত্যই কি ইত্যাদি কাজ করে শান্তির সাক্ষাত হয়েছে। সেই দেশ, সেই সমাজ ও সেই গৃহটির ভিতর অনুসন্ধান চালালেই আসল সত্যটি ধরা পড়বে। হয়ত শান্তি নামীয় ছেলেটির জীবনের ঘটনাপঞ্জীর পানে একবার চোখ বুলালে দেখা যাবে শান্তির বদলে অশান্তির কালো ছায়া তার সমগ্র জীবনটি ঘিরে আছে। শান্তি নিকেতনের ভিতর অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। তবে কিসে পাওয়া যাবে শান্তি, কোন পথ মত গ্রহণ করলে, কি কাজ করলে সত্যিকারের শান্তির সাথে সাক্ষাত হবে? কোর্মা পোলাও বিরানী খেতে পারলে, মূল্যবান পোষাক পরিধান করতে পারলে, বাড়ী- গাড়ী থাকলে, কোন বস্তুটির দ্বারা? শান্তি দৃশ্যমান কোন বস্তু নয়, ধরা যায় এমন কোন কায়া তার নেই। এটা হচ্ছে অনুভব করার বস্তু। ধরা যায় না, ছোয়াঁ যায় না, দেখা যায় না; শুধু কেবল অনুভূতি দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। জাগতিক তুলাদণ্ড বা থার্মোমিটার দ্বারা তার পরিমাপও সম্ভব নয়। পূর্ণ কুটীরে যে অনাবিল শান্তি বিরাজ করে, সেই শান্তি বিরাজ অভিজাত্যপূর্ণ অট্টালিকায় বাস করেও হয়তো পাওয়া যায় না। আবার অট্টালিকার ভিতরও শান্তি পাওয়া যায়– পূর্ণ কুটীরে তা হয় না। জাগতিক কোন বস্তু নিচয়ের দ্বারা সত্যিকারের শান্তি পাওয়া সম্ভব নয়। তা দ্বারা শুধু বস্তুজগতের সাময়িক অসুবিধার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। তাও ক্ষণিক কালের জন্য। মোটকথা মানুষ তার নিজস্ব মতবাদ আকীদা ও বিশ্বাসের আলোকে

যে যে কাজ করে, সেই কাজের দ্বারাই তারা শান্তি অণ্বেষণ করে। অন্তরের বিশ্বাস ও মতবাদই মানুষের কর্ম জগতকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তার দিগন্তের সামান্য চিহ্নিত করে এবং তার গতিধারা ও স্বরূপও অঙ্কন করে দেয়।

তাই আন্তরিক মতবাদ এবং মনের বিশ্বাসের আলোকেই মানুষ তার কর্মকে ঠিক করে। আর তার মাধ্যমেই সে শান্তি পাবার আশা রাখে। এখন কথা হচ্ছে যে সত্যিকারের চিরন্তন শান্তি পাবার ইচ্ছে থাকলে মানুষের মনে পোষণকৃত মতবাদ ও বিশ্বাসগুলো সঠিক, নির্ভূল ও নির্ভেজালপূর্ণ হতে হবে। অন্যথায় মায়া মরিচিকার পিছনে বৃথা জীবনাবসান করা ছাড়া কিছুই নয় এবং সঠিক শান্তি কোনক্রমেই পাওয়া সম্ভব নয়। সতুরাং মানুষ স্বভাবগত রূপেই বিচার-বিবেক ও বুদ্ধি সম্পন্ন জীব। নিজ বিচার বিবেক বুদ্ধি দ্বারাই সঠিক মতবাদ কোনটি তা নিরূপণ করে গ্রহণ করতে হবে। এ জগতে বিভিন্ন মতবাদ ও জীবন বিধান বিরাজমান রয়েছে। কোন মতবাদটি মনের কোনে স্থান দিলে এবং কোন জীবন বিধান দ্বারা আমি সত্যিকারের শান্তি পাবো, তা আমারই বিচার করতে হবে। শুধু জন্মগত বা বংশানুক্রমে কোন একটি মতবাদ ও জীবন বিধানের অনুসারী হয়ে অন্যান্য মতবাদ ও জীবন বিধান থেকে চোখ বুজে থাকলেই নিজের কার্য শেষ হয় না। স্বাধীন ও মুক্ত বুদ্ধি নিয়ে সকল বাঁধনের অক্টোপাশ থেকে মুক্ত হয়ে সবগুলো বিচার বিবেচনা করে তারপর তা গ্রহণ করতে হবে।

এ জগতে সাধারণতঃ দু'ধরনের মতবাদ ও জীবন বিধান আমরা বিরাজমান দেখতে পাচ্ছি। তার একটি হলো আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত জীবন বিধান। আর অপরটি হলো মানব রচিত জীবন বিধান। আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান মাত্র একটিই। এর কোন শ্রেণী ও প্রকারভেদ নেই। অপরদিকে মানব রচিত জীবন বিধান বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। তার মধ্যে আমরা হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান, জৌন ইত্যাদি পুরানো ধর্ম ও মতবাদগুলোকে যেমন গণ্য করতে পারি, তেমনি আধুনিক যুগের জড়ধর্মী মতবাদগুলো তথা কমিউনিজম, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, গণতন্ত্রবাদ, পুঁজিবাদ ইত্যাদি বলতে যা কিছু আছে সবই মানব রচিত বিধানের অন্তর্ভূক্ত। আর এগুলো কোনটিই পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান নয়। সবগুলোই মানুষের জীবনের কোন একটি বিশেষ দিক বা অংশকে অবলোকন করে রচিত। এগুলো সামগ্রিক রূপে মানব জীবনকে অবলোকন করে না এবং মানব জীবনের জন্য পূর্ণাঙ্গ সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি তাদের নেই। আংশিক যা কিছু রয়েছে, তাও নির্ভেজাল নয়। বরং তা একদিকে যেমন মানব প্রকৃতির পরিপন্থী, অপরদিকে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ ও অসামঞ্জস্যশীল।

বস্তুতঃ আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের নামই হচ্ছে ইসলামিক জীবন বিধান। সে মানব জীবনের কোন একটি দিক বিশেষ বা অংশ বিশেষের প্রতি দৃষ্টি দান করে না। বরং গোটা মানব জীবনটাই হচ্ছে তার কর্মক্ষেত্র। সমগ্র মানব জীবনকে কেন্দ্র করেই তার বিধান রচিত। সে যেমন নিজে পূর্ণাঙ্গ তেমনি গতিশীল, সময় যুগ ও স্থান পাত্র ভেদের চাহিদা অনুযায়ী সে এলাহী জীবন দর্শনের মৌলিক নীতিমালার আলোকে বিধান জারী করে। নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের নব নব উদ্ভুত সমস্যাবলীর সমাধান দিতেও সে পিছপা নয়। এক কথায় সে মানব প্রকৃতির সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি স্বাভাবিক বাস্তবধর্মী জীবন বিধান। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে আরম্ভ করে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক জীবনের সীমারেখা পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রের জন্য তার বিধান রচিত। এক কথায় মানুষের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত যতটি কর্মক্ষেত্র রয়েছে, সব কটির জন্যই সে নিজ বিধান রচনা করে দিয়েছে। জীবনের কোন একটি দিক বা কর্মক্ষেত্রও তার বিধানের সূচীপত্র থেকে বাদ যায়নি।

সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি ইসলামী মতবাদ ও জীবন বিধানকে স্বীয় মনের আংগীনায় মৌল বিশ্বাসরূপে স্থান দেয়, তখন আর কোন মানব রচিত মতবাদ গ্রহণের যেমন কোন অবকাশ তার জন্য থাকে না, তেমনি থাকে না জীবনের বিশেষ কোন ক্ষেত্রে তাকে গ্রহণ করার অবকাশ। ইসলামী মতবাদে বিশ্বাসী একজন মুসলিম আংশিকভাবে অপর কোন মানব রচিত জাহেলী জীবন বিধানে বিশ্বাস স্থাপন করলে বা গ্রহণ করলে যেমন সে আর মুসলিম থাকে না, তেমনি উক্ত জাহেলী মতবাদের ধারক ও বাহক একজন অমুসলিম আংশিক রূপে ইসলামী মতবাদে বিশ্বাস স্থাপন বা গ্রহণ করলেও সে মুসলিম হয় না। তাই একই সময় একজন মুসলিমের জন্য ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে ইসলামকে স্থান দেয়া অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে সমাজতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের আদর্শকে গ্রহণ করা আদৌ সম্ভব নয়। গায়ের জোরে সম্ভব করে নিয়ে সে নিজেকে মুসলমান বলে যতই পরিচয় দিয়ে জাহির করুক না কেন, আসলে সে আল্লাহ্‌র দপ্তরে মুসলমান নয়। জড়ধর্মী মতবাদগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী অমুসলিমদের বেলায়ও একই কথা। তারা আংশিকভাবে ইসলামী মতবাদের কোন একটি দিকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে বা তা গ্রহণ করলেও সে মুসলিম সমাজের সদস্য নয়। মুসলমানের দপ্তরে তার নাম উঠতে পারে না; যত সময় না সে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গভাবে মেনে না নিবে এবং তা জীবনের সকল ক্ষেত্রে কায়েমের চেষ্টা না করবে।

যেহেতু আল্লাহ তায়ালা মানব সৃষ্টি করে এ বসুন্ধরাকে তার সৃষ্টির পূর্বেই তাদের স্বভাবের অনুকুল উপযোগী করে তৈয়ার করে রেখেছেন। চন্দ্র, সূর্য, নিহারিকারাজী, আলো-বাতাস, পানি, নদী-নালা, মেঘমালা ইত্যাকার মানুষের জীবন ধারণে যা কিছু প্রয়োজন সবই তিনি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সুতরাং এ জগতে মানুষের মানুষ রূপে বেঁচে থাকতে হলে কি ধরনের নীতিমালা ও আইন কানুনের প্রয়োজন তা কি তিনি দান করেননি? কোন নীতি ও আইন-কানুন দ্বারা জগতের বুকে সাম্য, ভাতৃত্ব, সৌহার্দ্য কায়েম হয়ে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয় তা কি তিনি হাতে রেখে দিয়েছেন? যিনি মানব সৃষ্টি করে এ জগতে প্রেরণ করলেন সেই মানুষের কল্যাণ ও শান্তি অন্য কোন পথে আসতে পারে কি? কোন আইন-কানুন, নিয়ম ও নীতির অনুগত হলে মানব সমাজে সত্যিকারের ভারসাম্যপূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, কোন আইন-কানুন, মত ও পথ তাদের স্বভাব প্রকৃতির অনুকল হতে পারে। তাতো মানুষের চেয়ে তিনিই ভালরূপে অবগত আছেন; যখন তিনি মানুষের স্রষ্টা। তাই মানুষ যদি আল্লাহর চেয়ে অধিক জ্ঞানের দাবিদার হয়ে নব নব মত ও পথের রচনা করে মানব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালায়, তবে আল্লাহর উপর খোদদারী করা ছাড়া কি হতে পারে? আর মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা তথা ইসলামের কোন কার্যসূচি ও কার্যক্রম নেই, এই কথার জিগির তুলে যে সকল মুসলমানরা সমাজতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ কিম্বা পুঁজিবাদকে অথবা অন্য কোন মানব রচিত ধর্ম বা মতবাদকে কায়েম করার জন্য সরল প্রাণ নিরক্ষর মুসলিম জনসাধারণকে ঐ পথে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টা চালায়; হয় তারা ইসলাম সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখেন না; যদি কিছুটা রাখেও, তবে ব্রাহ্মণ্যবাদ ও খ্রীস্টানবাদের ন্যায় ইসলামকে মনে করে নিয়েছে এবং সাত অন্ধের হাতী ধরার ন্যায় জ্ঞান অর্জন করেছে বলে মনে করতে হবে। ইসলামে সামগ্রিক পূর্ণাঙ্গ রূপটিকে তারা অনুধাবন করতে পারেনি; অথবা নিজেদের পদমর্যাদা বাড়ানো কিম্বা হীন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এ পথে পা দিয়েছে।

আজ মুসলিম বিশ্বের কথা আলোচনা করলে হৃদয় করুণার উদ্রেক না হয়ে পারে না। প্রত্যেকটি দেশেই মুসলিম নামধারী একদল লোক আল্লাহর দ্বীনকে বাদ দিয়ে জড়ধর্মী মতবাদগুলো প্রতিষ্ঠার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছে। আর এ কাজের জন্য বরাবর তারা মুরুব্বীদের থেকে হালুয়া-রুটিও বেশ পায়। অপর দিকে জনগণকে সমান করার ভাত-কাপড় বাসস্থান ইত্যাদি দেবার ভাওতা দিয়ে বিভ্রান্ত করে তুলছে। শুধু ভাত-কাপড়, বাসস্থানই যে মানুষের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, এ কথাটি ভুলিয়ে দিয়ে বস্তুবাদী মতাদর্শের পানে তাদেরকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তা আমাদের

স্বভাবের উপযোগী কিনা, তার দ্বারা সামাজিক জীবনে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়ে সত্যিকারের শান্তি আনয়ন সম্ভব কিনা, তা আমাদের বিচার-বিবেচনা করে দেখা উচিত। শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র ইসলামী জীবন বিধানের বাস্তব রূপায়ন একান্ত অপরিহার্য তার জ্বলন্ত প্রমাণ পাঠকের সামনে এ পুস্তকটি। গ্রন্থকার অত্র পুস্তকে আধুনিক কালের জড়ধর্মী জাহেলী মতবাদগুলো তথা খ্রীস্টান মতবাদ, ব্রাহ্মণ্য মতবাদ, ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ, সমাজতন্ত্র, জাহেলতন্ত্র, কমিউনিজম, সেকুলারিজম, পুঁজিবাদ এক কথায় ইসলামের সাথে উক্ত মতবাদগুলোর তুলনামূলক আলোচনা করে এ কথা প্রমাণ করেছেন যে, বিশ্বের বুকে সত্যিকার অর্থে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে এবং মুসলমানদের ইহলৌকিক পারলৌকিক জীবনে উন্নতি শান্তি ও সমৃদ্ধি আনয়ন করতে হলে ইসলামী মতবাদকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের এক কথায় জীবনের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠা করা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন পথ নেই। লেখকের মতামতের সাথে সর্বস্থানে আমার মত অনেক লোকের ঐক্যমত না হলেও পুস্তকটি সামগ্রিক দিক দিয়ে অন্যান্য মতাবলম্বীদের মোকাবিলায় সে চ্যালেঞ্জ প্রদানকারী হাতিয়ার স্বরূপ, তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। লেখক সর্ব প্রথমই সামাজিক জীবন থেকে ইসলামকে বিদায় দিয়ে মুসলমান রূপে থাকতে পারে কিনা; আর ইসলামকে পূর্ণ একটি জীবন বিধানরূপে স্বীকার করে নেয়া হয় কিনা এবং সমাজ জীবন থেকে ইসলামকে এড়িয়ে চলার নিরপেক্ষ ধর্মীয় মতবাদটি কোথা থেকে মুসলমানদের মগজে ঢুকে পড়লো, সে বিষয় তিনি বেশ তাৎপর্য পূর্ণ যুক্তি ভিত্তিক আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, আধুনিক যুগের মতবাদগুলো ইয়াহুদী ও খ্রীস্টানরা মুসলমানকে গোমরাহ করার উদ্দেশ্য তাদের মনোজগতে চাপিয়ে দিয়েছে। আর ইসলামের প্রতি তাদের মনে ইসলামের নব উষা উদয়কাল থেকেই যে ঈর্ষা, বিদ্বেষ, হিংসা ও সংশয় বিদ্যমান, তা লেখকের কলমের দ্বারা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া ইসলামী সমাজের মূল বুনিয়াদ কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তার গতিধারা ও স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করতে তিনি ইসলামের রাজনৈতিক কর্মধারা অন্যান্য অধুনা জাহেলী মতবাদগুলোর জীবন্ত উদাহরণগুলো পেশ করেছেন, যা হচ্ছে ইসলামের বর্তমান ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নব পথের আলোর দিশারী বিশেষ।

অত্র পুস্তকটি বহুদিন ধরে অনুবাদ করার ইচ্ছা মনে ছিল। কিন্তু সময় সুযোগের অভাবে এ কাজে হাত দিতে পারছিলাম না। অবেশেষে অতি সাহস করে ইংরেজী ১৯৭১ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে এ কাজে হাত দেই। আল্লাহ তায়ালার লাখ লাখ

শোকর যে বিগত দীর্ঘ চৌদ্দটি .াসের ইতিহাস ভাঙ্গাগড়া ও রক্তাক্ত ইতিহাস। এর ভিতর আমার এই আরদ্ধ কাজটি সুসম্পন্ন করে সত্যিই নিজেকে ধন্য ও পুলকিত অনুভব করছি। যুগের আবর্তন বিবর্তনের সন্ধিক্ষণে আমার এ পুস্তকটি ছাপাবার মত কোন সহযোগী পাই কিনা সে চিন্তা আমার নয়। কারণ আমার যা কাজ ছিল তা করুণাময়ের ইচ্ছায় তিনি আমার দ্বারা করিয়েছেন। এখন প্রকাশনা সহযোগীর ব্যবস্থা তার হাতে। এ পুস্তকটি বাংলার মানুষের নিকট যতদিন পরিচিত হতে না পারবে, ততদিন বাংলার মানুষ একটি আন্তর্জাতিক খ্যাত ঐতিহাসিক সম্পদ থেকে বঞ্চিত থাকবে। কারণ এ পুস্তকটি বিশ্বের প্রধান প্রধান চারটি ভাষায় অনুদিত হয়ে মানুষের মনে নব আন্দোলন সৃষ্টি করেছে। ইংরেজী, ফরাসী, ল্যাটিন ও উর্দু ভাষায় অনুদিত হয়ে বহু সংস্কার এর ফুরিয়ে গিয়েছে। আমেরিকার ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় এ পুস্তকটি নিয়ে বহু পণ্ডিতেরা আজ গবেষণায় নিমগ্ন। আর আরবী ভাষায়তো এর জন্মই। সুতরাং মধ্যপ্রাচ্যে এর প্রভাবের কথা আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তাই আমরা বাংলার মানুষ যদি এ সম্পদটি থেকে বঞ্চিত থাকি, তা সত্যিই বেদনার কথা ছাড়া কিছু নয়। বস্তুতঃ আজ আমি ইসলামের এহেন সঙ্কটকালে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কোমল হাতে আমার বইখানা তুলে দিয়ে বিদায় নিচ্ছি। জানি না কোন ধর্মভীরু বীরচেতা প্রকাশের দ্বারা আমার এ প্রচেষ্টা সাফল্যের শীর্ষ চূড়ায় গিয়ে উপনীত হবে। আমি তার জন্য কায়মনোবাক্যে জানাই প্রার্থনা, কামনা করি তার নিরলস দীর্ঘায়ু, আর পরকালীন উন্নতি ও সমৃদ্ধি। আয় আল্লাহ! আপনার দরবারে ফরিয়াদ– এ অসিলায় আমাকে কবুল করে নিন। আর এ প্রচেষ্টাটুকু লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক, পাঠকসহ আমাদের সকলের পরকালীন সাফল্যের উপকরণে অবলোকন করার সুযোগ দিন। আমীন। ইয়া রাব্বুল আলামীন!

বিনীত

খাকসার–

মোঃ কারামত আলী নিযামী

২১ শে এপ্রিল ১৯৭২ সন

নেছারাবাদ, পোঃ বাসণ্ডা, ঝালকাঠি

গ্রন্থকারের জীবনী

"ইসলামী জগত" যে সকল মুসলিম মনীষী ও ইসলামী চিন্তাবিদদেরকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে মিসরের সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ হলেন সেই কাতারেরই একজন শীর্ষস্থানীয় ইসলামী চিন্তাবিদ ও সাবলীল লেখক। তার ক্ষুরধার লেখনীশক্তি তাকে যেমন জগতের বুকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে, অনুরূপ মানুষকে দিয়েছে এ অন্ধকারময় যুগে নব আলোর সন্ধান তাঁর লিখিত রচনাবলী আজ জড়বাদী সভ্যতা তথা জাহেলী শক্তির সামনে একটি বিরাট প্রতিবন্ধক হিসেবে দণ্ডায়মান। তার ক্ষুরধার লেখা জাহেলী সভ্যতার ধারক ও বাহকদের নিকট অসহনীয় বিধায়ই শেষ পর্যন্ত তাকে এ জগত থেকে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য করেছেন। বস্তুতঃ ইসলামী জগত তথা সমগ্র বিশ্ব মানবতার জন্য তার ন্যায় একজন প্রতিভাবান ব্যক্তির অবদান সত্যই যে নব পথের সূচনা করেছে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এ পুস্তকটিই তার জলন্ত স্বাক্ষর।

সাইয়্যেদ কুতুব মিসরের আস্ সাউয়্যুত প্রদেশের "মোশা" নামক গ্রামে ১৯০৬ ইংরেজী সালে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল হাজী কুতুব ইব্‌রাহীম, আর মাতার নাম ছিল ফাতিমা হোসাইন ওসমান। তারা উভয়ই আরবী বংশোদ্ভুত ছিলেন। সাইয়্যেদ কুতুব ছিলেন তার ভ্রাতা-ভগ্নীদের মধ্যে সকলের জেষ্ঠ্য। তার ছোট ভ্রাতাও একজন নামজাদা লেখক। তার "আল্ ইন্‌সান বাইনাল মাদাদায়াতে আল ইসলাম" এবং 'সুবহাতে হাওলুল ইসলাম নামক পুস্তক দু'টি খুব উচ্চাংগের পুস্তক। তার ভগ্নিও ইসলামী আন্দোলনের একজন বিপ্লবী কর্মী ও লেখিকা ছিলেন। তার পিতার জীবিকা অবলম্বনের একমাত্র পেশা ছিল কৃষি। মাতা ছিলেন একজন অন্যতম দ্বীনদার বিদ্ধুষী স্বনাম ধন্যা মহিলা। পবিত্র কালামে মজীদের সাথে তার সম্পর্ক ছিল নিবিড় ও একান্ত ঘনিষ্ঠ। তাই মনের একান্ত তাগিদেই তিনি বাল্য জীবনেই সাইয়্যেদ কুতুবকে পবিত্র কুরআন মজীদের হাফেজ করে ছিলেন। তখন কুরআন মজীদের সাথে তার বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গ্রামের মাদ্রাসায়ই সুসম্পন্ন হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে শিক্ষা লাভ এমন একটি স্কুলে সম্পন্ন হয়েছিল, যে স্কুলের নাম ছিল "তাজহিয়াজুল উলুম"। এখানে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনকারী ছাত্রদেরকে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হবার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হতো।

অতএব তিনি ১৯২১ সালে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে সেখান থেকে ১৯৩৩ সালে বি, এ, ডিগ্রি এবং ডিপ্লোমা ইন ইডুকেশন ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্র অবস্থায় তিনি সকলের নিকট একজন প্রগাঢ় ধীশক্তি সম্পন্ন ছাত্র রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তখন থেকেই কাব্য রচনা ও সাহিত্য রচনা পানে তার মনে প্রবল প্রবণতা দেখা দিয়াছিল। আর এ প্রবণতাই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিকাংশ সময় অনুপস্থিত থাকার কারণে পরিণত হয়েছিল।

শিক্ষা জীবন শেষ করেই তিনি শিক্ষা দফতরের অধীনে ইন্সপেক্টর অব স্কুলস পদে চাকুরী গ্রহণ করেন। উক্ত পদে ১৯৫২ সন পর্যন্ত তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ পদ গ্রহণের পূর্বে শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষা নবীসদের ট্রেনিং দান বিষয় গবেষণার উদ্দেশ্যে আমেরিকায় শিক্ষা দপ্তর কর্তৃক আহূত হয়ে ১৯৪৯ সনে প্রেরিত হয়েছিলেন। দু'বৎসর সেখানে গবেষণার কাজ শেষ করে ১৯৫১ সনে দেশে ফিরেছিলেন। আমেরিকায় অবস্থানকালে তিনি কিছু দিনের জন্য সেখানে বিভিন্ন কলেজ ইউনিভার্সিটি ও তার শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করার সুযোগও পেয়েছিলেন। ওয়াশিংটনের উইলসন টিচার্স কলেজ, গেরলী ফলোরিডা টিচার্স কলেজ আর ক্যালি ফোর্নিয়ার ইষ্টার্ণ ফোর্ড ইউনির্ভাসিটিতে অবস্থান করতেন। এ ছাড়া নিউইয়র্ক, শিকাগো, সানফ্রানসিসকো, লাইসনজিলস এবং সেখানে আরো অনেক শহরে যাবার সুযোগ তার হয়েছিল। আমেরিকা হতে দেশে ফিরার পথে তিনি ইটালী এবং সুইজারল্যান্ডেও কয়েক সপ্তাহ কাল যাপন করেছিলেন। কিন্তু ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার এ পুস্তকখানি তিনি রচনা আরম্ভ করেছিলেন ১৯৪৬ সালে এবং তা শেষ করতে সময় লেগেছিল পূর্ণ দু'টি বছর। এ পুস্তকটি রচনার পূর্বে তিনি সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অনেক পুস্তকই রচনা করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তা প্রকাশ করার বেলায় স্বীয় অমতের কথাও প্রকাশ করেছিলেন। তিনি পবিত্র কালামে মজীদের প্রতি সাহিত্য ও অলংকার শাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে 'আত্তাসবীরুল ফন্নী ফীল কুরআন' ও 'আল মোশাহিদাতুল কিয়ামত ফিল কুরআন' নামক দু'খানি উচ্চাংগের পুস্তক রচনা করেছিলেন। তা সাহিত্যিক সমাজে সর্বজন সমাদৃতও হয়েছিল। তখন থেকেই ইসলাম ও কুরআন শরীফের উপর তার গবেষণা কার্য আরম্ভ হয়।

এ পুস্তকটি হচ্ছে তার প্রথম পদক্ষেপ স্বরূপ। তিনি তার জীবনে ছোট-বড় সর্বমোট একুশ খানা পুস্তক রচনা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। ইসলামী মতবাদের উপর যে সকল পুস্তক প্রকাশ হয়েছে তার অধিকাংশই তিনি কারারুদ্ধ অবস্থায় থাকাকালে রচনা করেছিলেন। এখানে সবগুলোর নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তবে ইসলামী মতবাদের উপর রচিত বিশ্বের সর্বত্র প্রসিদ্ধ বইগুলোর নাম উল্লেখ করছি।

১। ফি যিলালুল কুরআন (কুরআনের তাফসীর কারারুদ্ধ কালে রচনা), ২। আত্‌তাসবীরুল ফন্নী ফীল কুরআন, ৩। মুশাহিদাতুল কিয়ামত ফিল কুরআন, ৪। মুয়ারেকাতুল ইসলাম ওয়া রেসামালীয়া (ইসলাম ও পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব), ৫। আস্‌সালামুল আলমী আল ইসলাম (ইসলাম ও বিশ্ব শান্তি), ৬। আল্‌ আদালাতুল ইজতেমাইয়াতু ফীল ইসলাম (ইসলামে সামাজিক সুবিচার), ৭। আল্‌ মুয়ালাম ফীত্‌ তরীক।

সাইয়্যেদ কুতুবের রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ হয় মিসরের ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী মুজাহিদ আল ইখওয়ানুল মুসলেমুন দলের সংস্পর্শে এসে। আমেরিকায় যাবার পূর্বে হতেই তার এ পার্টির সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ইখওয়ানের প্রতিষ্ঠাতা মোর্শেদে আম মরহুম হাসানুল বান্নার সাথে তার ব্যক্তিগত মতানৈক্য থাকায় এ সম্পর্ক গাঢ় হতে পারছিল না। আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তন করে তিনি ইখওয়ানের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ছিলেন। তিনি ইখওয়ানের ৫৩তম রোকন হয়ে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ইসলামের খেদমত আরম্ভ করেছিলেন। তখন থেকেই তার কলম ও লেখনী শক্তি ইসলামের জন্য ওয়াকফ হয়েছিল। ইখওয়ানের সাপ্তাহিক মুখপত্র "আদ্‌দাওয়াত" পত্রিকাটির এমন কোন সংখ্যা প্রকাশ হতো না যে সংখ্যায় তার লিখিত কোন না কোন একটি প্রবন্ধ স্থান না পেত। পার্টি তাকে কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগের জেনারেল সেক্রেটারী মনোনীত করেছিলেন। তিনি পার্টির লীটারেচারগুলো ইংরেজী, ফ্রান্সী ও ইন্দোনেশীয় ভাষাসহ নব নব সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী প্রণয়ন করতঃ কাজ আরম্ভ করে ছিলেন। কিন্তু এ কাজের সূচনাতেই পার্টিকে মিসরের স্বৈরাচারী নাসের সরকার বেআইনী ঘোষণা করে। সাইয়্যেদ কুতুব মিসরের 'ইখওয়ানুল মুসলেমুনের' সাথে থেকে আন্তর্জাতিক মানবিক আন্দোলনের সাথেও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এক কালের ইসলামী আন্তর্জাতিক সংস্থা মোতামারে আলমে ইসলামীর ফিলিস্তিন শাখারও সেক্রেটারী নিযুক্ত হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসসহ সমগ্র সিরিয়া দেশটিও সফর করেছিলেন। ইখওয়ানুল মুসলেমুন দ্বিতীয়বার পুনরুজ্জীবিত হবার পর তার সাপ্তাহিক মুখপত্র 'আল ইখওয়ানুল মুসলেমুন' পত্রিকার সম্পাদক সাইয়্যেদ কুতুবকেই নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। কিন্তু পার্টি প্রথমবারে আইনতঃ নিষিদ্ধ ঘোষণার সাথে সাথে ১৯৫৪ সনে পার্টির অন্যান্য শীর্ষ স্থানীয় কর্মীদের সংগে তিনিও গ্রেফতার হয়ে কয়েদখানা থেকে রেহাই না পাবার দরুণ উক্ত সম্পাদক পদে সমাসীন হতে পারেননি। পত্রিকায় প্রকাশ যে ঐ সময় ইখওয়ানের এক লাখ কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। প্রথমতঃ সাইয়্যেদ

কুতুবকে জেলখানায় অসহনীয় জুলুম অত্যাচারের গ্রাসে নিপাতিত হতে হয়েছিল। পরে অবশ্য তাকে আরাম-আয়েশে থাকার এবং জ্ঞান গবেষণা ও পুস্তক রচনা করার সুযোগ দেয়া হয়েছিল। এ সুযোগেই তিনি বিভিন্ন পুস্তক রচনা করেছিলেন। সাইয়্যেদ কুতুবরেব বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের বিচার অনুষ্ঠানের নিমিত্ত যে সামরিক আদালত গঠন হয়েছিল, উক্ত আদালতের সামনে তিনি এ কথা প্রকাশ করেছিলেন যে, যদি সরকার আমাকে মন্ত্রীত্ব দান করে এবং বিনা শর্তে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ঢালাই করে পুর্ণগঠন করণের পূর্ণ স্বাধীনতা দান করে তবে আমি তা গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু সরকার তার এ প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে দীর্ঘ দশটি বছর কারাগারের বন্দীশালায় জীবন কালাতিপাত করতে বাধ্য করেছিল। পরে ১৯৬৪ সালে যদিও গোটা কয়েক দিনের জন্য জালেম শাহী তাকে মুক্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু আবার আকে ১৯৬৫ সালে আগষ্ট মাসে গ্রেফতার করল। ইরাকের তদনীন্তন প্রেসিডেন্ট তার দ্বীনি পুস্তকাবলী থেকে স্বীয় প্রভাবিত হবার কথা জানিয়ে প্রেসিডেন্ট নাসেরের নিকট তাকে মুক্তিদানের বার বার সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতেই নাসের তাকে মুক্তি দিয়েছিল। কারণ তখন ইরাকের সাথে মিসরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। কিন্তু পরে এ সম্পর্ক বহাল ছিল না। পরিশেষে তাকে ফাঁসির কাষ্ঠে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার ঘোষণার সময় ইরাকের প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহামান আরিফ সাহেব এ দণ্ডাদেশ পরিবর্তন করার সুপারিশ.জানালে প্রেসিডেন্ট নাসের তা প্রত্যাখ্যান করে।

মিসরের সরকারী মুখপাত্র দৈনিক আল আহরাম সহ অন্যান্য পত্রিকান্তরে প্রকাশ যে, দ্বিতীয়বার তাকে গ্রেফতার করার কারণ ছিল একমাত্র তার স্বলিখিত 'মুয়া'লাম ফীত্ তরীক' পুস্তকটি। অর্থাৎ এ পুস্তুকে তিনি মিসরের মুসলমানকে একটি জাহেল সমাজে মুসলমান উন্মৎ নাম অভিহিত করার ন্যাক্কারজনক খোড়া অভিযোগ আনয়ন করে তাকে গ্রেফতার করেছিল। এ ছাড়া সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা, জনগণকে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার উস্কানি প্রদান, দেশের অভ্যন্তরে সংঘঠিত ধ্বংসাত্মক কার্যাবলী করণ ইত্যাদি আরও অনেক মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করেছিল। কিন্তু আদালত এ অভিযোগগুলোর একটিও সত্য প্রমাণ করতে পারে নি। দ্বিতীয়বার গ্রেফতার কালে তিনি বলেছিলেন– আমি জানি এবার সরকার আমার মাথাটি নিতে চায়। কিন্তু আমি যেমন লজ্জিত তেমনি আমার মৃত্যুর জন্য কোন আফ্সুসও নেই। ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াতের পথে যে আমার মৃত্যু হবে, এটাই আমার পরম সৌভাগ্য। সত্য পথের পথিক কে ছিল, ইখওয়ান না সরকার; এ কথার বিচার করবেন ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক বৃন্দ।"

সাইয়্যেদ কুতুবের বিচার করার জন্য মিসরের প্রেসিডেন্ট ট্রাইবুনাল নামে যে আদালতটি গঠন করেছিল, তাকে বাহ্যিক দিক দিয়ে আদালত বলা গেলেও তার গঠন প্রকৃতি ও কর্ম-পদ্ধতির দিক দিয়ে একটি সামরিক আদালত নামেই অভিহিত করা যায়। আদালতের সমগ্র কর্মপদ্ধতি উপর সেন্সারসীফ আরোপ করা হয়েছিল। এমনকি তার কার্যবিবরণী প্রকাশের বেলায়ও পত্রিকা সমূহের উপরও সেন্সারসীপ প্রবর্তন করেছিল। আসলে এটা কোন আদালতই ছিল না, বিচারের নামে প্রহসন বৈ কিছুই নয়। স্বৈরাচারী জালেম শাহীর ইচ্ছাকে রূপদান করাই ছিল আদালতের উদ্দেশ্য। এ জন্য রাজবন্দীদের অধিকার বলতে আন্তর্জাতিক আইনে যা কিছু সংরক্ষিত রয়েছে তা সেখানে সবই লঙ্ঘন করা হয়েছিল। এমনকি আদালতের সম্মুখে যে সাইয়্যেদ কুতুবকে তার নিজস্ব বক্তব্য পেশ করার অধিকারটুকু পর্যন্ত দেয়া হয়নি; তা আদালতের কার্যবিবরণী দেখলেই বুঝা যায়। আরব দেশসমূহের ওয়াকীলগণ একটি কনফারেন্সে এ রেজুলেশন পাশ করেছিলেন যে, যে কোন আরব দেশীয় রাজনৈতিক বন্দীদের আইনগত অধিকার ও আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আরব দেশ সমূহের সকল ওয়াকীলদের অধিকার থাকবে। যে কোন দেশে গিয়ে তারা আসামীর পক্ষ সমর্থন করতে পারবে। তদানীন্তন নাসের সরকারও এ রেজুলেশনটি মঞ্জুর করেছিল। কিন্তু সাইয়্যেদ কুতুব ও ইখওয়ান কর্মীদের বিচারের সময় যখন তাদের পক্ষে ওকালতী করার জন্য বিভিন্ন আরব দেশের ওয়াকীলগণ নাসের সরকারের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলো তখন সে অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছিল। এমনকি সুদান এবং মারাকেশ থেকে যে সকল ওয়াকীলগণ কায়রো এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাদেরকে অতিসত্বর কায়রো ত্যাগেরও নির্দেশনামা জারি করতে নাসের সরকার লজ্জাবোধ করেনি। প্রকাশ থাকে যে, মিসরীয় আইন অনুযায়ী সুদানের ওয়াকীলদের জন্য মিসরের আদালতের মোকদ্দমায় ওকালতী করার সাধারণ অধিকার রয়েছে। এ ছাড়া রাজনৈতিক বন্দীদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য "ইন্টার ন্যাশন্যাল ইমিনিটি' নামে যে আন্তর্জাতিক সংস্থাটি রয়েছে, উক্ত সংস্থার একজন প্রতিনিধি উক্ত মোকদ্দমায় অংশ গ্রহণের নিমিত্তে নাসের সরকারের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে দরখাস্ত করলে সে দরখাস্তও তারা প্রত্যাখ্যান করে। পরিশেষে উক্ত প্রতিনিধি দর্শক রূপে আদালতের গ্যালরীতে বসার নিমিত্তে অনুমতি প্রার্থনা করেও প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। ১৯৬৬ সনের পঁচিশে এপ্রিলে উক্ত সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত বিবৃতি পাঠ করলেই এ কথাগুলোর সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। সে বিবৃতিতে বলা হয়েছিল যে, মিসরীয় সরকার প্রেস কর্তৃপক্ষ, সাংবাদিক ও পাবলিকদের জন্য উক্ত আদালতে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে তার কার্যবিবরণীর

উপর সেন্সারসীপ আরোপ করেছে। সেখানে এও বলা হয়েছে যে, আসামীদের প্রতি অসহনীয় জুলুম অত্যাচার করে তাদের থেকে অপরাধের স্বীকারোক্তি নেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছে। এ কথাটি সাইয়্যেদ কুতুবও আদালতের সামনে পেশ করেছিল কিন্তু আদালত এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি। মোটকথা শুধু কেবল সাইয়্যেদ কুতুবই নয়, তার পরিবারের লোকজনের উপরও জালেম শাহী অত্যাচারের ষ্টীম রোলার চালিয়েছিল। সাইয়্যেদ কুতুবের ভ্রাতা মোহাম্মদ কুতুব এবং তার ভগ্নি আমেনা ও হামিদাকেও কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। এ ছাড়া ইখওয়ানের অন্যান্য কর্মীদের প্রতি যে বরবরতা মূলক অত্যাচার করা হয়েছে তার বর্ণনা শুনলে কোন ইসলাম দরদীর হৃদয় বিদীর্ণ না হয়ে পারে না। মোটকথা সাইয়্যেদ কুতুবসহ ইখওয়ানের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দকে হত্যা করে ইসলামী আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়াই ছিল জালেম শাহীর উদ্দেশ্য। তাই তদানীন্তন মিসেরর জালেম সরকার ইসলামী আন্দোলনের এ কর্মবীর এবং তার দু'জন অন্তরঙ্গ বন্ধু মোহাম্মদ ইউসুফ হওয়াস্ এবং আবদুল ফাত্তাহ ইসমাঈলকে উনত্রিশে আগষ্ট ১৯৬৬ সালে সোমবার অতিপ্রত্যুষ্যে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে তাদের জীবন প্রদীপ নিবিয়ে দিল। ইন্নালিল্লাহে ... কিন্তু তাদের জীবন প্রদীপ নিবিয়ে দেয়া হলেও তারা যে অসংখ্য মুসলিম নর-নারীর অন্তরপুরে ইসলামের নূরানী প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে সে প্রদীপ জালেম শাসকরা নিভাতে পারবে কি?

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

ধর্ম ও সমাজ

ইসলামী দর্শন বনাম খ্রীষ্টীয় দর্শন

কোন ধনবান ব্যক্তি স্বীয় ভাণ্ডারের ধন-সম্পদ আরব্ধ কাজের জন্য যথেষ্ট কি যথেষ্ট নয় তা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও হিসাব-নিকাশ না করা পর্যন্ত অন্যের থেকে যেমন ঋন গ্রহণ করে না, তেমনি কোন রাষ্ট্রও স্বীয় মওজুদকৃত ধন-সম্পদ খাদ্য সামগ্রী খেত-খামারের উৎপন্ন ফসল এবং প্রাকৃতিক উপায় প্রাপ্ত সম্পদের হিসাব-নিকাশ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করা পর্যন্ত অন্য দেশ থেকে কোন দ্রব্য আমদানী করে না। কিন্তু প্রশ্ন হলো যে, আমাদের নিকট দৈনন্দিন জীবনের আবশ্যকীয় বস্তু ও ব্যবসায়ী দ্রব্যাদি যতটুকু গুরুত্ব ও মর্যাদা পাবার অধিকার রাখে, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উর্বরতার সম্পদ এবং মন ও বিবেককে সক্রিয় ও জীবিত রাখার দ্রব্য সামগ্রী কি আমাদের নিকট ততটুকু গুরুত্ব ও মর্যাদা পাবার অধিকার রাখে না? এ প্রশ্নের জবাব সুস্পষ্ট। কিন্তু যে সব দেশকে বর্তমানে মুসলিম জাহান বলা হয় সে সব দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থা হলো– তাঁরা নিজেদের আধ্যাত্মিক ভাণ্ডার ও চিন্তা জগতের সম্পদের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ ব্যতিরেকেই সাত সমুদ্দুর তের নদীর ওপার থেকে অথবা নিকটস্ত অন্য কোন উন্নয়নশীল দেশ থেকে নিজেদের জন্য দর্শন-নীতিমালা, আইন-কানুন, সমাজ বিধান ইত্যাদি সবকিছু আমদানী করার সিদ্ধান্ত নেয়।

তারা যখন নিজেদের সমাজের পানে তাকায়, তখন তাদের সামনে এমন একটি নগ্ন চিত্র ফুটে উঠে যে তারা সমাজটাকে অন্তঃসার শূন্য দেখতে পায়– যে

সমাজে নেই শান্তি-নিরাপত্তা, বিচার-ইনসাফ, যেখানে পায় না তাঁরা মানবতার লেশ চিহ্ন। অতঃপর তাদের দৃষ্টি ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, রাশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, ভারত ইত্যাদি দেশের পানে চলে যায়। আর তারা যেমন সে সকল দেশ থেকে জাগতিক জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী আমদানী করে, তেমনি সে সব-দেশের দর্শন-নীতিমালা, আইন-কানুন ও চিন্তাধারা দ্বারা নিজেদের জটিল সমস্যাসমূহ সমাধানের প্রয়াসী হয়। অবশ্য এ চাওয়া-পাওয়ার ভিতর বিরাট পার্থক্য ও ব্যবধান বিদ্যমান রয়েছে। জাগতিক জীবনের আবশ্যকীয় দ্রব্য-সামগ্রী আমদানী করার পূর্বে তারা যেমন নিজেদের আভ্যন্তরীণ সম্পদের হিসাব-নিকাশ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে করে তেমনি বাজারে বর্তমানে কি কি দ্রব্য রয়েছে এবং কি কি জিনিসের প্রয়োজন, তা দেখার সাথে সাথে নিজেদের উৎপাদন শক্তিরও একটি মোটামমুটি ধারণা ও পরিমাপ করে। কিন্তু মৌলিক ও বুনিয়াদী নীতিমালা রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন এবং জাগতিক জীবন পরিচালনার নিয়ম-নীতি গ্রহণের সময় নিজেদের জাতীয় চিন্তা জগতের কোষাগারে কি পরিমাণ সম্পদ রয়েছে, তা তাদের প্রয়োজন পূরণার্থে যথেষ্ট কিনা ইত্যাদি হিসাব-নিকাশ ও পরিমাপ করার কষ্টটুকু স্বীকার করতে তারা আদৌ সম্মত নয়। তাদের সামগ্রিক অবস্থা, দর্শন, ইতিহাস, ধ্যান-ধারণা, আকিদা-বিশ্বাস, জাগতিক প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার মূল্যমান সাত সমুদ্দুর তের নদীর ওপারের অথবা ভিন্ন দেশ ও জাতির ইতিহাস, দর্শন, চিন্তাধারা ও আকিদা-বিশ্বাস এবং জীবন ধারনের রীতি-নীতির সাথে যতই বৈপারিত্য অবস্থা বিরাজমান থাকুক না কেন, তারা গনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র অথবা সাম্যবাদের নীতিমালা দ্বারা নিজেদের সমস্যার সমাধানের প্রয়াসী হওয়ায় কিছু মাত্র অসুবিধা অনুভব করে ন। আর এ জন্য নিজেদের আধ্যাত্মিক জগত ও চিন্তা-জগতের সমুদয় সম্পদ থেকে যেমন অনায়াসে তারা হাত গুটিয়ে বসে তেমনি জাতীয় দর্শন, ইতিহাস, চিন্তাধারা ও নীতিমালার আলোকে নিজেদের সমস্যা সমূহের যে বাস্তব সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় তার পানে দেখেও দেখে না। তাকে দৃষ্টির আঁড়ালে ফেলে যেতে বিন্দুমাত্র তাদের বিবেকে বাঁধে না।

তারা বলে যে ইসলামই হলো তাদের একমাত্র ধর্ম, আর মাঝে মাঝে তারা নিজেদেরকে ইসলামের পৃষ্ঠপোষক, মঙ্গলাকাংখী ও সাহায্যকারী বলে বড় গলায় দাবি করে। অথচ তারা ইসলামকে কর্মময় জীবনের বাস্তব ক্ষেত্র থেকে বহু দুরে ফেলে রেখেছে। তার সাথে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক তারা রাখে না। তারা ভাবাবেগ ও

উন্মত্ততার অন্ধকারময় কোঠায় এমনভাবে নির্বাক হয়ে বসে আছে যে, তারা না পারে নিজেদের উপর কর্তৃত্ব করতে এবং না রাখে কর্মময় জীবনের উপর কোন অধিকার। এমনি রূপ তারা না করতে পারে কর্মময় জীবনের জটিল সমস্যার কোন সমাধান। এর কারণ কি? এর কারণ হলো সাধারণ মানুষের মনের ধারণা হচ্ছে যে আল্লাহ্ এবং বান্দার মধ্যে একটি সম্বন্ধের নাম হলো ধর্ম। মানবতার সম্পর্ক হচ্ছে সামাজিক ক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পরের সাথে ওৎপ্রোত ভাবে জড়িত থাকার সম্পর্ক। আর জীবনের বাস্তব সমস্যাসমূহ এবং রাষ্ট্রীয় নীতি ও অর্থনৈতিক কর্মসূচীর যেখানে প্রশ্ন রয়েছে, সেখানে তার ভিতর ধর্মের না আছে কোন প্রবেশ অধিকার, আর না আছে তার সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক। তারা ধর্মকে অস্বীকার করে না– এ হলো তাদের মনের ধারণা। আর এক প্রকার লোক যারা ধর্মের অস্তিত্বকে স্বীকার করতে আদৌ সম্মত নয়। এ নাস্তিকতাবাদীরা বলে যে, আমাদের সামনে ধর্মের নামই উচ্চারণ করবে না। ধর্ম মানব জীবনের জন্য আফিমের মত বস্তু। অত্যাচারী শাসকবৃন্দ ও পুঁজিপতিরা ধর্মকে মজদুর শ্রেণী ও শ্রমিক-জনতাকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কল্পনা রাজ্যের মধ্যে নিপতিত রাখার জন্য এবং অকর্মন্য মানুষের অনুভূতি জ্ঞান-বুদ্ধি বিবেচনাকে নির্জীব ও তাদের স্মৃতি শক্তিকে দমিয়ে রাখার নিমিত্ত ব্যবহার করে।

তারা ইসলামের প্রাকৃতিক রূপরেখা এবং তার ইতিহাস সম্পর্কে এহেন অভিনব মতাদর্শ ও ধ্যান ধারণা কোথায় পেল? নিজেদের জাগতিক জীবনের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সাত সমুদ্দুর তের নদীর ওপার থেকে অথবা নিকটস্থ ভিন্ন দেশ থেকে আমদানী করে থাকে। এ অভিনব মতাদর্শ ও ধ্যান-ধারণাও সম্ভবতঃ সেখানে থেকেই আমদানী করেছে। নতুবা ধর্ম ও বস্তু জগতের মধ্যে পার্থক্য রেখার এ উপাখ্যান যেমন প্রাক ইসলামী দেশ সমূহের দ্বারা সৃষ্টি হয়নি, তেমনি ইসলাম এহেন ধ্যান-ধারণা ও মতাদর্শের সাথে কখনো পরিচিতও ছিল না। আর মানুষের মনে ইসলামের প্রভাব প্রতিপত্তির কারণেও এ ধারণা সৃষ্টি হয়নি যে, ধর্ম মানবিক অনুভূতি ও জ্ঞান-বুদ্ধির জন্য মৃত্যুবান স্বরূপ। ইসলামের প্রাকৃতিক স্বরূপের সাথে এ ধ্যান-ধারণার বিন্দু বিসর্গ পরিমাণ কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু এ কথাগুলো পাশ্চাত্যের মানস সন্তানেরা তোতা পাখীর ন্যায় বার বার জনসম্মুখে প্রচার করে। এ নতুন মতবাদ কোথা থেকে আমাদের ভিতর প্রসার লাভ করলো এবং তার মূল রহস্যভেদই বা কি, তা জানার জন্য একবারও তাদের মনে কৌতুহলের উদ্রেক হয় না। কেবল বানরের ন্যায় অপরের মুখের কথা অনুকরণ

করে। এতটুকু কষ্ট স্বীকার করতে তারা প্রস্তুত নয়। এখন চিন্তা করুন তারা কোন প্রকৃতির মানুষ। এখন আমি পাঠকবর্গের সামনে মুসলিম সমাজে কিরূপে এ মতাদর্শ প্রসার লাভ করলো এবং এর উৎসমূল কোথায় তা আলোচনা করবো।

প্রাচীন রোমান সমাজের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, খ্রীস্টান ধর্ম রোমান রাজতন্ত্রের ছত্র ছায়ায়ই লালিত-পালিত হয়ে এসেছে। এ সময় ইয়াহুদী ধর্ম শুষ্কতার অনার্দ্রতার শিকারে পরিণত হয়ে সমাজ দেহের উপর পক্ষাঘাতের চিহ্নের ন্যায় নিষ্প্রাণ প্রথা ও বাহ্যিক অনুষ্ঠান বা প্রদর্শনী সর্বস্ব পরিণত হয়েছিল। বর্তমানে ইউরোপে যে সকল আইন-কানুন ও বিধান প্রচলিত রয়েছে তার উৎসমূল হলো সে সকল আইন বিধান, যা তৎকালীন যুগে রোমান সাম্রাজ্যে প্রচলিত ছিল। তারা তাদের সমাজের নিয়ামক হিসেবে নিজেদের সমাজের বিশেষত্ব পূর্নবহাল রাখার নিমিত্ত এবং সমাজকে সুসংগঠিত করার মানসে নতুন নতুন আইন-কানুন ও বিধান রচনা করেছিল। কিন্তু খ্রীস্টানরা তাদের আইন ও বিধানকে গ্রহণ করা যেমন প্রয়োজন মনে করলো না, তেমনি অটল অচল ও সুদৃঢ় রোমান ষ্টেট এবং সুসংগঠিত সুশৃঙ্খল রোমান সমাজের জন্য নতুন কোন আইন-কানুন ও বিধান রচনা করে স্বীয় সৃজনশীল আদর্শ ও নীতিমালা অনুযায়ী দেশ সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করার সৃজনশীল শক্তিও তাদের ছিল না। এদিক বর্জন করে আত্মার পবিত্রতা, পরিচর্যা ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা সাধনের কাজে তারা মনোনিবেশ করলো। আর এ কাজকেই তারা অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ মনে করে তাকেই সবার উপরে প্রাধান্য দিল। এর চেয়ে অধিক করার মত তাদের কিছু ছিল না। এ ছাড়া তাদের প্রতিপক্ষ ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের নিষ্প্রভ নিষ্প্রাণ প্রথা সমূহ ও ইবাদত অনুষ্ঠানাদির সমালোচনা করতঃ মৃতবৎ ঘুমন্ত ইসরাঈলী সম্প্রদায়কে সজাগ করে তাদের মধ্যে প্রাণ চাঞ্চল্য আনয়নের কাজে ব্যাপৃত থাকাই ছিল তাদের দ্বিতীয়তম কাজ।

তৎকালীন যুগে খ্রীস্টান সম্প্রদায় যে আধ্যাত্মিকতার চর্চা এবং জাগতিক জীবনের কর্ম মুখর কোলাহল থেকে মুক্ত হয়ে ধৈর্য সহিষ্ণুতা ও বৈরাগ্যবাদের চরম শিখরে আরোহণ করেছিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনে একটি ধর্মের পক্ষে যা কিছু ক্রিয়া-কর্ম দেখাবার প্রয়োজন সম্ভাব্য সব কিছুই তা সে মানুষকে দেখিয়েছে। 'মন-মগজের পরিচর্যা, আত্মার শুদ্ধিকরণ এবং মানবিক কুবৃত্তি নিচয়ের প্রক্রিয়াশীল শক্তিকে এমনভাবে পর্যুদস্ত করে ছিল যে, জাগতিক জীবনের প্রয়োজনীয় চিন্তার উপর পরকালীন চিন্তা

প্রাধান্য বিস্তার করে বসলো। ভাবজগতের পবিত্র আকাংখাই শেষ পর্যন্ত তাদের লক্ষ্যবস্তু বা মন্‌যিলে মাকসুদে পরিণত হলো। আর এ কাজ করনে তারা সামাজিক শান্তি, নিরাপত্তা, বিচার, ইন্‌সাফ, আইন-কানুন ইত্যাদি থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রের শাসকবর্গের হাতে তার দায়িত্ব অর্পণ করল। ফলে তারা মানব রচিত সেকুলার আইন-কানুন ও নীতিমালা দ্বারা সমাজ গঠন ও তার পূর্ণবিন্যাসের কাজে আত্মনিয়োগ করলো। কারণ খ্রীস্টানদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা আত্মা ও মনোজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। গীর্জার পীর-পুরোহিতরা খ্রীস্টান ধর্মকে বিশেষ সীমার মধ্যে যে রূপরেখা অংকিত করে ছিল এবং যে সীমার মধ্যে লালিত-পালিত হয়ে এসেছে, তার সাথে তাদের এ নীতির যুক্তিভিত্তিক বিজ্ঞান সম্মত সমপর্ক বিদ্যমান ছিল। আর তৎকালীন যুগে ইসরাঈলী সম্প্রদায়ের জন্য প্রয়োজন মাফিকও যুক্তিযুক্ত ছিল তাদের এহেন ধর্ম নিরপেক্ষতা তথা– সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে সরিয়ে রাখার নীতি। এ ছাড়া তাদের জন্য অন্য কোন বিকল্প পথও ছিল না।

খ্রীস্টান ধর্ম যখন স্বীয় এহেন রূপ-আকৃতি নিয়ে সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে ইউরোপে প্রবেশ করলো, তখন সেখানে তাদের রোমান সম্প্রদায়ের সাথে বেশ আন্তরিকতা গড়ে উঠলো। যারা ছিল গ্রীসের মুর্তিপূজা সাদৃশ বস্তবাদী সভ্যতার অন্যতম উত্তরাধিকারী। এ ছাড়া ইউরোপের অন্যান্য স্থানের সেই সকল সম্প্রদাযের সাথেও তাদের সামাজিক জীবন গড়ে উঠতে লাগলো, যারা সবে মাত্র অসভ্যতা, বর্বরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছিল। আর সেখানে যে সকল সম্প্রদায় ছোট ছোট দেশ ও ভূখন্ডে খুব ঘন বসতি স্থাপন করেছিল, তারা সর্বদাই পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ আত্মকলহ ও রক্তারক্তির মধ্যে দিন কালাতিপাত করতো। স্বভাবের দিক দিয়ে ছিল যেমন তারা ভয়ানক কঠিন ও উগ্র মেজাজী তেমনি তাদের কৃপণতা ও লোভ-লালসা ছিল প্রকৃতিগত স্বভাব। তাদের শিরা-উপশিরা ও রক্তের স্রোতের মধ্যে অসভ্যতার বর্বরতা বিদ্যমান ছিল। এ সব ভূখন্ডের অধিবাসীদের জন্য অল্পকিছু দিনের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে দিন অতিবাহিত করা এবং কিছু সময়ের জন্য অস্ত্র সম্বরণ করে থাকা কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। এ ছাড়া তাদের জন্য নিজেদের বাস্তব জীবন খ্রীস্ট্রীয় দর্শনের রূপ-রেখায় গঠন করতঃ আত্মার উৎকর্ষ সাধন করে উর্দ্ধজগতের পানে মনকে আকৃষ্ট করা এবং বস্তুজগতের কর্মময় জীবন থেকে বিমুখ হয়ে থাকা কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না।

এ সব জাতি যখন "ধর্ম মানুষের জীবনের কর্মক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত নয় এবং সে বাস্তব জীবনের উদ্ভূত পরিস্থিতি ও সমস্যাবলীর সমাধান দিতে অপারগ" এ কথা পরিষ্কার রূপে উপলব্ধি করতে পারলো, তখন তারা এ দর্শন আবিষ্কার করলো যে, ধর্ম হলো স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং বান্দা ও প্রভুর মধ্যে একটি গোপন সম্বন্ধের নাম। এ দর্শনের ভিত্তিতেই কিছু সময় গীর্জার ভিতর ধর্মের সুশীতল ছায়াতলে কাটিয়ে দেয়া অথবা হায়কলে মোকাদ্দাসের ভিতর কিছু সময় শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়া এবং সামাজিক জীবনে পূর্বের সেই অসভ্যতা ও বর্বরতার নিয়ম-নীতি, আইন-কানুন গ্রহণ করার ব্যাপারে তাদের মনে বিশেষ কোন সন্দেহ বা দ্বিধাদ্বন্ধের উদ্রেক হলো না। বর্বর ও অসভ্য যুগের আচরণের ন্যায় তারা এখানো বিচারকের তরবারীকেই শাসক মনে করতে লাগলো। অথবা তারা সভ্যজাতিতে পরিণত হবার পর রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনকেই চরম সিদ্ধান্ত রূপে গ্রহণ করলো। সুতরাং ধর্ম সর্বদাই মানুষের হৃদয়ের চৌকোঠার বন্দীশালায় নির্বাক হয়ে বসে রইলো। গীর্জা ও হায়কালে মোকাদ্দাসের গণ্ডী থেকে বর্হিজগতে পা ফেলাবার আর সৎ সাহস তার হল না। খ্রীস্টান ধর্ম এ দুনিয়ার বুকে এমন জীবন বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি যা মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বস্তরে প্রযোজ্য হয়ে বস্তুজগত এবং পরজগতের মধ্যে একটি অটুট সম্বন্ধ জুড়ে দিতে পারে।

ইউরোপীয়দের জীবনে দ্বীন-দুনিয়ার মধ্যে পার্থক্য এখান থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের আলোচনা এ সিদ্ধান্তেই উপনীত করে যে, ইউরোপীয়গণ কখনো একটি দিনের জন্যও খ্রীস্টান ধর্মকে গ্রহণ করেনি। যখন থেকে এ পার্থিব জগতে খ্রীস্টান ধর্মের আগমন হয়েছে, তখন হতে আজ পর্যন্ত সে সর্বদাই কর্মময় জীবনের গঠনমূলক উন্নয়নের ভূমিকা থেকে দূরে সরে রয়েছে। কিন্তু এ কথা দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, পাদ্রীগণ যদি সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের কর্মক্ষেত্র থেকে দূরে সরে না থাকতো, তবে খ্রীস্টান ধর্মীয় পীর-পুরোহিত যথা– ক্যাথলিক কার্ডনীল আর পোপপলদের পক্ষে বস্তুগত ও জাগতিক উন্নতির ধারাকে চলমান রাখা অথবা নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তিকে অক্ষুন্ন রূপে বহাল রাখা সম্ভব হতো না। পাদ্রী শাসকবৃন্দ সম্রাটদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও শক্তির সামনে একটি স্বতন্ত্র বিরোধী শক্তি স্বরূপ নিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনে নিজেদের আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা প্রভাব বিস্তার করে উপকৃত হবার চেষ্টা করা ছাড়া আর তাদের কোন উপায়ও ছিল না। কতিপয় দেশে প্রাদ্রীদের নিকট বিপুল পরিমাণ বিষয়-সম্পত্তি,

জমিদারী ও সামরিক শক্তি মওজুদ এবং সমাজের উপর তাদের এত বেশী প্রভাব বিরাজমান ছিল, যা সম্রাটদের সহায়-সম্পত্তি, জমিদারী, সামরিক শক্তি এবং তাদের প্রভাব প্রতিপত্তির তুলনায় কোন অংশে কম ছিল না।

আর এরূপ অবস্থার স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবেই চার্চ ও রাষ্ট্র এবং পোপ্পল ও সম্রাটদের ভিতর টানা-হেঁচরা দ্বন্দ্ব ও আকর্ষণ-বিকর্ষণের সূচনা হয়েছিল। এহেন নৈতিক ও স্নায়ু যুদ্ধে দেশের সাধারণ মানুষ প্রাদ্রীদেরই পক্ষ অবলম্বন করে তাদেরকে পরাজিত করেছিল। অতঃপর এ শক্তিদ্বয়ের মধ্যে সন্ধিস্থাপন হয়ে গেল, যার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষকে অনুগত ও শোষণ করার ব্যাপারে উভয় দলই নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষা করে চলা। এ ক্ষেত্রে কেহ কাহাকে বাঁধা প্রদান করবে না। তাদের এ স্বার্থ যেমন ছিল বস্তুগত স্বার্থ বা ধন-সম্পদের স্বার্থ, তেমনি এ ঝগড়া বিবাদের মূলগত কারণ ছিল পার্থিব শক্তি সঞ্চয় ও দেশের কর্তৃত্ব ভার নেয়ার সমস্যা।

এই হলো তৎকালীন যুগের আসল অবস্থা। সেকালে এ কথাও প্রচার করা হতো যে, সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত অধীনস্ত এবং তাদেরকে বোকা বানাবার নিমিত্ত ধর্ম হলো শাসক গোষ্ঠি ও ধর্মীয় পীর-পাদ্রী শ্রেণীদের জন্য একটি অমোঘ অস্ত্র স্বরূপ। আর ইউরোপীয়দের মনে ধর্ম সম্পর্কে এহেন ধারণা বদ্ধমূল থাকার দরুনই সেখানে এ কথাগুলো জনগণের মুখে প্রচার হতো।

যেহেতু পাদ্রীরা প্রথম থেকেই একটি পবিত্র সংস্থার রূপ পরিগ্রহ করে মানুষের দুনিয়া ও আখেরাত উভয় বিষয় নিয়েই তাদের উপর শাসন দণ্ড চালিয়ে এসেছে। তারা এমন ছিল যে, পরকালে কে বা কারা পরিত্রাণ পাবে, তাদের নাম-ধাম লিখে বছর বছর মোটা অংকের ফি তাদের থেকে আদায় করে সার্টিফিকেট বিক্রয় করতো। আর কারা কারা পরকালের এহেন মুক্তিসনদ থেকে বঞ্চিত রইলো তাদের নামও তারা ঘোষণা করতো। তারা মানুষের অর্ন্তনিহিত চেতনা অনুভূতি তাদের মনের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারা উভয়ের উপর সমভাবে প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল। যদি কোন ব্যক্তি তাদের এহেন অসৎ দুরভিসন্ধি ও কারসাজীর বিরুদ্ধে স্ববাক হয়ে উঠতো অথবা বিদ্রোহ ঘোষণা করতো তবে তারা তার প্রতি শত্রুতা পোষণ, নাস্তিকতা ও রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগ আনয়ন করে তাদেরকে হত্যা বা আগুনে পুড়িয়ে চিরতরে খতম করে দিতো। অবশ্য এ কাজের জন্য দেশের আদলতগুলোর অবৈধ সাহায্য গ্রহণ করা হতো। আর আদালতকেই তারা নিজেদের এহেন হীন কারসাজী চরিতার্থ করার নিমিত্ত মাধ্যম হিসেবে

ব্যবহার করতো। দ্বিতীয় রেনেসা আন্দোলন পর্যন্ত ইউরোপে এ অবস্থাই বিরাজমান ছিল। কিন্তু বর্তমান যুগের আগমন ধ্বনির সাথে সাথে পাদ্রীরা এ কথা ভালরূপে অনুধাবন করতে পারলো যে, বিগত শতাব্দীর কুয়াশার নেকাব উন্মোচনের সাথে সাথে মানুষের জ্ঞানচক্ষুও উন্মীলিত হতে চলেছে। আর তাদের ঘুমন্ত চেতনা নতুন রূপে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের রূপ ধরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। তাদেরকে আর ধর্মের বাণী শুনিয়ে দমিয়ে রাখা যাবে না। সুতরাং মানুষের মনের নবতর চেতনা ও চিন্তাধারা এবং জীবনের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপনকারী বিজ্ঞাপনের সামনে এত সহজে স্বীয় প্রভুত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নেয়ার কথা পাদ্রীরা কোনক্রমেই বিবেচনা করতে সম্মত হলো না। বরং যারা তাদের দমননীতি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নির্ভীক সেনানীর ন্যায় মাথা তুলে দাঁড়াতো, তারা তাদের মুখে তালা লাগিয়ে দেবার ব্যবস্থা গ্রহণে কসুর করতো না। আর পুরানো দর্শন, ইতিহাস ও সভ্যতা-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যে নতুন চিন্তাধারা, ধ্যান-ধারণা মাথা উঁচু করে দণ্ডায়মান হল তার নির্মূল ও চিরতরে খতম করে দেবার নিমিত্ত আধাজল খেয়ে লেগে গেল। এদিন থেকেই স্বাধীন চিন্তাধারা এবং পাদ্রীদের মধ্যে শুরু হয় চরম দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের সূচনা।

পাদ্রীরা খ্রীস্টানদের ন্যায় শুধু ধর্ম নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে সম্মত হলো না। অনুরূপ অপরদিকে পোপ্‌পলদের মত শুধু পরকালের ব্যাপারে জনগণকে নির্দেশ দানের বিষয়ের মধ্যে তাদের কর্মক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ রাখতে আদৌ সম্মত হলো না। পৃথিবী নভোমণ্ডল এবং বস্তুজগত সম্পর্কে পাদ্রীদের সে দর্শন ও মতবাদের সাথে সংঘর্ষ বেঁধে গেল, যা ছিল গীর্জা দ্বারা নির্দিষ্টকৃত এবং যার ভিত্তি ছিল সম্পূর্ণ মানবিক জ্ঞান-বুদ্ধি। আর মূলগত দিকদিয়ে তার সাথে ধর্মের আদৌ কোন সম্পর্কও ছিল না। অতঃপর বংশানুক্রমিক পর্যায়ে এমন কতিপয় দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের আবির্ভাব হলো, যারা সর্বদা পাদ্রীদেরকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতো। ধর্মের পতাকাবাহীদের প্রতি তাদের মনে চরম ঘৃণা ও শত্রুতা উন্মুক্ত তরঙ্গমালার ন্যায় ঢেউ খেলতে আরম্ভ করলো। আর এখান থেকেই আরম্ভ হয় ইউরোপীয়দের জীবনের ধর্ম ও বিজ্ঞান চর্চা এবং স্বাধীন চিন্তাধারা ও দর্শনের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও টানা-হেঁচড়ার প্রথম সংগ্রাম।

জীবনের গাড়ী ক্রমবর্দ্ধমান গতিতে এখান থেকেই সামনের পানে চলমান হলো। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরশে মানুষের মধ্যে নবচেতনার উন্মেষ সাধন হলো। তারা আধুনিক বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার এমন চরম শিখরে আরোহণ করলো

যে, শিল্পজগতে দেখা দিল একটি অভূতপূর্ব বিপ্লব। বিজ্ঞানের সাহায্যে সমাজের মধ্যে বিরাট আকারে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত করার প্রতিযোগীতা আরম্ভ হয়ে গেলো। সৃষ্টি হলো অস্বাভাবিক মালিকানার শক্তিশালী পুঁজিপতির দল। সমগ্র ইউরোপ দু'টি শিবিরে পরিণত হলো প্রথমটি হলো পুঁজিপতিদের শিবির। আর দ্বিতীয়টি হলো শ্রমিকদের শিবির। উভয় শিবিরের উপাদান, মাল-মসল্লা ও আয়-উন্নতির মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হলো, তা ক্রমান্বয়েই বেড়ে চললো। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কার্যত শাসক গোষ্ঠির হাত থেকে বেড়িয়ে পুঁজিপতিদের হাতে চলে গেলো। সুতরাং পাদ্রীদের জন্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সমসাময়িক ব্যক্তিদের অনুগত হয়ে থাকা এবং পুঁজিপতিদের শিবিরের সাথে ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করে চলা ছাড়া বিকল্প দ্বিতীয় কোন পথ ছিল না। অগত্যা তারা এ পথেরই অনুগামী হলো।

ইউরোপের সব লোককে অভিযুক্ত ও দোষারোপ করা হলে তা নিতান্ত অপরাধের কাজ হবে এবং তাদের প্রতি করা হবে অবিচার। তাদের মধ্যে কতিপয় লোক ছিল স্বার্থের পুজারী। তারা সর্বদা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে স্বার্থ আদায় করার নিমিত্ত গোপন সম্পর্ক বজায় রেখে চলতো। আর শ্রমিক সমাজের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নেবার জন্য ধর্মকে তারা হাতিয়ার স্বরূপ ব্যবহার করতো। তাদেরকে নিজেদের ন্যায্য অধিকার আদায় এবং দুনিয়ায় ইন্‌সাফ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেকে বিরত রাখার নিমিত্ত তারা তাদেরকে পরকালের সুফল ও কল্যাণ লাভের আশা দিয়ে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করতো। কিন্তু তাদের মধ্যে আবার এমন একদল লোক ছিল, যাঁরা সত্যিকারের আন্তরিকতা নিয়েই তাদেরকে ধর্মের তালীম দিতো। কারণ চার্চ যে নীতি ও বিধিমালা তাদের জন্য তৈয়ার করে দিয়েছিল, তা ছিল তাদের সেই খ্রীস্টান ধর্মের মৌলিক বিশ্বাসের আলোকে রচিত। আর মূলতঃ এ খ্রীস্টান ধর্মের সৌধ এমারত নির্মাণ হয়েছে পার্থিব জগতের প্রতি ঔদাসিন্যতা ও কর্মময় জীবনের মুখরিত কোলাহল থেকে বিমুখ হয়ে সৃষ্টিকর্তার পানে মনোনিবশ করা এবং বস্তুজগত ও পরজগতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির ভিত্তির উপর।

সুতরাং শ্রমিক সমাজ যখন নিজেদের বঞ্চিত অধিকার আদায়ের নিমিত্ত দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের মধ্যে লিপ্ত হবার প্রস্তুতি চালাতে ছিল তখন তারা অনুভব করলো যে, অধিকার আদায়ের এ সংগ্রামে ধর্ম তাদের পক্ষ সমর্থন করবে না। বরং তাকে পাদ্রীরা নিজেদের হাতিয়ার স্বরূপ ব্যবহার করবে, তখন তারা ধর্মের বিরুদ্ধে

প্রকাশ্য ময়দানে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাকে সাধারণ মানুষের জীবনে আফিমের ন্যায় একটি ধ্বংসাত্মক বস্তু আখ্যা দিলো। আর পাদ্রীদের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করার বেলায় বস্তুবাদের এ সকল প্রবক্তারা বন্ধুত্ব সুলভ ব্যবহার দেখিয়ে থাকুক কি না-থাকুক আসল ঘটনা হলো যে, পাদ্রীরা কখনই সর্বহারা শমিকদের কাতারে ছিল না। বরং দ্বিতীয় কাতারে পুঁজিপতিদের সাথেই ছিল তাদের দহরম মহরম ও আনাগোনা। এখান থেকেই হয় এমনি রূপে ধর্ম ও কমিউনিজমের মধ্যে প্রকাশ্য বিদ্বেষ ও শত্রুতার সূত্রপাত।*

অপর দিকে আমাদের জাতীয় ইতিহাস ও ইসলামের প্রকৃতিগত স্বরূপ উভয়ের মধ্যে যখন এ সকল কথার কোন সম্পর্ক নেই বরং লক্ষ লক্ষ মাইল দুরত্বের ব্যবধান, তখন তার সাথে আমাদের কি সম্পর্ক থাকতে পারে? ইসলাম এমন একটি স্বাধীন দেশে লালিত-পালিত হয়ে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছে, যে দেশের উপর না ছিল কোন রাজা বাদশাহদের প্রভাব, আর না ছিল কোন সম্রাটের আধিপত্য। তার ক্রমবিকাশ হয়েছে একটি বেদুঈন বর্বর সমাজে, যে সমাজে রোমান সম্রাটদের ন্যায় কোন আইন-কানুন ও শাসন শৃঙ্খলা বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন সাংগঠনিক প্রতিষ্ঠান বর্তমান ছিল না।

এ অবস্থাটি এ দ্বীনের প্রাথমিক ক্রমবিকাশ ও উন্নতির জন্য একটি উপযুক্ততম অবস্থা ছিল। কেননা সে বিপ্লবের মাধ্যমে যে সমাজ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসী ছিল, তা মূলগত নৈতিক কোন বাঁধা ব্যতিরেকেই প্রতিষ্ঠা করার সুবর্ণ সুযোগ সে পেয়েছিল। এ সমাজের সংগঠনের নিমিত্ত আইন-কানুন রচনা করা, আর ক্রমিক পর্যায় তাকে উন্নতির উচ্চ সোপানে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য বিভিন্ন কর্ম-পদ্ধতি উপস্থিত করা ইত্যাদি সব কিছুর পূর্ণক্ষমতা তার হাতেই ছিল।

আর মানুষের মনো জগতের উপর এবং তাদের কর্মময় জীবন ও ব্যবহারিক জীবন উভয়ের উপর একই সময় প্রভাব বিস্তার করে রাখার সুযোগও তার হয়েছিল। সে আইন ও বিধান রচনা করার বেলায় এবং হেদায়েত দানের

---

* আমাদের একথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, ফ্রি মিশন আন্দোলনের ন্যায় সমাজতন্ত্রও একটি ইয়াহুদীদের আন্দোলন ও সংগঠন। ইয়াহুদীদের লক্ষ্য হলো মুসলিম অধ্যুষিত জগতকে ধ্বংস করার ব্যাপারে প্রবল পদক্ষেপ হিসেবে তাদেরকে ধর্ম বিমুখ করা এবং তাদেরকে জীবন গঠনের মৌলিক নীতিমালা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা।

ব্যাপারে দ্বীন-দুনিয়া উভয়কেই সামনে রেখে তার আরব্ধ কাজ শেষ করেছিল। সুতরাং ইসলাম মানুষের মনো জগতে পার্থিব এবং পারলৌকিক উভয় জাহানকেই একত্রিভূত করে দিয়েছে। সে ব্যক্তির অন্তঃপুরে এবং সমাজ ও দলের কর্মময় জীবনে উভয়ের জন্যই মূল প্রাণশক্তি হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। তার শাসন নীতি ও ব্যবস্থাপনার ভিতর কর্মীয় প্রেরণা কখনো সেই ধর্মীয় অনুভূতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি, যা খারাপ কাজের জন্য একটি বিরাট প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে– তা যতই নিত্য নতুন রূপে ও অঙ্গ সজ্জায় সজ্জিত হয়ে আমাদের সামনে আসুক না কেন। কিন্তু তার মুলগত ধাতু সর্বদাই স্বীয় আসল রূপে বর্তমান থাকে, কখনো সে রং পরিবর্তন করে না।

ইসলামের প্রথম কর্মসূচী হলো পূর্ণ মানব জীবনটাকে একটি নতুন ছাঁচে ঢালাই করে গঠন করা। তার জন্য কর্মময় জীবন থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করে নিরালায় গিয়ে বসে থাকা যেমন কোনক্রমেই সম্ভব হতে পারে না, অনুরূপ তার জন্য স্বীয় ঐতিহাসিক উৎকর্ষ ও উন্নতি সাধনের ব্যাপারে কোন রাজা বাদশাহার ভয়ের দরুন নিজের কর্মক্ষেত্রের সীমারেখাকে একটি সেকেণ্ডের জন্য সংকুচিত করতে বাধ্য নয়। সে সর্বদা নিজের পথ প্রর্দশক নিজেই ছিল। এমন কি বর্বর আরব জাতির সাথে যখন সে চরম লড়াই ও সংগ্রামে লিপ্ত ছিল, তখনকার যুগেও সে অন্য কাহাকে পথ প্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করেনি। কেননা খ্রীস্টান ধর্ম যেরূপ তার প্রাথমিক যুগে একটি সামাজিক শাসন ব্যবস্থাপনার সাথে সংগ্রাম করতে হয়েছে। অনুরূপ এ জাহেলী সমাজের মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের নিবিড় কোন সামাজিক সম্পর্ক এবং দৃঢ় ও মজবুত কোন সামাজিক শাসন ব্যবস্থা তাদের মধ্যে বর্তমান ছিল না। এ কারণেই সে নিজের পথ প্রদর্শক নিজেই ছিল। সমগ্র মানব জীবনটি হলো ইসলামের বাস্তব কর্মক্ষেত্র। নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা যেমন তার কর্মক্ষেত্রের অন্তর্ভূক্ত। অনুরূপ পরজগত ও জড়জগতের জীবনও তার কর্মক্ষেত্রের সীমার অধীন। সে যেমন উপযুক্ততম স্থানে বিচরণ করে স্বীয় অস্তিত্বকে ক্রমবিকাশের ধারায় প্রবাহমান রেখেছে, তেমনি সেখানে স্বীয় পূর্ণ প্রকৃতিগত চিত্রটিকে প্রদর্শন করার সুযোগও তখন সে পেয়েছিল।

বিকাশের প্রথম দিন থেকেই তার আসল স্বরূপকে বাস্তবতার ভিতরে অবলোকন করা হয়েছে। এ বিষয় আল্লাহ্ তায়ালা বেশ ভাল রূপে অবগত আছেন যে, নবুয়াতীর দায়িত্ব কার উপর অর্পণ করা উচিত– যাকে এ দ্বীনের জন্য শেষ যামানা পর্যন্ত অপেক্ষমান থাকতে হবে। ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য যাতে

করে এ দ্বীনের পূর্ণ চিত্রটি বাহিরের কোন বস্তুর সংমিশ্রণ ব্যতিরকেই সংশয়হীন অবস্থায় বহাল থাকে, তার জন্য বিনা বাঁধায় যাতে করে তার বিকাশ সাধন হতে পারে, তার যথা বিহিত ব্যাবস্থা সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই তিনি করে রেখে ছিলেন। এটাই হলো তাক্‌দীরে এলাহীর স্বাভাবিক গতি।

সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে বিচ্ছিন্নতা ঘোষণা করে এ দ্বীনের জন্য স্বীয় আসল রূপটিকে বহাল রাখা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তাই এ সমাজের ব্যক্তিবর্গ এমন "মুসলমান" হোক না কেন, যারা সামাজিক অর্থনৈতিক ও শাসন ব্যবস্থায় ইসলামকেই চূড়ান্ত ফয়সালাকারী হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। যারা ইসলামের আইন ও বিধানকে নিজেদের সামাজিক জীবনের আইন-কানুন ও ব্যবস্থাপনা থেকে দূরে সরিয়ে রেখে শুধু কেবল গতানুগতিক ইবাদত অনুষ্ঠানাদির সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে চলে, তাদের সমাজকে কখনো "ইসলামী সমাজ" আখ্যা দেয়া যায় না। কারণ শুধু একমাত্র আল্লাহর জন্য বন্দেগী করার নামই হলো ইসলাম। আর আল্লাহর প্রভুত্বের সমুদয় গুণাবলী শুধু কেবল তাঁর জন্য বিশেষরূপে পরিগণিত হয়। এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনা সামনের আলোচনা দ্বারা পরিষ্কাররূপে অনুধাবন করা যাবে। আল্লাহর এহেন বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে "সার্বভৌম শাসন ক্ষমতার অধিকারী" (হাকিমিয়াৎ) হওয়া হলো একটি অন্যতম প্রথম বৈশিষ্ট্য। পবিত্র কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন ঃ

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ

"অতঃপর ...... হে মুহম্মদ! তোমার প্রভুর শপথ নিয়ে বলছি, যত সময় পর্যন্ত নিজেদের পরস্পরের ভিতর মতানৈক্যের ব্যাপারে আপনাকে চূড়ান্ত ফয়সালাকারী ও বিচারক হিসেবে মেনে না নিবে এবং আপনার সিদ্ধান্তকৃত বিষয় সম্পর্ক তাদের মনের কোণায় কোন প্রকার সংকীর্ণবাদীতার উদ্রেক না হয়ে অবনত মস্তকে তা স্বীকার না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মুমিন হবে না।" (সূরা নিসা ঃ ৬৫)

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ـ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ـ

"দ্বীনের ব্যাপারে রাসুল তোমাদের নিকট যা কিছু উপস্থাপিত করেন তা তোমরা আঁকড়িয়ে ধরো। আর যে বস্তু থেকে তোমাদেরকে দূরে থাকবার নির্দেশ দেন, তা থেকে তোমরা বিরত থাকো।" (সূরা হাসার ঃ ৭)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ـ

"যারা আল্লাহ্র দেয়া আইন বিধান অনুযায়ী ফয়সালা দেয় না, তারা কাফির।" (সূরা মায়িদা ঃ ৪৪)

ইসলাম এ নীতি নির্ধারণ করনে যে বস্তুটিকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে গ্রহণ করেছে, তা এ দ্বীনের একটি অবিভাজ্য বস্তু। তার ইবাদত, লেনদেন, আইন-কানুন সমূহের বিধানসমূহ এবং তার উপদেশাবলী একটি সমষ্টিগত রূপ পরিগ্রহ করে অবিভাজ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এখানে ব্যবহারিক জীবন ও জীবন দর্শন থেকে স্বভাব প্রকৃতি উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে প্রচলিত ইবাদত অনুষ্ঠানসমূহ আলাদা নয়। বরং তার সাথে এর নিবিড় সম্পর্ক বিজড়িত রয়েছে। সুতরাং নামায যেহেতু ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যার উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয় পক্ষের একমাত্র পরাক্রমশীল মহান আল্লাহ্র প্রতি মনোনিবেশ করা। শুধু একমাত্র তাঁর সামনেই আনুগত্যের বশে মস্তক অবনত করে দেয়া।

আনুগত্যের বশে মস্তক অবনত করে দেয়া এবং সমুদয় অসৎ ও পথভ্রষ্টতা মূলক কাজ পরিহার করে সকলে একই কিব্লার পানে দাভায়মান হওয়া। আর সেই মহান প্রভুর একই ধরণের সাম্য, প্রতিদান ও শাস্তিদানের ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিতে সকলেই সমান, এ অনুভূতি অন্তরে জাগিয়ে তোলাও তার অন্যতম উদ্দেশ্য। সকলেই তাঁর গোলাম, বংশ জাতীয়তা বর্ণ ও শ্রেণী বৈষম্যের কোনই প্রভেদ তাঁর কাছে নেই– তার সামনে সকলেই সমান। এ ছাড়া তাওহীদী কলেমা "লাইলাহা ইল্লালাহুর" গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিশ্বাসও মানুষের অন্তরকে সৃষ্টজীবের সকল প্রকার বন্দেগীর সম্ভাবনা থেকে পবিত্র দেখতে চায়। এটাই হলো এ বিশ্বাস ও আকিদার স্বাভাবিক দাবী। আর এ স্বাধীন বিবেক ও অন্তর গঠনই হলো একটি পাক পবিত্র ও পূণ্যবান কল্যাণময়ী সমাজ গঠনের প্রথম পদক্ষেপ।

এ দ্বীন সম্পর্কে যদি কোন ব্যক্তি অধ্যয়ন ও গবেষণা করতে চায়, তবে সেই সামাজিকতা যা তার ধর্মীয় আদব-কায়দা, রীতি-নীতি এবং জীবন প্রাণালীর মধ্যে পরিপূর্ণরূপে ভরপুর হয়ে আছে, সে সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে না। এটা একটি শক্তিশালী মৌলিক চিন্তাধারার রূপ নিয়ে তার সমগ্র ব্যবস্থাপনার মধ্যে চলমান। সুতরাং কোন যুগে যদি মানুষ শুধু ইবাদতের দিকটির উপর অত্যাধিক জোর দিয়ে ধর্মকে সামাজিক জীবন থেকে এবং সামাজিক

জীবনকে ধর্ম থেকে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে আলাদা করতে চায়, তবে মনে করতে হবে যে, এটা এ দ্বীনের দুর্বলতার পরিচয় নয়; বরং তা সে যুগের একটি মহা বিপদও বটে।*

ইসলাম সম্পর্কে আমাদের এ অভিমত কোন নতুন বা মনগড়া অভিমত নয়। বরং এটা সেই ইসলাম এবং সেই রূপেই পেশ করা হচ্ছে, যেরূপে তাকে রসূল করীম (সাঃ) জনগনের সামনে পেশ করেছিলেন ও বুঝিয়েছিলেন। সেই আসল রূপরেখাটিই আমরা এখানে পেশ করছি।

পবিত্র কুরআন মজীদে আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ط ذٰالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ٥ فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ـ

“হে ঈমানদারগণ! জুম্‌আর দিন যখন তোমাদেরকে আযানের মাধ্যমে নামাযের জন্য ডাকা হয় তখন তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজ-কারবার আপাতঃ বন্ধ রেখে আল্লাহ্‌র যিকিরের জন্য দৌড়ে যাও। এ বিষয় যদি তোমাদের বাস্তব জ্ঞান থেকে থাকে, তবে এ বিধান যে তোমাদের জন্য কল্যাণময়ী; তা তোমরা উপলব্ধি করতে পারবে। আর নামাযের কাজ শেষ হলে, তোমরা আল্লাহ্‌র যমীনের চতুর্দিকে তাঁর নিয়ামত আহরণের নিমিত্ত ছড়িয়ে পড়।” (সূরা জুম্‌আ ঃ ৯ - ১০)

একটি দিনে ফরজ নামায সমূহের কতটুকু সময় ব্যয় হয়, তা প্রত্যেক ব্যক্তিই ভালরূপে জ্ঞাত আছে। এ ছাড়া দিনের অবশিষ্ট সময় পার্থিব জীবনের

---

* ইসলামী পরিভাষায় ইবাদাত শব্দটি ধর্মীয় রীতি-নীতি, চাল-চলন, আইন-কানুন এক কথায় মানুষের সমুদয় কর্মতৎপরতার উপর প্রযোজ্য। কিন্তু ফিকাহ্‌শাস্ত্রে ইবাদাত পরিভাষাটিকে শুধু ধর্মীয় রীতি-নীতির ব্যাপারে ব্যবহার করা হয়েছে। আর মোয়ামিলাৎ (লেন-দেন) পরিভাষাটি ব্যবহার করেছে অন্যান্য আইন-কানুন ও রীতি-নীতির বেলায়। অথচ ইসলামী বিধান একটি অবিভাজ্য বিধান। বিস্তারিত অবগতির জন্য আমার লিখিত, ‘খাছায়েছে তাসবীরুল ইসলাম” পুস্তকের আস্‌সমুল অধ্যায়টি পাঠ করুন।

কাজ-কারবার, উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য থাকে। অতএব সমষ্টিগত হিসেবে আমাদের সমগ্র জীবনটিতে কত কম সময় যে ব্যয় হয়ে থাকে; তা সহজেই অনুমেয়। এ ছাড়া বাকী সময় সমাজ এবং কর্মময় জীবনের আবেদন মিটানোর জন্য অবশিষ্ট থাকে। কাজেই সমাজ জীবন যে ধর্মীয় বিধি-নিষেধের আওতা বহির্ভূত, একথা ইসলাম কোনক্রমেই সমর্থন করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআন মজীদে বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا - وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا -

"আমি রাত্রকে তোমাদের জন্য আবরণ (বিশ্রামের সময়) এবং দিনকে জীবিকা অর্জনের সময় হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছি।" (সূরা নাবা ঃ ১০ - ১১)

ইসলামী জীবন বিধানে শুধু কতকগুলো গতানুগতিক আনুষ্ঠানিকতা পালনের নাম ইবাদত নয়। ইসলামী ধ্যান-ধারণা মতে ইবাদাতের অর্থ হলো সমগ্র জীবনটি আল্লাহর আইন ও বিধানের অনুগত করে গড়ে তোলা। আর সমুদয় কর্মতৎপরতায় আল্লাহর পানে মনোনিবেশ করা। সুতরাং এ অর্থে সমুদয় সামাজিক খেদমত এবং প্রত্যেকটি কল্যাণমূলক কাজের নামই ইবাদত।

রাসুল করীম(সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

"গরীব দুঃখী ও বিধবা রমণীদের খেদমতগারদের মর্যাদা ও সম্মান আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী অথবা রাত্রভর নামায আদায়কারী ও দিনভর রোযা পালনকারীর মর্যাদার সমতুল্য।" (বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

ইসলামের আসল স্বরূপ ও প্রাণ নবী করীম (সাঃ) এর ধ্যান-ধারণা মতে কি ছিল, তা নিম্নে উল্লেখ কৃত দু'টি ঘটনার দ্বারাই পরিষ্কার রূপে উপলব্ধি করা যায়। ঘটনা দু'টি এই ঃ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন– আমরা কোন এক সময় নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে বাহিরে সফরে গিয়েছিলাম। আমাদের দলের কিছু লোক রোযাদার ছিলেন। আর অবশিষ্ট লোকেরা রোযা ছিল না। এমতাবস্থায় একদিন খুব ভীষণভাবে প্রখর রৌদ্রতাপ আরম্ভ হলে আমরা একস্থানে গিয়ে শিবির স্থাপন করলাম। সেদিন যাদের নিকট চাদর ছিল কেবল তারাই চাদরের সাহায্যে রৌদ্রতাপ থেকে কিছুটা রক্ষা পেয়েছে। অবশিষ্ট সকলে নিজ নিজ হস্ত দ্বারাই রৌদ্রতাপ থেকে বাঁচার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। সুতরাং আমাদের দলে যারা রোযাদার ছিল না, তারা বিশ্রাম

গ্রহণ করতে লাগলো। আর যারা রোযাদার ছিলেন তারা শিবির স্থাপন ও সওয়ারীর জানওয়ারকে পানি পান করবার কাজে লেগে গেল। তখন রাসুল করীম (সাঃ) এরশাদ করলেন– আজ সমুদয় সওয়াব তারাই নিয়ে গেল; যারা রোযাদার নয়।"

হযরত আনাস (রাঃ) আর একটি হাদীস বর্ণনায় বলেন– রাসূলে করীম (সাঃ) কি পরিমাণ ইবাদত করতেন তা জ্ঞাত হবার উদ্দেশ্যে তিন ব্যক্তি তার স্ত্রীগণের নিকট গমন করলেন। আসল তথ্য জ্ঞাত হবার পর তারা যে ধারণা নিয়ে এসেছিল, সে ধারণা অনুযায়ী তাকে পায়নি। বরং তাথেকে বহুলাংশে কম পেয়েছে বলে তাদের চেহারা দর্শনে মনে হচ্ছিল। তারা পরস্পরে বলাবলি করতে লাগলো যে, কোথায় আমরা, আর কোথায় আল্লাহর রাসুল! তাঁর অগ্র-পশ্চাতের সব গুনাহরাশিই তো আল্লাহ্ তায়ালা মার্জনা করে দিয়েছেন। অতঃপর তাঁরা একে অপরের নিকট বলতে লাগলো আমি সমগ্র রাত্রি নামাযের মধ্যে অতিবাহিত করব। দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো– "আমি পরম্পরা সর্বাদাই রোযা রাখব। কখনো তা পরিত্যাগ করব না। তৃতীয় ব্যক্তি বললো– "আমি সর্বাদা নারীর সাহচর্য পরিত্যাগ করে চির কুমার থাকার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এমন সময় নবী করীম (সাঃ) তাদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন– এতক্ষণ এখানে যারা কথোপকথন করেছিলে তোমরা কি সেই লোক? তারা উত্তর করলো জি হাঁ। তখন নবী করীম (সাঃ) তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন– আমি আল্লাহ্র নামে শপথ নিয়ে বলছি যে, তাক্ওয়া পরহেজগারীর বেলায় আমি তোমাদের চেয়ে অনেক অগ্রগামী। এতদসত্ত্বেও আমি যেমন মাঝে মাঝে রোযা রাখি তেমনি মাঝে মাঝে তা পরিত্যাগ করেও চলি। আবার রাত্রিকালে যেমন নামায পড়ি, তেমনি নিদ্রার কোলেও কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেই। আর রমণীদেরকে বিবাহ করে তাদের সাহচর্যও গ্রহণ করি। মনে রেখ! যারা আমার রীতি-নীতি মত-পথ এক কথায় আমার সুন্নাতকে পরিহার করে অন্য কোন মত-পথ, রীতি-নীতি গ্রহণ করে; তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। (বুখারী, মুসলিম ও নাসায়ী)

রাসুল করীম (সাঃ) যে দ্বীন আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছিলেন, সে দ্বীনের আসল স্বরূপ ও মজ্জাগত গতি-প্রকৃতিকে তিনি সম্যক ভালরূপেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। উপরিবর্ণিত হাদীস দু'টিতে বর্ণিত তার ভাষ্য দ্বারা নামায

রোযার আবশ্যকতার প্রতি কটাক্ষ করা বা তার গুরুত্ব ও মর্যাদাহানী করা তার উদ্দেশ্য নয়। বরং দ্বীনের আসল গতি-প্রকৃতি ও স্বরূপটির বিকাশ সাধনই হলো তার আসল উদ্দেশ্য। এ দ্বীন হলো সেই দ্বীন, যা তার মৌলিক বিশ্বাস ও আকীদার দাবী মিটানোর সাথে সাথে মানুষের বাস্তব জীবনের চাহিদাও পুরণ করে। সে তার মূলগত বিশ্বাস ও আকীদা নিয়ে মনের নিরালা কোঠায় একাকী হয়ে বসে থাকে না। বরং বিশ্বাস ও আকীদাকে বাস্তব জীবনের প্রতি শিরা উপশিরার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবাহমান করে।

নিম্নের ঘটনা দু'টিই এর জ্বলন্ত স্বাক্ষর যে, দ্বীন সম্পর্কে খলিফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর ধ্যান-ধারণাও এরূপই ছিল। একদিন তিনি এক ব্যক্তিকে ইবাদত-বন্দেগী এবং আধ্যাত্মিক সাধনার চরম পর্যায় উপনীত হয়ে নিজকে জীর্ণতা শীর্ণতা এবং দুর্বলতার চরম পরকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে দেখে তাকে তিনি দোররা লাগিয়ে অভিশাপ দিয়ে বললেন– আল্লাহ তোমার অমংগল করুক। আমাদের দ্বীনকে কখনো মৃতরূপ বানিয়ে সমাজের সামনে পেশ করবে না।”

এমনিভাবে একবার আর এক ব্যক্তি তার নিকট মোকদ্দমার সাক্ষী সেজে উপস্থিত হলে তাকে তিনি বললেন– যে তোমাকে ভালরূপে জানে ও চিনে; এমন একজন লোক তুমি আমার কাছে ডেকে আনো। সুতরাং সে একটি লোককে ডেকে আনলে উক্ত ব্যক্তি খলিফার নিকট তার সম্পর্কে ভাল অভিমত প্রকাশ করলো। তখন হযরত ওমর (রাঃ) উক্ত লোকটির নিকট জিজ্ঞেস করলেন– তুমি কি এর প্রতিবেশী এর ভিতর-বাহির সম্পর্কে তোমার ভাল জ্ঞান আছে? উক্ত লোকটি তখন না সূচক জবাব দিল। অতঃপর তিনি বললেন, আচ্ছা যদি কোন ব্যক্তি কাহারো সাথে একত্রে সফরে থাকে, তবে তার চরিত্র সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা সে নিতে পারে। তুমি কি এর সাথে কোন দিন একত্রে সফরে ছিলে? এবারেও সে নেতিবাচক জবাব দিল। আবার তার নিকট জিজ্ঞেস করলেন– আচ্ছা এর সাথে কোন দিন টাকা-পয়সার লেন-দেন করেছো কি? কারণ লেন-দেন ও আদান-প্রদানের মধ্যে মানুষের তাকওয়া পরহেজগারী প্রকাশ হয়ে পড়ে। এবারেও উক্ত ব্যক্তি অস্বীকৃতি জানালো। তখন হযরত ওমর (রাঃ) বললেন– এখন আমার মনে হচ্ছে যে তুমি হয়তো একে মসজিদে দণ্ডায়মান হয়ে কুরআন তেলাওয়াত করতে এবং মাঝে মাঝে মাথা অবনত করতে ও উত্তোলন করতে দেখেছো। তখন উক্ত লোকটি এ কথার সত্যতা স্বীকার করল। অতঃপর

হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, চলে যাও, তুমি এর সম্পর্কে কিছুই জানো না। সুতরাং প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে তিনি নির্দেশ দিলেন যে, তোমার সম্পর্কে বাস্তবিক জ্ঞান রাখে ও জানে এবং তোমার চরিত্র সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট নিশ্চয়তা ও অভিমত দিতে পারে, এমন একজন লোক তুমি আমার নিকট নিয়ে আসো।

উপরে আমরা দ্বীন সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ)-এর দর্শন ও ধ্যান-ধারণা পাঠকের সামনে উপস্থিত করিয়াছি। আর হযরত ওমর (রাঃ)-এর বুঝ এবং উপলব্ধিও পেশ করেছি। সুতরাং এটাই হলো এ দ্বীনের সত্যিকারের রূপ ও সঠিক ধ্যান-ধারণা। উপাস্না-আরাধনা রীতি-নীতি আচরণ এবং অন্তঃকরণের অন্ধকারময় কোঠোর গোপন বিশ্বাস ও অনুভূতি, আর বাস্তব ক্ষেত্রে বাহ্যিক আচরণ ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে এটাই হলো ইসলামের সঠিক অভিমত। পবিত্র কুরআন মজীদে আল্লাহ বলেনঃ

وَابْتَغِ فِيمَا اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا-

"আল্লাহ তায়ালা তোমাকে যা কিছু নিয়ামত দান করেছেন তা দ্বারা পরকালের কল্যাণ অনুসন্ধান করো। আর বাস্তব জগতে যে অংশ তোমার রয়েছে তা থেকে তুমি উদাসীন হয়ো না।" (সূরা আল-কাছাছ–৭৭)

وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوٰتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيرًا-

"আল্লাহ তায়ালা যদি কতিপয় লোকের দ্বারা কতিপয় লোককে দমিয়ে না রাখতেন, তবে গীর্জা মাস্জিদ ও উপাসনালয়সমূহ যার ভিতর আল্লাহর নাম অত্যাধিক পরিমাণে স্মরণ করা হয় তা সবকিছু ধ্বংস ও বিলীন হয়ে যেত।"

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا - اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ-

"যারা তোমাদের সাথে লড়াই করতে আসে তাদের সাথে তোমরাও আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান এবং তাঁর আইন-কানুন কায়েমের নিমিত্ত লড়াই করো। কিন্তু সাবধান সীমা অতিক্রম করবে না। কারণ আল্লাহ তায়ালা কখনো সীমা অতিক্রমকারীকে ভালবাসেন না।" (সূরা বাকারা-১৯)

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ج وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ج وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ج وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ط

"পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে চেহারা ফিরানই পুণ্যের কাজ নয়। বরং আল্লাহর প্রতি, পরকালের প্রতি এবং ফিরিশতাজগত ও আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত কিতাবের প্রতি, আল্লাহর নবীদের প্রতি অটল বিশ্বাস স্থাপনের মধ্যেই পূণ্য নিহিত রয়েছে। আর রয়েছে আল্লাহর প্রতি ভালবাসা এবং তাঁর সৃষ্ট জীবের প্রতি দরদ প্রদর্শনের, এবং স্বীয় ধন-সম্পদকে এতীম মিস্‌কীন নিকটতম আত্মীয়-স্বজন আর সাহায্যের জন্য যারা মানুষের দুয়ারে হাত পাতে তাদের জন্য এবং ভৃত্য ও দাসকে মনিবের গোলামী থেকে মুক্তি করার মানসে ব্যয় করার মধ্যে নিহিত। আর পূণ্য রয়েছে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে নামায প্রতিষ্ঠা এবং যাকাত দানের ভিতর নিহিত। আর যারা ওয়াদা করে স্বীয় ওয়াদাকে বাস্তবায়িত করে এবং দরিদ্রতা ও বিপদের সময়, হক ও বাতিলের সংঘর্ষের প্রাক্কালে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়, তারাই হলো সত্যিকারের পূণ্যবান লোক।" (সূরা বাকারা-১৭৭)

নবী করীম (সাঃ) বলেন, "তোমাদের মধ্যে যে কেহই শরীয়াত বিরোধী কাজ অবলোকন করবে, তা বিদুরিত করার নিমিত্ত চেষ্টা করা তার প্রতি অপরিহার্য কর্তব্য। ((মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, আবুদাউদ)

আকিদা-বিশ্বাস ও কর্ম সম্পর্কে এ হলো ইসলামের আসল বুনিয়াদী দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গী। এখানে দ্বীন এবং দুনিয়া আকিদা-বিশ্বাস ও সমাজের মধ্যে সেই খ্রীস্টান ইজমের ন্যায় কোন পার্থক্য ও ব্যবধান নেই, যে খ্রীস্টান ইজম কয়েকটি পবিত্র সভা সমিতির মাধ্যমে নির্দিষ্ট একটি রূপ পরিগ্রহ করে আছে। বরং ইসলামের দৃষ্টিতে দ্বীন-দুনিয়া ধর্মবিশ্বাস ও সমাজ একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গীরূপে বিজড়িত। একটি বাদ দিয়ে অপরটির চিন্তা বাতুলতা ছাড়া কিছু নয়।

ইস্‌লামের ভিতর যেমন পাদী ও মুর্তিপূজারীদেয় নিজস্ব কোন নীতিমালা ও মতবাদের অবকাশ নেই, অনুরূপ শুধু স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে একটি সম্পর্কের নামও ইসলাম নয়। আল্লাহর যমীনের কোন নিরালা স্থানে বসবাসকারী অথবা সমুদ্রের উথাল তরঙ্গের উপর ভ্রমণরত কোন মুসলমান, সে কোন পীর, পুরোহিত ও পাদ্রী মোল্লাদের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে নিজে নিজেই আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। তাতে কোন আলেম বা পীর সাহেবদের মধ্যস্থতার প্রয়োজন হয় না। ইসলামী জীবন দর্শনের ভিতর শাসকবর্গ নিজেদের ক্ষমতা ও শক্তি যেমন কোন পোপবাদী দর্শন থেকে অর্জন করে না, অনুরূপ সরাসরি আল্লাহর থেকেও লাভ করে না। তাদের শাসন ক্ষমতা ও অধিকারের মূলকেন্দ্র ও চাবিকাঠি হলো ইস্‌লামী সমাজ। অনুরূপ ভাবে তাদের আইন-কানুন ও শাসন বিধানের উৎসমুল হলো ইসলামী শরীয়ত, যার ধারণায় ও সাম্যবাদী নীতিতে সকলে সমান। সকলে একই নিয়ম নীতিতে তাঁর নিকট আপীল ও আবেদন নিবেদন করতে পারে।

যে সব সম্প্রদায়ের গতানুগতিক উপাসনা অনুষ্ঠান ও ইবাদত বন্দেগীর প্রথাসমূহ ধর্মীয় পীর-পুরোহিত ও ইমামদের উপস্থিতি ও অংশ গ্রহণ ছাড়া সম্পন্ন হতে পারে না,- আর যে অর্থে এ সকল পরিভাষা সমূহ তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ, সে অর্থে ইস্‌লামের মধ্যে কোন ধর্মীয় ইমাম বা পীর-পুরোহিতদের অস্তিত্ব বর্তমান নেই। ইস্‌লামের ভিতর শুধু ধর্মীয় বিদ্যায় পারদর্শি লোকদেরই অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাদেরকে সাধারণ মুসলমানের উপর বিশেষ কোন ক্ষমতা দান করা হয়নি। এমন কি তার শাসকবর্গকে শুধু এতটুকু ক্ষমতা ও অধিকার দান করা হয়েছে যে, সে স্বরচিত শয়ীয়াত নয়; আল্লাহ কর্তৃক রচিত শরীয়াত ও

আইন-কানুন যা তিনি সমাজের সকল ক্ষেত্রে সকল শ্রেণীর মানুষের উপর ফরজ করেছেন, তা বাস্তব ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে প্রবর্তিত ও প্রতিষ্ঠিত করবে। এর বাহিরে যাওয়া তার ক্ষমতার এখতিয়ারভুক্ত নয়। যতটুকু ক্ষেত্রে পরকালের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে, কেবল ততটুকু ক্ষেত্রেই তার চলার সীমা। তার সর্বদাই স্মরণ রাখতে হবে যে, সকল মানুষকেই আল্লাহর দরবারে একবার স্বীয় কর্যময় জীবনের হিসাব-নিকাশের নিমিত্ত উপস্থিত হতে হবে। পবিত্র কুরআন মজীদে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন ঃ

كُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا

"প্রত্যেক ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন একাকী আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে।" (সূরা মরিয়াম-৯৫)

সাধারণ মানুষের উপর কোন ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তার করা অথবা তাদের ধন সম্পদের ব্যাপারে ধর্মীয় শ্রেণী ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শাসক শ্রেণীর মধ্যে কোনরূপ দ্বন্দ্ব ও রেষা-রেষীর আবকাশ ইসলামে নেই। এখানে যেমন বস্তুগত বা অন্য কোন এমন স্বার্থ নিহিত নেই, যার কারণে তাদের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও টানা হেঁচরার সূত্রপাত হতে পারে। অনুরূপ পোপপল ও সম্রাটদের মধ্যে যেমন ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও লড়াই চলতে থাকে, তেমনি ধর্ম নিরপেক্ষতা বাদীদের ক্ষমতা ও অধিকার; ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিকতাবাদীদের ক্ষমতা ও অধিকারের মধ্যে এমন কোন ভাগবাটারা নেই, যার কারণে তাদের উভয় শ্রেণীকে দ্বন্দ ও লড়াইর ময়দানে অবতীর্ণ হত হয়।

ইসলাম একদিকে যেমন ইল্‌ম ও বিজ্ঞানের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে না, অনুরূপ বিদ্বান, পণ্ডিত ও জ্ঞান বিজ্ঞানে পারদর্শি সুধীদের প্রতি রাখেনা কোনরূপ হিংসা দ্বেষ। বরং যে জ্ঞান দ্বারা আল্লাহর একত্ববাদের জ্ঞান ও পরিচয় লাভ হয় এবং যে সকল জ্ঞান বিজ্ঞান, সত্যিকার রূপে ঐ উদ্দেশ্য অর্জনের পানে মানুষকে প্রেরণা জোগায়, এ ধরনের প্রত্যেক জ্ঞান বিজ্ঞানকে সে শুধু কেবল তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেই দায়িত্ব শেষ করে না। তা অর্জনের সাধনাকে একটি পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করে তাকে দ্বীনী কাজের পর্যায় ভুক্ত করে দিয়েছে। রাসুলে করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ-

জ্ঞান সাধনা প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি ফরজ। (ইবনে মাজা)

তিনি অন্যত্র বলেছেন–

مَنْ سَلَكَ سَبِيلاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ–

“যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের নিমিত্ত কোন পথ অতিক্রম করতে থাকে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য বেহেস্তর পথ সহজতর করে দেন।” (মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, আবুদাউদ)

ইউরোপের গোয়েন্দা আদালত সমূহের সুপরিকল্পিত ভাবে দার্শনিক চিন্তাবিদদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা একটা স্বাভাবিক নীতিতে পরিণত হয়েছে। অনুরূপ কোন জুলুম অত্যাচারের সাথে ইসলামী ইতিহাসের কোন পরিচয়ই নেই। বিশেষ চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণা রাখার কারণে যে কিছু সংখ্যাক ব্যক্তিদেরকে শাস্তি দেয়া হয় ইসলামী ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা সংখ্যা নিত্যান্ত নগণ্য। ছিটে ফোটা দু'একটি ঘটনা পাওয়া গেলেও তা ঘটনাচক্র ও অস্বাভাবিক পন্থায় হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সকল ঘটনা কোন রাজনৈতিক কারণে অথবা কোন সম্প্রদায়ের গোড়ামী কিম্বা কোন ঝগড়া কলহ বিবাদের কারণে জন্মলাভ করে। ইসলামী জীবন দর্শনের সাধারণ গতি-প্রকৃতি থেকে এধরনের কথা সর্বদাই দুরে রয়েছে। যাদের চিন্তাধারা ও মনমগজে ইসলামের সঠিক জ্ঞান ও ধ্যান-ধারণা বর্তমান নেই এ ধরণের লোকের দ্বারাই তা সংঘটিত হয়।

যে ধর্ম শুধু মুজিজা এবং অস্বাভাবিক ঘটনা প্রবাহের উপর নির্ভর করে বসে থাকে না, আর যার আসন শুধু গায়েব ও অদৃশ্য কথার উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বরং, সৃষ্টি জগতের চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত নির্দশন সমূহের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিনিবদ্ধ করা। এবং তা নিয়ে চিন্তা গবেষণা করাকে যে মৌলিক নীতি হিসেবে নির্ধারণ করে নিয়েছে, তার থেকে এহেন গতি-প্রকৃতি ও স্বরূপই আশা করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে কুরআন করীম বলেছেন ঃ

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ

فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ـ وَتَصْرِيْفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَايٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ-

"এ জগতে যারা জ্ঞান বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়, তাদের জন্য আসমান যমীনের সৃষ্টি রহস্যের ভিতর, দিবারাত্রির গতিশীলতার ভিতর এবং মানুষের উপকারার্থে পণ্যদ্রব্য নিয়ে যে নৌকা বিশাল নদী-সমুদ্রে বিচরণ করে তার ভিতর। আর আল্লাহ তায়ালা মেঘমালা থেকে বর্ষিত যে বর্ষার পানি দ্বারা পৃথিবীকে শস্য শ্যামলময় করে তুলেন, আর তাঁর এ ব্যবস্থাপনার ফলে যমীনের বুকে যে সকল জীব জানওয়ার চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত করে দেন তার ভিতর এবং বায়ুর আবর্তন বিবর্তন ও শূন্যলোকের মধ্যে যে রাশি রাশি মেঘমালা সমুহকে অনুগত করে রেখেছেন এর ভিতর আল্লাহর কুদরতের অগণিত নিদর্শন বর্তমান রয়েছে।" (সূরা বাকারা–১৬৪)

يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَيُحْىِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ٥ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَا اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ٥ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ٥ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ٥ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ

وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ - وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ-

"সেই মহান প্রভু এমনই পরাক্রমশীল ও শক্তিশালী যিনি মৃত থেকে জীবিতকে এবং জীবিত থেকে মৃতের বিকাশ সাধন করেন। আর যমীন শুষ্ক ও অনুর্বর হয়ে যাবার পর আবার তাকে নব জীবন দানে শক্তিশালী ও উর্বরময় করে তুলেন। অনুরূপ তোমাদেরকেও মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার পুনরুত্থান করান হবে। তার কুদরতের আর একটি নির্দশন হলো যে তিনি তোমাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। আর তোমরা সেই মাটির সৃষ্টজীব হয়ে পৃথিবীর চতুর্দিকে বিচরণশীল মানুষে পরিণত হয়েছ। আর তাঁর কুদরতের নির্দশন সমূহের মধ্যে এও একটি নিদর্শন যে তোমাদের মনোরঞ্জনের জন্য তোমাদের দম্পতিকে তোমাদের সঙ্গী বানিয়ে পরস্পরের মধ্যে স্বভাবগত প্রীতি-ভালবাসা ও মহব্বতের সম্পর্ক গড়ে দিয়েছেন। এর মধ্যে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য চিন্তার খোরাক হিসেবে অনেক নিদর্শন নিহিত রয়েছে। আর আসমান যমীনের সৃষ্টি তোমাদের শরীরের বর্ণ ও মুখের ভাষার বিভিন্নতার মধ্যেও তাঁর মহান কুদরতের নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়। এর ভিতরও বিজ্ঞানী বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীলদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে তাঁর সীমাহীন ক্ষমতা ও কুদরতের নির্দশন নিহিত আছে। এমনি ভাবে দিবা-রাত্রে তোমাদের নিদ্রা যাওয়া এবং আল্লাহর নেয়ামত অনুসন্ধান ও তাঁর কুদরতের একটি অন্যতম নিদর্শন বিশেষ। আর তোমাদেরকে যে তিনি বিজলী প্রদর্শন করেন যার কারণে তোমাদের মনে আশা ভয়ভীতি উভয়টাই জাগরিত হয় এবং তিনি যে আসমান থেকে বর্ষা বর্ষণ করে বিশুষ্ক ও মৃত যমীনকে উর্বর ও শস্য-শ্যামলময় করে তুলেন তাও তার কুদরতের পরিচয়ের অন্যতম বাহন। সুতরাং এ সকল বস্তুর ভিতরও চিন্তাশীল ও জ্ঞানবান ব্যক্তিদের উপলব্ধির জন্য অনেক প্রমাণ ও নিদর্শন বর্তমান।" (সূরা রূম–১৯–২৪)

যে ধর্ম জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আল্লাহ ভীরুতার মধ্যে রোগ ও রোগীর সম্পর্ক নিরূপণ করে থাকে। আর জ্ঞানকে আল্লাহর তাওহীদ ও একত্ববাদের পরিচয়

লাভের বাহন এবং মানুষের মনে আল্লাহর আযাবের ভয়ভীতি জাগিয়ে তোলার মাধ্যম নির্ধারণ করে সে ধর্মের নীতি আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি এমনরূপ হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। কুরআনে করীমে ঘোষণা হয়েছে ঃ

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاؤُا

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক ও বাহক তারাই আল্লাহকে যথার্থরূপে ভয় করে।" (সূরা ফাতের- ২৮)

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ-

"হে নবী! (ছঃ) আপনি ওদের নিকট জিজ্ঞেস করুন যে যারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক ও বাহক এবং যারা তার সাথে কোন সম্পর্কই রাখেনা, তারা কি কখনো সমপর্যায় ভুক্ত হতে পারে? (সূরা যুমর-৯)

রাসুলে করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلٰى سَائِرِ الْكَوَاكِبُ-

"নিহারীকা জগতের উপর চন্দ্রের যেরূপ উচ্চ মর্যাদার আসন প্রতিষ্ঠিত, অনুরূপ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে ইবাদতকারী দরবেশদের উপর বিদ্বান ও পন্ডিত লোকদের মর্যাদার আসন।" (আবুদাউদ, তিরমিযী, বায়হাকী)

বস্তুতঃ যে জ্ঞান-বিজ্ঞান সৃষ্টিজগত ও মানুষের আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যে আল্লাহর নিদর্শন সমূহের গবেষণার পথে নিখুঁত সত্যের পচিয় লাভের পানে মানুষকে নিয়ে যায়, –সে জ্ঞান বিজ্ঞান ও ইসলামের মধ্যে কোনরূপ দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের অবকাশ নেই। অনুরূপ ইসলামের গতি-প্রকৃতি অথবা তার বাস্তব কর্মময় ইতিহাস পর্যালোচনা করলে ধর্ম এবং এ ধরণের জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে কোনরূপ বিদ্বেষ শত্রুতা পরিলক্ষিত হয় না, যেমনি পরিলক্ষিত হয় ইউরোপের দ্বিতীয় পুনর্জাগরণ এবং তার পরবর্তী যুগের ইউরোপীয় পাদ্রী ও যাজকশ্রেণী এবং বিজ্ঞানীদের মধ্যে।

এখন কথা হলো যে ধর্মীয় শ্রেণীরা'* দেশের শাসন ক্ষমতার অধিষ্ঠিত শাসকবর্গ এবং পুঁজিপতিদের সাথে একত্র হয়ে সাধারণ শ্রমিক সমাজের স্বার্থ আদায়ের আন্দোলনকে নিস্তব্ধ ও বানচাল করার নিমিত্ত ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে যে ব্যবহার করে তা অস্বীকার করা হলে সত্যের অপলাপ করা হবে। কেননা ইসলামী ইতিহাসের কোন কোন যুগে যে এ ধরণের আচরণ তাদের সাথে করা হয়েছে তা দিবালোকের ন্যায় সত্য। কিন্তু ইসলামের সত্যিকার নীতি ও আর্দশ তাদের এ ধরনের আচরণ ও কর্মপন্থা গ্রহণ করার প্রতি তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে। পার্থিব স্বার্থের পরবশে আল্লাহর আয়াত সমূহকে বিক্রয়লব্ধ পণ্য দ্রব্যে পরিণত করার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম তাদেরকে তীব্র ভাষায় তিরষ্কার করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং কঠোর শাস্তি দানের হুমকীও দিয়েছে।

আমরা ধর্মীয় শ্রেণী ও ধর্মীয় আলেম সম্প্রদায়কে দুইটি পৃথক পৃথক পরিভাষা মনে কর। কতিপয় দেশে ক্ষমতাসীনরা ধর্মীয় কতিপয় আলোকদেরকে পাথির্ব স্বার্থে প্রলুব্ধ করে দেশের ভিতর এমন একটি ধর্মীয় দফতর ও সংস্থা সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা করে, যাদের দ্বারা তারা নিজেদের সমর্থনে ফতুয়া দেয়ার ব্যাপারে আর তাদের কাজ-কর্ম বক্তৃতা বিবৃতি এবং ঐ সকল কর্ম-পদ্ধতির সাহায্য পুষ্টির জন্য তা ব্যবহার করে যার কোন স্বীকৃতি নেই। বরং ইসলামের সম্পূর্ণ খেলাফ। এ সকল ধর্মীয় দফতর ও সংস্থাসমূহ ইউরোপীয় গীর্জায় বাজকশ্রেণীর (Ecclesiatic) সমতূল্য। ইস্‌লামে এর কোনই স্থান নেই।

এ সকল লোকদের পর্যায়ক্রমিক ইতিহাস একটি আলাদা কর্মের ও চালচলনের বাহক হিসেবে সে তা দ্বীনদারদের সামনে উপস্থিত করে। কাহারো অভিযোগ আপত্তি তাকে সত্যের ঘোষণা থেকে বিরত রাখতে পারে না। সে মানুষের প্রতি আল্লাহর অধিকার এবং দ্বীন দরিদ্রের অধিকার আদায়ের সমর্থনে পুঁজিপতি ও ক্ষমতাসীনদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত। সে অধিকার প্রাপকদের মনে অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করা এবং তার কারণে রাষ্ট্রীয় তরফ থেকে জুলুম অত্যাচার নিষ্পেষণের শিকারে পরিণত হওয়া, মাঝে মাঝে তাদের কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হওয়া, এমনকি দেশ ত্যাগের নির্দেশ নামাকেও বরণ করে নেয়ার প্রবল অনুভূতি ও প্রেরণা জাগিয়ে তুলে। সংগ্রামের ময়দানে ঝাপিয়া পড়ার নিমিত্ত অনুপ্রাণিত করে।

ইস্‌লামের বিশেষ রূপ ও গতিধারা এবং তার ঐতিহাসিক পটভূমিকা এ দু'য়ের ভিতর কেহই ধর্মকে সমাজ থেকে পৃথকী করণের কোন বৈধ কর্মসূচী ও যুক্তি প্রমাণ উপস্থিত করে না। এখানে ঐ সকল কারণ সমূহের মধ্যে এমন কোন কারণ বর্তমান নেই, যা খ্রীস্টান ইজমের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং যার কারণে খ্রীস্টান

ধর্মাবলম্বীরা ধর্মকে সমাজ থেকে দুরে রাখার নীতি গ্রহণ করে তাকে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন এবং আত্মার পরিশোধন কাজের মধ্যে সীমিত রেখে বন্দীশালার কয়েদী বানিয়ে রেখেছে। আর সামাজিক জীবনের শক্তির মূল চাবিকাঠি অর্পণ করেছে আল্লাহর আইন-কানুনের বিরুদ্ধবাদীদের হাতে। অনুরূপ ইসলামী কর্ম-পদ্ধতি ও শরীয়তের সীমার মধ্যে অবস্থান করে ইস্‌লাম এবং সামাজিক জীবনে ইন্‌সাফ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সাধনার মধ্যে কোনরূপ সংঘর্ষ বা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবারও কোন কারণ নেই।

খ্রীস্টান ইজম আর সমাজতন্ত্রের পারস্পরিক দ্বন্দ ও টানা-হেঁচড়ার মধ্যে এ ধরনর কারণ সমূহ অবশ্যই বর্তমান। কিন্তু ইস্‌লাম নিজেই সামাজিক জীবনে ভারসাম্যপূর্ণ ইন্‌সাফ প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত নীতি আদর্শ ও কর্ম-পদ্ধতি রচনা করে থাকে। সে ধনীদের সম্পদে গরীবদের অধিকারের মাপকাঠি নির্ধারণ করে দেয়। আর রাষ্ট্রীয় পর্যায় অর্থনীতিতে একটি ভারসাম্যপূর্ণ বিধানও দেয়। যে যেমন সাধারণ মানুষকে ধাঁধাঁয় ফেলে দেয় না, অনুরূপ বস্তুজগতে স্বীয় অধিকার থেকে হাত গুটাইয়ে শুধু পরকালে তা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নেয়ার প্রত্যাশায় বসে থাকার শিক্ষাও না। বরং সে এর বিপরীত স্বীয় জন্মগত ও স্বভাবগত অধিকার থেকে যারা সহজেই হাত গুটিয়ে নেয়, তারা কাহারো প্রভাব অথবা চাপের মুখে পরে এমন করে থাকুক না কেন, ইসলাম তাদেরকে পরকালে কঠিন শাস্তিদানের ভীতি প্রদর্শন করে। সে তাদের প্রতি আনায়ন করে "নিজেদের উপর নিজেদের অত্যাচার করার" অভিযোগ। ইস্‌লাম তাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে না। পবিত্র কুরআন মজীদে ঘোষণা হয়েছে ঃ

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ
قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي
الْأَرْضِ - قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَا
جِرُوا فِيهَا - فَأُولٰئِكَ مَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ - وَسَاءَتْ
مَصِيرًا -

"যারা নিজেদের উপর নিজেরা জুলুম করতো, ফিরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে নেয়ার পর তারা তাদের নিকট জিজ্ঞেস করবো– তোমরা দুনিয়ায় কিরূপ ভাবে জীবন-যাপন করতে? তারা জবাব দিবে, আমরা দুনিয়ায় খুব দুর্বল ও সহয়হীন অবস্থায় থাকতাম। ফিরেশতারা উত্তর করবো, কেন আল্লাহ্র যমীন কি বিশাল বিস্তীর্ণ ছিল না, তোমরা সেখানে হিজরত করলে না কেন? এরা হলো সে লোক যাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান হলো দোযখে, সেস্থানটি খুবই বসবাসের অনুপযোগী খারাপ স্থান।" (সূরা নিসায়া–৯৭)

এ ধরণের সর্বহারা বঞ্চিত শ্রেণী লোকদেরকে ইসলামে তাদের ন্যায্য অধিকার ও পাওনা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নিবার জন্য জোড় তাগিদ দিয়েছে। আর সংগ্রাম করার জন্য করেছে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত। পবিত্র হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছেঃ

مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَظْلَمَةٍ فَهُوَ شَهِيْدٌ–

"যদি কোন ব্যক্তি নিজের উপর কৃত জুলুম অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাবার নিমিত্ত মৃত্যু বরণ করে, তবে সে শহীদের অন্তর্ভুক্ত।" (নাসাঈ)

সুতরাং এখন যদি ইউরোপীয়গণ ধর্মকে বাস্তব জীবনের কর্মময়-কোলাহল থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে বাধ্য হয়; তবে এ ব্যাপারে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণের আমাদের কোনই প্রয়োজন করে না। অনুরূপ সমাজতন্ত্রী মহল যদি শ্রমিক সমাজের প্রতি অতিদরদ প্রদর্শন করে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণার্থে ধর্মের প্রতি বিরোধীতা ও শত্রুতা পোষণ করতে বাধ্য হয়, তবে এখানেও আমরা তাদের প্রয়োজনীয়তা থেকে সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষীহীন।

কিন্তু কতিপয় লোক, যাদের ভিতর এ ধরণের লোকও বর্তমান রয়েছে, যারা জোড় গলায় নিজেরা মুসলমান হবার দাবি করে। আর মুসলমানদের ন্যায় নিজেদের নাম রাখে, তারা বলে– "ইস্‌লাম যে জীবন বিধান ও আইন-কানুন বিশেষ একটি যুগে ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তার ভিতর কি বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভের সম্ভাবনা এবং বর্তমান যুগের নতুন নতুন অবস্থা ও সমস্যার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করার মত কি যোগ্যতা ও রক্ষণশীলতা বর্তমান আছে? বর্তমান যুগটিতে যখন স্বীয় অবস্থা ও সামাজিক মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে ইস্‌লামে বিকাশ ও সমৃদ্ধির যুগ থেকে বহুলাংশে পার্থক্য ও বিভিন্নতা বর্তমান রয়েছে, তখন ইতিহাসের একটি নবতর অধ্যায়ের সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন যুগের সাথে তাল মিলিয়ে স্বায়ী উন্নতি ও সমৃদ্ধির গতিধারাকে সাফল্যের সাথে প্রবাহমান রাখার যোগ্যতা তার কোথায়?

যদিও এ পুস্তকটির আগাগোড়া এ ধরণের প্রশ্নের সঠিক জবাব, তবুও আমি এখানে পাঠকবর্গেয় সামনে সংক্ষিপ্ত রূপে কিছু কথা পেশ করতেছি।

ইস্‌লাম হলো সেই মহান পরাক্রমশীল স্বত্ত্বার রচিত জীবন পদ্ধতি যিনি সৃষ্টিজগত এবং তার ভিতর প্রচলিত প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুনের নিয়ামক ও রচয়িতা। আর তিনি তার ভিতর ভবিষ্যতের আবর্তন বির্বতনশীল ঘটনা প্রবাহ এবং নিত্য নতুন উদ্ভাবিত অবস্থা ও সমস্যা সম্পর্কেও পূর্ণ ওয়াকিফহাল। এ ঐতিহাসিক আবর্তন সম্পর্কে তিনি পূর্ব থেকে জ্ঞাত ছিলেন। আবর্তনের বিবর্তনের পরিণাম ফলে জগতে কি পরিবর্তন সুচিত হতে পারে– সে বিষয়ও তিনি পূর্ববৎ পূর্ণ সজাগ আছেন। তিনি যেমন মৌলিক আদর্শ ও নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, অনুরূপ উক্ত নীতিমালার একটি খসড়া চিত্রও রচনা করে দিয়েছেন। এখন যে উক্ত নীতিমালার কর্মময় জীবনের সাথে সমন্বয় বিধানের কাজ রয়ে গেল, তা হবে যুগের প্রয়োজনীয়তা কল্যাণকারীতা এবং তার আবর্তন বিবর্তনের চাহিদার মাফিকের উপর নির্ভরশীল। আর এ কাজ সম্পন্ন হতে হবে তার নির্দিষ্টকৃত নিয়ম-কানুন এবং চিহ্নিত কৃত সীমারেখার গণ্ডীতে অবস্থান করে।

আমরা যে কতকগুলো আনুসাঙ্গিক ও বিশদ ব্যাখ্যামূলক আইন-কানুন ও নীতিমালা ইস্‌লামে অবলোকন করিতেছি, তা জীবনের ঐ সকল ক্ষেত্র ও শাখা-প্রশাখার জন্য রচনা করা হয়েছে, যা মূলগত হিসেবে জাগতিক আবর্তনের দ্বারা কোনরূপ প্রভাবিত হয় না। ইস্‌লামী আইন-কানুন ও বিধান এ সীমারেখার ভিতর অবস্থান করে সর্বযুগে সর্বস্থানে সর্বক্ষেত্রে সর্বপরিবেশে পূর্ণ কল্যাণকারীতা ও আড়ম্বরের সাথে বাস্তবে প্রাযোজ্য হবার পূর্ণ যোগ্যতা তার মধ্যে বর্তমান। অনুরূপ ইসলামী আইন-কানুন ও বিধানের মধ্যে স্বীয় পূর্ণতা স্থিতিস্থাপকতা ও নমনীয়তা থাকার কারণে যুগের উন্নতির সাথে সাথে সে নিজে সমৃদ্ধি ও উন্নতি এবং সংস্কার করণের পূর্ণ যোগ্যতারও অধিকারী।

এ ধর্মের আইনবিদগণ যুগে যুগে অক্লান্ত পরিশ্রম করে ইস্‌লামের আইন-কানুন বিধানকে বাস্তব পরিবেশ ও অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষেত্রে যে খেদমত করে গেছেন; তা সত্যই শ্রদ্ধার বস্তু। সে সময় সমাজে ইস্‌লামী আইনের শাসন ব্যবস্থা বর্তমান ছিল। সেই সকল আইনবিদদের অক্লান্ত পরিশ্রমের দরুনই ইস্‌লামী আইন-কানুন ও নীতিমালাকে সমাজের নিত্য নতুন উদ্ভাবিত সমস্যার সমাধানে পূর্ণরূপে সহায়তা দান করা হয়েছিল। অতঃপর

দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদের আইন গবেষণার কাজ বন্ধ থাকার কারণে ইস্‌লামী আইনের ক্রমোন্নতির ধারা ঐখানেই বাধা প্রাপ্ত হয়। এখন বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে সমগ্র ইসলাম জগতে জাগরণ ও চেতনার নব উষার আলোক রেখা প্রতিভাত হচ্ছে। আর ধাপে ধাপে ইস্‌লামী আইন-কানুনের মধ্যে একটি নবতর প্রাণ চাঞ্চল্যো সৃষ্টি হতে চলছে।

অতএব বর্তমানে উদ্ভুদ্ধ পরিস্থিতির বাস্তব মোকাবিলার জন্য শরীয়াত থেকে উৎসারিত ইস্‌লামী আইনের সম্পাদনার যে কাজ খুব সংক্ষিপ্ত আকারে ক্রমিক পর্যায় চলে আসছে, তা পুনরায় নতুন রূপে আরম্ভ করার পূর্বে ফ্রান্সের আইন থেকে আমাদের আইন রচনা করার ব্যাপারে উপদেশ গ্রহণ করা অথবা সমাজতান্ত্রিক দর্শন থেকে আমাদের সমাজ-বিধান গ্রহণ করা কোন ক্রমেই সমীচীন হবে না। বরং তা হবে আমাদের জন্য আত্মঘাতীর শামিল।

আমাদের সামাজিক জীবন পূর্বে যে আইন-কানুনের অধীন হয়ে পরিচালিত হতো এবং যার মূল বুনিয়াদের উপর তা প্রতিষ্ঠিত ছিল, এখন যদি নতুন রূপে সমাজের পুর্ণবিন্যাস ও সংস্কার সাধনের বেলায় তার কার্যকারি যোগ্যতা ও উপকারীতা থেকে নৈরাশ হওয়া ব্যাতিরেকেই ধর্মকে শুধু ইবাদতের গণ্ডীর মধ্যে সীমায়িত করে রাখি, তবে তা ধর্মের প্রতি অবিচার করা ছাড়া আর কিছুই নয়। আসল কথা হলো যে কোন সমাজ ও পরিবেশের জন্য কেবল সেই নীতিমালা ও বিধানই কার্যকরি এবং ফলপ্রসু হতে পারে যে নীতিমালা ও বিধান সেই সমাজ ও পরিবেশের মধ্যে প্রাকৃতিক উপায় উন্নতি ও সমৃদ্ধির মান্‌যিল সমূহ অতিক্রম করে ফেলেছে। নতুন কোন সমাজ ও পরিবেশের আইন-কানুন যা বিশেষ পরিমণ্ডলের উন্নতির প্রাকৃতিক মান্‌যিল সমূহ অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি, তাকে টেনেএনে ঐ সমাজ ও পরিবেশের উপর চাপিয়ে দেয়া কখনো তার জন্য ফলপ্রসু হতে পারে না। আমাদের ইসলামের দাবি আমাদের থেকে যা কিছু পেতে চায়; তার সাথেই এ সকল আলোচনা পূর্ণরূপে সম্পর্কযুক্ত। এ দাবির মূল বুনিয়াদ হলো এটাই যে, আমারা এক আল্লাহকে উপাস্য মনোনীত করে তার গোলামী করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছি। আর আল্লাহ তায়ালাকে মাবুদ স্বীকার করে তার গোলামী ও বন্দেগী করার একমাত্র পথই হলো আল্লাহ প্রদত্ত্ব জীবন বিধান তথা তার শরীয়তকে নিজেদের শাসক হিসেবে নির্বাচিত করা। তা না করা শুধু দ্বীনের আসল স্বরূপের ব্যাপারে অজ্ঞ থাকারই পরিচয় নয়, বরং মানব জীবন ও মানব সমাজের সূক্ষ্মতত্ত্ব ও মূল রহস্য ভেদ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না

থাকারই প্রকাশ। এটা হলো দ্বীন-দুনিয়া ধর্ম ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য করণের সেই গতিধারা ও প্রবণতার অন্ধ অনুকরণ, যা ইউরোপের মাটিতে জন্মলাভ করে সেখানেই লালিত-পালিত হয়েছে। ইউরোপীয়ানদের ধর্মের গতি-প্রকৃতি নিজেই তাদের এহেন পার্থক্য করণের দাবি করে। সুতরাং ইসলামের স্বরূপ ও গতি-প্রকৃতি যখন তাদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং উভয়ের মধ্যে বহু দুরের ব্যবধান বিদ্যমান, তখন আমাদের সাথে তাদের কি সম্পর্ক থাকতে পারে? উপরে আমি ঐতিহাসিক বিচার বিশ্লেষণ করে পরিষ্কার রূপে প্রমাণ করেছি যে, তাদের মধ্যে ধর্ম এবং বিজ্ঞান আর গীর্জার যাজক শ্রেণী–তথা পাদ্রী ও রাষ্ট্রীয় শাসকবর্গের দ্বন্দ্ব ও কলহ বিদ্যমান, যা বিশেষ ঐতিহাসিক পটভূমিকার দরুন তাদের মধ্যে এ ধ্যানধারণা ও গতিধারা জন্মলাভ করেছে। সুতরাং ইসলামী ইতিহাসের বাস্তব অবস্থা যখন এর প্রতিকূল ও অসামঞ্জস্যশীল, এক কথায় যার সাথে এর আদৌ কোন সম্পর্ক নেই, তখন তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক যে, চির দিনের জন্য বিচ্ছেদপূর্ণ তাতে আর কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

আমাদের এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য এ নয় যে আমরা চিন্তাধারা আধ্যাত্মিকতা ও সামাজিকতার দিক দিয়ে মানবতার কাফেলা থেকে পৃথক হবার আহ্বান জানাচ্ছি। এ উদ্দেশ্য আমাদের কখনো নয়; আর এ ধরনের পৃথক করণের পক্ষপাতিও ইসলাম নয়। সে যখন একটি বিশ্বজনীন পয়গামের রূপ নিয়ে মানব সমাজের সামনে উপস্থিত হয়েছে, তখন তার দ্বারা তা কিরূপে সম্ভব হতে পারে? আমরা শুধু এ কথার উপরই বিশেষ জোর দেই যে কাহারো অন্ধ অনুকরণের পূর্বে আমাদের নিজস্ব সম্পদের একবার ভাল রূপে হিসাব-নিকাশ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নেয়া উচিত। প্রথমতঃ আমাদের নিজস্ব আদর্শ ও নীতিমালা আলোচনা পর্যালোচনা করে; সে যুগের চাহিদা মিটাতে পারে কিনা এবং তাকে গ্রহণ করার উপযুক্ততা ক্ষমতা কত দুর সীমা পর্যন্ত তার ভিতর বর্তমান রয়েছে তার একটি সঠিক অনুমান ও মূল্যমান নির্ধারণ করে নেয়া বাঞ্ছনীয়। আমাদের কিংবদন্তি উদ্ধৃতি ও ইতিহাস এ ধরনের অন্ধ অনুকরণের সাথে আদৌ কোন সম্বন্ধ রাখে না। আমরা তার বন্দীজালে আবদ্ধ হয়ে আমাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের ধর্ম যখন আমাদেরকে সর্বদা সম্মুখ পানে অগ্রসর হবার নিমিত্ত অনুপ্রাণিত করে তখন আমরা অন্য জাতির অন্ধ অনুসারী হয়ে মানবতার কাফেলার পিছনে পিছনে আমাদের চলতে হবে, তা কখনোই হতে পারে না।

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ-

"দুনিয়ায় তোমরাই হলে সেই উত্তম সম্প্রদায় যাদেরকে মানুষের হেদায়েত কল্যাণ ও উপকারার্থে ময়দানে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। তোমাদের কাজ হলো সৎকাজের আদেশ করা, অসৎ ও অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখা।" (সূরা আল্ ইমরাস-১১০)

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا-

"অনুরূপ আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যম পন্থার জাতি হিসেবে সৃষ্টি করেছি। কারণ তাহলে তোমরা দুনিয়ার উপর সাক্ষী হিসেবে থাকবে, আর রাসুল হবে তোমাদের উপর সাক্ষী।" (সূরা বাকারা-১৪৩)

তারা জানে না যে আমাদের নিকট সেই চিসিৎসা বিধান বর্তমান আছে, যা ব্যথিতের বেদনা দুরীভূত করার স্বার্থক বন্ধু ও সহযোগী হিসেবে কাজ করতে পারে। যাকে আধ্যাত্মিকতা বিবর্জিত বস্তুবাদী সভ্যতা উনবিংশ শতাব্দীর সংক্ষিপ্ত সময় দুটি বিশ্ব যুদ্ধের মাধ্যমে ভাল রূপে ঝেঁকেছে। আর বর্তমানেও বস্তুবাদী আর্দশের অনুসারীরা সেই পথ ভ্রষ্টতার মধ্যে নিপতিত যা তৃতীয় এমন একটি বিশ্বযুদ্ধের পানে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যা দ্বারা তারা সমগ্র পৃথিবীর তাহজীব তামদ্দুন ও সভ্যতা সংস্কৃতি ধ্বংসে পর্যবসিত হবার পূর্ণ সম্ভাবনা বিদ্যমান।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামে সামাজিক সুবিচারের গতি প্রকৃতি

ইসলামের সামাজিক সুবিচার সম্পর্কে আমরা সঠিক জ্ঞান ও পরিচয় তখনই লাভ করতে পারবো যখন তাওহীদ সৃষ্টি জগত, জীবন ও মানুষ সম্পর্কে ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারার মোটামুটি জ্ঞান ও বুঝ আমাদের লাভ হবে। কারণ সামাজিক সুবিচারের ইসলামী দর্শন সেই মৌলিক নীতি ও বুনিয়াদী চিন্তাধারারই একটি শাখা মাত্র; যা হলো ইসলামের সমুদয় শিক্ষা ও তালিমের মুল কেন্দ্রস্থল।

যেহেতু পূর্ণমানব জীবনটাকে একটি নবরূপে নবছাঁচে ঢালাই করে সংগঠন করার কাজই হলো ইসলামের মূল কর্মসূচী। এ জন্যই তার সমুদয় সংস্কার মূলক কর্মসূচী যেমন আলমারীর তাকের উপর রেখে দেয়া হয়নি, তেমনি সে প্রত্যেকটি উদ্ভাবিত সমস্যার জন্য স্বতন্ত্র রূপে আলাদা কোন নীতিমালা ও সমাধানও দেয়নি। তার নিকট রয়েছে তাওহীদ সৃষ্টি জগত জীবন ও মানুষ সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ দর্শন ও ধ্যান-ধারণা। তার সমগ্র শাখা-প্রশাখা ও আনুষঙ্গিক নীতিমালা তার দর্শন ও ধ্যান-ধারণা থেকেই জন্ম লাভ করেছে। তার দর্শন আইন-কানুন বিধান, তার নির্ধারিত সীমারেখা এবং ইবাদাত-উপসনা এবং পারস্পরিক লেন-দেন আদান-প্রদান সম্পর্কীয় নীতিমালার সবই এ মূলনীতির সাথে গভীর সম্পর্কে বিজড়িত। আর এহেন পূর্ণাঙ্গ চিন্তাধারার আলোকেই তার বাস্তব কর্মসূচী প্রণীত হয়। প্রত্যেকটি উদ্ভাবিত নতুন অবস্থার জন্য এমন একটি নতুন ও স্বাধীন কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয় যা অন্যান্য ব্যাপারে গৃহীত কর্মসূচীর সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না। অথবা প্রত্যেক সমস্যার জন্য স্বতন্ত্র সমাধান অনুসন্ধান করার ও নীতি ইসলামী গতি প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

এ মৌলিক চিন্তাধারার সঠিক জ্ঞান লাভ একজন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির জন্য ইসলামের নীতিবিজ্ঞান ও আইন-কানুনের জ্ঞান লাভকে সহজলব্ধ করে দেয়। তার আলোকেই সে অনায়াসে ইসলামের বিশদ নীতিমালাকে তার মৌলিক নীতিমালার সাথে গভীর বন্ধুত্ব দেখতে পায়। আর ইসলামী জীবন দর্শনকে মনোযোগ সহকারে গভীর ভাবে গবেষণা করা কেবল এ জ্ঞান লাভ করার পরই সম্ভব হয়। এ জ্ঞান থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করার পরই সে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হয় যে, ইসলাম এমন একটি অবিভাজ্য পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন, যার

প্রত্যেকটি শাখা-প্রশাখা অন্যান্য শাখা-প্রশাখার সাথে-ওৎপ্রোত ভাবে জড়িত। যখন এ জীবন বিধানকে একান্তভাবে আপন করে নিতে পারবে, কেবল তখনই মানব জীবনের জন্য এ বিধান ফলপ্রসু ও কল্যাণময়ী হতে পারে।

ইসলামী দর্শনের গবেষকদের জন্য গবেষণার সঠিক পন্থা হলো রাজনীতি, অর্থনীতি অথবা ব্যক্তি ও জাতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের অন্তর্ভূক্ত ইসলামী শিক্ষা ও তালীমের পর্যালোচনার পূর্বে তাওহীদ সৃষ্টি জগত জীবন ও মানুষ সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক ও দার্শনিক চিন্তাধারার ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে পূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল হওয়া। কারণ এ সকল বিষয়-বস্তু হলো ঐ মৌলিক চিন্তাধারারই শাখা-প্রশাখা মাত্র। আর ঐ মৌলিক চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণা থেকেই তার উৎপত্তি। তার পূর্ণ উপলব্ধি ও জ্ঞানলাভ ব্যতিরেকে এ সব বিষয় গভীরভাবে পূর্ণবুৎপত্তি ও জ্ঞান লাভ করা আদৌ সম্ভব নয়। সুতরাং সর্ব প্রথম এ চারটি বিষয় সম্পর্কে ইসলামের দর্শন ও ধ্যান-ধারণা কি সে সম্পর্কে সমক্য জ্ঞান লাভ করা একান্ত প্রয়োজন।

ইসলামের সত্যিকার চিন্তাধারা ও জ্ঞান গবষণা ইব্নে সীনা, ইব্নে রুশ্দ, ফারাবী প্রমুখ অন্যান্য দার্শনিক চিন্তাবিদ যারা ইসলাম জগতে দার্শনিক নামে খ্যাত; তাদের নিকট পাওয়া যাবে না। তাদের দর্শন হলো গ্রীস দর্শনের অবিকল নকল কপি মাত্র, যা অধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে ইসলামের জন্য একটি অভিনব দর্শন। ইসলামের নিকট তার নিজস্ব এমন একটি সত্যিকার পূর্ণাঙ্গ চিন্তাধারা বর্তমান আছে, যার মূল উৎস কেন্দ্র হলো কুরআনে করীম, হাদীসে রাসুল আর নবী করীম (সাঃ)-এর জীবন দর্শন এবং তার বাস্তব জীবনের কর্ম পদ্ধতি। ইসলামের যে মৌলিক চিন্তাধারা থেকে তার অবশিষ্ট সমুদয় শিক্ষা ও তালীম তথা উপসনা-আরধনা লেন-দেন কাজ-কারবার এবং রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন নবরূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ হয়েছে, তাকে লালন-পালন ও বাঁচিয়ে রাখার নিমিত্ত প্রত্যেক অবিজ্ঞ অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির জন্য এ মৌলিক চিন্তাধারার উৎসকেন্দ্রই যথেষ্ট। অন্য কোন থিউরি বা মতবাদের আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজন করে না।

ইসলাম স্রষ্টা এবং সৃষ্টি, মানুষ, জীবন, ও সৃষ্টি জগত আর মানুষ এবং তার নিজস্ব সত্ত্বা, ব্যক্তি ও সমষ্টি, ব্যক্তি এবং রাষ্ট্র এক কথায় সমগ্র মানব জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যত বংশধরদের পারস্পরিক সম্পর্কের ধরন ও গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে। সে তার তাতে প্রত্যেকের ব্যাপারে নিজস্ব নীতিমালা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে এমন একটি পূর্ণাঙ্গ চিন্তাধারা রচনা করেছে, যার রূপরেখা

হলো বিশাল ও সর্বজনীন। এ মৌলিক চিন্তাধারার বিশদ আলোচনা এ পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। এর বিশদ আলোচনা "ইসলামী চিন্তাধারার বৈশিষ্ট এবং তার নীতি" নামক শীর্ষক এক পুস্তকে করেছি। এখনে শুধু আমি নীতিগত এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলোর পানে এ জন্য ইঙ্গিত করতেছি যেন, তা "সামাজিক সুবিচার" শীর্ষক প্রবন্ধের মুখবন্ধ হিসেবে কাজে আসে।

দীর্ঘকাল পর্যন্ত মানবতা সৃষ্টি জগত এবং সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা এবং সৃষ্টি জগত, জীবন এবং মানুষ সম্পর্কে কোন পুর্ণাঙ্গ চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণায় উপনীত হতে পারে নি।

আল্লাহর তরফ থেকে যখনই কোন নবী এহেন চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণা নিয়ে এসে জগতে মানব সমাজের সামনে পেশ করেছে, তখনই কিছু সংখ্যক লোক দ্বিধাহীন চিত্তে তা গ্রহণ করে নিয়েছে। কিন্তু সমাজের অধিকাংশ মানুষ তা থেকে পৃষ্ট প্রদর্শন করে চলে গেছে। অতঃপর পরিশেষে সমগ্র মানবতাই তার থেকে মুখ ফিরিয়ে জাহেলিয়াতের চিন্তা-ধারা ও ধ্যান-ধারণার পানে ধাবিত হয়েছে। অতঃপর ইসলাম উক্ত বিষয় সমুহের একটি পূর্ণাঙ্গ ধ্যান-ধারণাসহ একটি পূর্ণাঙ্গ শরিয়াত এক সাথে নিয়ে মানব সমাজের নিকট হাজির হয়েছে। আর সে এ দু'টি ভিত্তির উপরই জীবন বিধান প্রতিষ্ঠিত করেছে, যা হলো সেই মৌলিক ধ্যান-ধারণা ও শরিয়াতেরই বাস্তব প্রদর্শনী বিশেষ।

যতদুর পর্যন্ত স্রষ্টা ও সৃষ্টির (সৃষ্টি জগত, মানব, জীবন) মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের প্রশ্ন বিদ্যমান, তার মূল হলো সেই ঐচ্ছিক শক্তি যা থেকে কোন মাধ্যম ছাড়াই সমগ্র সৃষ্টি জগত বাস্তবে রূপলাভ করেছে। পবিত্র কুরআনে করীমে আল্লাহ বলেছেনঃ

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٥

"সেই মহান প্রভুর বৈশিষ্ট হলো যে, যখন সে কোন কাজের ইচ্ছা পোষণ করে তখন তিনি বলেন–"হয়ে যাও" অমনি তা স্বাভাবিক ভাবে হয়ে যায়।" (সূরা ইয়াসীন–৮২)

স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যবর্তি স্থানে কোন রূপ মধ্যস্ততার প্রতিবন্ধক নেই, যেমন নেই কোন প্রকার শক্তির মাধ্যম, অনুরূপ নেই কোন প্রাকৃতিক মাধ্যম। বরং কোন মধ্যস্ততা ব্যতিরেকেই সৃষ্টি জগত স্রষ্টার সাধারণ ইচ্ছার দ্বারা সরাসরি কোনরূপ বিলম্ব ছাড়াই অস্তিত্বের বাস্তব রূপ লাভ করেছে। তারই সাধারণ অথচ

পূর্ণ ইচ্ছা দ্বারা সৃষ্টি জগতের হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাদের ব্যবস্থাপনার যাবতীয় কাজ স্বাভাবিক ভাবেই হয়ে থাকে। কুরআন মজীদে আল্লাহ বলেন ঃ

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ ٥

"আল্লাহ তায়ালা নিজেই যাবতীয় কাজের ব্যবস্থাপনা করেন আর তিনি তার আয়াত সমূহের বিস্তারিত বর্ণনা দেন।" (সূরা রয়া'দ-২)

وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ٥

"তিনি নভোমণ্ডল যাতে করে তা ভূমণ্ডলে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ে না যায়, তার ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু আল্লাহর অন্যরূপ নির্দেশ হলে তখন আর বর্তমান ব্যবস্থা থাকবে না।" (সূরা আল্ হজ্জ-৬৫)

لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ـ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ٥

"সূর্যের এমন কোন নিজ শক্তি নেই যে সে চন্দ্রকে ধরে ফেলতে পারে। অনুরূপ রাত্রির ও দিবসের পূর্বে আগমন করার কোন শক্তি নেই। তারা প্রত্যেকই নিজ নিজ কক্ষ পথে ঘুর্ণিয়মান অবস্থা কর্মব্যস্ত রয়েছে।" (সূরা ইয়াসিন-৪০)

تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ٥

"সেই মহা প্রভু বড়ই প্রাচুর্যময়, যার আয়াত্বে রয়েছে সকল রাজক্ষমতা, আর তিনি হয়েছেন প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাশীল।" (সূরা মূল্ক-১০)

একটি সাধারণ ইচ্ছা থেকে প্রকাশিত এ বিশাল সৃষ্টি জগতের অস্তিত্বের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে একটি পুর্ণাঙ্গ একাত্ব। যার প্রতিটি অংশ এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, তার অন্যান্য অংশের সাথে একটি পারস্পরিক সম্বন্ধ বিদ্যমান। এখানে প্রতিটি অংশের ভিতর এমন একটি বিশেষ গূঢ়রহস্য ও নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত রয়েছে, যা পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সম্পর্কের এহেন পূর্ণ ব্যবস্থাপনার সাথে গভীর সম্পর্ক বজায় রেখে চলে। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ٥

"আর তিনি সৃষ্ট জগতের প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি তার প্রতিটির জন্য একটি নিয়তিও নির্ধারণ করে দিয়েছেন।" (সূরা আল্ ফুরকান–২)

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ○

"নিশ্চয় আমি প্রতিটি বস্তু তার মূল্যমান ও পরিমাপ হিসেবে সৃষ্টি করেছি।" (সূরা ক্বামার–৪৯)

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا - مَا تَرٰى فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ - فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ○ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ○

"সেই মহান প্রভু যিনি নভোমণ্ডলকে পরস্পরা স্তরে সাত ভাগ করে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা রহমানুর রহীম আল্লাহ তায়ালা রব্বুল আলামীনের সৃষ্টি নিপুণতার ভিতর কোনরূপ তারতম্য ও বিশৃঙ্খলা দেখতে পাবে না। তোমরা উন্মেলিত নেত্রে তাকিয়ে দেখতো, তোমরা কি কোনরূপ ত্রুটি বিচ্যুতি দেখতে পেতেছো? আবার তোমরা দ্বিতীয়বার ভাল করে তাকিয়ে দেখো; তোমাদের দৃষ্টিশক্তি লজ্জ্যায় অবনমিত হয়ে নিম্নগামী হয়ে যাবে। অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টির ভিতর কোনরূপই ত্রুটি বিচ্যুতি তোমরা দেখতে পাবে না।" (সূরা মূল্‌ক–২–৪)

وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا-

"আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর উপর একদিকে যেমন পাহাড় সৃষ্টি করে রেখেছেন অপর দিকে তার ভিতর তার বরকত ও প্রাচুর্য্য নিহিত রেখে তার ভিতর মানুষের রিযিকের সংস্থান করে রেখেছেন।" (সূরা হা-মীম সিজদাহ্–৩) ১০

اَللّٰهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا

فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ
كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهِ ۚ فَاِذَا اَصَابَ
بِهٖ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ-

"আল্লাহ তায়ালা এমন পরাক্রমশীল যে একমাত্র তিনিই বায়ুকে প্রবাহিত করেন, অতঃপর সেই বায়ু মেঘমালাকে বিভিন্ন দিকে নিয়ে খণ্ড-খণ্ড রূপে রেখে দেয়। তোমরা সেই মেঘমালা থেকেই বৃষ্টি বর্ষণ হতে দেখতে পাও। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছে তা দান করেন এবং তোমরা তাকে খুব আনন্দিত ও খুশী অবস্থায় দেখতে পাও।" (সূরা রুম-৪৮)

কুরআনে করীমের উপরিবর্ণিত আয়াতগুলো থেকে এ কথা পরিষ্কার রূপে বুঝা যায় যে, বর্তমান প্রত্যেকটি বস্তুর সৃষ্টির পিছনে আল্লাহ তায়ালা রব্বুল আলামীনের এমন একটি মহান উদ্দেশ্য ও হেকমত এবং বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তত্ত্ব রহস্য নিহিত রয়েছে, যা সৃষ্টি জগতের উদ্দেশ্যের সাথে সম্পূর্ণ রক্ষণশীল ও বন্ধুত্ব সুলভ সম্পর্ক বিদ্যমান। আর সৃষ্টি জগতের সৃষ্ট এবং তার সংগঠন, পরিচালনা ও দেখাশুনার পিছনে যে মহান ঐচ্ছিক শক্তি কার্যারত রয়েছে, সেই ঐচ্ছিক শক্তিই প্রত্যেক বস্তুর ব্যাপারে বিশেষ লক্ষ্য রাখে যাতে তা সার্বিক সৃষ্টি জগতের জন্য সার্বিক কল্যাণের বাহক এবং তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

সৃষ্টিজগত যেহেতু সাধারণ অথচ পূর্ণ একটি ইচ্ছাশক্তি থেকে সরাসরি ভাবে প্রকাশিত হবার দরুন তার ভিতর এমন একটি ঐক্যতা বিরাজমান, যার প্রতিটি অংশ ও শাখা-প্রশাখা পরস্পর পরস্পরের সাথে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ ও ওৎপ্রোত ভাবে বিজড়িত।

এ কারণেই সে জীবন এবং বিশেষ ভাবে নৈতিক জীবনের সর্বোচ্চ প্রদর্শনীর সৃষ্টিকুল শুধু কেবল ফলপ্রসু ও উপযোগীই প্রমাণিত হয় না, বরং সাহায্যকারী ও সহানুভূতিশীলও হয়ে থাকে।

বস্তুতঃ সৃষ্টি জগত যেমন জীবনের জন্য শত্রু নয়, তেমনি নয় মানুষের জন্য। বর্তমান জাহেলিয়াতের পরিভাষায় যাকে প্রকৃতি নামে অভিহিত করা হয়, তা মানুষের দুশমন নয় যে, তাকে গলা টিপে মেরে ফেলা হবে এবং তা আল্লাহর সৃষ্টিজগত ও মানুষের গতি বিধির পরিপন্থীও নয়। তার সাথে লড়াইর ময়দানে

অবতীর্ণ হয়ে পাঞ্জা ধরার ভূমিকায় নেমে পড়া জীবন ধারণকরী জীবের কাজ নয়। কারণ তারা তারই স্নেহের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হয়েছে। আর তারা এবং প্রকৃতি উভয়ই সেই সৃষ্টি জগতের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে চলে। আর সমুদয় সৃষ্টি জগত একই ইচ্ছা থেকে বিকশিত। মানুষ সম্বন্ধযুক্ত উপযোগ পরিবেশের এমন সৃষ্টি কুলের মধ্যে বসবাস করে, যারা সর্বদাই তার বন্ধু ও সহানুভূতিশীল। আল্লাহ তায়ালা যখন এই মায়াময় বসুন্ধরা সৃষ্টি করেছেন, তখন–

وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا بَارَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا أَقْوَاتَهَا–

"তিনি পৃথিবীর বুকে বিভিন্ন স্থানে পাহাড় স্থাপন করে দিয়েছেন এবং তার ভিতর বরকত ও প্রাচুর্য্য দান করে খাদ্যের সংস্থান করে রেখেছেন।" (সূরা হা-মীম সিজদাহ–১০)

وَأَلْقَى فِى الْأَرْضِ رَوَاسِىَ أَنْ تَمِيْدَبِكُمْ

"পৃথিবী যাতে করে তোমাদের নিয়ে হেলেদুলে না পড়ে সে জন্য তিনি পৃথিবীর উপর ভার স্বরূপ পাহাড় স্থাপন করে দিয়েছেন।" (সূরা নাহল–১৫)

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ–

"আর পৃথিবীকে তিনি সৃষ্ট জীবের বসবাসের জন্য সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আররহমান–১০)

هُوَالَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهِ–

"মহান প্রভু পৃথিবীকে তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তার উপর বিচরণ করো এবং আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক ভক্ষণ করো।" (সূরা মূলক–১৫)

خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْأَرْضِ جَمِيْعًا–

"পৃথিবীর সমুদয় বস্তু তিনি তোমাদের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা বাকারা–২৯)

নভোমণ্ডল হলো উজ্জ্বল তারকারাজিসহ আল্লাহর সৃষ্টি কুলের একটি অংশ মাত্র, যা অন্যান্য অংশের সাথে সম্মিলিত হয়ে পুর্ণতার উচ্চমার্গে উপনীত হয়েছে। অনুরূপ সৌরজগত ও পৃথিবীর অভ্যন্তরে যা কিছু বিদ্যমান রয়েছে, তা সকলই সৃষ্টিকুলের অন্যান্য অংশের পথের সাথী স্বরূপ। তাদের সাথে তাদের ঘনিষ্ট সম্পর্ক ও যোগসুত্র বিদ্যমান। আর তারা পরস্পর পারস্পরের প্রতি সহানুভূতি শীল দরদী বন্ধু স্বরূপও বটে। পবিত্র কুরআন মজীদে আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ-

"আমি পৃথিবীর নিকটস্থ আসমানকে নিহারিকারাজির বিচ্ছিন্ন মালা দ্বারা সজ্জিত করে রেখেছি।" (সূরা মূলক-৫)

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا- وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا-
وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا- وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا-
وَجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا- وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا-
وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا- وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا
وَّهَّاجًا وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا
لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا - وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا-

"আমি কি পৃথিবীকে বিছানা স্বরূপ তৈয়ার করিনি? আর পাহাড়কে কি কীলক রূপে সৃষ্টি করিনি? আমি তোমাদেরকে নরনারী রূপে জোড়ায় জোড়ায় করে সৃষ্টি করেছি। আর আমি তোমাদের বিশ্রামের উপকরণ হিসেবে নিদ্রাকে সৃষ্টি করে দিয়েছি। আর রাত্রকে করে দিয়েছি আবরণ স্বরূপ এবং দিবসকে নিয়োজিত করেছি আয় উপার্জন করার নিমিত্ত। আমি তোমাদের মাথার উপরে সাতটি আসমানকে দৃঢ়রূপে সৃষ্টি করে তাতে একটি প্রদীপও (সুর্য) রেখে দিয়েছি। আর আমি পৃথিবীকে বিভিন্ন তরিতরকারী, ফল-মূল ও শস্য-শ্যামল

করে সবুজের শ্যামল আভা আনয়নের নিমিত্ত মেঘমালা থেকে অপরিমিত বৃষ্টির পানিও বর্ষণ করে থাকি। (অতএব তোমাদের শুকরিয়া জ্ঞাপন করা উচিত।" (সূরা নাবা ৬-১৬)

বিশ্ব নিয়ন্তা পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা রাব্বুল আলামীন এ সকল শক্তি সমূহকে এ জন্য সৃষ্টি করেছেন যে, তারা মানুষের বন্ধু সাহায্যকারী ও মদদগার হিসেবে সর্বদা প্রস্তুত থাকবে! তাদের এহেন বন্ধুত্ব অর্জনের বাস্তব কর্মপন্থা হলো গবেষণা পরীক্ষা-নিরিক্ষা চালিয়ে তার মূল তত্ত্ব রহস্য অনুধাবন করবে এবং তার স্বরূপ ও গতি প্রকৃতি উপলব্ধি করে তার সাহায্যকারী রূপে থাকবে। যদি এ সকল শক্তিসমূহ মাঝে মাঝে মানুষের জন্য কষ্টদায়ক ও পীড়াদায়ক হতে দেখা যায়, তবে তার কারণ হবে যে, মানুষ তা নিয়ে চিন্তা গবেষণা পরীক্ষা-নিরিক্ষা চালায়নি। আর ঐ সকল নিয়ম নীতি ও আইন কানুন ও বিধান সমূহ তারা অনুধাবন করতে পারেনি যার অনুবর্তি হয়ে তারা অবিরত গতিতে কাজ করে যাচ্ছে। আর সাথে সাথে এটা হওয়াও সম্ভব নয় যে, স্রষ্টা মানুষসহ অন্যান্য সৃষ্ট জীবকে সহানুভূতিশীল সৃষ্ট জগতের নিকট সোদর্প করে তাদেরকে নিজের দেখাশুনা ও পরিচালনার কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করবেন। একই সময় সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রতি এবং প্রতিটি একক বস্তুর প্রতি তার ঐচ্ছিক শক্তি কার্যকরি থাকে। এটা হলো ইসলামী বিশ্বাসের অন্তর্নিহিত মূল কথা। পবিত্র কুরআন মজীদে- আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ـ
وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ ـ

"মূল কথা হলো যে, আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী যাতে হেলে দুলে না পড়তে পারে, সে জন্য আল্লাহ তায়ালাই তাদের গতি প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করেন। বাস্তবিক পক্ষে তা যদি হেলে দুলে পড়ে যায়, তবে আল্লাহ ছাড়া আর কোন শক্তিই তার গতি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে না।" (সূরা ফাতের-৪১)

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا
وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا مُسْتَوْدَعَهَا-

"পৃথিবীর বুকে এমন কোন জীব নেই, যার খাদ্যের সংস্থান আল্লাহ তায়ালা না করেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের স্থায়ী নিবাস ও অস্থায়ী নিবাস সম্বন্ধে বেশ ভাল রূপেই ওয়াকিফহাল আছেন।"

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَاتُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ-

"আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং আমি ভাল রূপেই অবগত আছি যে, তার নাফ্স কি কুমন্ত্রনা তাকে দেয়? আমি তার গলদেশের প্রধান শীরাটির চেয়েও তার অনেক নিকটবর্তী।" (সূরা কাফ-১৬)

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ-

"তোমার প্রতিপালক বলেন- তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো।" (সূরা মুমিন-৬০)

وَلَاتَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ - نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ-

"খাদ্য-দ্রব্য ঘাটতি পড়ে যাবার সন্দেহে নিজেদের শিশু-সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমি তোমাদের এবং তাদের সবারই রিযিকের সংস্থান করি।" (সূরা আন্য়াম-১৫১)

ঐক্যের একই সুর বিতানে ঝঙ্কারিত এ বিচিত্রময় সৃষ্টি জগত একটি নবতর ইচ্ছা শক্তির বদন্যতার বাস্তব অভিব্যক্তি বৈ কিছু নয়। মানুষ হলো সেই সৃষ্টি জগতেরই একটি অংশ মাত্র, যা তার অন্যান্য অংশের সাথে একান্ত ঘনিষ্টরূপে-বিজড়িত। আর স্বতন্ত্ররূপে সৃষ্টি জগতের নিয়ম শৃঙ্খলার সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিজড়িত থাকার অনিবার্য দাবি হলো যে, মানুষ স্বতন্ত্র রূপে ব্যক্তি ব্যক্তির সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক ও পরম আত্মীয়তার সুত্রে আবদ্ধ হয়ে এ জগতে থাকবে। এ কারণেই ইস্লাম মানবিক ঐক্য ও সাম্যের দাবিদার। এ ঐক্যের অংশ সমূহ বিভিন্নও যদি হয়, তথাপি তা হবে মানবিক ঐক্যতা ও সাম্যের খাতিরে। আর বিভিন্ন পন্থাগ্রহণ করে পরিশেষে একে অপরের সাহায্য সহানুভূতিই করে। কারণ

সৃষ্টি জগতের ঐক্যের সূরের সাথে সূর মিলানো হচ্ছে সকলের একান্ত বাঞ্ছনীয় আশা।

يَايُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنٰكُمْ ....

شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْ-

"হে আমদ সন্তানা! আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতিতে ও গোত্রে এজন্য ভাগ করে সৃষ্টি করেছি যেন, তোমাদের পরস্পর পরস্পরকে জানতে বুঝতে ও পরিচয় লাভ করতে সুবিধা হয়।" (সূরা হুজ্‌রাত-১৩)

যত সময় পর্যন্ত এহেন সাহায্য সহানুভূতি ও পারস্পরিক যোগসূত্র পূর্ণতার উচ্চ সোপানে উপনীত না হয়, তত সময় পর্যন্ত মানবিক জীবনের সংগঠন সঠিক ও সুষ্ঠ হয় না। মানবতার মুক্তি সমৃদ্ধি ও উৎকর্ষতার নিমিত্ত তার পূর্ণতা এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, এ পথ থেকে যারা দূরে সরে গিয়েছে, তাদেরকে পথে আনয়নের জন্য শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করাও বৈধ। পবিত্র কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْيُصَلَّبُوْا

اَوْتُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْيُنْفَوْا مِنَ

الْاَرْضِ-

"যারা আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসুলের সাথে লাড়াইর ময়দানে অবতীর্ণ হয়, এবং পৃথিবীর বুকে ঝগড়া-ফাসাদ যুদ্ধ-বিগ্রহ করার জন্য চেষ্টা চরিত্র চালায় তাদের শাস্তি হলো হত্যা করে ফেলা অথবা শুলদণ্ডে চড়িয়ে দেয়া অথবা তাদের হাত ও পা বিপরীতমুখী হিসেবে কেটে ফেলা কিম্বা দেশ থেকে তাড়িয়ে নির্বাসিত করা।" (সূরা মায়েদা ঃ ৩৩)

وَاِنْ طَائِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا

فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا - فَاِنْ بَغَتْ اِحْدٰهُمَا عَلَى

الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى امر الله ـ فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ط

"যদি মুসলমানদের দু'টি গ্রুপ পরস্পরে লড়াইর ময়দানে অবতীর্ণ হয়, কিম্বা ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়, তবে তাদেরকে নিবারণ করে তাদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করে দাও। যদি উক্ত দু'টি গ্রুপের কোন একটি গ্রুপ বিদ্রোহ করে সন্ধি করতে সম্মত না হয়, তবে সে গ্রুপ আল্লাহ্‌র নির্দেশের অনুবর্তি না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে লড়াই কর। অতঃপর যখন সেই গ্রুপ ফিরে আসবে তখন উভয় গ্রুপের মধ্যে ইন্‌সাফের ভিত্তিতে সন্ধি চুক্তি করিয়ে শত্রুতার অনির্বান শিখা নির্বাপিত কর এবং তার উপর অচলরূপে পর্বতবৎ দৃঢ় থাকো!" (সূরা হুজ্‌রাত-৯)

ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض-

"আল্লাহ্ তায়ালা যদি মানুষের একটি গ্রুপ দ্বারা অপর গ্রুপকে দমিয়ে না রাখতেন তবে পৃথিবীর শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট হতো।" (সূরাবাকারাহ-২৫১)

অতএব এখানে যে বস্তুটিকে আমরা মূল ও আসল বলে ধরে নিতে পারি, তা হচ্ছে সেই পারস্পরিক সৌহার্দ ও সহানুভূতি। আর এ মূল বস্তটিকে যারা পরিত্যাগ করে চলবে, তাদেরকে পথে আনার নিমিত্ত উপরোক্ত পথের যে কোন একটি পথ গ্রহণ করা যেতে পারে। কেননা যে পদ্ধতি সৃষ্টি কুলের সার্বিক কল্যাণ আনয়নের বেলায় অধিক ফলপ্রসু, যে নিয়ম পদ্ধতির আনুগত্য স্বীকার করা সর্বাবস্থায় ব্যক্তি ও সমষ্টি অথবা কোন দলের মনগড়া নিয়ম পদ্ধতি থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুতঃ যে পদ্ধতিটি সৃষ্টিজগত ও সৃষ্টি জগতের স্রষ্টার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের সাথে ওৎপ্রোত ভাবে বিজড়িত, সেটিই হলো পারস্পরিক সৌহার্দ্য সহানুভূতির চরিত্র।

মানুষের মধ্যে শ্রেণী ও জাতিগত হিসেবে যেমন একটি সাম্য বিদ্যমান রয়েছে, তেমনি রয়েছে ব্যক্তিগত হিসেবে। এ সাম্যের বাহ্যিক বিভিন্ন শক্তিসমূহ

মূলতঃ তারা সকলে একই পথের যাত্রি। আর তাদের মান্যিল মাকসুদও এক ও অভিন্ন। এ ব্যাপারে সৃষ্টিকুলের অন্যান্য জীব ও প্রাণীর যে রূপ অবস্থা অনুরূপ অবস্থা মানব জাতিরও। সকলের আসল মূল উৎস একই কিন্তু তার বাহ্যিক প্রদর্শনী হলো অগণিত।

দীর্ঘদিন যাবত মানবতা মানুষ ও সৃষ্টি জগতের শক্তির মূল উৎস সম্পর্কে কোন একটি পূর্ণাঙ্গ দর্শনের দিগন্তে উপনীত হতে পারেনি। আধ্যাত্মিক শক্তি ও জড়ধর্মী শক্তিকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। কখনো একটিকে প্রমাণ করতে গিয়ে অপরটিকে অস্বীকার করা হয়েছে। আবার কখনো তাদের উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ ও টানা-হেঁচড়ামূলক সম্পর্কে ভাগ করা হয়েছে। আধ্যাত্মিকতা ও জড়বাদীতার মধ্যে মূলগত দিক দিয়ে যে দ্বিমুখী গতিধারা ও সংঘর্ষ মূলক সম্পর্ক বিদ্যমান, সেই দর্শনের উপরই মানুষ তার শিক্ষার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছে। তাদের ভিতর কোন একটিকে গ্রহণ করা বা প্রাধান্য দেয়া ছাড়া তার জন্য আর কোন বিকল্প পথই থাকে না। এ দর্শন দ্বারা বুঝা যায় যে সৃষ্টি জগত এবং মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাবের মধ্যে দু'টি বিপরিত গতিধারা ও সংঘর্ষ মূলক আচরণ বিদ্যমান।

এ দর্শনটির সবচেয়ে বাস্তব দৃষ্টান্ত হলো আধুনিক যুগের মিশ্রিত সেই খ্রীস্টান মতবাদ, যাকে গীর্জাসমূহ এবং বিভিন্ন কন্‌ফারেন্সে বসে বর্তমান রূপ দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে তারা কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্ম ও বুদ্ধ ধর্মের সাথে একমত হয়েছে, যদিও এ দু'টি ধর্মের দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি পরস্পর বিভিন্ন। তাদের ধর্ম মতে আত্মার মুক্তি প্রাপ্ত হবার একমাত্র পথ হলো দেহকে দুঃখ কষ্ট দেয়া, তাকে বিগলিত করে ফেলা, এক কথায় তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া অথবা কমপক্ষে তার থেকে স্বাধীন ও মুক্ত হওয়া এবং দৈহিক স্বাদ আস্বাদন থেকে আত্মাকে বিমুক্ত রাখার ভিতর নিহিত।

রূপান্তরিত সেই খ্রীস্টান ধর্ম আর তার সাথে মিশ্রিত বিভিন্ন ধর্মের এহেন নীতিমালা মানব জীবন এবং তাদের বিভিন্ন সমস্যার দর্শন ও মতবাদের উপর বেশ অনেকটা প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে। ব্যক্তি ও দলের কর্মনীতি ও নিয়ম-কানুন এবং মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও যোগ্যতা সমূহের ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি তার আলোকেই নির্ধারিত হয়।

এ উভয় শক্তির ভিতর সংঘর্ষ ও টানা-হেঁচড়া অবিরত ধারায় বলবৎ আছে। এ টানা-হেঁচড়ার যুগসন্ধিক্ষণে মানুষের জ্ঞান একবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

তারা এখন উদাসীন অবস্থায় পাগলের ন্যায় কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে রয়েছে বটে। কিন্তু শান্তির ক্ষীণ আলোক রেখা টুকু পর্যন্ত এখনো তাদের দৃষ্টি গোচর হয়নি। শেষ পর্যন্ত ইস্‌লাম তাদের সামনে সকল প্রকার জঞ্জাল বক্রতা বিক্ষিপ্ততা ও বিচ্ছিন্নতা এবং সকল প্রকার বৈপারিত্য ও দ্বিমুখী গতিধারা থেকে মুক্ত একটি পবিত্রতম শান্তি ও সৌহার্দ্য মূলক মতবাদ নিয়ে হাজির হয়েছে। সমূদয় বিভিন্ন প্রকার শক্তি ও যোগ্যতা সমূহকে ঐক্যের একই বিতানে জুড়ে দেয়া এবং সমগ্র প্রবণতা ও গতিবিধিকে একই পথে পরিচলিত করাই ছিল তার একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য। জীবন জগত ও মানুষের ভিতর মূলগতঃ যে ঐকত্যতা ও সাম্যবাদীতা বর্তমান রয়েছে, তাকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রকাশ করে দেখানই ছিল তার মিশনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। তার আগমন এ জন্যই হয়েছিল যে, সে সৃষ্টি জগতের ব্যবস্থাপনার মধ্যে আকাশ ও পৃথিবীকে, ধর্মীয় ব্যবস্থাপার মধ্যে দুনিয়া এবং আখেরাতকে মানবিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে দেহ এবং আত্মাকে, আর কর্মময় জীবনের ব্যবস্থাপনার মধ্যে কাজ-কারবার ও উপাসনা-আরাধনাকে একাত্ব করে দেখাবে। আর তাদেরকে সেই একই পথে কর্মব্যস্ত অবস্থায় চলয়মান থাকতে দেখা যাবে সেই পথে, যে পথের গতিধারা হচ্ছে আল্লাহ মুখী এবং সে পথ সকলকে একই শক্তির অনুগত হয়ে থাকার সুযোগ করে দেয়।

বিশ্বজগত এমন এক একক বস্তু বা প্রসিদ্ধ অপ্রসিদ্ধ প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য দৃশ্য অদৃশ্য বস্তু নিচয়ের সংমিশ্রণে সৃষ্টি। আর জীবনের মধ্যে এমন একটি ঐক্যতা বিদ্যমান, যা জড়বাদীশক্তি ও আধ্যাত্মিক শক্তির সম্মিলনের একটি বাস্তব চিত্র। যেখানে এ শক্তিদ্বয় একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, সেখানে দেখা দিয়েছে বৈষম্য ও বিশৃঙ্খলা। এমনিভাবে মানুষও এমন একটি অভিন্ন সত্তা যা উর্ধ্বগামী আধ্যাত্মিক চেতনা এবং মাটির সাথে সম্পৃক্ততা দৈহিক চাহিদা এবং জাগতিক প্রবণতার সংমিশ্রণের একটি বাস্তব রূপ। মানব প্রকৃতি এ দুয়ের ভিতর কোনরূপ দুরত্ব বা সংঘর্ষ ও টানা-হেঁচড়া থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। কারণ সৃষ্টি জগতের মধ্যে আকাশ ও পৃথিবী এবং দৃশ্য অদৃশীয় বস্তু-নিচয়ের মধ্যে যেমন কোনরূপ টানা-চেঁচড়া ও সংঘর্ষ নেই, তেমনি ধর্মীয় ব্যবস্থাপনার মধ্যে দুনিয়া আখেরাত এবং কাজ-কারবার লেন-দেন ও উপসনা আরাধনার মধ্যে কোনরূপ বৈপারিত্য ও সংঘর্ষ মূলক সম্পর্ক নেই। এসব সৃষ্টি কুলের পৃষ্ঠদেশে এমন একটি অদৃশ্য অনন্ত শক্তি কার্যকরি রয়েছে, যার নেই কোন আদি অন্ত সুচনা আর নেই কোন শেষ সীমা; আর যাকে আমরা আমাদের মানবিক জ্ঞান সীমার আয়ত্বে এনে-না পারি

জানতে না পারি বুঝতে। এ শক্তিটি সার্বজনীন পূর্ণরূপ নিয়ে সৃষ্টিকুল, জীবন, জগত মানুষ সমূদয়ের উপর প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করে বসে আছে। আর এ শক্তির নামই হলো সেই এলাহী শক্তি, যা আমরা সচরাচর মুখে উচ্চারণ করে থাকি।

এহেন চিরন্তন শক্তির সাথে নশ্বর মানুষ ব্যক্তিরূপে সর্বদাই একটি জোড়ালো সম্পর্ক ও অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র স্থাপন করতে পারে। আর সে মানব জীবনে তাদের পথ প্রদর্শনের কাজ করে। আর ব্যক্তি তার বিপদ আপদের সময় তার নিকটই সাহায্যের প্রার্থনা করে। এমন কি মানুষ যখন জীবিকার অন্বেষণে পৃথিবীর বুকে বিভিন্ন কাজ-কারবারে নিমগ্ন থাকে, তখনো তারা একমাত্র তার নিকটই সাহায্যের প্রার্থনা জানায়।

ব্যক্তি সর্বাবস্থায়ই পরকালের কল্যাণ মূলক কাজ করতে পারে। সে রোযা রেখে সর্ব প্রকার খাদ্য-দ্রব্য ও পানাহার থেকে দেহকে বঞ্চিত করুক অথবা রোযা না রেখে জীবনের প্রতিটি পবিত্র নেয়ামত দ্বারা লাভবান হোক, যদি সে আল্লাহর পানে মনোনিবেশ সহকারে প্রতিটি কাজ একমাত্র তার জন্যই করে, তবে উভয় অবস্থায় তার প্রতিটি কাজ পরকালের জন্য কল্যাণময়ী হতে পারে। পরকালের একটি ক্ষেত্র হলো এ পার্থিব জীবন। সেখানে যেমন আছে নামায রোযা, তেমন আছে ব্যবসা-বাণিজ্য কাজ-কারবার। আর সফলতা ব্যর্থতা উভয়ই এখানে বিদ্যমান। পরকালের এ মনযিল থেকে জান্নাত ও জাহান্নাম আল্লাহর সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি উভয়টারই ব্যবস্থা করে নেয়া যায়।

সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন শক্তি ও অংশসমূহ এবং মানুষের বিভিন্ন যোগ্যতার মধ্যে যে, ঐক্যতা বিরাজমান রয়েছে, তার মূলগত রহস্য ও এ মহান শক্তির মধ্যেই নিহিত। আর এহেন অনন্ত শক্তিই মানুষ এবং তার জীবনের বর্তমান বাস্তব এবং ভবিষ্যৎ স্বপ্নিল দিকটিকে করে দেয় একাকত্ব।

জগত-জীবন এবং জীবনধারী ব্যক্তি, সমুদয় বস্তু জগত, ব্যক্তি ও দল, আর ব্যক্তির নিজস্ব বিভিন্ন গতিবিধি ও মনের প্রবণতার ভিতর ভারসাম্য ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও বন্ধুত্ব সেই অনন্ত মহান শক্তিরই বদান্যতার বাস্তব প্রকাশ। এ শক্তিই দ্বীন-দুনিয়া পৃথিবী ও আকাশের মাধ্য একটি সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক ও চিরন্তন বন্ধুত্বমূলক যোগসূত্রের চিশ্চয়তা বিধানকারী।

এহেন ভারসাম্যের দ্বারা দৈহিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির কোনরূপ ক্ষতি সাধন হয় না, অনুরূপ হয় না আত্মীক-উন্নতি সমৃদ্ধির কোন রূপ ক্ষতি সাধন। তাদের

উভয়েরই পূর্ণরূপে কর্মব্যস্ত থাকবার এমন সুযোগ ঘটে থাকে যেন, এ শক্তি তাদের এ কর্মব্যস্ততাকে কল্যাণ, মুক্তি সংস্কার ও সমৃদ্ধির উপকরণে পরিণত করে দিতে পারে। এহেন সৌহার্দ্য মূলক সম্পর্কের কারণ ব্যক্তিকে অধিক মাত্রায় বাধ্যবাধকতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা অথবা সমষ্টি ও দলের বেলায় লাগাম ছেড়ে দেয়া এ মহান শক্তির নিয়ম নয়। একটি দলকে অপর দলের উপর অথবা একটি বংশকে অপর একটি বংশের উপর অনার্থক প্রাধান্য দেয়াও তার বিধান নয়। বরং সে প্রত্যেকের অধিকার ও কর্তব্য আদল-ইন্‌সাফের আলোকে পরিষ্কার রূপে নির্ধারণ করে দিয়েছে।

একটি বিধানই রয়েছে যা ব্যক্তি দল শ্রেণী সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন বংশের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। আর একটি উদ্দেশ্য আছে যা তার সামনে সর্ব স্থানে বর্তমান থাকে। অর্থাৎ কোনরূপ সংঘর্ষ ও দ্বন্ধ ব্যতিরেকেই ব্যক্তি ও সমষ্টি দল ও সম্প্রদায়ের নিজ নিজ পূর্ণ কর্মশক্তি ও দক্ষতা প্রদর্শন করার সুযোগ ঘটে থাকে। প্রত্যেকটি বংশ জীবনের পুর্নবিন্যাস ও উন্নতি সমৃদ্ধির নিমিত্ত চেষ্টা চরিত্র চালাবার এবং সকলকে স্বীয় প্রভুর পানে আকৃষ্ট করে দেয়া ব্যবস্থাও সে করে দেয়।

নিঃসন্দেহে ইসলাম একটি একাত্ববাদী ধর্ম। কারণ সে সৃষ্টি জগতের সমুদয় শক্তির মধ্যে একাত্ব রূপ ও এক দিক দর্শনের প্রবক্তা। তার মতে প্রভু হবার অধিকারী স্বত্তা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর দ্বিতীয় কেউ নেই। সয়ং আল্লাহ্ সমগ্র ধর্ম সমূহকে সে একটি ধর্ম নির্ধারণ করে দিয়েছে। জীবন প্রভাতের সুচনায় এ একক দ্বীনের ধ্বজাধারী নবী হবার দিক দিয়ে সমগ্র নবীগণ একই মালার বিভিন্ন ফুল বিশেষ।[১] পবিত্র কুরআন মজীদে আল্লাহ্ বলেন ঃ

إِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً (ز) وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ-

—"নিঃসন্দেহে (তোমাদের) এ জাতি একটি অবিচ্ছিন্ন জাতি। আর আমি হলাম তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা সকলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমার গোলামী ও ইবাদাত করো।" (সূরা আম্বিয়া-৯২)

ইস্‌লাম ইবাদত উপাসনা, ব্যবসা-বাণিজ্য কাজ-কারবার, বিশ্বাস ও কর্ম আধ্যাত্মিক শক্তি জড়বাদী শক্তি, অর্থনৈতিক মূল্যবোধ আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ আর পার্থিব জগত ও পারলৌকিক জগত এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সকলের মধ্যে একাত্ববাদের যোগসূত্রের প্রবক্তা।

এহেন মহান একাত্মবাদ থেকেই ইস্‌লামের আইন-কানুন বিধান হেদায়েত ও সীমারেখা এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয় তার আদর্শ ও নীতিমালার প্রকাশ ঘটেছে। তার আলোকেই সে মানবিক অধিকার এবং তাদের দায়িত্ব কর্তব্য নির্ধারণ এবং লাভ ক্ষতির বাস্তব বন্টন নির্ণয় করেছে।

এক কথায় তার সমুদয় আদর্শ ও নীতিমালা এ মৌলিক নীতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে। জগত জীবন, মানুষ, সম্পর্কে ইসলামী চিন্তাধারার আসল স্বরূপ ও মূলতত্ত্ব যদি পূর্ণরূপে আমাদের মানবিক জ্ঞান সীমার আয়ত্বে এসে যায়, তবে ইস্‌লামের সামাজিক ইন্‌সাফ ও সুবিচারের মৌলিক রূপরেখাটিও আপন থেকে অনায়াসে আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠে।

সামাজিক সুবিচারের ইসলামী ধ্যান-ধারণার প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য হলো যে, তা সীমিত অর্থে কোন অর্থনৈতিক ইন্‌সাফ ও সুবিচারের প্রতিষ্ঠার নাম নয়,

১. লেখকের আত্‌তাছবীরুল গিনা ফিল কুরআন পুস্তকের "আল্‌কিছাছ" অধ্যায় বিশদ দ্রষ্টব্য ঃ–

বরং এটা একটি সার্বজনীন পূর্ণাঙ্গ মানবিক সুবিচার কায়েমের বাস্তব ব্যবস্থাপনার নাম। জীবনের সমুদয় বাস্তব কর্ম প্রদর্শনী এবং সকল প্রকার কর্ম ব্যস্ততা তার সীমা পরিধির অন্তর্ভূক্ত। সে চিন্তাজগত, কর্মজগত, মনোজগত এবং আধ্যাত্মিক চেতনাবোধের সর্ব স্তরে স্বীয় প্রতিপত্তি বিস্তার করে বসে আছে। অর্থনৈতিক মূল্যবোধের সীমিত গণ্ডীর ভিতরই তার কর্মসূচী শেষ নয়। সে বিশাল অর্থে সমুদয় জড়বাদী মূল্যবোধ পর্যন্ত তার কর্মক্ষেত্র সীমিত নয়। তা হচ্ছে জড়বাদী, আত্মিক, আধ্যাত্মিক, সকল প্রকার শক্তির একটি মনঃপুত মিশ্রিত নাম।

রূপান্তরিত খ্রীস্টান মতবাদ মানুষকে শুধু তার আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণার গতি-প্রবণতার দৃষ্টি কোন থেকে অবলোকন করে। আর তাদের দৈহিক আভীপ্সা ও চাহিদাকে ঐ সকল গতিধারা ও প্রবণতার কারণে পদদলিত করে দিতে চায়। কমিউনিষ্ট ও সমাজতান্ত্রিক দর্শনে শুধু মাত্র মানুষের জড়বাদী প্রয়োজনকে অধিক মাত্রায় গুরুত্ব প্রদান করে। সে শুধু কেবল মানবতার নয় বরং সমুদয় সৃষ্টি কূলের উপর জড়বাদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। আর ইসলাম এতদুভয়ের পরিপন্থী মানুষকে সে এমন একটি একাত্ম ধারণা করে যার আধ্যাত্মিক গতিধারা ও প্রবণতা এবং দৈহিক প্রয়োজন ও চাহিদার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা যায় না। তার বস্তুধর্মী প্রয়োজন এবং অবস্তুধর্মী প্রয়োজন চাহিদার কোনটাই একটি থেকে অপরটিকে

আলাদা করা যায় না। জীবন ও জগতের এহেন পূর্ণাঙ্গ ধ্যান-ধারণা ও রূপরেখা কোন প্রকার পার্থক্যকরণ ও বন্টনের পক্ষপাতি নয়। ইস্‌লাম, কমিউনিজম ও সমাজতন্ত্র এবং খ্রীস্টান ইজম এখানে এসেই মতবিরোধ হয়ে বিভিন্ন পথে চলে গিয়েছে। এ মতদ্বৈত্যতার কারণ হলো যে ইস্‌লামের সমুদয় আদর্শ, বিধান ও নীতিমালা শুধু আল্লাহ্ প্রদত্ত দ্বীনের একটি বাস্তব চিত্র। আর বর্তমান খ্রীস্টান ইজমের মধ্যে মানুষের অবৈধ হস্তক্ষেপের কারণে দ্বীনের আসল চিত্রটির রূপরেখা পালটে গিয়ে একটি মানব রচিত মনগড়া ধর্মে রূপ লাভ করেছে। আর সমাজতন্ত্র ও কমিউনিষ্ট দর্শনের ভিত্তি হলো মানবিক জ্ঞান ও ধ্যান ধারণার উপর নির্ভরশীল। আল্লাহর একাত্ববাদের সাথে এর আদৌ কোনরূপ সম্পর্ক নেই। অতএব সকলের গতি-প্রকৃতি যখন বিভিন্নমুখী তখন সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও সকলের কর্মসূচী বিভিন্নমুখী হওয়া স্বাভাবিক। আসলে খ্রীস্টান ইজম এবং সমাজতন্ত্রের মধ্যে সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার ন্যায় সংগত ইন্‌সাফপূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত কোন কর্মসূচী নেই বললেই চলে।

ইস্‌লামের দৃষ্টিতে মুসলমানদের কাছে বিশেষ করে সাধারণ মুসলমানদের নিকট বাস্তব ক্ষেত্রে পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতি সৌহার্দ্য ভালবাসা এবং সাম্য ও ভ্রাতৃত্যের নামই হলো জীবন। আর খ্রীস্টান ধর্মের দার্শনিক ভূমিকাও তাই। কিন্তু বাস্তব জগতে তার সামনে যেমন নেই কোন যুক্তি ভিত্তিক কর্মসূচী, তেমনি তার নিকট পরিষ্কার ও নির্দিষ্টতম কোন শরিয়তও নেই। সমাজতন্ত্র ও কমিউনিষ্ট দর্শন তাকে শ্রেণী সংগ্রামের ময়দান রূপে এ জন্য ভেবে থাকে, যেন এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর উপর প্রাধান্য লাভ করে সমাজতন্ত্রের মহান আশা-আকাঙ্খা সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে পারে। এর দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, খ্রীস্টানধর্ম আধ্যাত্মিক জগতে এমন একটি সাপ্নিক কাহিনী যার ভিতর মানবতাকে উর্ধ্ব জগতের ঝলক রূপে দৃষ্টমান হয়। আর ইসলাম হলো মানবতার সেই আদিম কালের স্বপ্নের একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত, যা পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে আসল সত্যের রূপ পরিগ্রহ করে বসে আছে। আর সমাজতন্ত্র হলো একটি বিশেষ যুগের মানবিক হিংস্র অনুভূতি ও চেতনা বোধের দ্বিতীয় নাম।

ইস্‌লাম সামাজিক ইন্‌সাফ প্রতিষ্ঠার বেলায় এহেন দু'টি মৌলিক নীতিকে সামনে রেখেই তার কর্মসূচী বাস্তবায়নের কাজ আরম্ভ করেছে। ভারসাম্য পূর্ণ পারস্পরিক যোগসূত্র ও পূর্ণ একত্ববাদ। ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি ও হামর্দীর চেতনাবোধ ও স্প্রীটই হলো তার ভিত্তি মূল। এ ইন্‌সাফ

প্রতিষ্ঠার বেলায় ইসলাম মানব প্রকৃতির মূল উপাদানের প্রতি লক্ষ্য রেখে কাজ করে। আর সামনে রেখে থাকে মানুষের যোগ্যতার মাপকাঠি।

পবিত্র কুরআন মজীদে মানুষ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ-

"নিশ্চয় তারা ধন-সম্পদের ভালবাসার বেলায় অনেকখানি অগ্রগামী অর্থাৎ ধন-সম্পদের প্রতি তাদের আসক্তি অনেক প্রবল।" (সূরা আল্ আদীয়াত-৮)

ধন-সম্পদের প্রতি মানুষের আন্তরিক অনুরাগ ও ভালবাসা উক্ত ধন-সম্পদের কারণেই হয়ে থাকে। আর হয়ে থাকে সেই সকল বস্তুর দরুন, যার অর্জন তার সাথে সম্পৃক্ত। মানুষকে স্বভাবগত হিসেবে কৃপণ আখ্যা দিয়ে কুরআনে করীমে বলা হয়েছে ঃ

وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ-

"কৃপণতার প্রতি মানুষের মনের প্রবণতা ও ঝোক থাকে।" (সূরা নিসায়া-১২৮)

এ স্বভাব সর্বদাই মানুষের মধ্যে বর্তমান। পবিত্র কুরআন মজীদে এ স্বভাবের একটি সুন্দরতম উদাহরণ পেশ করে তার আসল স্বরূপ উদঘাটন করে দিয়েছে। কুরআন বলতেছে ঃ

قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّىْٓ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ - وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا-

"হে মোহাম্মদ (সাঃ) আপনি বলে দিন! যদি কখনো আমার প্রতিপালকের রহমতের ভাণ্ডার তোমাদের হস্তগত হতো, তবে তোমরা তা খরচ হওয়ার আশঙ্কায় আকড়িয়ে ধরে রাখতে। বাস্তবিকই মানুষ খুব সংকীর্ণমনা ও কৃপণশীল।" (সূরা বনী ইসরাইল-১০০)

এ কথা আমাদের বিস্মৃত হওয়া ঠিক হবে না যে, আল্লাহর রহমত সমগ্র বস্তু জগতের ওপর ছেয়ে আছে। একদিকে তার এই অপরিসীম রহমতের বর্ষণ। আর অপর দিকে মানুষের এ কৃপণতা। মানুষকে যদি তালীম ও শিক্ষাহীন অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হয়, তবে সে কতদুর পর্যায় গিয়ে পৌঁছতে পারে তা-এর দ্বারাই পরিষ্কাররূপে অনুমিত হয়।

ইস্‌লাম জীবন ব্যবস্থার সংগঠন বা আইন বিধান রচনা এবং হেদায়তে ও উপদেশের বেলায় সাধারণ একটু সময়ের জন্যও সেই প্রকৃতিগত নিজ সত্তার প্রতি ভালবাসা এবং তাদের স্বার্থপরতাকে দৃষ্টির আড়ালে রেখে দেয় না, যার মূল শিকড় বিস্তীর্ণ রয়েছে মানব প্রকৃতির গভীর তলদেশ পর্যন্ত।

সে উপদেশ নসীহত আইনগত বাধ্য বাধকতা দ্বারাই ব্যক্তি স্বার্থপরতা এবং সংকীর্ণমনা ও কৃপণতা রোগের চিকিৎসা করে। সে কখনো ব্যক্তির উপর তার শক্তির বহির্ভূত কোন বোঝা চাপিয়ে দেয় না। সাথে সাথে সে সমাজের কল্যাণ ও প্রয়োজনের প্রতি রেখে থাকে পূর্ণ সজাগ দৃষ্টি। তার সামনে রয়েছে ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয়ের সেই উচ্চ আকাঙ্খা, যা প্রত্যেক বংশ ও প্রত্যেক যুগের জন্য একই রূপে সমানে হয়।

ব্যক্তির লোভ-লালসা ও কামনা দ্বারা যেরূপ সমষ্টির স্বার্থকে পয়মাল করে দেয় কেবল উচিতই নয়, বরং প্রকাশ্য জুলুম ও বেইন্‌সাফী। অনুরূপ ভাবে তা করা ও প্রকাশ্য জুলুম, যে দল বা সমষ্টি ব্যক্তির ধৈর্য ও সহনশীল শক্তির প্রতি দৃষ্টি না করে তার স্বভাবের উপর অনর্থক বোঝা চাপিয়ে দেয়। এমন করা শুধু কেবল ব্যক্তির উপরই জুলুম নয় বরং সম্পূর্ণ সমাজটির উপর জুলুম করা হয়ে থাকে। ব্যক্তির গতিধারাকে পদদলিত করা এবং তার মনের অনুরাগ ও প্রবণতাকে দাবিয়ে রাখার প্রতিক্রিয়া শুধু তার সত্তা পর্যন্তই সীমিত থাকে না। বরং সমষ্টি ও দলের জন্য এ ব্যক্তির যোগ্যতা ও খেদমত থেকে পূর্ণরূপে উপকৃত হবার সুযোগকেও চিরতরে খতম করে দেয়া হয়। ব্যক্তির যোগ্যতা ও ক্ষমতা থেকে দল ও সমষ্টির অধিকার আদায়ের জন্য সামাজিক নীতিকে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও তার গতিধারাকে কিছুটা সীমায়িত করে দেয়া উচিত। কিন্তু সাথে সাথে তাকে ব্যক্তির অধিকার আদায়ের বেলায় উদাসীন থাকা উচিত নয়। ব্যক্তির গতি-প্রকৃতি ও চাল-চলনের এমন একটি সীমারেখা পর্যন্ত স্বাধীনতা থাকা চাই; যে সীমারেখা পর্যন্ত জীবনের উচ্চ আকাঙ্খার সাথে তার কোনরূপ সংঘর্ষ সৃষ্টি না হয়; আর না হয় সমষ্টি ও দলগত স্বার্থের কোনরূপ ক্ষতি সাধন। ইস্‌লামের নিকট ঝগড়া-ফাসাদ যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের নাম জীবন নয়। বরং পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতি সৌহার্দ্য ভালবাসা এবং সমঝোতার নামই জীবন। ব্যক্তি ও সমষ্টিগত ক্ষমতার স্বাধীনতা এবং তার পরিচর্য্যা ও লালন-পালনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে জীবন। তাকে শৃঙ্খলিত করা বা নিয়মানুবর্তিতা ও বাধ্য-বাধকতার আবেষ্টনে বন্দী করে দেয়ার মধ্যে নয়।

যে সকল বস্তুকে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়নি, তার প্রতিটিই বৈধ। আর যাকে বাতিল বলে নির্ধারিত করা হয়নি, তাই হক্ক ও সত্য। আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে যে জীবন-বিধান ও শরীয়াত দান করেছেন, তার সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করে সেই প্রতিটি কাজ ও কর্মব্যস্ত মুখর সময়ের উপযুক্ত প্রতিদান সে পেতে পারে, যার ভিতর আল্লাহ্ সন্তুষ্টি অর্জনকেই সে স্বীয় কাজের প্রধান উদ্দেশ্য নিরূপণ করে। আর আল্লাহ্র মনঃপুত ও পছন্দনীয় জীবনের সেই সকল উচ্চ আকাংখা ও উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের বেলায় প্রতিটি চেষ্টা চরিত্রেরও উপযুক্ত প্রতিদান তার জন্য অবশ্যই বর্তমান রয়েছে।

সমাজের বুকে আদল-ইন্সাফ প্রতিষ্ঠা করা এবং পরস্পরের মধ্যে সাম্য ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলা অন্যান্যদের তুলনায় ইস্লামের জন্য খুবই সহজ কাজ। কেননা মানব জীবন সম্পর্কে তার দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ, সার্বজনীন এবং খুব উদার। জড়বাদী ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধের নিকট গিয়েই তার গতি থেমে যায় না। বরং সে সম্মুখ পানে অগ্রসর হয়ে যে সকল মূল্যবোধ ও শক্তির সাথে মানবতার মুক্তি ও সমৃদ্ধি সম্পৃক্ত তাকে সে আপন বানিয়ে নেয়। সমাজতন্ত্রের মধ্যে সামাজিক আদল-ইন্সাফের যে সীমায়িত রূপরেখা ও ধ্যান-ধারণা রয়েছে, ইস্লামী ধ্যান-ধারণা তার অনেক উর্ধ্বে। সমাজতন্ত্রের কাছে বিনিময় ও মজুরী প্রদানকরা এমন সাম্যের নাম যা দ্বারা অর্থনৈতিক বৈষম্য ও উচু-নীচুতা সম্পূর্ণরূপে শেষ হয় যায়;– যদিও এ নীতি বাস্তব জগতের বাস্তব অসুবিধা সমূহ কার্যকরি হতে দেয়নি। সমাজতন্ত্র তার আপন দেশ ও সমাজের বুকে তা বাস্তবায়িত করতে অপারগতা অকৃতকার্যতা ও ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। ইস্লামের দৃষ্টিতে মানবিক সাম্যের নামই হলো আদল-ইন্সাফ; যার মধ্যে জীবনের সমুদয় মূল্যবোধ সমূহের ভারসাম্য পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও বন্ধুত্ব বাস্তবায়িত হয়। এ মূল্যবোধ সমূহের মধ্যে অর্থনেতিক মূল্যবোধও শামিল রয়েছে।

ইস্লামের সামনে অগণিত মূল্যবোধ বিদ্যমান রয়েছে, যা পরস্পর বিজড়িত। সুতরাং তদের সম্মিলিত শক্তি দ্বারা সমাজের সর্বস্তরে ইন্সাফ প্রতিষ্ঠা করা তার জন্য খুবই সহজ কাজ। এ জন্য তাকে সীমায়িত অর্থে শুধু অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন করে না। সাম্যবাদের এহেন সীমায়িত ধ্যান-ধারণা ও রূপরেখা মানব প্রকৃতির সাথে সংঘর্ষ সৃষ্টি করে। যেহেতু ব্যক্তির উপযুক্তা সমূহের মধ্যে জন্মগত হিসেবে যে বৈষম্য বিদ্যমান দেখতে পাওয়া যায়, তা-ও

তার পরিপন্থী। সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের এ নীতি ও বিধান উন্নতমানের যোগ্যতো সমূহকে সাধারণ ও নিম্নমানের যোগ্যতা সমূহকে এক পর্যায় ও সমমানের করে তাদের সাহস হিম্মত ও উচ্চ আশা আকাংখাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। ফলে পরিণামে এ দাঁড়ায় যে, অসাধারণ যোগ্যতার ধারক ও বাহক ব্যক্তিবর্গ যেমন পারে না সেই সকল যোগ্যতা সমূহকে নিজের কল্যাণের কাজে ব্যবহার করতে; আর না পারে তাকে জাতির কল্যাণের কাজে নিয়োজিত রাখতে। জাতি এবং মানবতা এহন আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতার বদান্যতা ও কল্যাণকারিতা থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত থেকে যায়।

মানুষের প্রকৃতিগত ক্ষমতা ও যোগ্যতা সমূহের মধ্যে যে বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে, তা এমন একটি বাস্তব সত্য যাকে অস্বীকার করা বা মিথ্যা জানবার আদৌ কোন জো নেই। গোপন যোগ্যতা সমূহের অস্বীকার যদিও বাস্তব ঘটনা জগতে সম্ভব নয়, কিন্তু তাকে এড়িয়ে অন্যান্য প্রকাশ্য বৈশিষ্ট্যাবলীর ব্যাপারটি দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। কোন কোন ব্যক্তির স্বাস্থ্য ধৈর্যশক্তি এবং দৈহিক ও মানবিক শক্তির পূর্ণতায় উপনীত হবার সার্মক্য ও যোগ্যতা জন্ম থেকে সাথে করে সে নিয়ে আসে। আবার কিছু লোক এমন হয় যে, রোগ, ব্যাধি দুর্বলতা এবং বহু প্রকার অপূর্ণতার পোকা নিয়েই জন্মলাভ করে। সমুদয় যোগ্যতা সমূহ এবং সকল প্রকার আল্লাহ প্রদত্ত জন্মগত ক্ষমতা ও যোগ্যতাকে একাকার করে দেয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কারণ দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত এমন কোন মেশিন তৈয়ার করা হয়নি, যা অন্যান্য শিল্প-দ্রব্যের ন্যায় মানুষকেও একই ছাঁচে ঢেলে সৃষ্টি করতে পারে।

অসাধারণ ও উন্নতমানের মানসিক ও আধ্যাত্মিক যোগ্যতাসমূহের আস্তিত্বকে অস্বীকার করা বাতুলতা বৈ-আর কি? এ ব্যাপারে আমাদের একান্তরূপে লক্ষ্য থাকা উচিত। তারা যাতে নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে নতুন-নতুন বস্তু উৎপাদন ও আবিষ্কার করতে পারে, সে সুযোগ তাদের থাকা উচিত। কেননা এ সকল উৎপাদন ও আবিষ্কার থেকে সমষ্টির তথা সমাজের স্বার্থের তাকীদে যে সকল বস্তুর প্রয়োজন হয় তা যেন তা থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু এ সকল যোগ্যতা সমূহের সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতঃ তার গতিধারা রোধ করে ফুল থেকে ফলের ভবিষ্যত সম্ভাবনার দ্বার চিরতরে বন্ধ করে দেয়া কোন ক্রমেই ঠিক হবে না। এমনটি করা যেমন সকল যোগ্যতা সমূহের প্রতি জুলুম হয় অনুরূপ জুলুম হয় দেশ সমাজ ও মানবতার প্রতি।

সামাজিক ইন্‌সাফ ও সুবিচার এবং মানবিক সাম্যের রূপরেখা প্রকাশ করে দেয়ার পর ইস্‌লাম প্রত্যেক যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য যাতে করে তারা সকলে সাধনা গবেষণা ও চেষ্টা তদবীর চালিয়ে একে অপরের সামনে দ্রুত গতিবেগে অগ্রসর হতে পারে, তার সুবর্ণ সুযোগ ও প্রয়োজন মাফিক ব্যস্থাও সে করে দেয়। এ প্রতিযোগিতায় শুধু কেবল অর্থনৈতিক দিকটিকেই সে গুরুত্ব দেয় না, বরং অর্থনৈতিক মূল্যবোধ ছাড়া অন্যান্য মূল্যবোধের ব্যাপারেও সে সমধিক গুরুত্ব প্রদান করে। এ গুরুত্ব প্রদান কেবল তার মৌখিক বুলি নয়;- বাস্তবতার মাপকাঠিতেই তার ওজন ও পরিমাপ সে সমর্থন করে নিয়েছে। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে করীমের ভাষা হলো এই ঃ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ-

"তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সৎ কর্মশীল ও বুজুর্গ সেই ব্যক্তি, যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু ও পরহেজগার।" (সূরা হুজুরাত-৩)

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ-

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইল্‌ম ও জ্ঞান-বিজ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে উচ্চ সম্মানের আসন সমাসীন করবেন।" (সূরা মোজাদিলাহ্‌-১১)

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا-

-"এ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি শুধু কেবল মাত্র পার্থিব জীবনে আরাম-আয়েশের বস্তু। অবশিষ্ট থাকার বস্তু হলো সেই পুণ্য বা বস্তু, যা পরিণাম ফলের দিক দিয়ে তোমার প্রভুর নিকট খুবই কল্যাণকর বলে বিবেচিত। আর তা দ্বারা সুফল পাবার আশা করাও যায়। (সূরা কাহাফ-৪৬)

এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, একমাত্র অর্থনৈতিক মূল্যবোধ ছাড়া অন্যান্য যে সকল মূল্যবোধের অস্তিত্ব বিদ্যমান, তার গুরুত্ব সম্পর্কেও ইসলাম পূর্ণ সজাগ দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছে।

মানুষের মধ্যে আয় উৎপন্ন এবং ধন-সম্পদের উপায় উপকরণ ও উপাদানের দিক দিয়ে যখন পার্থক্য দেখা যায়, তখন ইসলাম অর্থনৈতিক মূল্যবোধ ছাড়া এ সকল মুল্যবোধকে সমাজের বুকে ভারসাম্যপূর্ণ আদল ইন্‌সাফ প্রতিষ্ঠা করার উপকরণ রূপেও গ্রহণ করে।

এখানে শুধু সেই সকল অর্থনৈতিক পার্থক্যের কথা উল্লেখ রয়েছে, যা বিভিন্ন প্রকার স্বভাবগত ক্ষমতা ও যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। যেমন যুক্তিযুক্ত ও বিজ্ঞান সম্মত উপকরণাবলী। কিন্তু যে সকল অবৈধ ও খারাপ উপকরণ যা ইসলাম হারাম বলে ঘোষণা করেছে, তা তার উপর নির্ভরশীল হবে না। (বিস্তারিত অর্থনৈতিক কর্মপদ্ধতির অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

আমরা উপরে এ কথা পরিষ্কার রূপে আলোচনা করেছি যে, ইসলাম সীমিত অর্থে অর্থনৈতিক সাম্যকে কখনো সমর্থন করে না। ধন-সম্পদ আয় উৎপন্ন করা এমন সব ক্ষমতা ও যাগ্যতার উপর নির্ভরশীল যা সকল মানুষ সমানভাবে পায়নি। মানুষের মধ্যে কিছুটা অর্থনৈতিক দুরত্ব ও ব্যবধান বর্তমান থাকা এবং কিছু সংখ্যক লোকের অপরাপর লোকের তুলনায় কিছুটা বেশি ধন-সম্পদের মালিক হওয়া এটা আদল-ইন্‌সাফেরই স্বাভাবিক চাহিদা। অবশ্য মানবিক সাম্যকে সর্বদা স্থায়ীরূপে বহাল রাখা কর্তব্য। এ মানবিক সাম্যকে বহাল রাখার অনিবার্য শর্ত হলো যে, সর্বক্ষেত্রে যোগ্যতা মাফিক সকলের এক রকম সমান সুযোগ-সুবিধা থাকতে হবে। কাহারো গতিপথে কোনরূপ বংশীয় আভিজাত্য বা এমনিরূপ কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারবে না। সকল প্রকার মূল্যবোধকে যথোপযুক্ত সম্মান দিতে হবে। আর মানুষের অন্তরকে জড়বাদী ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধের অন্ধ গোলামীর নাগপাশ থেকে মুক্তি দিতে হবে। জড়বাদী ও অর্থনৈতিক সম্পর্কীয় মূল্যবোধকে তাদের যথোপযুক্ত স্থানে স্থান দেয়া একান্ত প্রয়োজন। কেননা আমাদের সমাজের অবস্থা এত করুণ যে, অজড়বাদী মূল্যবোধের মর্যাদা এবং তার গুরুত্ব ও মূল্যমানের অনুভূতি হয়ত পাওয়াই যাবে না। যদি কিছুটা পাওয়া যায়, তাও তা ভাসমান অবস্থায় বিরাজমান। তাদের নিকট মান-সম্মানের একমাত্র ধারক ও বাহক পার্থিব ধন-সম্পদ। অর্থনৈতিক

মূল্যবোধ-তথা ধন সম্পদের প্রতি অসাধারণ গুরুত্ব প্রদান করে তাকে অপরাপর মূল্যবোধের মর্যাদার তুলনায় সকলের উচ্চে স্থান দেয়া সম্পূর্ণরূপে একটি অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক কথা। কারণ পার্থিব ধন-সম্পদকেই জীবনের সব কিছু মনে করা বনী আদমের মুখ্য উদ্দেশ্য হতে পারে না, তা কেবল মানব ছাড়া অন্যান্য জাতির বেলায়ই হতে পারে।

পার্থিব ধন-সম্পদকে সর্বোচ্চ মর্যাদা অথবা তাকেই সার্বিক মূল্যমান নির্ধারণ করার দর্শন ও মতবাদ ইসলামের নিকট একটি অযৌক্তিক দর্শন ও মতবাদ। বরং তা সম্পূর্ণ ইস্‌লামী ধ্যান-ধারণার পরিপন্থী। ইস্‌লাম এটা কখনো সমর্থন করে না যে, মানুষের জীবনটি এক টুকরা রুটি বা কিছু পয়সার অন্বেষণে অথবা দৈহিক ক্ষুধা নিবারণের উদ্দেশ্যে চিন্তা-জগতের বন্দীশালায় আবদ্ধ থাকুক। আবার সাথে সাথে সে দীনতা, হীনতা ও দরিদ্রতা দুরীকরণকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভেবে থাকে। সে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার মৌলিক প্রয়োজন মিটাবার এমনকি মাঝে মাঝে তার চেয়ে অধিক পরিমাণ প্রয়োজন পুরণের নিশ্চয়তা দেয়। ইসলাম এমন সব আরাম-আয়েশপূর্ণ পথকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়, যে পথে মানবিক কুবৃত্তি নিচয় পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে বিচরণ করে এবং একে অপর থেকে অস্বাভাবিক পার্থক্য ও বৈষম্যতা বিরাজমান শ্রেণী সমূহের প্রকাশ ঘটে। ধন-সম্পদের বেলায় ইস্‌লাম ধনী সম্প্রদায়ের উপর গরীবের অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করেছে। সমাজের কল্যাণ ও স্বার্থ সামনে রেখে তাদের প্রয়োজন মাফিক যাতে করে সকলের মধ্যে আদল-ইনসাফ কায়েম হয়, সে উদ্দেশ্যের পানে লক্ষ্য রেখে এ অধিকারের মূল্যমান ও পরিমাণ নির্ধারিত হয়ে থাকে। এ পরিমাণ নির্ধারণ এমনভাবে হওয়া চাই যেন, একটি সীমারেখা পর্যন্ত সকলের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমাজের মানুষের আর্থিক অবস্থার ক্রমোন্নতি ও সমৃদ্ধি এবং তাদের লালন-পালন ও ভরণ-পোষণের একটি যথাযোগ্য পরিবেশের সৃষ্টি হয়। মোটকথা জীবনের বিভিন্ন দিক ও সমস্যাগুলো কোন একটি দিক সমস্যাকেই ইসলাম তার কার্যক্রমের সীমারেখার বাহিরে ফেলে রাখে না। সে পার্থিব-আধ্যাত্মিক, ইহকাল-পরকাল সকল দিকগুলোর পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে যাতে সব কিছু মিশ্রিত হয়ে এমন একটি সমষ্টিগত রূপ ধারণ করবে, যে রূপটি হবে সুসংগঠিত সুশৃঙ্খলিত এবং এমন উত্তমরূপে সুসজ্জিত সমষ্টিগত রূপ, যা পরস্পর বিজড়িত ও সম্পৃক্ত উপাদান সমুহের মধ্যে থেকে কোন একটি উপাদানকে বাদ দেয়ার সম্ভাবনা না থাকে। তার একাত্মতা যেন বিশাল বিরাট সৃষ্টি জগত জীবন ও মানুষের একাত্মতার সাথে বন্ধুত্বশীল সম্পর্কে বিজড়িত ও সম্পৃক্ত হয়ে যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামে সামাজিক সুবিচারের ভিত্তি মূল

ইসলামের সামাজিক ইন্‌সাফের প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্পর্কে বিগত অধ্যায় ইতিপূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে। তা একটি লৌহ কঠিন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে। তাকে সংক্ষিপ্ত দাওয়াত ও অস্পৃষ্ট বস্তু রূপে না রেখে তার পরিবর্তে সে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের নিমিত্ত নির্দিষ্টতম উপাদান ও উপকরণের সংস্থান করে দেয়। ইস্‌লাম হলো একটি বাস্তবধর্মী জীবন বিধান। তা এমন ধর্ম নয় যে, ধ্যানের জগতে ওয়াজ নছীহত ও তালীম তালকীনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

আমরা মোটামুটিভাবে এ কথাগুলো পাঠকবর্গের সামনে উপস্থি করেছি যে, সৃষ্টি জগত জীবন ও মানুষ সম্পর্কে ইস্‌লামের একটি মৌলিক চিন্তাধারা ও বুনিয়াদী দর্শন বিদ্যমান আছে। আর সামাজিক ইন্‌সাফের ধ্যান-ধারণা ও রূপরেখা হলো সেই মৌলিক চিন্তাধারা ও বুনিয়াদী দর্শনেরই একটি বাস্তব আলোকরশ্মি ও প্রতিবিম্ব। এ দর্শন ইস্‌লামী ইন্‌সাফকে এমন একটি উদারময় ও সার্বজনীন মানবিক ইন্‌সাফের রূপ দিয়ে পেশ করে, যা বস্তুজগতের বিষয়াবলী ও অর্থনৈতিক সমস্যা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। তার কাছে জীবনের মৌলিক মূল্যবোধ একই সময় বস্তুজগত আধ্যাত্মিক জগত উভয়ের ভিতর নিহিত। এর ভিতর পার্থক্যের রেখা অঙ্কিত করা ঠিক নয়। মানবতা এমন একটি পুর্ণাঙ্গ একাত্ম রূপ, যার বিভিন্ন উপাদান পরস্পর বিজড়িত ও সম্বন্ধযুক্ত এবং দায়িত্বশীলতার পরিচয় দানে একে অপরের অংশীদার। এটা পরস্পর সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণকারী বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ের সমষ্টি নয়। মাঝে মাঝে অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে, আসল ব্যাপারটি ইস্‌লামের এ মৌলিক চিন্তাধারার পরিপন্থী। সুতরাং সর্ব প্রথম আমাদের আসল ব্যাপারটির স্বরূপ ভালরূপে উপলব্ধি হওয়া প্রয়োজন। ইস্‌লাম যে বস্তুটিকে আসল বিষয়ের পর্যায়ভুক্ত করে তা কোন ব্যক্তি জাতি সম্প্রদায় বা কোন বংশের পুরানো ইতিহাস নয়। কারণ এমন ইতিহাস স্থান কাল ও পাত্রের অনুবর্তি একটি সীমিত ঘটনার ন্যায় রূপক ঘটনা মাত্র।

নশ্বর মানুষের অদুরদর্শী জ্ঞান ও বোধশক্তি পৃথিবীর প্রভাত কাল থেকে অনন্ত কালের দিগন্ত পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত মানব জীবনের উত্থিত মহান্ সত্য বিস্মৃত হয়ে ইতিহাসকেই সবকিছু মনে করে থাকে। ইস্‌লাম এহেন অদূরদর্শীপনা ও সংকীর্ণ দৃষ্টির আদৌ সমর্থক নয়। সে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল স্তরে তার সীমাহীন দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। আর করে সকল প্রকার উপকার ও কল্যাণের প্রতি দৃষ্টিপাত। পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সমরূপে মানবতার সম্পর্ক বিরাজমান; সেই লক্ষ্য ও উদ্দশ্যকেই কর্মময় জীবনের লক্ষ্য বিন্দুতে পরিণত করে। সুতরাং একটি বস্তু যদি তা কতিপয় বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আসল সত্যের পরিপন্থী মনে হয়; আর তার যখন সমগ্র মানব ইতিহাস এবং সমুদয় মানব জীবনের সেই বিস্তীর্ণ দৃশ্যের পটভূমির আলোকে অবলোকন করা হয়; যা ব্যক্তি জাতি ও বংশের আনুগত্যের আয়ত্তের বহির্ভূত, তখন সমুদয় প্রতিবন্ধকতার অবসান হয়ে আসল রহস্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়।

ইসলামের বিস্তারিত নীতিমালা ও আইন-কানুনকে উপলব্ধি করা এবং জ্ঞানের আয়ত্তাধীন করা তার সেই মৌলিক ও সামগ্রিক চিন্তাধারার অংশ যা সামাজিক ইন্‌সাফের মহান উদ্দেশ্যের প্রতিভু, তাই আমাদেরকে সাহায্য সহানুভূতি করে। যে সকল আইন-কানুন ও নীতিমালাকে স্বতন্ত্ররূপে ব্যাখ্যা দেয়া কঠিন বলে মনে হয়, তা এ মৌলিক চিন্তাধারার আলোকেই নিপূণ জ্ঞান-শক্তি দ্বারা দৃশ্যমান হয়। এ সকল আনুষঙ্গিক নীতিমালার প্রতি যদি কোন একটি দলের, কোন ব্যক্তির, কোন একটি জাতির কোন সম্প্রদায়ের বা একটি বংশের কোন সম্প্রদায়ের কিম্বা বিভিন্ন বংশের কোন একটি বংশের স্বার্থ ও কল্যাণের আলোকে চিন্তা করা হয়, তবে তার আসল তাৎপর্য জ্ঞান অর্জন করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। তাকে সঠিকরূপে জ্ঞানসীমার আওতাভূক্ত করার নিমিত্ত এ মৌলিক চিন্তাধারার পথ প্রর্দশনের প্রয়োজনীয়তা একান্ত অপরিহার্য। ব্যক্তিগত মালিকানার বিধি-বিধান, মিরাসী আইন-কানুন, যাকাতের নিয়ম-কানুনন, ব্যবসা-বাণিজ্যের নীতিমালা এবং কোর্ট কাছারি ও আইন আদালতের নীতিমালা এক কথায় ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সাথে সম্বন্ধযুক্ত সমুদয় ইস্‌লামী আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের মূল তাৎপর্য এ মৌলিক চিন্তাধারার আলোকেই উপলব্ধি করা যায়।

এ সব বিষয়াবলীর উপর আলোচনা করা এ পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। ইস্‌লামের সামগ্রিক চিন্তাধারার গণ্ডীসীমার মধ্যে অবস্থান করে এখানে শুধু সেই সব মৌলিক সাধারণ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করা হবে, যার উপর সামাজিক ইন্‌সাফের ইস্‌লামী নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধানবলী নির্ভরশীল হয়।

আমাদের আলোচনা দ্বারাই এ কথা পরিষ্কার হবে যে, ইস্‌লাম ব্যক্তির দেহ আত্মা এবং জীবনের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের মধ্যে একাত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। আর সে তার বিধানের মধ্যে এ ব্যবস্থাও করে দিয়েছে যে, ব্যক্তি ও সামাজের জীবনের উদ্দেশ্য থাকবে এক ও অভিন্ন। আর একই জাতির বিভিন্ন সম্প্রদায় স্বার্থ ও কল্যাণের বেলায় থাকবে পরস্পর সম্পৃক্ত ও সহানুভূতিশীল। মানবিক সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে ছোট ছোট সীমিত স্বার্থ ও কল্যাণের বেলায় মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দিক দিয়ে তাদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে ঐক্য ও সংহতি, ইত্তেহাদ ও ইত্তেফাক।

সামাজিক ইন্‌সাফ কায়েমের ইস্‌লামী বিধানাবলী তিনটি মৌলিক নীতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এ নীতিটি ছাড়া তাকে কোনরূপই ভাবা যায় না। নীতি তিনটি এইঃ

১। আত্মার অবাধ স্বাধীনতা ও পুর্ণ মুক্তি।

২। পুর্ণ সামাজিক সাম্য।

৩। স্থায়ী ও সুষ্ঠ সামাজিক বন্টন।

আত্মার মুক্তি

সামাজিক ধ্যান-ধারণার কোনরূপ ব্যাখ্যা এবং তার প্রতিষ্ঠা ও স্থায়ীত্বের চিন্তা করা ঐ সময় পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতক্ষণ না তার পিছনে এ ইন্‌সাফের সামাজিক প্রয়োজন প্রকটভাবে অনুভূত এবং ব্যক্তির অধিকারের গভীর জ্ঞান অনুভূতি বর্তমান না থাকবে। অতঃপর এমনি রূপেই যে একটি মানবিক উচ্চ আশা-আকাঙ্খার ও মহান উদ্দেশ্যের দ্বারদেশে উপনীতি হওয়া সম্ভব হতে পারে, সে বিশ্বাস ও প্রত্যয় থাকাও একান্ত অপরিহার্য। সাথে সাথে জাগতিক পরিবেশ ও অবস্থা এমনতর হতে হবে যেন, ব্যক্তি এ ইনসাফের ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্ক যুক্ত হতে এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ ও তার জন্য সর্বপ্রকার দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নেয়ার জন্য সামনে এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে। ব্যক্তির মধ্যে যদি তার প্রয়োজনের বাস্তব অনুভূতি না থাকে এবং যদি সে এ অনুভূতিকে সতেজ সাবলীল রাখার জন্য বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ না করে, তবে শুধু কেবল আইনের আবেষ্টনী দ্বারা এহেন ইন্‌সাফ ও সুবিচার কায়েম করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এ আইন-কানুন যদি বাস্তবে রূপায়িতও হয়, তবে সমাজ তাকে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত রাখতে সক্ষম হয় না। ব্যক্তির মনোজগতে এমন বিশ্বাস ও প্রত্যয় বর্তমান থাকা প্রয়োজন, যা সামাজিক ইন্‌সাফ প্রতিষ্ঠায় সাহায্যকারীর ভূমিকা নিতে পারে। অনুরূপ তার বর্হিজগতের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এমনতর হতে হবে, যেন তাকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হয়।

সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে ইস্‌লাম এ সুক্ষ্মতত্ত্ব বিষয়টিকে ভালরূপেই উপলব্ধি করেছে এবং তাকে সে তার তালিম, হেদায়েত ও আইন রচনা কে সামনে রেখেই কাজ করে যাচ্ছে।

গীর্জা ও বিভিন্নতম কন্‌ফারেন্সে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর আলোকে রূপান্তরিত খ্রীস্টান মতবাদের মতে এবং অনুরূপ বুদ্ধ ধর্মমতে পার্থিব জীবনের আরাম-আয়েশ সুখ-স্বাচ্ছন্দ এবং তার সাধ আস্বাদন থেকে মুক্ত হওয়া, জগতের নিকটতম আকাশে আল্লাহর সৃষ্টি রহস্যের পানে আন্তরিক অনুরাগের সাথে অবলোক করা এবং বৈরাগ্যবাদ তথা পার্থিব জগতকে বিসর্জন মানুষকে স্বাধীনতা দান করতে এবং তাদের সাফল্য মুক্তি ও সৌভাগ্য আনয়নের বেলায় খুবই যথেষ্ট। কথাটা একদিকে সত্য বটে, কিন্তু জীবনের প্রয়োজন ও চাহিদার প্রতি সর্বদা উপেক্ষা প্রদর্শন আদৌ সম্ভব নয়। অনুরূপ তাকে দাবিয়ে রাখাও যায় না। মানুষ এ প্রয়োজন ও চাহিদার দমন অনুভুত হতে এবং অধিকাংশ সময় তার

সামনে নতজানু হতে বাধ্য হয়। জীবনের প্রয়োজন ও চাহিদাকে উপেক্ষা করা বা সর্বদা পদদলিত করে যাওয়ার পরিণাম ফল সব সময় শুভ হয় না। স্রষ্টা জীবনকে এ জন্য সৃষ্টি করেনি যে, তার প্রয়োজন সর্বদা উপেক্ষা করে চলবে। আর এটা তার কাম্য নয় যে, মানুষ তাকে পরিত্যাগ করে কর্মহীন অবস্থায় কালাতিপাত করে জীবনের ভবিষ্যত উন্নতি ও সমৃদ্ধির উজ্জ্বল সম্ভাবনা হতে চিরতরে বঞ্চিত থাকবে। জীবনের প্রয়োজনের উর্ধ্বে থাকা এবং তার প্রতি মুখাপেক্ষী না হওয়ার অর্থ এ নয়;-যে নিজেই জীবনকে অকর্মণ্য অবস্থায় ফেলে রাখবে।

যে পথে মানুষের আভ্যন্তরীণ শক্তিনিচয় ও কর্মদক্ষতা সমূহের উৎকর্ষ সাধন ও উন্নতি বিধানের পূর্ণ সুযোগ পাওয়া যায়, সেই পথটিই হলো যুক্তিযুক্ত ও বিজ্ঞান সম্মত পথ। এ পথে গেলে মানুষের উন্নতির সম্ভাবনা যেমন উজ্জ্বল; তেমনি সাথে সাথে সে জীবনের প্রয়োজন ও চাহিদা মিটাবার অসম্মান জনক পথের গ্লানি থেকেও বেঁচে থাকতে পারে। ইস্‌লাম মানুষের জন্য এহেন পথেরই সন্ধান দেয়। সে মানুষের দৈহিক প্রয়োজন এবং মানসিক ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও প্রবণতা উভয়ের জন্য একটি বিধান নির্ধারিত করে রেখে দিয়েছে। সে আত্মার মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য যেমন মানুষের অভ্যন্তরে জ্ঞান-বুদ্ধি বিচক্ষণতা ও অনুভূতি সৃষ্টি করে রেখেছে, অনুরূপ তাদের বহির্জগতের অবস্থা করে রেখেছে অনুপম ও উপযোগী রূপে। এর বিপরীত সমাজতান্ত্রিক দর্শনে মানবাত্মার মুক্তির একমাত্র নিশ্চয়তা দানকারী বিষয় হলো অর্থনৈতক মুক্তি। ব্যক্তিকে সাধারণতঃ আইনগত সাম্য ভ্রাতৃত্ব এবং ইনসাফের যে সাধারণ নিশ্চয়তাটুকু দেয়া হয় তা থেকে অর্থ-নৈতিক চাপ সৃষ্টির কারণে সে বঞ্চিত থেকে যায়। এটা একদিক দিয়ে সত্য বটে, কিন্তু এটাও দিবালোকের ন্যায় সত্য যে সমাজে অর্থনৈতিক মুক্তির নিশ্চয়তা বিধান সেই স্বাধীনতা ব্যতিরেকে সম্ভব নয়, যার মূলদেশের শিকড় আত্মিক জগতের গহীন কোঠা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ। মানুষের উপর জীবনের প্রয়োজন, কর্মদক্ষতা এবং গতিধারার যে চাপ সৃষ্টি হয় তার মোকাবিলা ও প্রতিরক্ষা শুধু আইনগত আবেষ্টনী দ্বারা করা যায় না। যে ব্যক্তি জন্মগতরূপে দুর্বলপনা হবার কারণে ধন-সম্পদ অর্জন এবং উন্নতি ও সমৃদ্ধি আনয়নের দৌড়ের পাল্লায় অন্যান্যদের সাথে সমপর্যায় থাকতে পারেনা;- কিছু সময় থাকতে পারলেও পরিশেষে স্বীয় হীনতা ও দুর্বলতার অনুভুতির শিকারে পরিণত হয়ে পশ্চাতে থেকে যায়। অতঃপর সে ব্যক্তি আর সেই সাম্যতার দাবিদার থাকে না, যার নিশ্চয়তা সাধারণতঃ আইনগত বিধান থেকে পাওয়া যায়। অনুরূপ যে ব্যক্তি

অসাধারণ শক্তি ও কর্মদক্ষতার অধিকারী সে একদিন সাধারণ সাম্যের আইনগত বেড়াজাল ছিন্ন করে সম্মুখে অগ্রসর হবেই। যদি সে সামনে অগ্রসর হবার সুযোগ না পায়, তবে তার মনের উনানে আইনগত বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অনির্বাণ শিখা ধুমায়িত হতে থাকবে। পরিশেষে হয়ত সে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে বসবে, নতুবা তার কর্মদক্ষতা নির্জীব হয়ে সমুদয় কর্মশক্তি পক্ষঘাত গ্রস্ত হয়ে পড়বে। এর পরিণতি যে খুব মারাত্মক তাতে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই।

এহেন সামাজিক সাম্যের পশ্চাৎভুমে যদি স্বাধীনতার অনুভূতি ক্রিয়াশীল থাকে আর যদি থাকে তার পশ্চাতে আইনগত সাহায্য, তবে তার অনুভূতি দুর্বলতা ও শক্তিশালীতা উভয়ের মধ্যেই সমপর্যায় উজ্জীবিত থাকে। দুর্বলের মধ্যে সাম্যের এহেন ধ্যান-ধারণা প্রবল উত্তেজনার আকারে প্রকাশ পায়। আর শক্তিমানের মধ্যে থেকে প্রকাশ পায় নম্রতা ও শিষ্টাচারিতার রূপ নিয়ে।

সাম্যবাদের এহেন ধ্যান-ধারণা মানুষের অন্তর্জগতে প্রবেশ করার সাথে তার অন্যান্য মৌলিক ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের সাথে সংযোজিত হয়। আল্লাহর প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস, জাতীয় ঐক্যের ধ্যান-ধারণা এবং তার ব্যক্তিবর্গের মধ্যে দায়িত্বশীলতা ও জিম্মাদারীর ক্ষেত্রে পারস্পরিক অংশ গ্রহণের ধ্যান-ধারণা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে সমগ্র মানবতার মধ্যে একাত্বতার বিধান এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতিভু হবার বিধানাবলী এ সাম্যের সাথে গভীর ভাবে সম্পর্কশীল দেখতে পাওয়া যায়। ইস্‌লাম সাম্যবাদের এহেন রূপরেখারই আকাংখী ও দাবীদার। সে তার বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রথমতঃ আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় প্রকার উপায় উপকরণ ব্যবহার করে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার মৌলিক প্রয়োজনের পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করে। পরিশেষে করে তার আত্মার মুক্তি সাধন।

ইসলামী দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গী মানবাত্মার সুচনা হতেই তাকে গায়রুল্লার ইবাদত-বন্দেগী এবং তার আনুগত্য ও ফরমাবরদারী থেকে মুক্ত করে। মানুষের উপর আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তার প্রভুত্ব নেই। আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন শক্তিশালী সত্তা নেই; যে তাদেরকে মারতে পারে জীবনদান করতে পারে। অন্য কোন সত্তাই তাদের কোন কল্যাণ ও ক্ষতি সাধন করার শক্তি রাখে না। সর্ব জগতে একমাত্র তিনিই আছেন যিনি মানুষকে রিযিক দান করেন। আর আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে মাধ্যম স্বরূপ কোন কিছুর অস্তিত্বও নেই। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহ ছাড়া যা কিছু বিদ্যমান রয়েছে সকলই তার সৃষ্টি ও বান্দা, যারা

নিজেরা না পারে যেমন নিজেদের কোন উপকার ও কল্যাণ সাধন করতে, অনুরূপ পারে না অপরের জন্য।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ج اَللّٰهُ الصَّمَدُ ج لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ
ج وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ٥

"হে নবী!–আপনি বলে দিন যে আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, আল্লাহ কাহারো মুখাপেক্ষী নন, তাঁকে কেহ জন্ম দেয়নি এবং তিনিও কাহাকে জন্ম দেননি। আর তাঁর সমকক্ষ নেই কোন বস্তু" (সূরা ইখলাস)

আল্লাহ তায়ালা যখন এক ও অদ্বিতীয় তখন তার উপাসনাও একই রকম হওয়া উচিত। সমুদয় মানুষের একমাত্র তার পানেই মনোনিবেশ করা উচিত। অন্য কাহারো উপাসনা করার প্রশ্নই উত্থাপন হতে পারে না। আর কোন মানুষের এ অধিকার নেই যে, সে অন্য কোন মানুষকে প্রভু ও রব বলে স্বীকার করে নিবে! কোন মানুষের উপর যদি কাহারো কোন প্রকার মহত্ত্ব ও সম্মান থেকে তা হচ্ছে তাক্ওয়া পরহেজগারী ও বাস্তবতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

কুরআন মজীদে আল্লাহ বলেনঃ

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ
شَيْــًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ
اللّٰهِ –

"হে আহ্লে কিতাবগণ! তোমরা আমরা যে বিষয় ঐক্যমত পোষণ করি, তার উপর ভিত্তি করে এসো– তোমরা আমরা সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ি। সেই বিষয়গুলো হলো আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহারো বন্দেগী করবো না, একত্ববাদে কাহাকেও অংশীদার করবো না। আর আমাদের মধ্যে কেহ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তাকে রব বা প্রতিপালক বলে স্বীকার না করা।" (সূরা আলে ইমরাণ–৬৪)

এলেম তালীম ও শিক্ষার ব্যাপারে ইসলাম খুবই গুরুত্ব প্রদান করে। পবিত্র কুরআনে করীম বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারে এহেন মৌলিক নীতিরই সাহায্য গ্রহণ

করে। সন্দেহ হয়েছিল যে, মানুষ হয়তো নবীদের মুজেজা ও বুজর্গীর কারণে তাদের ইবাদত উপাসনা অথবা এ ধরনের কিছু আদব আখলাক ও চিরা-চরিত প্রথার পানে আকর্ষিত হবে। সুতরাং ইসলাম সর্বপ্রথম মানবাত্মাকে এ কুসংস্কার ও সন্দেহবাদীতা হতে মুক্ত রাখার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। পবিত্র কুরআন মজীদে আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে এরশাদ করেছেনঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ج قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُوْلُ ط اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْقُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ-

'মুহম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসুল ছাড়া আর কিছুই নন, তার পূর্বে বহু নবী এমনিরূপে এ জগত ত্যাগ করে চলে গেছেন। সুতরাং সে যদি ইন্তেকাল করে অথবা তাঁকে কেহ হত্যা করে তবে কি তোমরা আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে পিঠ ফিরিয়ে চলে যাবে।" (সূরা আলে ইমরাণ-১৪৪)

নবী করীম (সাঃ)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ তায়ালা পরিষ্কার ঘোষণা দিচ্ছেন ঃ

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْئٌ اَوْيَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْيُعَذِّبَهُمْ

"ফয়সালা দেয়ার অধিকারের বেলায় আপনার কোন অংশ নেই। অধিকার রয়েছে একমাত্র অল্লাহর। তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে মার্জনাও করতে পারেন, আর ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন। এ বিষয় ফায়সালার অধিকারী একমাত্র তিনিই।" (সূরা আলে ইমরাণ-১২৮)

وَلَوْ لَا اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيْلًا- اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَاتَجِدُلَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا

"তা খুব দুরে ছিল না যে, আমি যদি আপনাকে দৃঢ় অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত না রাখতাম, তবে আপনি তাদের পানে কিছু না কিছু অবশ্যই ঝুঁকে পড়তেন। যদি আপনি তাই করতেন, তবে আপনাকে পার্থিব জগতে দ্বিগুণ শাস্তি এবং আখেরাতে দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাতাম। অতঃপর এক্ষেত্রে আপনি আমার সামনে কোনই সাহায্যকারী পাতেন না।" (সূরা বনী ইস্রাঈল-৭৪-৭৫)

তিনি মানুষকে তাদের প্রকৃত ভরসাস্থল কোনটি তা প্রকাশ্য রূপে সামনে রেখে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

قُلْ اِنَّمَا اَدْعُوْا رَبِّىْ وَلاَاُشْرِكُ بِهٖ اَحَدًا ٥ قُلْ اِنِّىْ لاَاَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلاَ رَشَدًا ٥ قُلْ اِنِّىْ لَنْ يُّجِيْرَنِىْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ٥

-"হে নবী! আপনি বলে দিন যে, আমি একমাত্র আমার প্রতিপালকেরই উপাসনা করি। তাঁর উপাসনার বেলায় কাহাকেও অংশীদার করি না। আপনি আরো বলে দিন যে, তোমাদের কোনরূপ ক্ষতি সাধন করা যেমন আমার ক্ষমতার বাহিরে তেমনি তোমাদেরকে হেদায়াতও আমি করতে পারবো না। আল্লাহর শাস্তি হতে কেউই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না বরং আল্লাহ ব্যতীত আমি কোন আশ্রয় ও পাব না।।" (সূরা জ্বিন-২০-২২)

হযরত ঈসা (আঃ)-কে যারা প্রভু মনোনীত করে নিয়েছে, তাদের পরিণতি যে কত ভয়ানক ও অপমানজনক, তা উল্লেখ করে কুফরীর অপরাধে তাদেরকে পবিত্র কুরআনে মজীদে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ط قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ط

"যারা হযরত মরিয়াম (আঃ)-এর ছেলে হযরত ইসা (আঃ)-কে বলেছে যে তিনিই আল্লাহ তারা বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহর সাথে কুফরী করছে। হে মুহাম্মদ (সাঃ)! আপনি জিজ্ঞেস করুন যে, আল্লাহ তায়ালা যদি হযরত ইসা (আঃ) এবং তাঁর মাতা সাহেবানী সহ দুনিয়ার সমগ্র বস্তু ধ্বংস করার ইচ্ছা করেন, তবে তাঁকে তার এ ইচ্ছা থেকে তিনি ব্যতীত বিরত রাখতে পারে এমন কেহ আছে কি?" (সূরা মায়েদা-১৭)

হযরত ইসা (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে করীমে অনত্র বর্ণিত হয়েছে ঃ

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ۝

'তিনি শুধু মাত্র একজন বান্দা, যাকে আমি আমার নেয়ামত দান করে সম্মানিত করেছি। আর বনী ইসরাইলদের জন্য করেছি একটি মুর্তিমান উত্তম উদাহরণশীল আদর্শ।' (সূরা আয যখরুফ-৫৯)

হযরত ইসা (আঃ) আল্লাহ হয়ে এ দুনিয়ায় আগমন করেছেন, ইয়াহুদীদের এ কথাটি সম্পর্কে যখন আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিকট তার মতামত জিজ্ঞেস করবেন, সেই সময়ের একটি দৃশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে পবিত্র কোরআনে করীমে মানুষের মনের কোঠায় যাতে করে বিষয়টি দৃঢ়রূপে বসে যায়, সে জন্য প্রভাবশালী গুরুগম্ভীর জোড়ালো কণ্ঠে আল্লাহ তায়ালা হযরত ইসা (আঃ)-কে সেই মিথ্যা অপবাদ থেকে মুক্ত করে দিয়ছেন, যা থেকে সে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র এ বিষয় কুরআনের ভাষা নিম্নরূপ ঃ

وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ ط قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ط إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ط تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ط إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ

الْغُيُوْبِ ٥ مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَآ اَمَرْتَنِيْ بِهٖٓ اَنِ
اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ - وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا
مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ - فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ
الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ - وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ٥ اِنْ
تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ - وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ
الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥

"কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ্ তায়ালা হযরত ইসা (আঃ)-কে সম্বোধন করে বললেন হে ইসা! তুমি কি আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতীত তোমার নিজকে এবং তোমার মাতাকে আল্লাহ্ মনোনীত করে নেয়ার জন্য মানুষের নিকট বলেছিলে? তখন সে জবাবে বলবেনা– সে কথা বলার অধিকার আমার নেই। ছোবাহানাল্লাহ! সে কাজ আমার ছিল না। আমি বাস্তবিকই যদি এমন কিছু বলতাম, তবে আপনি আমার অন্তর্যামী। কিন্তু আমি আপনার অন্তর্যামী নই। আপনার নিকট সর্ব প্রকার গোপন রহস্য ভেদের তথ্য ও জ্ঞান বর্তমান রয়েছে। তাদের নিকট আপনি আমাকে যা কিছু বলতে নির্দেশ দিয়েছেন, তা ব্যতীত আমি আর কিছুই তাদের নিকট বলিনি। আমি তাদেরকে বলেছিলাম যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করো। তিনি যেমন আমার প্রতিপালক তেমনি তোমাদেরও প্রতিপালক। আমি তাদের মধ্যে যতক্ষণ ছিলাম ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদের রক্ষক ও পাহারাদার ছিলাম। আমাকে আপনি যখন ডেকে আপনার নিকট নিয়ে এসেছেন, তখন থেকে আপনিই তাদের রক্ষক ও পাহারাদার ছিলেন। আর আপনিইতো সৃষ্টি জগতের সমুদয় বস্তুরই রক্ষক। যেহেতু তারা আপনার গোলাম ও বান্দা, আপনি ইচ্ছা করলে তদেরকে শাস্তি দিতে পারেন। আবার যেহেতু আপনি মহান পরাক্রমশীল বিচারক ও উদার, সেহেতু তদেরকে আপনি ক্ষমা করতেও পারেন।" (সূরা আল্ মায়েদা–১১৬-১১৮)

আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মধ্যে কতিপয়কে "ইলাহ" বা মাবুদ মনোনীত করে নেয়ার এমন একটি বাস্তব উদাহরণ পেশ করেছেন, যেখানে তারা

আকীদা ও বিশ্বাসের দিক দিয়ে তাদেরকে "মাবুদ" মনোনীত করে ছিল না। আর তাদের খোদায়ীত্বের বিশ্বাসকে যেমন তারা মনবজগতে স্থান দেয়নি, অনুরূপ তারা তাদের সামনে বা নামে কোনরূপ ইবাদাত বন্দেগীও করেনি। বরং তারা শুধু আল্লাহ বান্দাদের থেকে জীবন বিধান গ্রহণ করেছিল। এতটুকু করার কারণেই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে "মাবুদ" মনোনীত করার অপরাধী করেছিলেন। এ বিষয় কুরআনে করীমের বর্ণনা যে কত স্পষ্ট ও প্রকট তাই লক্ষ্য করুন। আল্লাহ বলেনঃ

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ - وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا - لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ - سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ -

তারা আল্লাহ ছাড়া নিজেদের আলেম ওলামা ও পীর দরবশদেরকে আল্লাহ মনোনীত করে নিয়েছে। অনুরূপ তারা হযরত মরিয়াম (আঃ)-এর ছেলে ইসা (আঃ)-কেও আল্লাহর আসনে বসিয়ে দিয়েছে। অথচ তাদেরকে একজন মাবুদ ছাড়া আর অন্য কাহারো ইবাদত করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। তিনি এমনই উপাস্য যে তিনি ছাড়া আর কাহারো উপাস্য হবার অধিকারও যোগ্যতা নেই। তিনি সর্বপ্রকার কালিমা থেকে পবিত্র। তারা তার বেলায় যে মুশ্‌রিকী কাজ কর্ম করতেছে, তা থেকেও তিনি মুক্ত।" (সূরা তাওবা-৩১)

পবিত্র কুরআনে করীম যেমন এ আকীদা ও বিশ্বাসকে পরিষ্কার রূপে বিশদ বিবরণ সহ মানুষের সামনে পেশ করে, অনুরূপ বিশ্বাস মানুষের মনের গভীর কোঠায় এজন্য পৌঁছিয়ে দেয়, যেন মানবতা আল্লাহর এবং তাঁর পরিবত্রতার বেলায় আল্লাহর সাথে অংশীদার করার মারাত্মক ভুল থেকে রেহাই পায়। শিরক মানবাত্মার উপর যেমন সাংঘাতিক রূপে আঘাত হানে তেমনি মানসিক শক্তিকে করে দেয় পঙ্গু ও পর্যুদস্ত। পরিশেষে তাকে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে থেকে কাহারো বন্দেগী ও অন্ধ গোলামীর জিঞ্জির পায়ে পড়ে নিতে বাধ্য করে। যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ মনোনীত নবী বা রাসুলও হন, তবে তিনি আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে বান্দাই থেকে যায়, তিনি আল্লাহ হন না।

যখন আল্লাহর সামনে কোন বান্দা অন্য কোন বান্দার থেকে বান্দা হিসাবে কোন রূপ মর্যাদা ও স্বাতন্ত্রতা রাখার নীতি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, তখন এ থেকেই আল্লাহ এবং তার বান্দাদের মধ্যে কোন রূপ মাধ্যম বা অসীলা গ্রহণ করার নীতি আপন থেকেই বিলীন হয়। এখন আর গায়েব জানার অথবা অসীলা ধরার কোন প্রকার প্রশ্ন উত্থাপনের কোন অবকাশই থাকে না। এবং প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় স্রষ্টার সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করবে। তার দুর্বল নশ্বর সত্তা অনন্ত অসীম শক্তির সাথে এজন্য সম্পর্ক স্থাপন করবে যেন, তার থেকে সে শক্তি, সম্মান, সাহস অর্জন করতে পারে এবং তার দয়ার্দ্রতা ও বদান্যতার স্বাদ গ্রহণ করে যেন তার আধ্যাত্মিক শক্তিতে নব উদ্যম ও চেতনা শক্তির সংযোজন হয়।

স্রষ্টার সাথে যাতে এ সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে দৃঢ় প্রথিষ্ঠিত হয়, তার জন্য সে সর্বদাই চিন্তা করে।

সে সর্বদা ব্যক্তিকে এ প্রেরণা দেয়, যাতে সে রাত্র দিনের সময়গুলির প্রতিটি সময় অহরহ এ মহান অসীম শক্তির নিকট সাহায্যের প্রার্থী হয়।

اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ–

–"আল্লাহ বান্দাদের প্রতি মেহেরবান।" (সূরা শুরা–১৯)

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ – اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ–

"হেনবী! আমার বান্দারা যদি আপনার নিকট আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তবে আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আমি তাদের নিকটেই আছি। আমাকে যারা ডাকে আমি তাদের ডাক শুনি এবং তার জবাবও দেই। সুতরাং তাদের উচিত আমার আহ্বানে সাড়া দেয়া এবং আমার প্রতি ঈমান আনা। আমার এ কথাগুলি আপনি তাদেরকে শুনিয়ে দিন; হয়ত তারা হেদায়াতের পথে আসতে পারে।" (সূরা বাকারা–১৮৬)

وَلَا تَايْئَسُوا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ط اِنَّهٗ لَايَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ-

"আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। কাফের ছাড়া আল্লাহর রহমত থেকে কেহই নিরাশ হয় না।" (সূরা ইউসুফ-৮৭)

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ - اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط

"হে নবী! আমার সেই সকল বান্দাদেরকে বলে দিন যারা নিজ আত্মার উপর জুলুম করেছে। তারা যেন আমার রহমত থেকে নিরাশ না হয়। আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের সমস্ত গুনাহরাশি মার্জনা করে থাকেন।" (সূরা যুমার-৫৩)

ইস্‌লাম দৈনিক পাঁচবার নামাযের ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে আল্লাহর বান্দাদের জন্য দৈহিক নির্দিষ্ট সময় স্বীয় প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। যার মাধ্যমে সৃষ্টি তার স্রষ্টার সাথে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। এছাড়া আরও বহুত এমন সময় রয়েছে, যখন বান্দার মনে চায়, তখন সে স্বীয় প্রভূর সামনে দণ্ডায়মান হয়ে তার পানে মনোনিবেশ করে প্রার্থনার মাধ্যমে দৃঢ় বন্ধনে তার সাথে আবদ্ধ থাকতে পারে। শুধু মুখে কিছু অক্ষর উচ্চারণ করা এবং দেহ সঞ্চালনই নামায ও প্রার্থনার উদ্দেশ্য নয়। বরং তার আসল উদ্দেশ্য হলো একই সময় দেল-দেমাগ মন-মগজ দেহ-আত্মা সমেত পূর্ণ একাগ্রতার সাথে আল্লাহর পানে মনোনিবেশ করা। ইস্‌লামের এহেন পূর্ণাঙ্গ মৌলিক চিন্তাধারার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার পর মানুষ স্বীয় গঠন আকৃতি ও লালন-পালনের বেলায় এবং জগতের স্রষ্টা স্বীয় আল্লাহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অভিন্ন ও এক বিশ্বাস পোষণ করে।

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ٥ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ-

"সেই সকল নামাযীদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য যারা নিজেদের নামাযের বেলায় উদাসীনতা প্রদর্শন করে।" (সূরা আল-মাউন-৪-৫)

মানবাত্মা বান্দার গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্তি পাবার সাথে সাথে আল্লাহর সাথে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের ইচ্ছায় সজাগ চেতনাবোধ দ্বারা উন্নতি ও উৎকর্ষতার উচ্চ সোপানে আহোরণ করতঃ জান মাল, ধন-সম্পদের প্রেক্ষিতে সর্বপ্রকার অনিষ্টতার ভয়ভীতি এবং সন্দেহবাদীতার মোহমুক্তি ঘটিয়ে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করতে থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে এহেন সন্দেহবাদীতা ও ভয়ভীতি মানবতার জন্য এতখানি ধ্বংসাত্মক ও মারাত্মক, যা মানুষের স্বকীয়তা ও ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষুণ্ন ও ক্ষতবিক্ষত করে। হয়ত কখনো কখনো তাকে অপমানের মুখে ঠেলে দেয়া, বহু অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এমন কি শেষ পর্যন্ত স্বীয় মান-সম্মানকে বিসর্জ্জন দিতে সে প্রস্তুত হয়। ইস্‌লাম মানুষের ইজ্জৎ সম্মান এবং তাদের শিষ্টাচারিতার পুর্ণ নিশ্চয়তা বিধানের প্রতি খুব গুরুত্ব প্রদান করে। তাদের মধ্যে সত্যিকারের অর্থ ব্যক্তিত্ব ও স্বকীয়তা এবং মান সম্মান গড়ে উঠতে পারে, এবং তারা যাতে করে সমাজের বুকে আদল-ইন্‌সাফ প্রতিষ্ঠার রক্ষক ও পাহারাদার হয় সেজন্য সে তার বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সে চায় যে এমনিরূপে আইন-কানুন ছাড়া সেই সকল বিষয়ের দ্বারা সে এমন একটি সাধারণ অথচ পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ইন্‌সাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দান করবে, যার ভিতর কোন মানুষ নিজ নিজ সীমারেখা অতিক্রম করতে চেষ্টা করবে না। এ সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের প্রেক্ষিতে ইস্‌লাম এ বিষয় বিশেষভাবে চিন্তিত থাকে যে, মানুষ স্বীয় জীবন, পেট পুরিয়ে খাবার খাদ্য এবং জীবন ধারণের মান নির্ণয়ন ইত্যাদি বিষয়ের ব্যাপারে প্রতিটি ভয়ভীতি ও সন্দেহবাদীতা থেকে কিরূপে মুক্ত থাকতে পারে? মানুষের জীবন হলো আল্লাহর হাতের মুঠায়। কোন মানুষের এমন শক্তি ও ক্ষমতা নেই যে, সে তার বয়ঃ সীমা থেকে এক বিন্দু সময় সরিয়ে দিবে অথবা তা থেকে কিছু কম বেশী করবে। যেমন মানুষ কোন সৃষ্টি জীবের একটি শ্বাস-প্রশ্বাসকে তার নির্দিষ্ট গণনা থেকে কম করতে পারে না, তেমনি বিন্দু বিসর্গ পরিমাণ তার ক্ষতি সাধন করারও ক্ষমতা রাখে না।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا ـ

"কোন জীবই আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া মৃত্যুবরণ করতে পারে না। মৃত্যুর সময়তো নির্ধারিত রূপে লেখাই রয়েছে।" (সূরা আলে ইমরাণ-১৪৫)

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا - هُوَ مَوْلٰنَا-

"(হে নবী!) আপনি বলে দিন যে, আল্লাহ তায়ালা ভাগ্যলিপিতে কল্যাণ অকল্যাণ যা কিছু আমাদের জন্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, তাই কেবল বাস্তবে ফলে ও আমাদের কাছে পৌছে। তাছাড়া কিছুই হয় না। আল্লাহ তায়ালাই হলো আমাদের একমাত্র অভিভাবক।" (সূরা তাওবা)-৫১)

لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ - إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَايَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَايَسْتَقْدِمُوْنَ-

"প্রত্যেক জাতির জন্যই অবকাশ যাপনের একটি নির্ধারিত সময় সূচী রয়েছে। যখন সে সময় শেষ হয়, তখন আর নির্দিষ্ট সময় সূচীর বিন্দুবিসর্গ পরিমাণ সময় অগ্র পশ্চাৎ করা হয় না।" (সূরা ইউনুস-৪৯)

এখানে ভয়ভীতি বা ভীতিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের কোনরূপ স্থান নাই। কারণ জীবন, মরণ, লাভ, ক্ষতি সবকিছুর একমাত্র নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রণকারী আল্লাহ তায়ালাই।

قُلْ أَغَيْرَ اللّٰهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَايُطْعَمُ -

"হে নবী! আপনি জিজ্ঞাসা করুণ যে, আমি কি আল্লাহ ব্যতীত আর কাহাকেও পৃষ্ঠপোষক ও অভিভাবক করতে পারি? অথচ তিনি হলেন একমাত্র আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। তিনি কাহারো থেকে খাদ্য গ্রহণ করেন না, বরং সমগ্র জীবের খাদ্যের সংস্থান তিনিই করেন।" (সূরা আল্ আনায়ম-১৪)

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ-

"আল্লাহ যাকে চান তাকেই রিযিকের বেলায় প্রাচূর্য্য দান করেন। আর যাকে ইচ্ছে কম দিয়ে থাকেন"। (সূরা রয়া'দ-২৬)

وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَابَّةٍ لَاتَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ -

"কত জীব রয়েছে যারা রিযিক সাথে করে চলে না। তাদের রিযিকের ব্যবস্থা আল্লাহ তায়ালাই করেন। আর তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থাও করেন তিনি।" (সূরা আনকাবুত-৬০)

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ط فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ -

"আপনি তাদের নিকট জিজ্ঞাস করুন- আকাশ ও পৃথিবী থেকে কে তোমাদেরকে রিযিক দান করেন? আর শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি-শক্তি কার হাতের মুঠায় রয়েছে? আর কে নির্জীব থেকে জীবন এবং জীবন্ত থেকে নির্জীব করে বাহির করেন? আর কে-ই বা এ অনন্ত জগতের ব্যবস্থাপনার নিয়ামক? তারা অবশ্যই উত্তর দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেহই নয়।" (সূরা ইউনুস-৩১)

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ - هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ - لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ -

"হে মানুষ। তোমাদের প্রতি আল্লাহর দানকৃত নিয়ামত সমূহের কথা স্মরণ করো। সেই আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন সৃষ্টিকর্তা কি আছে? যিনি আকাশ ও পৃথিবী থেকে তোমাদের জীবিকার সংস্থান করেন। (মনে রেখ) তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় আর কোন মাবুদ নেই। আবার তোমরা তার পথ ছেড়ে বিপথে চলতেছো কেন?" (সূরা ফাতের-৩)

وَلَاتَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ - نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ -

"দরিদ্র হাবার ভয়ে নিজেদের সন্তান-সন্ততিদেরকে হত্যা করো না। আমিই একমাত্র তোমাদেরকে এবং তাদেরকে জীবিকা দান করি। (সূরা আনয়াম-১৫১)

وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ

"যদি তোমাদের মনে দরিদ্রতার ভয়ের উদ্রেক হয়, তবে (চিন্তিত হবার কারণ নেই) অনতিবিলম্বেই আল্লাহ তায়ালার যদি মর্জি হয়, তবে তিনি স্বীয় রহমত দ্বারা তোমাদেরকে ধনী করে দিবেন। (সূরা তাওবা-২৮)

কুরআনের মতে অন্তরে গরিবী ও দারিদ্রতার ভয় জাগরূক হওয়া আসল কোন ব্যাপার নয়। বরং তা শয়তানের কুমন্ত্রণারই পরিনামের ফল, যা আমাদের প্রকৃতি ও স্বভাবকে এমনরূপে দুর্বল করে দেয় যে, আমাদের থেকে আত্মনির্ভরশীলতা ব্যক্তিত্ব এবং আল্লাহর প্রতি ভরসা করার দৃঢ় প্রত্যয় ও সৎগুণাবলী ছিনিয়ে নিতে চায়।

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ - وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا - وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ -

-"শয়তান তোমাদেরকে দরিদ্র হওয়ার ভীতি প্রদর্শন করে। আর অশ্লীল ও লজ্জাস্কর কাজ করার জন্য ইন্ধন যোগায়। কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে মার্জনা করার এবং অনুগ্রহ করার প্রতিশ্রুতি দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও মহাজ্ঞানী।" (সূরা বাকারা-২৬৮)

কুরআনে করীমের এ ভাষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে কোনক্রমেই এ কথা ঠিক হতে পারে না যে জীবিকা অর্জনের বেলায় একজন মানুষের অন্য একজন মানুষের নিকট মাথা অবনত করতে হয়। তাদের রিযিকের সংস্থান ও বন্টনের ভার হলো একমাত্র আল্লাহর উপর ন্যস্ত। মানুষের মধ্যে একটি সাধারণ দুর্বল মানুষেরও এমন শক্তি নেই যে সে কোন মানুষকে রিযিক দান করতে অথবা তাকে দরিদ্রতার গহীন আঁধার কুয়াতলে নিক্ষেপ করতে পারে। কুরআনের এ মতবাদ দ্বারা জীবিকা অর্জনের উপসর্গ ও উপকরণকে অস্বীকার করা হয় না। বরং এ মনোভাব দ্বারা অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যয় জন্মলাভ করে। অন্তরকে নব চেতনার

শক্তি দানে উর্ব্বরময় করে তুলে। দরিদ্র ব্যক্তি জীবিকা অর্জনের বেলায় পূর্ণশক্তি ও সাহস নিয়ে উন্মীলিত নেত্রে সেই সকল ব্যক্তিবর্গের সামনে দণ্ডায়মান হবার যোগ্যতা অর্জন করে, যাদের হাতে বাহ্যিকরূপে খাদ্য-সামগ্রীর চাবিকাঠি বিদ্যমান। এর ফলটা গিয়ে এ দাঁড়ায় যে, এখন 'সে ভয়ভীতি ও সন্দেহবাদীতার কারণে এবং স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও মান সম্মানকে প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং স্বীয় ন্যায্য ও বৈধ অধিকার সমূহ আদায় করার বেলায় পিছ পা হয় না। আর পারবে না তাকে উদ্বুদ্ধ করতে জীবিকার উপর বিপদ না আসার দরুন স্বীয় বাস্তব পারিশ্রমিক অথবা স্বীয় সম্মান সম্ভ্রম থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া থেকে।

পবিত্র কুরআনে করীমের হেদায়েত এবং ইস্‌লামের স্বরূপ প্রকৃতিকে এ দৃষ্টিভঙ্গী ও ভাবধারা নিয়েই বুঝতে হবে। এটা সেই অনুভূতি ও ভাবধারা, যা আইন প্রণয়ন শিক্ষা ও উপদেশ এবং কুরআনের যাবতীয় নির্দেশাবলীর বেলায় ইস্‌লামের মৌলিক ও সাধারণ দর্শনের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। ইজ্জত ও মান-সম্মান চলে যাবার ভয়ভীতি, মৃত্যু-বিপদ আপদ এবং বুভুক্ষতা ও দারিদ্র্যতার ভয়ের সাথে সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। এ জন্যই ইসলাম এ ব্যাপারে যাতে করে কোন ব্যক্তি অন্য কাহারো ক্ষতি সাধন করতে না পারে, তার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে এহেন ভয়ভীতি ও সন্দেহবাদীতা থেকেও নিশ্চিতরূপে মুক্ত করতে চায়। পবিত্র কুরআনে মজীদে এরশাদ হয়েছে ঃ

قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ - بِيَدِكَ الْخَيْرُ - اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

"হে নবী আপনি বলুন! হে শাহানশাহ্ রাজাধিরাজ দয়াময় আল্লাহ। আপনি যাকে ইচ্ছে তাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আসনে সমাসীন করেন, আবার যার থেকে ইচ্ছে হয়, তার থেকে ঐ ক্ষমতার আসন ছিনিয়ে নিয়ে যান। আপনি যাকে ইচ্ছে সম্মানিত করেন, যাকে ইচ্ছে অপমানিতও করেন! কল্যাণ একমাত্র আপনার হাতের মুঠার মধ্যেই নিহিত। নিশ্চয় আপনি সমুদয় বস্তু জগতের উপর শক্তিশালী ও ক্ষমতাবন।" (সূরা আলে ইমরাণ-২৬)

قُلْ مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ

وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ
قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ-

"আপনি জিজ্ঞেস করুন! কার হাতে এই বিচিত্রময় সমূদয় সৃষ্টি জগতের শাহানশাহী রয়েছে? আর কে-ইবা আশ্রয়দানকারী আছে- অর্থাৎ তিনিই আশ্রয় দেন। কিন্তু তাঁর অপরাধীর আশ্রয় দাতা কেহই নেই। এ বিষয়ে যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে তবে উত্তর দাও? তারা উত্তরে বলবে–আল্লাহ ছাড়া আর কেহই নেই। এখন আপনি বলে দিন- যদি তাই হয়, তবে সত্যকে ছেড়ে তোমরা কোন মায়া মরিচিকার ইন্দ্রজালের পানে ছুটে চলছো? (সূরা আল্ মুমিনুন ৮৮-৮৯)

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ج وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ
فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ-

"আল্লাহ তায়ালা যদি তোমাদেরকে সাহায্য করেন, তবে এমন কোন শক্তি নেই, যা তোমাদেরকে পরাজিত করে তোমাদের উপর বিজয় লাভ করতে পারে। আর তিনি যদি তোমাদেরকে অপমানিত ও পরাজিত করেন, তবে এমন কে আছেন যে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে?" (সূরা আলে ইমরাণ–১৬)

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا-

"যে ব্যক্তি মান সম্মানের প্রত্যাশী তার জেনে রাখা উচিত যে, সমুদয় মান-সম্মান শুধু একমাত্র আল্লাহ তায়ালা রাব্বুল আলামীনের শক্তির মুঠার মধ্যে রয়েছে। (ইচ্ছা করলেই তা লাভ করা যায় না!)" (সূরা ফাতের–১০)

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ-

"সমুদয় মান-সম্মান একমাত্র আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর নবী ও তার অনুসারী মুমিনগণের জন্য।" (সূরা মুনাফিক-৮)

সুতরাং শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী যে একমাত্র সেই খোদায়ী সত্তা এবং মান-সম্মানের একচ্ছত্র অধিপতি যে একমাত্র তিনিই, এদিক দিয়ে এখন আর কোনরূপ সন্দেহবাদীতার অবকাশ থাকে না।

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ـ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ-

'তিনি স্বীয় বান্দাদের উপর পূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি মহান জ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ।"

তাক্ওয়া পরহেজগারী ও বুজর্গী দ্বারা প্রভাবিত হওয়া বা জানমাল ধন-সম্পদ এবং মান-মর্যাদা ও সম্মান প্রতিপত্তি সম্পর্কে যে সন্দেহবাদীতা এবং তার পরিণাম ফল থেকে সৃষ্ট দাসত্ব মনোবৃত্তি থেকে যদিও মানুষ মুক্ত হতে পারে, কিন্তু সেই সামাজিক শক্তিসমূহের পূজা পার্ব্বন থেকে মুক্ত হওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার, যা হচ্ছে ধন-সম্পদ ইজ্জৎ সম্মান ও বংশীয় প্রভাব প্রতিপত্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। যদি তারা তা দ্বারা মানুষের কোনরূপ কল্যাণ বা ক্ষতি সাধন করতে পারে না। সুতরাং মানবাত্মা যখন এসব শক্তি সমুহের কোন একটি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে, তখন সেই প্রভাবের কারণে একটি সীমা পর্যন্ত তার স্বাধীনতাও খর্ব হয়। আর যাদের এ স্বাধীনতা অর্জন হয় তারা সত্যিকারের সাম্যের চরম ও নরম উভয়বিধ আদর্শবাদকে পরিত্যাগ করে সেই সকল শক্তি নিচয়কে তাদের নিজ নিজ মর্যাদার উপযোগী যোগ্যতার আসনেই বসায়, যা তাদের সামাজিক জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে থাকা উচিত। তারা প্রকৃত মূল্যমান ও মর্যাদাকে সেই মৌলিক ও স্বপ্রতিষ্ঠিত সাধারণ এবং আপেক্ষিক নয় এমন মানদণ্ডে যাচাই করে, যা হয়তো কোথাও মানুষের মনের গোপন কোঠায় নিহিত আছে অথবা তাদের কর্মময় জীবনে বাস্তবতার রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। ফলে ঐ সকল জড়ধর্মী শক্তি নিচয়ের প্রভাব প্রতিপত্তিতে যেমন ভাটা পড়ে তেমনি তাদের মূলগত প্রভাবও দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। আর এ বস্তুই ইসলামের দেয়া অর্থনৈতিক ও আইনগত নিশ্চয়তা বিধানের প্রতিটি স্তরে স্তরে মানবাত্মার মুক্তির অন্যতম উপকরণে পরিণত হয়।

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ-

"তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঐ ব্যক্তি সম্মানিত– যিনি হচ্ছেন আল্লাহভীরু ও পরহেজগার।" (সূরা হুজরাত–১৩)

এ কথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, সত্যিকারের অর্থে সেই ব্যক্তিই সম্মানিত বলে বিবেচিত হতে পারে– যিনি আল্লাহর নিকট সম্মানিত বলে আখ্যায়িত হয়েছেন।

وَقَالُوا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَلاً وَاَوْلاَدًا وَ مَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ- قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَعْلَمُوْنَ ٥ وَمَا اَمْوَالُكُمْ وَلاَ اَوْلاَدُكُمْ بِالَّتِيْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰى اِلاَّ مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْاوَهُمْ فِي الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ-

"তারা বলে যে, তোমাদের তুলনায় আমাদের ধন-সম্মদ সন্তান-সন্ততি তথা জনশক্তি অনেক বেশী। সুতরাং আমাদের কখনো শাস্তি ভোগ করতে হবে না। হে নবী! আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, আমার প্রতিপালক যাকে ইচ্ছে অঢেল রিযিক ও ধন-সম্পত্তি দান করেন, আবার যাকে ইচ্ছে তার বেলায় সংকুচিত করে রাখেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই বুঝে না। তোমাদের ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে আল্লাহর নিকট পৌছাতে পারবে না বটে। তবে যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎ ও নেক কাজ করে, তাদের জন্য কর্মফল হিসেবে কয়েকগুণ প্রতিদান থাকবে। আর তারা বেহেস্তের সৌখিন বালাখানাসমূহে পরম শান্তির সাথে জীবন-যাপন করে আনন্দমুখর অবস্থায় কালাতিপাত করতে থাকবে।" (সূরা সাবা–৩৫-৩৬)

ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির দিক দিয়ে যদি কোন ব্যক্তি বিরাট প্রাচুর্য্যের অধিকারী হয়, তবে হতে পারে। কিন্তু এ সকল বস্তুর এমন কোন মূল্যমান নেই যা উক্ত ব্যক্তিকে কোনরূপ স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রদান অথবা বিরাট একটা কিছু করতে পারে।

اِلاَّ مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا-

(কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করে।) কারণ মানদণ্ডের কাজ শুধু মাত্র দু'টি মৌলিক ও মজ্জাগত বিষয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, যার একটি হলো আভ্যন্তরীণ বস্তু– যার নামই ঈমান। আর দ্বিতীয়টি হলো মানুষের কর্মময় জীবনে বাস্তব প্রদর্শন, যাকে সৎ কর্ম বা আমলে সালেহ্ নামে অভিহিত করা হয়।

আবার এর সাথে সাথে ইসলাম ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির বাস্তব মূল্যমান ও মর্যাদা দেবার বেলায় কোনরূপ কার্পণ্য প্রদর্শন করে না।

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا-

(ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি পার্থিব জীবনের আড়ম্বর পূর্ণ অলঙ্কার স্বরূপ) এ সকল বিষয়সমূহ শুধু অলঙ্কার বিশেষ-ই বটে। মানুষের উন্নতি অবনতি নির্ণয়ের যে আসল মানদণ্ড রয়েছে, তার মধ্যে এ মূল্যবোধ সমূহকে সে আদৌ গণ্য করে না।

وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَخَيْرٌ اَمَلًا-

"(আপনার প্রভুর নিকট পরিণাম ফল লাভের দিক দিয়ে একমাত্র সৎকর্মাবলীর সওয়াবই হলো কল্যাণময় ও স্থায়ী বস্তু। আর তার মাধ্যমেই আল্লাহর দরবারে সাফল্য লাভের আশা করা যায়।") (সূরা কাহাফ-৪৬)

পবিত্র কুরআনে করীম প্রাকৃতিক ও মৌলিক মূল্যবোধ সমূহের আসল তথ্যকে দু'টি মানব সত্তার মুর্ত্তিমান প্রতিবিম্ব রূপে এমন ভাবে প্রকাশ করে যে, এর পর আর এ মূল্যবোধ সমূহের একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দিবার অবকাশ থাকে না। সে একজন মুমিনের অন্তর্জগতে ও চিন্তাজগতে বিভিন্ন প্রকার মূল্যবোধের যে মর্যাদার আসন দিয়ে থাকে, তার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র সে অংকিত করে রেখে দিয়েছে কুরআন মজীদের এ বর্ণনায়ঃ

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِاَحَدِهِمَا
جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ وَّحَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّجَعَلْنَا
بَيْنَهُمَا زَرْعًا - كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا وَلَمْ
تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْئًا وَّفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا - وَّكَانَ لَهٗ
ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ

مَالًا وَّاَعَزُّ نَفَرًا ۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۔
قَالَ مَا اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖ اَبَدًا ٥ وَّمَا اَظُنُّ السَّاعَةَ
قَائِمَةً وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّىْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا
مُنْقَلَبًا ٥ قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗ اَكَفَرْتَ
بِالَّذِىْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰكَ
رَجُلًا ٥ لٰكِنَّا هُوَ اللّٰهُ رَبِّىْ وَلَا اُشْرِكُ بِرَبِّىْ اَحَدًا ٥
وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا
بِاللّٰهِ ۔ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا ٥ فَعَسٰى
رَبِّىْ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ ۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا
حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ٥
اَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا ٥
وَاُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَا
اَنْفَقَ فِيْهَا وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَيَقُوْلُ
يٰلَيْتَنِىْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّىْ اَحَدًا ٥ وَلَمْ تَكُنْ لَّهٗ فِئَةٌ
يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ۔

"হে মুহম্মদ (সাঃ)! আপনি তাদের সামনে একটি উদাহরণ পেশ করে বুঝাইয়ে দিন যে, কোন একটি দেশে দুই জন লোক ছিল। তাদের একজনকে

আমি আঙ্গুরের দুটি বাগিচা দান করেছিলাম। যার চতুষ্পার্শ্বে সবুজে ঘেরা খেজুর বৃক্ষের সারি এবং মাঝখানে ছিল কৃষি কাজ করণের উর্বর সমতল ভূমি। বাগিচা দু'টি যাতে করে ফুলে ফলে সুশোভিত হয়, তার ব্যবস্থাপনা করতে চেষ্টার আদৌ কসুর করে নি। আমি বাগিচার মধ্য দিয়ে একটি স্রোতময় নহরও প্রবাহিত করে দিয়েছিলাম, তা দ্বারা খুবই লাভবান হয়েছিল। সে একদিন মনের খুশিতে স্বীয় প্রতিবেশী লোকটির নিকট বললো– আমি তোমার তুলনায় বিরাট ধনাঢ্যশালী হয়েছি; এবং শক্তিও কর্মদক্ষতায়ও অনেক বেশী। অতঃপর উক্ত ব্যক্তি স্বীয় বাগিচার ভিতর ঢুকে আনন্দে আত্মহারা হয়ে স্বীয় আত্মার উপর জুলুম করে বলতে লাগলো–আমার এ ধন-সম্পদ যে কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে, তা আমার মনে একটুও ধারণা হয় না। আর কিয়ামত হবে বলেও আমি মনে করি না। কিয়ামতের বিশ্বাস একটি বাতুল কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি একান্ত রূপে আমাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হয়, তবে এথেকে অনেক আরামদায়ক সুখময় স্থানই পাবো। তখন প্রতিবেশী ব্যক্তি তাকে সম্বোধন করে বললো-ওহে, তুমি কি সেই মহান সত্তার সাথে কুফরী করলে– যে তোমাকে প্রথমতঃ মাটি থেকে তারপর মানুষের শুক্র থেকে সৃষ্টি করে একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষের রূপ দান করেছেন? আমার প্রতিপালক কিন্তু একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেহই নয়। আমি তার সাথে কাহাকেও শরীক করি না। তুমি যখন বাগিচার ভিতর প্রবেশ করেছিলে, তখন তুমি مَاشَاءَ اللّٰهُ لَاقُوَّةَ اِلَّابِاللّٰهِ কেন বললেন? তোমার তুলনায় যদিও আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি কম দেখতেছো, কিন্তু খুব দূরের কথা নয় যে, আমার প্রভু আমাকে তোমার বাগানের চেয়ে খুব ভালো সুজলা-সুফলা বাগান দান করতে পারেন। আর তোমার বাগানের উপর দিয়ে তিনি আসমান থেকে কোন বালা মুসিবৎ নাযিল করে তাকে পরিষ্কার ময়দানে পরিণত করে দেন

১. অর্থাৎ আল্লার যা কিছু মর্জি হবে, বাস্তবে তাই ঘটবে ও হবে। আমার বা কাহারো তার উপর কোন শক্তি নেই। আমাদের যদি কোন কিছু করণীয় থাকে, তবে তা একমাত্র আল্লাহ তা'লার তাওফীক দানে হতে পারে

অথবা তার পানি যদি বাগানে জমে যায়, তবে তা বের করার ক্ষমতা কখনোই হবে না। পরিশেষে তার বাগানের ফল-ফলাদি সমূলে বিনষ্ট হয়ে গেল এবং সে তার আঙ্গুরগুলি ঝাকার উপর বিবর্তন অবস্থায় অবলোকন করে স্বীয় কর্মফলের জন্য মাথায় হাত মেরে বলতে লাগলো– হায়! আমি যদি আমার প্রভুর

সাথে কাহাকেও শরীক না করতাম। এখন আর বায়ু আল্লাহর আদেশ লজ্ঘন করে তার ক্ষেতে না পারে সাহায্য করতে। আর সে নিজে না পারে এহেন মহাসঙ্কটের মুকাবিলা করতে।" (সূরা কাহাফ-৩-৪৩)

অনুরূপ মর্দে মূমিনের স্বীয় ঈমান ও প্রত্যয়কেই ইজ্জত-সম্মানের মূল উৎস মনে করা এবং তার সেই সকল পার্থিব উপাদান ও মূল্যবোধ সমূহকে কিছু মনে না করা। উক্ত আয়াতে প্রথম কথোপকথনকারী ব্যক্তি স্বীয় ধন-সম্পদকেই ইজ্জত-সম্মানের মূল উপাদান ও চাবিকাঠি মনে করে নিয়েছিল, এখন আমাদের নিকট বিষয়টি পরিষ্কার রূপে প্রতিভাত হলো।

উপররোক্ত উদাহরণটিতে একটি দৃষ্টি আকর্ষণীয় দিক হলো যে, বাগানকে যিনি স্বীয় মান মর্যাদার মূল বস্তু মনে করছিল, তিনি প্রকাশ্যে ও নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় আল্লাহর সাথে শিরিক করার কথা প্রকাশ করেনি। তথাপিও কুরআনে করীম তাকে মুশরিক নামে অভিহিত করে তার থেকে শিরিক করার অপরাধের স্বীকারোক্তি নিয়েছে। আসল ব্যাপার হলো যে উক্ত ব্যক্তি নিছক একটি জড়ধর্মী উপাদান তথা একটি পার্থিব বস্তুকেই স্বীয় মান-সম্মানের মূলকেন্দ্র মনে করে আল্লাহর সাথে শিরিক করেছিল। তাকে স্বীয় ধ্যান-ধারণা ও মন-মগজে সেই মর্যাদার স্থানই দিয়েছিল, যা হলো একমাত্র আল্লাহর জন্য বিশেষরূপে নিবদ্ধ। তিনি ব্যতীত তা আর কাহারো জন্য নয়; অথচ প্রকৃত মুমিন ব্যক্তিদের জন্য এমনটি করা আদৌ সম্ভব নয়। আর তাঁরা কোন বস্তুকে আল্লাহর সাথে অংশীদারও করতে পারে না।

পবিত্র কুরআন মজীদে বর্ণিত কারুনের ঘটনার মধ্যে ধন-সম্পদের বিষয় দুটি পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন চিন্তাধারার ধারক ও বাহক মানুষের মনোবৃত্তি ও ধ্যান-ধারণার রূপরেখা অংকিত হয়েছে। একটি রূপরেখা হলো সেই সকল মানুষের- যাদের চক্ষুকে এ সকল পার্থিব বস্তু নিয়ে ও উপাদানবলী ঝল্সিয়ে দিয়ে অন্ধ বানায়। আর তারা নীচুতা-হীনতার মনোবৃত্তির অন্ধকারময় কুয়ার মধ্যে নিপতিত হয়ে ধনাঢ্য ব্যক্তি ও সম্পদশালীদের সামনে নিজেকে দুর্বল ও নীচু মনে করে। আর ঐ সকল ব্যক্তিদের জন্য হলো দ্বিতীয় রূপরেখাটি, যাদের ভিতর সর্বদা উজ্জীবিত রয়েছে, শক্তি, সাহস, ইজ্জ্বত-সম্মান মহত্ব ও গাম্ভীর্য্যের চেতনাবোধ। যারা কোথাও নিজেদেরকে দুর্বল অনুভব করে না- আর হয় না তারা নীচুতা ও হীনতাবোধের শিকারের পরিণত। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ
وَاٰتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوا
بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ٥ وَابْتَغِ فِيمَا اٰتٰكَ اللَّهُ الدَّارَ
الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ـ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٥ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ
عِلْمٍ عِنْدِي ـ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ
مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ـ
وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ٥ فَخَرَجَ عَلَىٰ
قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ـ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيٰوةَ
الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ
لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ٥ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ
ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ج
وَلَا يُلَقّٰهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ٥ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ
الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ ٥ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ

تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ ـ لَوْلَا اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَاَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ ـ

“হজরত মুসা (আঃ)-এর কওমের মধ্যে কারূণ নামে এক ব্যক্তি ছিল। কিন্তু সর্বদা সে হযরত মুসা (আঃ)-এর মত, পথ ও কথার বিরুদ্ধাচরণ করে চলতো। তাকে আমি বেশী ধন-সম্পদ দান করে এমন ঐশ্বর্যশালী করেছিলাম, যে তার ধন-সম্পদের ভাণ্ডারের চাবিগুলো এক বহর শক্তিশালী উটের পক্ষে বহন করা খুবই কঠিন ছিল। তার সমগোত্রীয় লোকেরা যখন তাকে বললো ওহে। তুমি ধন-সম্পদ পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে মেতে যেও না। তোমাকে আল্লাহ তায়ালা যে ধন-সম্পদ দান করেছেন, তা দ্বারা পরকালের পথকে কন্টক মুক্ত করে সেখানে সুখে থাকার ব্যবস্থা করো। আর পার্থিব জগতের বেলাও স্বীয় অংশের কথা ভুলে যেও না। আল্লাহ তায়ালা যেরূপ তোমার প্রতি সদয় হয়ে অনুগ্রহ করেছেন, অনুরূপ তুমিও মানুষের উপর সদয় হয়ে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করো। আর আল্লাহর যমীনের উপর বসে ঝগড়া ফাসাদ করাতো দূরের কথা তার কামনাও করো না। কারণ ঝগড়া-ফাসাদকারীদেরকে আল্লাহ তায়ালা কখনোই ভালবাসেন না। কারূণ তাদের জবাবে বললো—এ ধন-সম্পদ আমার জ্ঞান-বুদ্ধি ও হুনার হেকমত দ্বারা অর্জন হয়েছে! কারূণের কি এ কথা অবগত নেই যে, তার চেয়ে বহুলাংশে বেশী ধন-সম্পদশালী এবং পরিসংখ্যানের দিক দিয়েও অনেক বেশী সৌভাগ্যের অধিকারী এমন সব জাতিকে আমি সমূলে ধ্বংস করে বিলীন করে দিয়েছি? কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশ তো দুরের কথা এমন সব অপরাধীদের নিকট কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদও করা হবে না। কারুন যখন রাজকীয় ফ্যাসনে খুব আড়ম্বরের সাথে নিজ সম্প্রদায়ের লোকের সামনে উপস্থিত হলো, তখন তার আড়ম্বরপুর্ণ রাজকীয় ফ্যাসন দেখে ধন-সম্পদ লিপ্সু দুনিয়াদার ব্যক্তিরা বলে উঠলো— ওহে! কারূণের ন্যায় আমরাও যদি সহায় সম্পদের অধিকারী হতাম, তবে কতই না সৌভাগ্যের কথা ছিল। সত্যই কারূণ খুবই ভাগ্যবান ব্যক্তি। আর তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী ছিল, তারা বলল— ওরে হতভাগারা!

ঈমানদার ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত পরকালের প্রতিদানই হলো কল্যাণময় ও উত্তম বস্তু। পার্থিব ধন-সম্পদ তার তুলনায় কিছুই নয়। অবশ্য যারা এ জগতে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করে তা তাঁদেরই হস্তগত হবে। সুতরাং আমি কারূণকে তার সমুদয় বাড়ী গাড়ী ও মাল মালিয়াত সমেত মাটির নিচে ধ্বসিয়ে দিয়েছি। তখন আল্লাহর আযাব থেকে রেহাই দেবার জন্য না ছিল কোন সম্প্রদায়ের লোকজন, যারা তার উপকারে আসতে পারে, আর না করতে পেরেছিল অন্য কোথাও থেকে সাহায্য গ্রহণ। বিগত দিন যারা কারূণের ন্যায় ধনাঢ্য ব্যক্তি হবার আশা প্রকাশ করেছিল, আজ তারা বলতে লাগলো– আহা! আল্লাহ তায়ালা যাকে তার বান্দাদের মধ্যে উপযুক্ত মনে করেন, কেবল তাকেই রিযিকের বেলায় প্রাচুর্য্য দান করেন। আর যাকে দারিদ্র্যতার মধ্যে পতিত হওয়া সঠিক মনে করেন, তাকে তার মধ্যেই রেখে দেন। আল্লাহ তায়ালা যদি আমাদের প্রতি মেহেরবানী না করতেন, তবে আমরাও তার ন্যায় মাটির নিচে বিলীন হয়ে যেতাম। আহ! যারা আল্লাহদ্রোহী কাফেরদের ন্যায় চাল-চলন করে তাদের পরিণতি এ হয় যে, তারা আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি পায় না।" (সূরা আল কাসাস–৭৬-৯২)

ইস্‌লামের এ মতাবাদ ও চিন্তাধারার বিভিন্ন প্রকার তাৎপর্যপূর্ণ এমন ব্যাখ্যা ও শাখা-প্রশাখা রয়েছে, যা বাস্তবিক পক্ষে মানব জীবনের জন্য মুক্তি সনদ স্বরূপ। সুতরাং এ বিষয়গুলোর একটি দিক হচ্ছে এই যে আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম তার প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-কে জাগতিক বিষয় ও ধন-সম্পদ, যা হচ্ছে কতিপয় লোকের জন্য আনন্দ স্ফুর্তি ও গর্বের সামগ্রী, তাকে মান-সম্মান ও পদ মর্যাদার উৎসমূল এবং বাহক নিরূপণ করতে পরিষ্কারভাবে নিষেধ করেছেন! কারণ আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্যই তা দান করেন। পবিত্র কুরআন মজীদে এ বিষয় ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ
زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ
خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۝

"আমি দুনিয়াদার লোকদেরকে যে বিভিন্ন প্রকার ধন-সম্পদ ও বিষয় সম্পত্তি দান করেছি, তার পানে আপনি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। তা পার্থিব

জীবনের শোভাও চাকচিক্য বৈ আর কিছু নয়। এর দ্বারা আমি তাদেরকে পরীক্ষা করি। আপনার প্রতিপালকের নিকট যে রিযিক রয়েছে, তা তার চেয়ে খুবই মূল্যবান ও স্থায়ী সম্পদ–" (সূরা তোহা–১৩১)

আমাদের সমাজের কতিপয় লোক মনে করে যে, কুরআনে করীমের এ আয়াতটি এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াত সমূহ দ্বীন দারিদ্রদেরকে স্বীয় আর্থিক অবস্থার উপর তুষ্ট থাকার নিমিত্ত এবং রাজা-বাদশাহ ও আমীর ওমারাহ মন্ত্রী মিনিষ্টারদেরকে তাদের ধন-দৌলত ও বিশাল জীবিকা সামগ্রির মধ্যে নিমগ্ন থাকার আহ্বান জানায়। তাদের এ ব্যাখ্যা পরিস্কার রূপে যে ভুল ব্যাখ্যা, তাতে আদৌ সন্দেহ নেই। এ ব্যাখ্যা ইস্‌লামের মূলগত বিষয় বস্তু ও প্রান্তিক ভাবধারার সাথে আদৌ কোন সম্পর্ক রাখে না। এ ব্যাখ্যা হলো সেই সকল পেশাদারী দ্বীনদার ফরাজীদের মনগড়া ব্যাখ্যা, যাদের উদ্দেশ্য হলো সাম্রাজ্যবাদ ও ডিক্‌টেটরী শাসনামলে সাধারণ মানুষের অনুভূতি ও চেতনাবোধকে চিরতরে নির্জীব ও মুরদা করে দিয়ে তাদেরকে সমাজ জীবনে ইন্‌সাফ ও সুবিচার লাভের দাবী থেকে নিবারণ করে রাখা। তাদের অপরাধের প্রতিফল তারাই ভোগ করবে! ইসলাম তাদের এ মন গড় ব্যাখ্যা থেকে সুম্পূর্ণ মুক্ত। কুরআনে করীমের এ আয়াত এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াত সমূহ মানুষের হারানো মর্যাদা তার যথাযোগ্য স্থানে ফিরিয়ে আনা এবং দ্বীন দরিদ্রদের অনুভূতি ও চেতনা-বোধকে সেই দুর্বলতা ও সাহসহীনতা থেকে মুক্ত রাখার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, যার মধ্যে তারা ধন-সম্পদের ন্যায় অন্যান্য জাগতিক বিষয়বস্তু ও উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিমগ্ন হয়। আমাদের এ ব্যাখ্যার সমর্থনে দেখতে পাচ্ছি যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি নবীকে এ সকল জাগতিক উপাদান ও বিষয়াবলীর প্রতি কোনরূপ গুরুত্ব না দেয়ার জন্য এবং তাকে মানদণ্ডের রূপ দিয়ে মানুষের পদ মর্যাদাকে নির্দিষ্ট না করার নিমিত্ত জোর তাগিদ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ
وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ -
تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا
قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا-

"আর আপনি স্বীয় অন্তরকে ঐ সকল লোকদের সাহচর্য গ্রহণ করে শান্ত রাখুন, যারা স্বীয় প্রভুর সান্নিধ্যের প্রার্থী হয়ে সকাল সন্ধ্যায় তাকে ডাকে। আর তাদের ধনাঢ্যদের প্রতি কখনো আপনি ভ্রুক্ষেপ করবেন না। আপনি কি পার্থিব জগতের চাকচিক্য ও আড়ম্বরকে পছন্দ করেন? আর আমি যাদের অন্তরকে আমার স্মরণের ব্যাপারে অলস বানিয়েছি এবং যারা নিজের মনের ইচ্ছা মতো চলে এবং যাদের কর্মনীতি চরম ও নরম আদর্শ বাদের ভিত্তির উপর নির্ভরশীল আপনি কখনো এমন লোকেরও আনুগত্য করবেন না।"

فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ - اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ
لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ
وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ٥

"তাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য দেখে আপনি যেন ধোকা ও প্রতারণার মধ্যে নিপতিত না হন। তাদেরকে এ পার্থিব জীবনে এ সকল বস্তুর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা কঠিন শাস্তির মধ্যে নিশ্চিতরূপে নিপতিত করতে চান। আর তাদের অন্তরে যদি নবচেতনা ও স্পন্দন দেয়া হয়, তাও হবে সত্যের অস্বীকারকারী– তথা কাফের অবস্থায়।" (সূরা তাওবা–৫৫)

রাসুলের করীম (সাঃ)-এর সাথে উম্মে মাকতুম নামীয় একজন অন্ধ পুরুষ আর সরদার অলীদ বিন মুগীরাকে নিয়ে যে ঘটনা হয়েছিল, এ ব্যাপারে তাও এখানে বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য। সেখানে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবীর আচরণের কঠোর প্রতিবাদ করেছিলেন। পবিত্র কুরআনে করীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

عَبَسَ وَتَوَلّٰى ٥ اَنْ جَاۤءَهُ الْاَعْمٰى ٥ وَمَا يُدْرِيْكَ
لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰى ٥ اَوْيَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ٥ اَمَّا مَنِ
اسْتَغْنٰى ٥ فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ٥ وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى
٥ وَاَمَّا مَنْ جَاۤئَكَ يَسْعٰى ٥ وَهُوَ يَخْشٰى ٥ فَاَنْتَ
عَنْهُ تَلَهّٰى ٥ كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ٥ فَمَنْ شَاۤءَ ذَكَرَهٗ ٥

"অন্ধ বৃদ্ধ আপনার নিকট আসলে পর আপনি তার থেকে ভ্রুকুঞ্চন করে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তার অন্তরের পরিচর্যা হতো কিনা অথবা সে নসীহত গ্রহণ করতো কিনা সে বিষয় কি আপনি অবগত আছেন? এ উপদেশ তার বেলায় উপকারীই প্রমাণিত হতো। আর যে গর্ব অহঙ্কার করে আপনি কেবল তার পিছনে পড়ে রয়েছেন। সে যদি আপনার কথায় কর্ণপাত না করে বা হেদায়াত না হয়, তবে তাতে আপনার কোনরূপ গুনাহ হবার আশংকা নেই। যে ব্যক্তি নিজে ইস্‌লামের কথা জানার জন্য আপনার নিকট কষ্ট স্বীকার করে এসেছে এবং যার অন্তরে পুরো আল্লাহর ভয়ভীতি নিহিত রয়েছে, তার বেলায় আপনার এ আচরণ ঠিক নয়;- এই হলো আমার নসীহত। সুতরাং যার ইচ্ছে "এ থেকে নসীহত গ্রহণ করতে পার।" (সূরা আবাসা-১-১২)

এ মুহূর্তটুকু ছিল প্রকৃতিগত মানবিক লোভ লালসা বিকাশের মুহূর্ত। যার প্রতিফলন আমরা রাসূলে করীম (সাঃ)-এর এ চিন্তাধারা ও আশা-আকাঙ্খার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে, তিনি আশা পোষণ করেছিলেন হয়ত যদি আল্লাহ তায়ালা কোন ভাবে অলীদকে ইসলামের প্রতি ঝুকিয়ে দিতেন। সুতরাং ইবনে উম্মে মাকতুম যখন কিছু কুরআনের তালীম গ্রহণের মনোভাব নিয়ে নবী করীম (সাঃ)-এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি অলীদের সাথে কথোপকথনের মধ্যে লিপ্ত ছিলেন। এ দিকে বৃদ্ধ নবী করীম (সাঃ)-কে ডাকতেছিল, আর নবী করীম (সাঃ) অলীদের সাথে কথোপকথনের মধ্যে লিপ্ত থাকাটাই ভাল মনে করলেন, এ সময় ডাকাডাকি করার কারণে তিনি মনে মনে খুব রাগান্বিত হলেন। এমন কি গোস্বায় অগ্নিশর্মা হয়ে তাঁর চেহারা মুবারক টক্‌টকে লাল হয়ে গিয়েছিল। তাঁর এ আচরণের জন্য আল্লাহ তায়ালা এমন কঠোর ভাষায় তাঁকে শাসালেন যে, তা ভীতি প্রদর্শনের চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। এর কারণ কি? যেহেতু যে সকল মূল্যবোধের উপর ইস্‌লামের মান-ইজ্জৎ, উন্নতি সমৃদ্ধি নির্ভরশীল এবং তা যাতে করে সত্যিকারের স্বীয় গুরুত্ব ও মর্যাদার সাথে পরিষ্কার হয় এবং আত্মার মুক্তি সাধনের ব্যাপারে তার উপযুক্ত নীতিপথ ও গতিধারা বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হয়, কেবল তার জন্যই এ ধমক। মানুষ বুজর্গী ও কারামত দ্বারা প্রভাবিত এবং তার পূজা পার্ব্বনের মরণ ফাঁদ থেকে খুব তাড়াতাড়িই মুক্তি লাভ করতে পারে। এক পর্যায় তারা মৃত্যু এবং অন্যান্য বিপদাপদ এবং দরিদ্রতা অপমান-লাঞ্ছনার ভয়ভীতি থেকেও আল্লাহর ইচ্ছায় মুক্তি অর্জন করতে পারে। কিন্তু নফসের জন্য স্বীয় গোলামীর জিঞ্জির

থেকে বাহির হওয়াটা তার পক্ষে খুবই কঠিন হয়। সে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বীয় আনন্দদায়ক উপায় উপাদান ও বাঞ্ছিত বস্তুর গোলামই থেকে যায়। স্বীয় বাসনা ও আকাঙ্খার অক্টোপাশের আবেষ্টনী থেকে আর সে বাহির হতে পারে না।

মানুষ বাহ্যিক দিক দিয়ে স্বাধীন হবার পরেও আভ্যন্তরীণ রিপুর আবেষ্টনী থেকে পুর্ণরূপে মুক্ত হতে পারে না। এমতাবস্থায় সে জ্ঞান অনুভূতি ও চেতনাবোধের সেই স্বাধীনতার পূর্ণস্তরে উপনীত হতে পারে না, যে পর্যন্ত ইস্‌লাম তাকে ও সামগ্রিক মানবিক সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য উপনীত করে দেয়ার প্রয়াসী।

ইস্‌লাম মানবাত্মা ও চেতনাবোধের মুক্তির জন্য এহেন গোপন অথচ মহাবিপদের অনিষ্টতা থেকে অনবহিত নয়। বরং তার প্রতি সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। ইস্‌লাম যে মানুষের অন্তর জগতকে সুসজ্জিত রাখার যথা বিহিত ব্যবস্থা করে এর প্রতি দৃষ্টি দানই হলো তার জ্বলন্ত প্রমাণ। এর দ্বারাই আমরা অনুমান করতে পারি যে, ইস্‌লাম মানব আত্মার সকল দিকগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে এবং তার ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত কতটুকু যত্নবান হয়। এ ব্যাপারে খ্রীস্টান ধর্ম যা কিছু অনুধাবন করে এবং সে যা নিজের শেষ মনযিল রূপে ঠিক করে নিয়েছে, তা সবই ইস্‌লামের সামনের বিদ্যামান।

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ
وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ناقْتَرَفْتُمُوْهَا
وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَا
اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ط وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ
فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ وَرَسُوْلَهُ (وَجِهَادٌ فِىْ
سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ) وَاللّٰهُ
لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ٥

"হে নবী! আপনি বলুন যে, আমি তোমাদের নিকট তোমাদের পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বন্ধু, পাড়া-প্রতিবেশী এবং যে ধন-সম্পদ তোমরা

অর্জন করেছ সে ধন-সম্পদ, আর যে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার তোমরা আশংকা কর– সেই ব্যবসা বাণিজ্য এবং যে থাকার স্থানগুলোকে খুব পছন্দ কর সেই প্রিয় স্থানগুলো, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল, এবং তার পথে চেষ্টা চরিত্র ও জেহাদ করার চেয়ে প্রিয় হলে তবে তোমরা আল্লাহর নির্দেশ (আযাব) আসা পর্যন্ত ক্ষাণিকটা সময় অপেক্ষা করো। মনে রেখ, আল্লাহ কখনো ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদোয়াতের পথ প্রদর্শন করেন না।" (সূরা তাওবা–২৪)

এখানে ইস্‌লাম এ স্বল্প পরিসরের আয়াতটুকুর মধ্যে পার্থিব জীবনের সকল প্রকার উপায়-উপাদান; প্রিয় ও আনন্দদায়ক বস্তুগুলোর কথা এক এক করে মোটামুটি রূপে উল্লেখ করেছে এবং মানব আত্মার সকল দুর্বল দিকগুলির প্রতিও আঙ্গুলী নির্দেশ করে নির্দিষ্টরূপে দেখিয়ে দিয়েছে। ইস্‌লাম এ সব জড়ধর্মী বস্তুগুলিকে পৃথক রূপে এক পাল্লায় এবং অপর পাল্লায় আল্লাহ রাসুলের মহব্বত এবং তাদের পথে চলার ও জেহাদ করার প্রেরণা এ জন্য রেখে দিয়েছে, যেন মানুষ উভয়কে ভাল রূপে অনুধাবন ও পরিমাপ করার পর ত্যাগ ও তিতিক্ষার পূর্ণতায় উপনীত হয়ে সাফল্যের উচ্চ সোপানে আরোহণ করতে পারে। আর মানবিক কুবৃত্তি নিচয়ের মরণ ফাঁদ থেকে পূর্ণরূপে চিরতরে মুক্তি পায়। ইস্‌লাম সেই "নাফস" বা আত্মারই দবীদার, যা এ সকল আবেষ্টনী থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত এবং করে এ সকল অবরোধের বেড়াজালকে ছিন্নবিচ্ছন্ন! আত্মা ও বিবেক যাতে করে নিতান্ত কম ও সাধারণ প্রয়োজনের উর্দ্ধে উঠে সব অবস্থাই আনন্দদায়ক উপায় উপকরণের পরিবর্তে সেই সকল বস্তুর পানে ধাবিত হয়, যা মহান ও অবিনশ্বর এবং তা যাতে করে নিজ নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। এমন রূপে ও ছাঁচে ঢালাই করে মানুষকে গঠন করার জন্যই ইসলাম মানুষের কাছে উদাত্ত আহ্বান জানায়। ইসলাম বলে ঃ

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ـ
ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ـ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ
الْمَاٰبِ ٥ قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ـ لِلَّذِيْنَ

تَقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ۝
وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ۝

"রমণীদের প্রতি মনের যৌন আবেগ অনুরাগ সন্তান-সন্ততি, রাশি রাশি স্বর্ণ রৌপ্য, উত্তম নির্বাচিত ঘোড়া, (বর্তমানে টেক্সি বাস ও অন্যান্য যানবাহন) গৃহ পালিত জীবন জন্তু এবং ফসলের ক্ষেত-খামার এগুলো হলো নাফ্সের আনন্দদায়ক বস্তু। এগুলো মানুষকে খুব খুশী খোশালিত ও আনন্দ মুখর করে। কিন্তু এগুলি হলো এ পার্থিক নশ্বর জীবনের গুটি কয়েক দিনের উপায়-উপকরণ বিশেষ! আসলে যা কিছু কল্যাণময়ী ও চিরস্থায়ী বস্তু তা রয়েছে আল্লাহর নিকট গচ্ছিত। হে নবী (সাঃ)! আপনি ওদের নিকট বলুন যে, আমি কি তোমাদেরকে সেই অবিনশ্বর ও কল্যাণময়ী বস্তু কোন্‌টি তা বলব? তা হচ্ছে যারা সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে তাকওয়ার আচরণ গ্রহণ করে তাঁদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট এমন সুসজ্জিত বাগিচা-যার তলদেশ থেকে দু'ধারায় প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা চিরন্তন রূপে জীবন-যাপন করবে। তাদের মনোরঞ্জনের জন্য এমন এমন অভূতপূর্ব সুন্দরী রমণীদেরকে তাদের সাথী করা হবে, যা জীবনে কস্মিনকালেও তারা দেখেনি। আর আল্লাহর সুভাশীষ ও রহমত দ্বারা তাদের তৃষ্ণাতুর হৃদয় হবে সিক্ত। আল্লাহ্ তায়ালা সর্বদা স্বীয় বান্দাদের মনের অবস্থা ও আচরণের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন!" (সূরা আলে ইমরাণ ১৪–১৫)

পবিত্র কুরআনে করীমের এ শিক্ষা ও আদর্শ একদিকে যেমন উদাসীনতার মধ্যে লিপ্ত রাখতে চেষ্টা করে না, তেমনি অপর দিকে পার্থিব জগতের কর্মময় জীবনকে পরিত্যাগ করে বৈরাগ্যবাদ গ্রহণ করতঃ পাক-পবিত্র বস্তু নিচয়কে বর্জন করতেও আহ্বান জানায় না। যেমন কতিপয় মুফাস্সির স্বীয় মনের গতি ধারামত তা বুঝেছে এবং ব্যাখ্যা করেছে। অথবা আমাদের বিরুদ্ধবাদীরাই ইস্লামের বদনাম করার জন্য তার মাথা মুণ্ডিয়ে দেয়। বরং এটা হলো স্বভাব প্রকৃতি এবং মানবিক বৃত্তি নিচয়ের লোলুপ কামনার দাসত্বের শৃংখল থেকে মুক্তি অর্জন করার আহ্বান। হা মানুষ যদি জীবন এবং তার স্বাদ ও আনন্দ গ্রহণের

উপায় উপকরণের দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ হবার পরিবর্তে তাদেরকে স্বীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে রেখে চলে, তবে তার থেকে উপকার ও লাভবান হওয়ায় কোনই অসুবিধা নেই। কুরআন মজীদে আল্লাহ বলেনঃ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِيْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ٥

"হে নবী! আপনি জিজ্ঞাস করুন যে, আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বান্দাদের জন্য যে উপায়-উপকরণ ও অলঙ্কারসমূহ সৃষ্টি করেছেন, তা এবং পানাহারের দ্রব্যাদির মধ্যে পাক-পবিত্র বস্তুগুলোকে কে হারাম করে দিয়েছে?" (সূরা আরাফ ৩২)

وَلَاتَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ٥

"জাগতিক জীবনে স্বীয় অংশ অর্জন করার কথা বিস্মৃত হয়ো না।" (সূরা কাসাস-৭৭)

এ ব্যাপারে আমরা এখানে ইস্‌লামের সিয়াম সাধনার কথা উল্লেখ করতে পারি। ধারাবাহিক কিছু দিন "নাফ্‌স" স্বভাবের প্রকট চাহিদা ও কামনা এবং তার মৌলিক প্রয়োজন থেকে বিরত থেক ঐ সবের উর্দ্ধে উঠে কাল যাপন করতে হয়। ফলে তার ঐচ্ছিক শক্তি অধিক পরিমাণে সাবলীলতা লাভ করে অনেক উর্দ্ধে উঠে। এরূপ স্বীয় প্রয়োজনের উর্দ্ধে উঠার পর এ নফসকে সাথে করে নিয়েই স্বীয় সত্তার থেকেও মানুষ অনেক উচ্চ স্তরে আরোহণ করে।

ইস্‌লাম এহেন মহান উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করেছে! আর সেই সকল পন্থার মধ্যে একটি পথ হলো ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির বিপদ থেকে এড়িয়ে থাকার শিক্ষা। পবিত্র কালামে মজীদে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ٥

"তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি আসলে তোমাদেরকে পরীক্ষা করার উপরকরণ বিশেষ।" (সূরা তাগাবুন-১৫)

ধন-সম্পদের প্রতি মনের আকর্ষণ অনুরাগ্ এবং এ ব্যাপারে স্বীয় প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতার আনুগত্যের মধ্যে যে মহা বিপদ ও সঙ্কট নিহিত রয়েছে– সে সম্পর্কে যেমন ইস্‌লাম মানুষকে সজাগ করে, অনুরূপ তার ক্ষয়ক্ষতি থেকে নিজকে বাঁচিয়ে রাখারও পরামর্শ ও প্রেরণা দেয়। একাধিকবার এও দেখা যায় যে,

ধন-সম্পদের মধ্যে গভীরভাবে লিপ্ত থাকার পথে মহা বিপদের এমন ভয়ঙ্কর আক্রমণে নিপতিত হয়, যার দরুন সে এমন সব জিনিস গ্রহণ করে, যা সে অন্যান্য সময় করতো না। আর অনুরূপ এত নীচ ও হেয় হয়ে যেতে থাকে, যা অন্য কোন সময় করতে আদৌ সম্মত হতো না। আর তার থেকে অন্যান্য সময় যে সকল কাজ-কর্ম প্রকাশ হত না তখন সেই সব অবাঞ্ছিত কাজ তার থেকে প্রকাশ পায়। একদিন রাসুলে করীম (সাঃ) স্বীয় আদরের দুলাল নাতীদ্বয়ের একজনকে নিয়ে বাহিরে বেড়াতে বেড়াতে তাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ

إِنَّكُمْ لَتُبَخِّلُوْنَ وَتُجَبِّنُوْنَ وَتُجَهِّلُوْنَ

"তোমরা মানুষকে কৃপণ, ভীরু, ও কাপুরুষ বলাও এবং নিপতিত করো জাহেলিয়াতের ঘনঘোর তিমির আঁধারে!" (তিরমিযী)

যে সব বস্তু মানুষের মান সম্মান ও ইজ্জতকে ধ্বংস করার জন্য প্রকাশ্য রূপে আক্রমণ চালায় তার খপ্পর থেকে যদিও মানুষ মুক্তি অর্জন করে, কিন্তু কখনো কখনো মানুষের তার আবার প্রয়োজনও দেখা দেয়। কখনো এমনো হয় যে, একমুটো খাবার জন্য পরের নিকট মুখাপেক্ষী হতে হয়। আর এখানে এসেই হয় সে লাঞ্ছিত অপমানিত। কারণ মানুষকে মান হানিকর কাজের দিকে ধাবিত করার জন্য তাদের প্রয়োজনই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ক্ষুধাতুর মানুষের মন-মগজে কখনো মূল্যবান নসীহত ও দার্শনিক কথা প্রবেশ করে না! তা কেবল পাগলের প্রলাপেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মানুষ যখন অপরের দুয়ারে ভিক্ষার জন্য হাত বাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয় তখনই তার এহেন ভূমিকা তার ব্যক্তিগত মান-মর্যাদাকে ধুলিসাত করে দেয়। এ ব্যাপারে ইস্‌লাম সকলের আগে সামনে অগ্রসর হয়ে তার কর্তব্য নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে! সে আসল সমস্যাকে নিজ দায়িত্বে নিয়ে একদিকে দুঃখ দৈন্য সৃষ্টির পথ চিরতরে বন্ধ হয় সে জন্য আইন রচনা করে সমস্যার সমাধান করে। অপর দিকে যদি অশ্লীল ও দুশ্চরিত্রমূলক কোন কিছু প্রকাশ পায়, তবে তারও অদপতন হয়। সুতরাং ইস্‌লাম জাতির সামর্থ্যবান লোকের প্রতি এবং রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির সমুচিত অধিকার আবশ্যিক রূপে নির্ধারণ করে দিয়েছে। তা আদায় করা ও রক্ষা করাকে এমন কঠোর কর্তব্য নির্ধারণ করেছে, যার বিরুদ্ধবাদী ও বর্জনকারীদের সাথে এ পার্থিব জগতে দিয়েছে সে কঠোর সংগ্রামের ঘোষণা। আর পরকালের জন্য রেখে দিয়েছে কঠোরতম শাস্তি।

(বিস্তারিত বিবরণ সামনে ইসলামের অর্থনৈতিক কার্য্যক্রমের অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

আবার ইস্‌লাম ব্যক্তিকে ভিক্ষার হাত সামনে সম্প্রসারিত করার জন্য জারি করেছে চরম নিষেধাজ্ঞা। সুতরাং কুরআনে করীমে মুসলমানদের এমন একটি সম্প্রদায়ের ভুয়সী প্রশংসা করা হয়েছে যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে কর্মব্যস্ত থাকে যে, তারা হেঁটে হেঁটে রুজী রোজগার করে না। বলা হয়েছে ঃ

لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا (মানুষের নিকট কাকুতি মিনতি করে ভিক্ষা চাহে না।") রাসুলে করীম (সাঃ)-এর নিকট যদি ভিক্ষা চেয়ে হাত বাড়ানো হতো, তবে তিনি তার রিক্ত হস্তে একটি দিরহাম দিয়ে তাকে বলতেন যে, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি ধৈর্য ধারণ করে স্বীয় লালসার লাগামকে সংকুচিত করে রাখতো, আর বনে গিয়ে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতঃ তা পিঠে বইয়ে এনে বাজারে বিক্রয় দিয়ে তার লব্ধ অর্থ দ্বারা স্বীয় জীবিকা ও সংসার নির্বাহ করতো, তবে আল্লাহ তায়ালা এর মধ্যেই তার মান ইজ্জতকে অক্ষুন্ন অবস্থায় বহাল রাখতেন। মানুষের নিকট মান সম্মানকে পদদলিত করে ভিক্ষার হাত সম্প্রসারিত করা এবং যদি মানুষের মনে চায় তবে তাকে কিছু দিয়ে বিদায় করবে অথবা কিছু দিবে না; এর চেয়ে এ ব্যবস্থা কতই না উত্তম পথ? (বুখারী মুসলিম) অন্য একটি হাদীসে তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِالسُّفْلٰى (উপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম। অর্থাৎ ভিক্ষা না করার হাত ভিক্ষা করার হাতের চেয়ে অধিকতর উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম) এ ছাড়া নবী করীম (সাঃ) ধন-সম্পদ আয়ের লজ্জাস্কর পথ থেকে দূরে থাকার জন্যও কঠোর রূপ তাগিদ করেছেন! কারণ ভিক্ষা বৃত্তি ইসলামের দৃষ্টিতে একটি লজ্জাজনক খারাপ বৃত্তি, যা শুধু সে বিশেষতম কঠোর প্রয়োজন মুহূর্ত ছাড়া বৈধ করে না। এখন আসা যাক যাকাতের আলোচনায়। ইস্‌লামের দৃষ্টিতে যাকাত হলো একটি আইনগত পাওনা ও অধিকার। এটা যেমন নয় দানের বস্তু, তেমনি নয় বদান্যতার বস্তু। এটা সর্ব অবস্থায়ই আদায় করতে হয়। কিন্তু দান ও বদান্যতার বেলায় এর ব্যতিক্রম হয়। পবিত্র কলামে মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

"তাদের ধন-সম্পদে ভিক্ষুক ও বঞ্চিত ব্যক্তিদের জন্য একটি নির্ধারিত অংশ রয়েছে।" (সূরা আয্‌য়ারীয়াত–১৯)

এ যাকাতের বিধান হলো প্রত্যেকটি নাগরিকের জন্য এমন আবশ্যিক পালনীয় বিধান, যা রাষ্ট্র আদায় করে মুসলমানদের পার্থিব প্রয়োজন পুরণ, তাদের মান সম্মান স্বকীয়তা এবং তাদের মন অন্তর অনুভূতি ও চেতনাবোধের পবিত্রতার ও উৎকর্ষতার রক্ষণাবেক্ষণ ও নিশ্চয়তা দান-এক কথায় তাদের সমুদয় স্বার্থ ও কল্যাণের জন্য ব্যয় করে। তাদের এ সকল কাজের জন্য যদি যাকাতের সম্পদ যথেষ্ট না হয়, তবে সামর্থবান ধনী শ্রেণীদের নিকট থেকে একটি সীমারেখা পর্যন্ত ট্যাক্স আদায় করে তা দ্বারা দুর্বল গরীব ও প্রয়োজনশীল অভাবী লোকদের প্রয়োজন পুরণার্থে ব্যয় করে। (বিস্তারিত বিবরণ সামনে দ্রষ্টব্য)

মুদ্দাকথা হলো যে, ইস্‌লাম ব্যবহারিক জীবনের প্রতিটি দিকের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে আইন বিধান রচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করে। মানবিক জ্ঞান অনুভূতি ও চেতনাবোধকে এমন পুর্ণ আযাদীর নিশ্চয়তা দেয়, যা শুধু ধ্যান-ধারণা ও দার্শনিক মূল্যবোধের উপরই যেমন নির্ভরশীল নয়, তেমনি নয় তা একমাত্র অর্থনৈতিক ও পার্থিব কার্যক্রমের উপর। বরং তা একই সময় উভয় প্রকার মৌলিক বুনিয়াদের উপর নির্ভরশীল হয়।

সে জীবনের বাস্তব সত্যাবলী ও মানব-সত্তার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার শক্তি এ উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখে। সে একদিকে যেমন মানুষের পবিত্রতম গতিধারাকে অনুপ্রাণিত করে। তেমনি উজ্জীবিত করে তাদের মূল্যবান যোগ্যতাবলী শক্তি ও ক্ষমতাসমূহকে। পরিশেষে সে তাকে জ্ঞান অনুভুতি ও চেতনাবোধের পূর্ণ ও অবিমিশ্রিত স্বাধীনতার দ্বারদেশে উপনীত করে দেয়। কেননা পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতিরেকে সে কখনো দুর্বলতা ও হীন অনুভূতি এবং দাসত্ব মনোবৃত্তির কবল থেকে মুক্তি অর্জন করতে পারে না। যেমন পারে না সে সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায় ও বিচার থেকে স্বীয় অংশ আদায় করে নিতে, তেমনি পারে না সে তা পাওয়ার পরে স্বীয় শক্তি ও শ্রম ব্যয় করে স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যকে চূড়ান্তরূপে সম্পাদন করতে।

ইস্‌লামের সামাজিক ইনসাফ ও সুবিচারের সৌধ-ইমারত যে সকল মৌলিক বুনিয়ানের উপর সুপ্রতিষ্ঠিতঃ– তার মধ্যে এহেন স্বাধীনতা অর্জন হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ অন্যতম বুনিয়াদ–বরং একেই আমরা একমাত্র মৌলিক ভিত্তি বলতে পারি। কারণ এর উপরই অন্যান্য ভিত্তিগুলি প্রতিষ্ঠিত।

মানবিক সাম্য

ইতিপূর্বের আলোচনা দ্বারা আমরা সত্যিকারের সাম্যের মৌলিক উপাদানাবলী এক এক করে গুণে একত্র করেছি। এখন মানুষের আত্ম চেতনাবোধ ও দাসত্ব মনোবৃত্তির মিশ্র দ্রব্যের কবল থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। মানুষ দারিদ্রতার অভিশাপ দুঃখ-কষ্ট অপমান এবং মৃত্যুর সংশয় থেকে এ ধারণা-জ্ঞান নিয়ে নিশ্চিত হয়েছে যে কোন কাজই আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া হয় না। সে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের শক্তি সমূহের নির্যাতনের যাতাকলের নিষ্পেষণ থেকে যেমন বেড়িয়ে এসেছে, তেমনি মানুষের দুয়ারে ভিক্ষার হাত সম্প্রসারিত করার অপমানজনক কাজ থেকে ও নিষ্কৃতি লাভ করেছে। সে স্বীয় মানবিক বৃত্তিনিচয়ের বেড়াজাল ছিন্ন করে সেই মহান একত্ববাদের দাবিদার এক মাত্র স্রষ্টার পানে মনোনিবেশ করেছে– যার পানে দাস মনিব সবই মাথাবনত করে। এ সব বিষয়ের ক্রমানুমিক পর্যায় প্রতিটি দিকের এবং জীবনের আবশ্যকীয় উপকরণ প্রত্যেক ব্যক্তির আয়ত্তাধীনে এসেছে এবং সত্যিকার সাম্যবাদের মৌলিক উপাদানাবলী সংগ্রহ হয়ে সাম্যবাদ যখন মানুষের দেহের প্রতিটি শিরা উপশিরার ও ধমনির সাথে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছে, তখন আর মানব আত্মার সাম্যবাদের আওয়াজ বুলন্দ করার প্রয়োজন করে না। কারণ এহেন স্বভাব প্রকৃতি সৃষ্টি হয়ে যাবার পর সে এখন সেই সকল স্বাতন্ত্র মর্যাদাবোধের অস্তিত্বকে স্বীকার করতে আদৌ সম্মত হবে না– যা শুধু সামাজিকতা ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সাম্যবাদের এহেন ধ্যাণ-ধারণা জ্ঞাত হয়ে এখন সে স্বীয় অধিকার আদায়ের সংগ্রাম নিয়ে মাথা উত্তোলন করে দাঁড়াবে। আর যখন সে এ অধিকার অর্জন করবে তখন সে তার রক্ষণাবেক্ষণের বেলায় কোনরূপ কসরত করবে না। তার এ অধিকারকে সে মনে-প্রাণে ভালবাসবে এবং সেই তাকে বহাল রাখার নিমিত্ত দুঃখ-কষ্ট ত্যাগ-তিতিক্ষা হাসিমুখে বরণ করবে। আর তার এ অধিকারকে হরণ করার জন্য যদি কোনরূপ আক্রমণ হয়, তবে সর্বশক্তি নিয়োগ করে তার প্রতিরোধের জন্য সংগ্রামের ময়দানে হবে সে অবতীর্ণ।

সাম্যাবাদের এ রূপরেখা ও ধ্যান-ধারণা প্রতিটি মানব মনকে আলোড়িত করে সেখানে যেমন স্বীয় বাসস্থান গড়ে নেয় , তেমনি তার পৃষ্ঠদেশে প্রত্যেক ব্যক্তি পাবে মৌলিক প্রয়োজন পূর্ণ হবার আইনগত নিশ্চয়তা। এ জন্যই তার

প্রার্থী শুধু কেবল দুর্বল ও দরিদ্রশ্রেণী লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং সেই সকল সম্পদশালী বিত্তবানরাও তার প্রার্থীর তালিকায় সাগ্রহে নামে লিখাবে, যাদের অন্তর হয়েছে ইস্‌লামী শিক্ষা ও তালীমের জ্যাতির্ময় নুরানী আলোক আভায় উদ্ভাসিত। এর বাস্তব চিত্রটি আমরা আজ অবলোকন করতেছি চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে ইস্‌লামী সমাজের খাঁজে খাঁজে।

এ বিধানাবলী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও মানব আত্মা স্বাধীনতার অর্ন্তভুক্ত থেকে যে জ্ঞান ও বুদ্ধি লাভ হয় ইসলাম তাকে যথেষ্ট মনে করেই চুপ করে বসে থাকে না। বরং বিষয়বস্তু যাতে করে সুস্পষ্ট রূপে সকলের নিকট পরিষ্কার হয় তার নিমিত্ত সে সাম্যবাদের মৌলিক নীতিমালাকে ভাষাগত ও আইনগত উভয় দিক দিয়েই বর্ণনা করে। এ পার্থিব জগতে যখন ইস্‌লাম তার দাওয়াতী কাজের আওয়াজ বুলন্দ করেছে, তখন মানুষ বিভিন্ন প্রকার কুসংস্কারের মধ্যে লিপ্ত ছিল। মানবতার তখন সাম্যবাদ তো দুরের কথা তার শব্দটির সাথেও পরিচয় ছিল না। কেহ কেহ দাবি করতো যে, তারা দেবতার বংশধর। এ দাবির পিছনে বেশ কিছু লোক সমর্থকও ছিল। আবার কেহ কেহ এ ধারণার মধ্যে নিপতিত ছিল যে, তাদের শরীরে প্রবাহমান শোণিত ধারা-সাধারণ মানুষের শোণিত ধারার মত নয়। বরং তাদের শরীরে নির্ভেজাল নিরঙ্কুশ ও রাজ রাজাদের রক্তধারা প্রবাহিত রয়েছে। আর এহেন অলীক ধারণা ও বিশ্বাসের কাছে একদল মানুষ শ্রদ্ধাভরে মাথা অবনত করতো। মানব জাতিকে বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায় বিভক্ত করে কোন শ্রেণীকে আল্লাহর মস্তক থেকে সৃষ্টি হবার ধারণা নিয়ে তাদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধার উচ্ছাসনে বসিয় কুর্নিশ করতো। আবার কোন শ্রেণীকে আল্লাহর পদযুগল থেকে সৃষ্টি;– এ ধারণা নিয়ে তাদেরকে সমাজের অস্পৃশ্য ও কুলাঙ্গার জাতি গণ্য করে লাঞ্ছনা বঞ্চনার নীচ ও হেয় জাতিতে পরিণত করতো। রমণীদের দেহে আত্মা রয়েছে বা নেই এই নিয়ে দু'দলের মধ্যে প্রচণ্ড তর্কবিতর্ক ও বাকযুদ্ধ চলতো। আর সমাজের প্রভু শ্রেণীদের জন্য তাদের দাস দাসীদেরকে মর্মান্তিক শাস্তি দেয়া বা হত্যা করাও সম্পূর্ণ বৈধ ছিল। কারণ স্বীয় প্রভূদের সাথে একটি অন্য ধরণের সম্বন্ধের আবেষ্টনীর মধ্যে তাদেরকে কয়েদ করে রাখা হতো বলেই তাদেরকে কঠিনতম শাস্তি দান বা হত্যা করাকে অপরাধ মনে করা হতো না। এহেন কুসংস্কার ও জাহেলীয়াতের তিমির আঁধারে ইসলাম জগতের বুকে নিয়ে এসেছে মানবতার নুরানী আলোক ছটা। শিক্ষা দিয়েছে তাদেরকে সাম্যবাদের নতুন সবক। সে জীবনের শুরুতে, শেষে এবং জীবন মৃত্যু। অধিকার ও কর্তব্যের

বেলায় আইন আদালতের সামনে, দুনিয়ায় এবং আখেরাতে আল্লাহর দরবারে এক কথায় সর্বদিক দিয়ে বিশ্বের সমগ্র মানব সন্তানকে সমান করে দিয়েছে। সে তদের মধ্যে কোনরূপ দেশগত ভাষাগত শ্রেণীগত বংশগত এবং বর্ণগত বৈষম্যের অবকাশ রাখেনি;– দেয়নি কাহাকেও সে কোন রূপ স্বাতন্ত্র্যতা। আর সে কৌলীন্যের মানদন্ড নিরূপণ করেছে সৎকর্মকে। মান-ইজ্জৎ-ভদ্রতা শিষ্টাচারিতা কৌলিন্য ও আভিজাত্য বলতে যদি কিছু থেকে থাকে, তা হচ্ছে শুধু কেবল ঐসকল ব্যক্তিদের জন্য যারা সৎকর্মশীল ও আল্লাহভীরু– পরহেজগার।

এহেন নীতিমালা মানবতার জন্য হলো একটি গর্বের বস্তু, যার নজীর দুনিয়ার অন্য কোন ইতিহাসে পাওয়া যায় না। আর এখনো সে এমন একটি পর্বত শৃঙ্গ, যার উচ্চতার কারণে মানুষ তাকে কখনো স্পর্শ করতে পারবে না। বরং এটা ছিল মানবতার পূর্ণজন্ম যার ভিতর জন্ম নিয়েছিল একজন মহা মানব। এটা ছিল সম্মান ও মর্যাদাবোধের সেই উচ্চাসন, যাকে মানবতা পরবর্তী কালে হারিয়ে ফেলেছে। এখন যদি দ্বিতীয়বার সে তার পূর্বের সম্মানিত আসনে সমাসীন হতে চায়, তবে তা একমাত্র আল্লাহর আইন ও বিধানের আলোক ছায়ায় জীবন ধারণের মাধ্যমেই সম্ভব। অন্য কোন মত পথ ও তন্ত্রের দ্বারা সম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালাকে কোন মানুষ জন্ম দিয়েছে এহেন ধারণা ও মতবাদ অলীক কথা ছাড়া কিছুই নয়। আল্লাহ তায়ালাকে কোন দিন কেহ যেমন জন্ম দেননি, তেমনি তিনিও কোন বংশের প্রতিষ্ঠাতা নয়। কুরআন মজীদের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা-ই এর জ্বলন্ত প্রমাণ। কুরআন বলে ঃ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ٥ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ٥ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ٥ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ٥

"হে নবী আপনি ঘোষণা করুন যে, আল্লাহ তায়ালা এক অদ্বিতীয় তার সত্তায় কোন অংশীদার নেই। আর তিনি কাহারো মুখাপেক্ষীও নন। তিনি যেমন কাহাকেও জন্ম দেননি, অনুরূপ তাঁকেও কেহ জন্ম দেন নি। আর দুনিয়ার জীবজগত ও বস্তুজগতের কোন কিছুই তার সমকক্ষ নয়।" (সূরা ইখলাস)

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ٥ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا ٥ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ

وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ٥ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ٥ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ٥ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا اٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ٥ لَقَدْ أَحْصٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ٥ وَكُلُّهُمْ اٰتِيهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ٥

–"তারা বলে দয়ালু আল্লাহ কাহাকেও নিজের পুত্র বানিয়ে নিয়েছে। তামাদের এ বিশ্বাস ও প্রত্যয় নিতান্ত বাতুল ও অলীক ছাড়া কিছুই নয়। মানুষ যে আল্লাহর প্রতি কাহাকেও পুত্র বানিয়ে নেয়ার মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে দিয়েছে; হয়ত অনতিবিলম্বে এর দরুন আসমান ফেটে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যমীনে ধ্বসে পড়বে; আর যমীন ফেটে চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে এবং বিশাল বিশাল পাহাড় সমুহ ধ্বংস হবে। কহাকেও পুত্র বানান এটা রাহমানুর রাহিমের শান ও মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সুতরাং আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সমুদয় বস্তুই আল্লাহর দাস ও বান্দারূপে হাজির হবে। (পুত্র বা আত্মীয় হিসেবে নয়। সমুদয় বস্তুই তার আবেষ্টনী সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত এবং সে তা এক এক করে তার হিসেবের খাতায় গণনা করে লিখে রেখেছেন। শেষ বিচারের দিন তারা নিজে নিজে স্বতন্ত্ররূপে তার সামনে হাজির হবে।" (সূরা মরিয়ম–৮৮-৯৫)

তারা যে স্বীয় ধমনীতে রাজ-রাজাদের রক্তধারা প্রবাহমান থাকার দাবী করেছে, সে দাবিও বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়। শাহী রক্ত আর সাধারণ রক্ত এ শ্রেণী বিভাগটি এবং কাহাকে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় মাথা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন কাহাকেও পা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। এসব ধারণাগুলোও গাজাখোরী ধারণা বৈ কি? পবিত্র কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

أَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ ٥ فَجَعَلْنٰهُ فِي قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ٥ إِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ٥ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ ٥

"আমি তোমাদের সকলকে কি নিতান্ত এক ফোটা অপবিত্র পানি দ্বারা সৃষ্টি করিনি? অতঃপর উক্ত পানি ফোটাকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দিয়েছি। তারপর আরো অধিক সময় তার জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছি। আমিই সত্যিকার রূপে সময়ের আসল নিয়ামক ও নির্ধারক– (সূরা মুরসেলাত–২১-২৩)

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ ٥ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ٥

"মানুষের গঠন প্রকৃতি কিরূপে হয়েছে সে বিষয় গভীর রূপে তাদের চিন্তা করা উচিত। তাদেরকে এমন এক অপবিত্র নিক্ষিপ্ত পানি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, যা পৃষ্ঠদেশের এবং মেরুদণ্ডের হাড় থেকে নির্গত হয়। (সূরা আত্‌তারেক ৫–৭)

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ـ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَاتَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ـ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَايُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ ـ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ٥

"আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে মাটির উপাদান দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর যৌন তরল ধাতু দ্বারা অবয়বকে চূড়ান্ত রূপ দান করেছেন। তারপর ক্রমানুকপর্যায় বংশ রক্ষার জন্য তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় নর-নারীরূপে তিনি সৃষ্টি করেছেন। কোন নারী তাঁর জ্ঞান ও অবগতি এবং নির্দেশ ছাড়া যেমন গর্ভধারণ করতে পারেনা, অনুরূপ গর্ভপাতও করতে পারে না। আর কোন জীবই আল্লাহর "লাওহে মাহফুজের" নির্ধারিত নিয়ম ব্যতীত বয়ঃসীমা কাটাতে পারে না। আর তার বয়সকে উক্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে ঘাটতি করে দেয়াও আদৌ সম্ভব নয়। যা কিছু হয়েছে তা লাওহে মাহফুজের খাতায় লিখিত বিধান অনুযায়ী হয়ে চলছে। এ সকল কার্যাবলী আল্লাহর জন্য করা মোটেই কঠিন নয় বরং সহজ।" (সূরা ফাতের–১১)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ ثُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ٥ ثُمَّ
جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ٥ ثُمَّ خَلَقْنَا
النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا
الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ
اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ-

"আমি মানুষকে মুলতঃ মাটির উপাদান দ্বারা সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাকে আমি নির্গত জলবিন্দুতে রূপান্তরিত করে একটি রক্ষিত স্থানে স্থানান্তরিত করেছি। তারপর উক্ত জল-বিন্দুকে জমাট রক্তে এবং রক্তকে মাংসপিণ্ডে রূপ দিয়ে তার হাড়ে রূপান্তরিত করে তা মাংস দ্বারা সজ্জিত করেছি। তারপর তাকে একটি ভিন্ন রূপ দান করে নবরূপে নবসাজে সৃষ্টি করেছি। সুতরাং আল্লাহ তা'য়ালা খুবই বরকতময় ও সমগ্র শিল্পীর চেয়ে শ্রেষ্ঠতম শিল্পী।" (সূরা মুমিমুন–১২-১৪)

কুরআন করীম তার এ দাওয়াতকে একবার নয় বহুবার আলোচনা করেছে যে বিশ্বের সমগ্র মানব জাতি একই মাটির উপাদান দ্বারা সৃষ্টি। পার্থক্য ব্যতিরেকে প্রতিটি লোকের জন্ম একবিন্দু অপবিত্র জলীয় পদার্থ দ্বারা। সমগ্র মানুষ একই মৌলিক উপাদান দ্বারা এবং একই নিয়মে সৃষ্টি ও লালিত-পালিত হবার মূলগত রহস্যভেদ ও হাকিকত যাতে করে সকলের মনে বদ্ধমূল হয়, সেই উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্তই বারবার এ আলোচনা। এ বিষয় নবী করীম (সাঃ) বিভিন্ন সময় তাঁর পবিত্র বাণীর ভিতর পরিষ্কার করে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন– তোমরা সকলে আদমের বংশধর এবং আদম ছিল মাটির তৈয়ারী।"

اَنْتُمْ بَنُوْا اٰدَمَ وَاٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ-

বস্তুতঃ এ কথা যেমন দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে গেল যে, কোন ব্যক্তি তার সত্তার দিকদিয়ে অন্য কোন ব্যক্তির থেকে শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করা নিছক আহম্মকী বৈকি? তাদের এ দাবি বাতুলতা বৈ কিছু নয়। এ দাবি হলো সেই জাহেলী যুগের শ্লোগান, যা বর্তমান বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগেও কোন কোন জাতির মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে।

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ٥

"হে মানুষ! তোমাদের সেই প্রতিপালককে ভয় করে চলো, যিনি তোমাদেরকে একটি জীবন থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর সেই জীবন থেকেই তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের এ দু'টি জীবন থেকেই সৃষ্টি করেছেন, –অগণিত নর-নারী এবং চতুর্দিক বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রেখে দিয়েছেন তাদেরকে।" (সূরা নিসায়া–)

একটি মাত্রই জীবন ছিল। আর অনুরূপই একজোড়া মানুষ ছিল। জগতের সমগ্র নর-নারী– এ দু'জন থেকে জন্ম লাভ করে তারা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়েছে। সমগ্র মানুষ একই বংশোদ্ভুত এবং সকল ব্যক্তি মানবিক বংশের দিকদিকে ভাইভাই ও একে অপরের সমান মর্যাদা বোধের অধিকারী।

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا – اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ٥

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে একই নর-নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তোমরা যাতে করে একে অপরকে জানতে পার, পরিচয় লাভ করতে পার, সে জন্য তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও বংশে বিভক্ত করে রেখেছি। তোমাদের মধ্যে তারাই আল্লাহতায়ালার সম্মানিত যারা আল্লাহভীরু ও পরহেজগার।" (সূরা হুজুরাত–১৩)

বিশ্ব মানবের মধ্যে জাতিগত ও বংশগত এহেন বিভিন্নতা-একে অন্যের প্রতি গর্ববোধ করা এবং একে অন্যের প্রতি কাদা ছোড়াছুড়ি করার জন্য নয়। এ বিভিন্নতার একমাত্র উদ্দেশ্য হলা পরস্পরের পরিচয় লাভের পথ সহজতর হওয়া এবং একে অন্যের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা। বিশ্বের সমগ্র জাতি ও বংশ আল্লাহর নিকট সমান! তাঁর নিকট বংশ ও জাতিগত প্রভেদ নেই। এককে যদি

অন্যের উপর মর্যাদা ও সম্মান করার কোন বিধান থেকে থাকে, তা হচ্ছে, তাক্ওয়া পরহেজগারী ও আল্লাহ ভীরুতার মাপকাঠি বিদ্যমান থাকার বিধান। এটি এমন একটি মানব অর্জিত প্রশংসনীয় গুণ, যার সাথে বংশীয় আভিজাত্যের কোন সম্পর্ক নেই। আর আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করা হলো তাক্ওয়া পরহেজগারী ও আল্লাহ ভীরুতারই প্রথম সোপান। সুতরাং মানব জীবনে যদি এ আনুগত্য বিদ্যমান না থাকে, তবে যেমন হবে না তাক্ওয়া, তেমনি হবে না কোনরূপ কল্যাণ।

বস্তুতঃ ইসলাম যে গোত্রীয়, বংশীয় ও সাম্প্রদায়িকতা ধার্মিকতা ও মতবাদের গোড়ামী থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এ সত্যটিকে অস্বীকার করবে কে? ইসলাম এ ব্যাপারে এতখানি মহান উদারতার উচ্চমার্গে আরোহণ করেছে, যেখানে পাশ্চাত্য সভ্যতা আজো এ চন্দ্র বিজয়ের যুগেও উপনীত হবার সৌভাগ্য লাভ করেনি। এ সভ্যতার জন্মভূমি আমেরিকা প্রকাশ্যে রেডইন্ডিয়ান বংশকে চিরতরে খতম করার সুপরিকল্পিত চেষ্টাকে তারা বৈধ মনে করতেছে। আর তারা শ্বেতাংগ ও কৃষ্ণকায় এ দুটি বর্ণ বিশিষ্ট জাতির মধ্যে হিংসাত্মক বৈষম্য ও পার্থক্যকে জীবন্ত রাখতে এবং কৃষাঙ্গদের সাথে পশু সুলভ আচরণ করাকে নিজেদের জাতীয় কর্তব্য বলে বৈধ মন করে। এ সভ্যতা দক্ষিণ আমেরিকায় সরকারের জন্য রংগীন গোত্রীয় ও বংশীয়দের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে স্বাতন্ত্র্যতা বহাল করণ ও পার্থক্য সুচিতকরণ আইন প্রণয়ন করাকে যেমন বৈধ স্বীকারোক্তি দিয়েছে; তেমনি ঘোষণা দিয়েছে তারা চীন, রাশিয়া ভারত আবিসিনিয়া ও সুগোশ্লাভিয়ার মুসলমানদেরকে হত্যা করার বৈধতা।

পার্থক্য জনিত আভিজাত্য যেখানে যে রূপ ও আকারে পাওয়া যায়, ইসলাম গোয়েন্দার ন্যায় তার পিছনে লেগে তাকে সমূলে খতম করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। কিন্তু সেই স্বাতন্ত্র্যতা ও আভিজাত্যবোধকে সে খতম করতে চায় না; যার মূলগত ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ ভীরুতা ও তাক্ওয়া পরহেজগারী। মনে করুন নবী করীম (সাঃ) ও কুরআনে করীম বারবার এ সত্যটির উপর বিশেষ জোর দিয়েছে যে, "তিনিও [নবী করীম (দঃ) অন্যান্য সমস্ত মানুষের ন্যায় একজন মানুষ।" এমনকি নবী করীম (সাঃ)-এর মুখ নিঃসৃত পবিত্র বাণীতে এ একই কথার প্রতিধ্বনি ঘোষিত হয়েছে। কেননা তিনি ছিলেন আল্লাহ প্রেরিত নবী এবং সমাজের নেতা। তার মহত্ব সম্মান ইজ্জত জাতির অন্তঃপুরকে দখল করে নিয়ে সেখানে গেড়েছিল চিরস্থায়ী আসন। সুতরাং তার এহেন স্বাতন্ত্র্যবোধের রূপটি জাতি পরিগ্রহণ করে নাকি এটাই ছিল সন্দেহের কারণ। আর এ সন্দেহের

বশবর্তী হয়েই তিনি জাতির কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছেন ঃ

لَاتُطْرُوْنِىْ كَمَا اَطْرَتِ النَّصَارِىْ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَاِنَّمَا اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ ٥

"আমার প্রতি ভালবাসার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করনে আমার প্রশংসার বেলায় মাত্রাতিরিক্ত কিছু করো না; যে রকম করেছে খ্রীস্টানরা হযরত ইসা (আঃ)-এর বেলায়। কেননা আমি শুধু তোমাদের ন্যায় একজন আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর প্রেরিত নবী বৈ কিছু নই।" (বুখারী)

কোন এক সময় একটি ক্ষুদ্র গণজমায়েতে নবী করমি (সাঃ) উপস্থিত হলে তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত লোকেরা উঠে দাঁড়ালো, তখন নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করলেন ঃ

مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّمْثُلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ ٥

"মানুষ তাকে সম্মান প্রদর্শন করনে দাঁড়িয়ে যাক্ এ কাজের যে ব্যক্তি খুশীবোধ করে, সে যেন স্বীয় বাসস্থান জাহান্নামে ঠিক করে নেয়।"

আর অনুরূপ এ সন্দেহটিও মনের কোনায় উদয় হয়েছিল যে হয়ত লোকেরা মুহম্মদ (সঃ)-এর পরিবারবর্গের লোকজনকে সীমা অতিক্রম করে আদব ইহ্তিরাম ও সম্মান প্রর্দশন করতে পারে। এ জন্য তিনি তাদেরকে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, যে, আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবার প্রাক্কালে তাদেরকে সাহায্যের জন্য সে দণ্ডায়মান হতে পারবে না।

يَامَعْشَرَ قُرَيْشٍ لَاَغْنِىْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَابَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ لَا اَغْنِىْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَاعَبَّاسَ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا اَغْنِىْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّتَهُ عَمَّتَهُ رَسُوْلُ (صلعم) لَا اَغْنِىْ عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ٥

"হে কুরাইশগণ! মনে রেখ! আল্লাহর দরবারে আমি তোমাদের কোন উপকারে আসব না। হে আবদে মনাফ! আমি আল্লাহর দরবারে তোমাদের কোন উপকার করতে পারবো না। হে আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব। আমার দ্বারা আল্লাহর দরবারে বসে তুমি কোন প্রকার সাহায্য সহানুভূতি পাবে না। –"হে আল্লার নবীর ফুফু আম্মা সুফিয়াহ! আমি আল্লাহর সামনে আপনার জন্য কোনরূপ উপকারে আসবো না। (বুখারী মুসলিম)

আর রাসুলে করীম (সাঃ)-এর জীবনে স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মানবিক লালসার প্রবৃত্তি উদ্বেলিত হয়ে যে সময়টি অতিবাহিত হয়ে ছিল, সে সময়টি ছিল, দরিদ্র উম্মে মাকতুমের কথার প্রতি কর্ণপাত না করে গোত্রীয় নেতা ওলীদ বিন মুগীরের সাথে কথোপ-কথনে লিপ্ত থাকা। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা নবী করীম (সাঃ)-কে যে কতখানি কঠোর ভাবে ধমক দিয়েছিলেন, ভাষার কর্কশতাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। এ ধমক তার প্রতি কেন ছিল এটা আমাদের জানবার বিষয়। সামাজিক ক্ষেত্রে যাতে করে সাধারণ রূপে সাম্যবাদ স্বীয় আসল মানদণ্ডের সাথে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে, সেই জন্যই ছিল নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি এহেন সর্তকবাণী। তৎকালীন যুগে কতিপয় সম্পদশালী উচ্চবংশীয় লোকেরা গরীব নর-নারীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনকে নিজেদের মান মর্যাদা হানিকর বলে মনে করতো। আর এ ধারনা অপনোদনের জন্যই আল্লাহ তায়ালা কুরআনে করীমে এ আয়াত নাযিল করেছেন ঃ

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ - اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ - وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

"তোমাদের মধ্যে যে সকল বিধবা রমণী এবং পূণ্যবান দাসদাসী রয়েছে, তাদের সাথে তোমাদের বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করো। তাঁরা যদি গরীব হয় (তবে নিরাশ হবার কোন কারণ নেই) আল্লাহ তায়লা স্বীয় অনুগ্রহ ও মেহেরবানী দ্বারা তাদেরকে ধনী করে দিবেন। আল্লাহ তায়ালা মহান জ্ঞানী ও বিপুল প্রাচুর্য্যের অধিকারী।" (সূরা নুর–৩২)

যতদুর সীমারেখা পর্যন্ত-এ দু'টি শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক বিজড়িত, ততদুর পর্যন্ত ইস্‌লাম রমণীদেরকে একটি শ্রেণী ও জাতি হিসেবে পুরুষ জাতির

সমপর্যায় গণ্য করে। সে যে সকল উৎকৃষ্টতা ও মর্যাদাবোধের উপর প্রকৃতিগত ক্ষমতা কর্মনিপুনতা এবং পারদর্শিতা উজ্জীবিত ও প্রাণবন্ত করে রেখেছে, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে জাতিগত ও বিভিন্ন বৈষম্যতার সাথে তার যে কোনরূপ সম্পর্ক নেই, তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। যেখানে প্রকৃতিগত ক্ষমতা যোগ্যতা ও কর্মনিপুনতা একই ধরনের হয়, সেখানে এ দু'টি শ্রেণীকে সমমর্যাদা দান করা হয়েছে। পার্থক্য শুধু সেইখানে এবং সেই সীমারেখা পর্যন্ত পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে থাকে, যেখানে তাদের মধ্য থেকে কোন বস্তু কোন একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা পর্যন্ত ভিন্ন থাকে। সুতরাং উভয় শ্রেণী যে, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে সমপর্যায়ভুক্ত তার প্রমাণ দিচ্ছে কুরআনে করীমের এ আয়াতগুলিঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَاُولٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ
نَقِيْرًا ۝

"যে সকল মুমিন মুসলিম সৎকর্মশীল ও পূর্ণবান হবে তারা নারী হোক বা পুরুষ হোক, তারা বেহেস্তে প্রবেশ করবে। তাদের পাওনা ও অধিকার-বিন্দু বিসর্গ পরিমাণ নস্যাৎ হবে না।" (সূরা নিসা-১২৪)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ
بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

-"আর যে মুমিন মুসলিমবর্গ তারা নর হোক বা নারী হোক যা হোক না কেন, যদি তারা সৎকর্মশীল ও পূণ্যবান হয়, তবে তাদেরকে আমি এ পার্থিব জগতে স্বসম্মানে সুস্থ সাবলীলতার সাথে জীবিত রাখবো এবং দান করবো তাদেরকে তাদের সৎকর্ম মাফিক যথাযোগ্য প্রতিদান।" (সূরা নহল-৯৭)

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَا اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ
مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى - بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ

"তাদের প্রভু জবাব দানে তাদেরকে বললেন– আমি তোমাদের ভিতর কাহারো কর্ম ধ্বংসকারী নই, চাই সে নারী বা পুরুষ হোক না কেন। তোমরা সকলে একে অপরের সমশ্রেণীভুক্ত। (সূরা আলে ইমরাণ–১৯৫)

এমনিভাবে মালিকানা স্বত্বের অধিকারী ও ধন-সম্পদ হস্তান্তর আইন সম্মত হবার দিক দিয়েও উভয় শ্রেণীই সমপর্যায়ভুক্ত। এ ব্যাপারে কুরআনের ভাষা হচ্ছে এই ঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ٥

–"পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিতে যেরূপ পুরুষদের ন্যায্য অংশ রয়েছে অনুরূপ ন্যায্য অংশ রয়েছে রমণীদের জন্যও পিতামাতা আত্মীয়গণের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে।" (সূরা নেসায়া–৭)

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ـ وَلِلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ٥

"পুরুষরা যা কিছু আয় উপার্জন করে, তৎ পরিমাণ অংশ রয়েছে তাদের জন্য (অনুরূপ) রমণীগণ যা কিছু আয় উপার্জন করে, তৎ পরিমাণ অংশ রয়েছে তাদের জন্য।" (সূরা নিসায়া–৩২)

এখন আমাদের মনকে যে প্রশ্নটি বার বার পীড়িত করে তুলছে, তা হচ্ছে মিসরী আইনে পুরুষদেরকে রমণীদের দ্বিগুণ অংশ দিবার বিধান। এখানে যে ইস্‌লাম বৈষম্যের নীতি দেখিয়েছে, এর কারণ কি? যেহেতু পুরুষদেরকে জাগতিক জীবনের কর্মক্ষেত্রে রমণীদের তুলনায় অনেক বেশী পরিশ্রম, দায়িত্ব পালন এবং নেতৃত্ব দানের বাস্তব পরিচয় দানই এ বৈষম্য করণের মূল কারণ। রমণীদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে তাদের সমুদয় প্রয়োজন পুরণ করে দেয়ার দায়িত্ব এবং তাদের থেকে ভুমিষ্ট সন্তান-সন্ততির লালন-পালনের কঠিনতম বোঝা একমাত্র তারাই নিজেদের স্কন্ধেই বহন করে নেয়। এক কথায় সংসার জীবনের সমুদয় কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের দায়িত্ব ও ব্যবস্থাপনার পরিশ্রম, চিন্তা, কল্পনা, একমাত্র তাদেরই মাথার উপর ন্যস্ত থাকে। সুতরাং তাদেরকে নারীদের অংশের দ্বিগুণ অংশ প্রাপ্যের জন্য এ একটি মাত্র কারণই যথেষ্ট। বিশেষ করে

নারীদের বিবাহ হোক বা না হোক, অথবা তাঁরা বিধবা হোক সর্বাবস্থায় তাদের ভরণ পোষণ এবং অন্যান্য প্রয়োজন পুরণের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব থাকে পুরুষদের উপর। বৈবাহিক জীবনে তাদের ভরণ পোষণ ও যাবতীয় খরচাদির জন্য দায়িত্ববান থাকে তার স্বামী। আর যদি কোন কারণে পিত্রালয়েই তাঁর থাকতে হয়, অথবা যদি সে বিধবা হয়, তবে ওয়ারীস সুত্রে প্রাপ্ত ধন-সম্পদ তখন তার কাছে আসে। অতএব এখানে আসল যে বিষয়টি তা হচ্ছে দায়িত্ব বহন করা ও গ্রহণ করার পার্থক্য। আর তাই হলো মীরাসের বেলায় পার্থক্য করণের একমাত্র কারণ।

এখন নারীদের উপর পুরুষের যে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব করার অধিকার দেয়া হয়েছে, সেই বিষয় আলোকপাত করা এবং এখানে তাদের মধ্যে সমতা বিধানের পরিবর্তে প্রাধান্য দেয়ার মূল রহস্যটাই বা-কি তা খুঁজে বের করা। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআন মজীদের ভাষ্য হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ط

"নারীদের উপর পুরুষদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের প্রাধান্য লাভ করার কারণ হচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্যে একেকে অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আর নারীদের যাবতীয় প্রয়োজন ও খরচ পত্র বহন করার দায়িত্ব পুরুষদের স্কন্ধে ন্যস্ত থাকাটাও এর আর একটি বিশেষ কারণ।" (সূরা নিসায়-৩৪)

সুতরাং নারীদের উপর পুরুষের প্রাধান্য লাভ করার কারণ হলো সেই কর্মদক্ষতা ও পারদর্শীতা, যা নেতৃত্বের কাজ সম্পাদন করার জন্য প্রয়োজন হয়। যেহেতু পুরুষদের মাতৃক দায়িত্বশীলতা থেকে মুক্ত থাকার কারণে সমাজ জীবনে তাদের তুলনায় কর্মক্ষেত্রে অধিক সময় ব্যয় করতে হয় এবং সেখানে স্বীয় পূর্ণ কর্মশক্তি ও চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগাতে হয়। আর এহেন দায়িত্বশীলতাই একটি নির্দিষ্ট সময়সূচী পর্যন্ত রমণীদের পথ প্রদর্শক হিসেবে থাকে। উপরন্তু পুরুষদের মধ্যে যখন চিন্তা-গবেষণা দুরদর্শিতা ও বিবেচনা শক্তি প্রবলরূপে উচ্ছ্বসিত থাকে, তখন রমণীদের মাতৃক দায়িত্ব অনুভূতি, অনুতাপ পরিতাপের কর্মপ্রেরণা ও চেতনাবোধের মূল উপাদান সমূহকে অধিক মাত্রায় উত্তেজিত করে রাখে।

অতএব এখন যদি তাকে, নারীদের উপর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব করার জন্য নিযুক্ত করা হয়, তবে তা হচ্ছে এ কারণে যে, উক্ত পদমর্যাদা দ্বারা সফলতা ও কৃতকার্য হবার নিমিত্ত যে যোগ্যতা ও কর্ম দক্ষতার প্রয়োজন তা তার মধ্যে বর্তমান রয়েছে। আর এ দায়িত্বকে, পালন করার জন্য যে সকল আবশ্যকীয় শর্তাবলী থাকা প্রয়োজন তাও তাঁর ভিতর বর্তমান পাওয়া যায়। এ ছাড়া পুরুষরাই যেহেতু ব্যয় নির্বাহ করার বেলায় দায়িত্ববান হয়। আর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের সাথে ধন-সম্পদের দিকটার যে নিবিড় সম্পর্ক নিবদ্ধ সে বিষয় কথা বলাই বাহুল্য। এ দিক দিয়ে এটা এমন একটি কর্তব্যের মোকাবিলায় প্রাপ্য অধিকার। মৌলিক দিকের পরিপ্রেক্ষিতে জীবন ক্ষেত্রে উভয় শ্রেণীর মধ্যে কর্তব্য ও অধিকারগুলো পূর্ণ সাম্যবাদের ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

বাস্তব জগতের দায়িত্বশীলতার কথা বাদ দিয়ে যদি মানবিক দিকদিয়ে বিচার করা হয়, তবে পুরুষের তুলনায় রমণীগণকে খেদমত ও সেবা পাবার অনেক বেশী অধিকারের মালিক হতে দেখা যায়। আর পুরুষদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারের প্রতিদ্বন্দ্বী স্বরূপ হচ্ছে রমণীদের এ অধিকারটি। এক ব্যক্তি রাসুলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া নবী আল্লাহ! আমার নিকট ভাল আদান প্রদান, সম্পর্ক রক্ষা ও আচরণের সর্বাধিক অধিকারী কে? নবী করীম (সাঃ) উত্তর করলেন- তোমার মাতা সাহেবানী। উক্ত ব্যক্তি আবার জিজ্ঞেস করলো এরপর কে? নবী করীম (সাঃ) উত্তরে বললেন- তোমার মাতা! প্রশ্নকারী আবার বললো এরপর আরকে অধিকারী হতে পারে? নবী করীম (সাঃ) উত্তরে বললেন- তোমার মাতা। উক্ত ব্যক্তি অনুরূপ আবার জিজ্ঞেস করলে নবী করীম (সাঃ) শেষের বারে বললেন- তোমার পিতা। (বুখারী মুসলিম)

প্রকাশ্য দৃষ্টিতে দেখা যায় যে সাক্ষী দানের ক্ষেত্রে ইস্‌লাম নর-নারীদের একটি শ্রেণীকে অপর শ্রেণীর উপর প্রাধান্য দান করেছে এ ব্যাপারে কুরআন বলেছে ঃ

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ج فَإِنْ لَّمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

"তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন পুরুষকে সাক্ষী নিযুক্ত কর। আর যদি দু'জন পুরুষ পাওয়া সম্ভব না হয়, তবে একজন পুরুষ এবং দু'জন মহিলাকে সাক্ষী নিয়োগ করো। দু'জন মহিলার ব্যবস্থা এ জন্য করতে হবে যেন তাদের মধ্যে একজন যদি ঘটনার আসল তথ্য ভুলে যায়, তবে অপর জন যেন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। আর এ সাক্ষীর জন্য এমন গুণবিশিষ্ট লোক হতে হবে, তোমাদের মধ্যে যাদের সাক্ষী গ্রহণীয় হয়।" (সূরা বাকারা–২৮২)

এখানে যে নারী পুরুষের মধ্যের সমতা বিধানের পরিবর্তে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে, এর কারণ আমরা যদি উপরোক্ত আয়াতের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করি, তবে পরিষ্কার রূপে উপলব্ধি করতে পারি। পুরুষের মধ্যে চিন্তা ও বিচার বিবেচনার প্রকৃতিগত গুণাবলী যতটা প্রবল থাকে, অনুরূপ নারীদের মধ্যে মাতৃত্বের কৃপায় প্রকৃতিগত মূল চাহিদার কারণে ভাবাবেগ প্রেরণা এবং লাজুক প্রবণ হওয়ার অবস্থাটাও সমধিক প্রবল ও উচ্ছ্বসিত থাকতে দেখা যায়। এ জন্যই ইস্‌লাম এ ব্যবস্থা নিয়েছে যে, যদি একজন রমণী সাক্ষী ক্ষেত্রে আসল তথ্য বিস্মৃত হয় অথবা লজ্জার শিকারে পরিণত হয়ে মূল ঘটনা প্রকাশ করতে অক্ষম হয়, তবে যেন অপর জন তাকে স্মরণ করিয়ে দিবার জন্য উপস্থিত থাকতে পারে। সুতরাং এখানে আসল বিষয় হলো জীবনের একটি নিবিড় সত্যকে উপলব্ধি করে তার সম্মুখীন হওয়া এবং তার পদ অলঙ্কৃত করার বিষয়।

ইস্‌লামের জন্য এ কাজটি করা কম কথা নয় যে, সে দ্বীনের ব্যাপারে যেমন নারী পুরুষ উভয় জাতিকে সমমর্যাদা ও অধিকার দান করেছে; তদ্রুপ ধন-সম্পদ অর্জন ও মালিকানা স্বত্বের অধিকারী হবার ব্যাপারেও সমপর্যায়ে মান দান করেছে। অতঃপর সে নারীদেরকে এ নিশ্চয়তা আইনগত বিধানে রূপ দিয়েছে যে, তাদের বিবাহ তাদের অনুমতি ও মর্জি ছাড়া হতে পারবে না। অনুরূপ এ ব্যাপারে তাদেরকে যেমন বাধ্য করা যাবে না তেমনি যাবে না, এ বিষয় কোনরূপ দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

لَاتَنْكِحُوْا الشَّيِّبَ حَتّٰى تَسْتَامِرُوْا لَا تَنْكِحُ
حَتّٰى تَسْتَاذِنَ وَاذْنُهَا الصَّمُوْتُ -

"বিবাহিত রমণীদের প্রকাশ্য সম্মতি না পাওয়া পর্যন্ত তাদেরকে পুনঃবিবাহ দেয়া চলবে না। আর অবিবাহিতদেরকে বিবাহ দিবার সময় তাদের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। তাদের অনুমতির বাস্তব দৃশ্য হলো জিজ্ঞাসার সময় তাদেরকে চুপ থাকতে দেখা।" (বুখারী, মুসলিম)

অনুরূপ ভাবে ইস্‌লাম বিবাহ এবং মোহরানা অথবা তালাকের পরে, সৃষ্ট নারীদের অন্যান্য অধিকারকে রক্ষার জন্য নিশ্চিত রূপে আইনগত বিধান জারি করে দিয়েছে। এ ব্যাপারে কুরআনের ঘোষণা হলো ঃ

فَاتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ـ

"তাদের মোহরানাকে ফরজরূপী কর্তব্য মনে করে দিয়ে দাও।"

(সূরা নিসায়া–২৪)

فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ـ

"হয়তো তাদেরকে ন্যায়ানুগ পন্থায় এবং ভালভাবে জীবন-যাপন করতে দাও অথবা তাদেরকে ভদ্রতার সাথে বিদায় দাও। আর তাদের যদি দুঃখ-কষ্ট দেয়ার জন্য রেখে দাও, (তবে মনে রেখ) তা তাদের প্রতি তোমাদের পরিষ্কার ভাবে জুলুম করা হবে।" (সূরায় বাকারা–২৩১)

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ـ

"তাদের সাথে সুন্দররূপে জীবন-যাপন করো।" (সূরা নিসায়া)

প্রকাশ থাকে যে, নারীদের জন্য তাদের এ সকল অধিকার সমূহের যে নিশ্চয়তা বিধান করেছে, তা কোন অর্থনৈতিক বা জাগতিক চাপের কারণে নয়। বরং তা করেছে সে একমাত্র নিছক মানবিক প্রেরণা অনুভূতির খাতিরে। নারী যে পুরুষের প্রতি একটি অর্থনৈতিক বোঝা স্বরূপ এবং তাদের সৃষ্টি হবার সাথে সাথে এ বিপদ থেকে মুক্তি লাভ একটি উত্তম কাজ-ইস্‌লাম এহেন মানসিকতা ও মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম প্রকাশ্য জিহাদ ঘোষণা করেছে! ছোট মেয়েদেরকে জীবন্ত সমাহিত করার একটি প্রথা দ্বারা জাহেলী যুগে আরবের কতিপয় গোত্রের লোকেরা যে খ্যাতি অর্জন করেছিল, তার বিরুদ্ধেও কঠোর জিহাদ ঘোষণার বেলায় ইস্‌লাম কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করেনি। সে এ কুসংস্কারকে সেই মানবিক প্রেরণা ও অনুভূতির খাতিরেই খতম করে দিয়েছে, যার আলোকে সে মানব জীবনকে অবলোকন করে। সুতরাং প্রথমেই সে বিনাদ্বিধায় মানুষকে হত্যা করার বিরুদ্ধে অর্ডিনান্স জারী করনে বলেছে ঃ

وَلاَتَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ ـ

"যে প্রাণ হত্যা করাকে আল্লাহ তায়ালা অবৈধ করেছে, তা তোমরা হত্যা করো না! তবে ইনসাফের সাথে বিচারের ক্ষেত্রে করতে পারো।"

(সূরা আন্‌য়াম-১৫১)

তৎকালীণ বর্বর যুগে লোকেরা শুধু কেবল মেয়ে শিশুদেরকেই জীবন্ত কবরস্থ করতো- ছেলে শিশুদেরকে নয়। কিন্তু ইস্‌লাম একধাপ অগ্রসর হয়ে মেয়েসহ ছেলদেরকেও জীবন্ত সমাহিত করতে নিষেধ করে দিয়েছে। কুরআন মজীদে আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَاتَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ـ

"তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্রতার ভয়ে হত্যা করো না। আমি তাদের জীবিকার যেমন সংস্থান করি তেমনি তোমাদেরও করি।"

(সূরা বনী ইসরাইল-৩১)

লক্ষ্য করুন, কুরআন মজীদের এ আয়াতটিতে সন্তানদের রিযিকের কথা প্রথম উল্লেখ করে তারপর পিতামাতা ও অন্যান্যদের রিযিক দানের কথা বলেছে। কেননা বুভুক্ষাতা এবং দারিদ্রতার সন্দেহবাদীতার কারণেই এহেন সমস্যা দেখা দেয়। সুতরাং পিতার অন্তঃকরণ যাতে করে এ বিশ্বাসে ভরপুর হয়ে যায় যে, আল্লাহ তায়ালাই মানুষের রিযিকের সংস্থান করেন। সেজন্যই প্রথম তার কালামে সন্তানদের রিযিক দানের কথা উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে রিযিকের দায়িত্ব তিনি পিতার পরিবর্তে নিজ স্কন্ধেই গ্রহণ করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের আলোচনা করে আদল ইনসাফ ও রহমতের চেতনা অনুভূতি তিনি এমনিরূপে চৈতন্যোদয় করেছেন ঃ

وَاِذَا الْمَوْءدَةُ سُئِلَتْ ـ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ـ

"কি অপরাধে তোমাদেরকে হত্যা করা হলো? এ কথা যখন জীবন্ত সমাহিতদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। (সূরা আত্‌তাকবীর ৮-৯)

আয়াতের বর্ণনাভঙ্গী দ্বারা মনে হচ্ছে যেন এ কথাটিকে তিনি সেই ভয়ানক ভীতিপ্রদ দিনে বিশেষরূপে জবাব চাহিবার যোগ্য করেছেন। প্রকাশ থেকে যে ইস্‌লাম নারীদেরকে তাদের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক অধিকার দানের সময় প্রকৃত পক্ষে পুরুষদের ন্যায় তারাও যে মানুষ-এ বৈশিষ্ট্যটির প্রতি সে লক্ষ্য রাখে!

অনুরূপ সে 'মানবিক একত্বের' স্বীয় দর্শনটির প্রতিও যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়। কুরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে ঃ

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۔

"আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে একটি জীবন থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর তার জাতিত্ব থেকেই তার সঙ্গীকে এ জন্য সৃষ্টি করেছেন, যেন তার নিকট গিয়ে প্রশান্তি লাভ করে আনন্দিত হত পারে।" (সূরাআল আ'রাফ-১৮৯)

ইস্‌লামের উদ্দেশ্যে হলো নারী জাতির আসল মর্যাদাকে উন্নতির সই উচ্চ সোপানে নিয়ে যাওয়া; যাতে করে তারা 'একাত্মার' অর্ধাঙ্গিনী হয়ে থাকতে পারে।

এ আলোচনার পর ইস্‌লামের জন্য এ কথাগুলো আলোচনা করা খুবই প্রয়োজন যে, বস্তুবাদী পাশ্চাত্য জগত নারী জাতিকে যে স্বাধীনতা দান করেছে তার ঝর্ণাধারা যেমন নির্ভেজাল ও পবিত্র মানবিক প্রস্রবন থেকে উৎসারিত হয় না, অনুরূপ তার পশ্চাৎভুমে কলঙ্কহীন বন্ধুত্বসুলভ নেই কোন তেমন আন্দোলন, কর্মপ্রেরণা, যা ইসলামের মধ্যে স্বাধীনতা ও সাম্যবাদের অধিকার দানের পর সৃষ্টি হয়। ইতিহাসের বাস্তব দৃষ্টান্ত যেমন আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়- তেমনি উচিত নয় বাস্তব ঘটনাবলীর উপর পতিত চোখ ঝলসানো আবরণ দ্বারা প্রতারিত হওয়া। ভালরূপে স্মরণ রাখতে হবে যে, নারীদেরকে পাশ্চাত্য জগত শুধু পরিশ্রম ও মজুরী দ্বারা জীবিকা অর্জনের জন্য পরিবারের চৌহদ্দির সীমানার বহির্জগতের বিপদ সঙ্কুল কর্মক্ষেত্রে নামিয়ে দিয়েছে। সেখানে পুরুষরা নারীদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করার কারণেই তারা বর্হিজগতের কর্মক্ষেত্রে পদার্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। মোটকথা পারিপার্শ্বিক অবস্থা এমন দুর্বিসহ ছিল,, যার কারণে অসহয় নারী জাতিকে জীবিকা অর্জনের খাতিরে পরিশ্রম করতে বাধ্য করা হচ্ছে।

এ কথাও বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য যে, নারীরা যখন বাধ্য হয়ে জীবিকার জন্য মেহন্‌ত মজদুরী করার ইচ্ছায় ঘরের প্রাচীর ডেঙ্গিয়ে বর্হিজগতে পদার্পণ করে তখন বস্তুবাদী পাশ্চাত্য জগত তাদের আগমনকে জানালো স্বাগতম। আর অপর দিকে তাদের প্রতি দরদ ও ভালবাসার প্রবাল্যকে কর্ম মজুরী প্রদানের বাহানা বানিয়ে নিল, যেন মালিক শ্রেণীরা সেই কম আয়কারী নারীদেরকে শ্রমিক

রূপে কাজে নিয়োগ করে নিতে পারে। আর যারা ন্যায্য পারিশ্রমিক ও মজুরী প্রদানের দাবিতে আন্দালনের লেলিহান অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করে, তাদের প্রতি যেন তার মুখাপেক্ষী না হয়। অর্থাৎ তাদেরকে যেন কর্মক্ষেত্র থেকে দুরে সরিয়ে সেখানে কম আয়কারী নারীদেরকে নিয়োগ করে নিজেরা যেন রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ বাহির হবার ন্যায় পুঁজিপতি হবার সুযোগ পায়। এটাই ছিল তাদের প্রতি সমস্ত ভালবাসা ও দরদ প্রদর্শনের মূল উদ্দেশ্য।

বস্তুত সেখানের নারীগণ যদি এখন সাম্যের দাবি উত্থাপন করে সে দাবীর অর্থ হবে মজুরী প্রনানের ক্ষেত্রে সাম্য ও ইন্‌সাফ প্রতিষ্ঠার দাবী, যাতে তারা দু'চারটা ডাল ভাত পেট পুরিয়ে খেয়ে জীবন অতিবাহিত করার ন্যূনতম সুযোগটুকু পায়। যখন তারা এখানে সমতার দাবি আদায় করতে গিয়ে ব্যর্থতার পরিচয় দিলো, তখন তারা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা কল্পে এ দাবি আদায়ের আন্দোলনকে জোরদার করার নিমিত্ত নির্বাচনে ভোটাধিকার লাভের দাবি করে বসলো। অতঃপর পরবর্তি পর্যায়ে তারা এহেন সমতাকে অন্যায়রূপে প্রমাণিত করা এবং তার সমর্থন আদায়ের জন্য নিয়মিত রূপে আওয়াজ জোরদার করার জন্য পার্লামেন্টে নিজেদের প্রতিনিধিত্বের দাবি করে বসলো। কারণ তাদের সমাজ যে আইনের অধীনে শাসিত হয়, এবং যে আইন কানুন ও নিয়ম নীতি তাদের সমাজে প্রচলিত তার রচয়িতা হলো শুধু পুরুষ জাতি। ইস্‌লামের ন্যায় সেখানে আল্লাহর দেয়া এমন কোন আইন বিধান নেই, যার দ্বারা তারা আল্লাহর বান্দাদের নারী-পুরুষ এক কথায় সৃষ্ট জীবের সকল জাতির মধ্যে সাম্য ও আদল ইন্‌সাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

আমাদের এ কথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, নিজস্ব সম্পদ ব্যয়ের বেলায় ইস্‌লামের মধ্যে যে রূপ নারীর অবাধ স্বাধীনতা ও অধিকার রয়েছে, অনুরূপ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর চতুর্থ সাধারণতন্ত্র পর্যন্ত ফরাসীতে নারীদের স্বীয় ধন-সম্পদ অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতিরেকে ব্যয় করার কোন অধিকার ছিল না। অথচ নারীদের জন্য সেখানে গোপনে ও প্রকাশ্যে সর্বরকম লজ্জাহীনতা ও অশ্লীল কাজ করার পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার দিয়ে রাখা হয়েছে।

সুতরাং এটাই হলো একমাত্র শেষ অধিকার-যা থেকে ইস্‌লাম নারী-পুরুষ সকলকে মানবিক জ্ঞান অনুভূতি বিচার বিবেচনা এবং তাদের ইজ্জৎ-সম্মান ও আভিজাত্যের মূল চাহিদার খাতিরে বঞ্চিত করেছে। আর করেছে সে এ জন্য যে জাতিগত ও শ্রেণীগত সম্পর্ককে সে নিম্ন সমতল ভূমি থেকে মহান উচ্চ শিখরে

উপনীত করতে চায়; যাতে বিচ্ছিন্ন দুটি সত্তা এমন একটি দেহে রূপ নিয়ে থাকতে পারে; যা না হবে বংশীয় সম্পর্কের কারণে এবং না হবে পারিবারিক যোগসুত্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত।

আমরা বর্তমানে বস্তুবাদী পাশ্চাত্য জগতকে কতিপয় কাজে বিশেষ করে ব্যবসা বাণিজ্য, দোকান পাট ও সংস্থা সমূহে মধ্যস্থতা ও দ্বৈতকার্য আইন ব্যবসা ও রাজকীয় দূত কার্যে এবং সংবাদিকতা ও বাইণ্ডিং কাজে পুরুষদের উপর নারীদেরকে প্রাধান্য দিতে দেখছি। এ প্রাধান্য দানের পৃষ্ঠদেশে যে ধরণের ন্যাক্কারজনক অপবিত্র মনোবৃত্তি ও মানসিকতা লুকায়িত রয়েছে, তা দৃষ্টির আড়ালে ফেলে যাওয়া উচিত নয়।

এটা আতর লোবান ও আফীনের ছড়ানো সুবাসে পরিপূর্ণ পরিমণ্ডলে দাসত্ব ও আনুগত্যের একটি বাস্তব রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। এটাকে অবুঝ ও বোকাদের শ্রেণীগত অনুভূতি ও চেতনা থেকে অবৈধ স্বার্থ উদ্ধার করা ছাড়া আর কি বলা যায়। সুতরাং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ অথবা সেই রাষ্ট্র যারা নারীদেরকে দালালী ও মধ্যস্থতায় এবং আইন ব্যবসা ও পার্লামেন্টের অফিসিয়াল কাজের পদে নিয়োজিত করে। অনুরূপ পত্রিকার মালিকগণ যারা সাংবাদিকতা ও সম্পাদনার কাজে তাদেরকে নিয়োজিত করে; তাঁদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি তারা নারীদেরকে এ কাজে আসলে কি উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যবহার করতেছে এ কিরূপে নারীরা এ ময়দানে সহজভাবে সাফল্য অর্জন করে নেয়, এ বিষয় খুব ভালরূপেই তারা ওয়াকিফহাল আছে। স্থানভেদে তারা নারীত্বের ভাণ্ডার থেকে যদি নিজেরা কিছু ত্যাগ নাও করে তবে তারা ভালরূপেই জানে যে, বুভুক্ষ যৌনপিপাসা এবং লোলুপ দৃষ্টিবান, তাদের কথাবার্তা আলাপ আলাপন দ্বারাই দেহ সৌষ্ঠবের চতুষ্পার্শ্বে ভীড় জমিয়ে থাকবে। তারা নিজেদের হীনস্বার্থ উদ্ধার ও সাধারণ কিছুটা সফলতা অর্জনের নিমিত্ত এহেন যৌন বুভুক্ষদের থেকে অবৈধ স্বার্থ লুণ্ঠন করে নেয়। মোটকথা এ উভয় গ্রুপের ন্যাক্কার জনক ভুমিকার একমাত্র কারণ হচ্ছে যে মানবিক জীবনের উচ্চতম মূল্যবোধ ধ্যান-ধারণা ও দর্শন থেকে তারা শত সহস্র মাইলের দুরত্বে অবস্থান করছে। মানবতার আসল ধ্যান-ধারণা বলতে কিছুমাত্র তাদের কাছে নেই, যার বাস্তব প্রকাশ হচ্ছে তাদের এহেন ন্যাক্কার জনক ভূমিকা।

সমাজতন্ত্র নারী পুরুষের সম অধিকারের বেলায় খুব বিরাট বিরাট মুখরোচক শ্লোগান দেয় বটে, কিন্তু তাদের এসব অধিকারের দাবি শুধু কর্মের

সংস্থান ও পারিশ্রমিকের ক্ষেত্র পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। শ্রম ও মজুরীর সমতার পর নারীদের রয়েছে সেখান পূর্ণ স্বাধীনতা। পুরুষদের ন্যায় তাদের সীমাহীন চাল চলনের পূর্ণ স্বাধীনতা ও অবাধ অধিকার রয়েছে অর্জিত। সমাজতান্ত্রিক দর্শনে মানব জীবনের মূল সমস্যা হলো পয়সার সমস্যা। এ ছাড়া আর কিছুই নয়। মানব জীবনের সমুদয় মানবিক জীবন দর্শন ও ধ্যান-ধারণা বিভিন্ন উপাদান থেকে সংকলন করে নিয়েছে।

গভীরভাবে দেখলে এর মূল কারণ এটাই দেখা যায় যে, পুরুষরা নারীদের দায়িত্ব গ্রহণ থেকে দুরে সরিয়ে থাকতে চায়। সুতরাং নারীরা নিজেদের জীবিকা নির্বাহের জন্য কেবল পুরুষের ন্যায়ই নয় বরং তাদের কর্ম সমাবেশে গিয়ে কাজ করতে বাধ্য হয়। প্রকৃত পক্ষে কমিউনিজমকে যদি ভালরূপে বিচার বিশ্লেষণ করা হয়, তবে দেখা যাবে যে তা বস্তুবাদী পাশ্চাত্য চিন্তাধারার উৎকর্ষতা ও সমৃদ্ধির একটি বাস্তব নমুনা মাত্র। যা হচ্ছে সর্বপ্রকার সত্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও অনুগ্রহ ও বদান্যতার দাবি শূন্য এবং মানবিক জীবনে অধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা বিবর্জিত।

এ হলো বস্তুবাদী সভ্য জগতের বাস্তব ইতিহাস যা আমাদের সামনে না আসলে পর তার মায়া মরিচিকা সাদৃশ্য চোখ ঝলসানো চাকচিক্য আমাদের দৃষ্টিকে প্রতারিত করতে পারে। কারণ চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে ইস্‌লাম নারী সমাজকে যে স্বাধীনতাও অধিকার দান করেছে, তা আজ পর্যন্ত পাশ্চাত্য সভ্যতা দান করতে আদৌ সমর্থ হয়নি। ইস্‌লাম নারী সমাজকে প্রয়োজন বোধে মেহনত মজদুরী ও জীবিকা অর্জনের অধিকার দান করে থাকলেও সাথে সাথে সে তাদের জন্য পারিবারিক জীবনে অভিভাবকত্ব এবং তার দেখাশুনা ও রক্ষাণাবেক্ষণের পূর্ণ অধিকার যথাবিহিত বহাল রেখেছে। তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য শুধু পানাহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়– বরং তার সীমানা দৃশ্য জগতের গণ্ডী পার হয়ে এক অদৃশ্য জগতের পাদপ্রান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত। সে মানব জীবনকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে। তার নিকট বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র থাকলেও তারা একে অপরের সাহায্য সহানুভূতিতে যেমন এগিয়ে আসতে পারে। অনুরূপ সকলে তারা একে অপরের সাথে ওৎপ্রোত ভাবে বিজড়িত। এ দৃষ্টি দিয়েই সে নারী পুরুষ উভয় শ্রেণীর দায়িত্ব ও কর্তব্যকে অবলোকন করে। আর তাদের জীবন বৃক্ষের প্রতিটি শাখা-প্রশাখা যাতে করে পত্র পল্লবে ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে উন্নতি লাভ করতে পারে, তার জন্য সে উভয়ের প্রতি সর্ব প্রথম নিজের আসল কাজ সম্পাদন করাকে অবশ্য কর্তব্য নির্ধারণ করে। সে উভয়ের মধ্যে প্রত্যেককে

সেই অধিকার দান করে যা মানুষের সম্মিলিত লক্ষ্য বিন্দুতে উপনীতি করার নিশ্চয়তা দান করতে পারে। ইস্‌লাম সমগ্র মানব জাতিকে এমন একটি সম্মান ও মর্যাদা দান করেছে, যাকে ধ্বংস করা কোনক্রমেই ঠিক নয়। পবিত্র কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا -

"আমি বনী আদমকে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছি, আর দান করেছি তাদেরকে জলে স্থলে চলার জন্য সওয়ারী। এমনি ভাবে পবিত্র বস্তু থেকে রিযিক দান করেছি এবং বহু সৃষ্ট জীবের উপর দান করেছি তাদেরকে মহত্ত ও শ্রেষ্ঠত্ব।" (সূরা বণী ইস্রাইল-৭০)

"আমি তাদেরকে মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি" এ কথাটি জাতিগত দিক দিয়ে সমস্তের উপর প্রযোজ্য। শুধু ব্যক্তি বংশ অথবা গোত্র সমূহের ব্যক্তিগত দিক দিয়ে তাদের উপর প্রযোজ্য নয়। সুতরাং সাধারণ রূপে সমগ্রের জন্য সমভাবে এ মহত্ব প্রযোজ্য। কারণ সমগ্র মানব-গোষ্ঠি একমাত্র আদমের (আঃ) সন্তান। আর আদম ছিলেন মাটির সৃষ্টি এবং আদমকে দান করা হয়েছে মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব। অতএব তার সমগ্র সন্তানগণই বংশ পরম্পরায় মহত্বও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।

সমগ্র মানব সন্তান যখন শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী তখন কোনক্রমেই এহেন মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বকে ব্যাঙ্গোক্তির লক্ষ্য বস্তুতে অথবা ঠাট্টাবিদ্রূপে পরিণত করা বৈধ নয়। পবিত্র কুরআন মজীদে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ - وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ -

"হে মুমিনগণ! মনে রেখ একজাতি অপর জতিকে এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে ঠাট্টা বিদ্রূপ করবে না। এটা খুবই সম্ভব যে যারা বিদ্রূপ করতেছে তাদের তুলনায় তারা অনেক ভাল। অনুরূপ কোন নারী অপর কোন নারীকে ঠাট্টা বিদ্রূপের বস্তুতে পরিণত। হতে পারে যে, বিদ্রূপকারীর তুলানায় সে খুব ভাল নারী। আর তোমরা নিজেরা নিজেদেরকেও ঠাট্টা-বিদ্রূপের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করো না। আর তাদেরকে অসভ্য ও খারাপ নাম নিয়েও ডেকো না। (কারণ) ঈমান আনার পর মুখে খারাপ নাম উচ্চারণ করা খুবই খারাপ কথা। যারা এহেন আচরণ থেকে তাওবা করে ফিরে না আসবে– তারা জালেম।" (সূরা হুজরাত–১১)

"নিজেরা নিজেকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করো না।" এ সুন্দর অথচ তাৎপর্যপূর্ণ কথাটি যে নিগূঢ় তথ্যের পানে ইঙ্গীত করে, তা হচ্ছে যে মানুষ অন্য মানুষকে ঠাট্টা বিদ্রূপের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করার অর্থ হচ্ছে নিজেরা নিজেদের ঠাট্টা বিদ্রূপের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করা। কারণ সমগ্র মানব জাতির সৃষ্টি হয়েছে একটি মাত্র জীবন থেকে।

ইস্‌লামের দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তিই সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত। সুতরাং একে অপরের সম্মানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা একান্ত কর্তব্য। কুরআন মজীদে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ
بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى
اَهْلِهَا ـ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ـ فَاِنْ لَّمْ
تَجِدُوْا فِيْهَا اَحَدًا فَلَاتَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ـ
وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ـ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ـ

"হে ঈমানদারগণ! নিজেদের ঘর ছাড়া অপর লোকের ঘরে তাদের বিনা অনুমুতিতে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ করো না। যদি তোমাদের

মধ্যে নসিহত গ্রহণ করার মত যোগ্যতা থাকে, তবে মনে রেখ যে, এ নিয়ম নীতিই তোমাদের জন্য কল্যাণময়। যদি তাদের ঘরে লোকজন দেখতে না পাও তবে অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত ঘরের ভিতরে প্রবেশ করো না। আর যদি তোমাদেরকে প্রত্যাবর্ত্তন করতে বলা হয়, তবে তোমরা ফিরে যাও। এ আচরণ তোমাদের পবিত্রতা রক্ষা কল্পে খুবই ফলপ্রসু। (তোমরা জেনে রেখ) তোমরা যা কিছু করো না কেন, আল্লাহ সে সম্পর্কে খুব ভালরূপে ওয়াকিফহাল থাকেন।" (সূরা নূর-২৭-২৮)

وَلَاتَجَسَّسُوا وَلَايَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا -
(الحجرات - ١٢)

" তোমরা একে অপরের দোষক্রটি অন্বেষণ করো না-আর করো না তোমরা একে অপরের কুৎসা রটোনা।" (সূরা হুজ্‌রাতা-১২)

ইস্‌লামের এহেন তাৎপর্যপূর্ণ বিধানের মূল্যমান এতেই নিহিত যে; তা প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে এ অনুভুতি সৃষ্টি করে যে, সে একজন সম্মানিত লোক এবং সে একপ্রকার সম্ভ্রম ও আভিজত্যের অধিকারী; যার প্রতি অন্য লোকের আক্রমণ করা কোনক্রমেই বৈধ নয়।

কোন ব্যক্তির সম্মান, সম্ভ্রম অপর ব্যক্তির চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এ বিষয় সমগ্র মানব সমপর্যায়ভুক্ত এবং সকল মানুষ একে অপর থেকে নিরাপদ।

এমনিভাবে ইস্‌লাম জীবনের প্রত্যেকটি দিকের প্রতি আলোকপাত করে থাকে। যেমন করে সামাজিক দিকের প্রতি- তেমনি করে অনুভূতি ও চেতনাবোধ জগতের প্রতিটি কোণায় কোণায়। আর প্রতিষ্ঠিত করে সর্বস্তরে পূর্ণ সাম্যবাদ। মানব আত্মাকে সর্ব-প্রকার প্রয়োজন এবং সামাজিক শক্তিসমূহের দলন থেকে মুক্তি দিয়ে নীতিগত ভাবে সাম্যবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার পর ইসলামের জন্য বক্তৃতা মঞ্চে বসে সাম্যবাদের বাহ্যিক রূপরেখা ঘোষণা করার প্রয়োজন আর অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু তা-ও ইসলাম করছে। কারণ সে সাম্যবাদকে খুব পছন্দ করে । সে তাকে গোত্র বংশ পরিবার ও স্থানের সংকীর্ণ আবেষ্টনী থেকে মুক্তি দিয়ে পূর্ণ রূপে একটি মানব আকৃতির ন্যায় অবলোকন করতে চায়। পাশ্চাত্য জগতের বাস্তুবাদী দর্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের বিধানের মত এ সাম্যবাদের চৌহদ্দীর সীমারেখা শুধু কেবল অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সংকীর্ণ সীমারেখার মধ্যে আওতাভূক্ত হয়ে না পড়ে। বরং তার আকৃতি ও রূপরেখার সীমানা যেন বিশাল বিস্তৃত ও সামগ্রিক আকারে হয়। এটাই ইস্‌লামের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও কাম্য।

সামাজিক জীবনে পারস্পরিক দায়িত্বশীলতা

এমন জীবন কোনদিন সাফল্যের মুখ দর্শন করতে পারে না, যার ভিতর প্রত্যেক ব্যক্তি লেগামহীন স্বাধীনতা ভোগ করার সাথে সাথে ভোগ বিলাস ও স্বার্থ সংরক্ষণের কজে সর্বদা ব্যস্ত থাকে। আর যদি এহেন স্বাধীনতার পশ্চাৎ ভূমে সাধারণ সাম্যবাদের দার্শনিক ধ্যান-ধারণা বর্তমান থাকে, তবে তার পরিণাম ফল হয় খুবই ভয়াবহ এবং ব্যক্তি ও সমাজ উভয়কে ঠেলে দেয় ধ্বংসের অতল গহ্বরে। প্রত্যেক সমাজের জন্যই সামগ্রিক উপকার ও কল্যাণের এমন রূপরেখা থাকে, যাকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সীমারেখা মনে করা উচিত। তার মধ্যে যেমন থাকে সমাজের সমগ্রিক স্বার্থ, তেমনি ব্যক্তির স্বার্থও তার ভিতরে নিহিত থাকে। ব্যক্তির স্বার্থ হলো এদিক দিয়ে যে সে যখন স্বীয় স্বাধীনতার দ্বারা কোন প্রকার নিজস্ব উপকার সাধন করতে যায়, তখন তার গতিবেগ তার কোন না কোন একটি সীমারেখার নিকটে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। সে আর তা অতিক্রম করার চেষ্টা করে না। অন্যথায় ভোগ-বিলাসের বাসনা এবং মনের কুবৃত্তি-নিচয়ের উদগ্র কামনা হয় তাকে ধ্বংসের অন্ধকার কূপের ভিতর নিক্ষেপ করবে অথবা তার ব্যক্তি স্বাধীনতা অন্য ব্যক্তিদের ব্যক্তি স্বাধীনতার সাথে এমন চরম সংঘর্ষ বাঁধিয়ে দিবে, যার দরুন সমাজের মধ্যে সৃষ্টি হবে বিশৃঙ্খল, আর জ্বলে উঠবে ঝগড়া বিবাদ ও হিংসা বিদ্বেষের এমন অনির্বান শিখা, যাকে নিভিয়ে ফেলা শেষ পর্যন্ত আর সম্ভব হয় না। ফলে এ স্বাধীনতাই মানুষের জীবন বিধ্বংসী বস্তুতে পরিণত হয়। এ স্বাধীনতা নিয়ে জীবনের উন্নতি ও সমৃদ্ধি এবং তার পূর্ণতা লাভের পানে পদক্ষেপ গ্রহণের গতিবেগ অস্থায়ী হীন ব্যক্তিস্বার্থের সীমারেখার নিকট এসে থেমে যায়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপনার "স্বাধীনতার" মধ্যেও এহেন নীচু প্রবৃত্তি এবং তার সাথে লেগামহীন কামুক ও যৌনবৃত্তির পাশবিক দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম লাভ করে।

ইস্‌লাম মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে তার নিজস্ব সুন্দরতম ব্যবস্থাপনায় দান করে একটি মহান ও উচ্চাংগের সাম্য গড়ে তুলে। কিন্তু সে তাদেরকে লেগামহীন ঘোড়ার ন্যায় ময়দানে ছড়ে দেয় না। একদিকে সামাজিক স্বার্থ ও অধিকার অপরধিকে মানবতার স্বার্থ ও কল্যাণ এবং তার মৌলিক চহিদার পানে দৃষ্টি রাখে। আর সাথে সাথে ধর্মীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধির মূল্যবোধও থাকে তার সামনে বর্তমান। এ জন্যই ইসলাম ব্যক্তি স্বাধীনতার সামনে ব্যক্তির দায়িত্বশীল হবার নীতিমালা পেশ করে। আর তার পার্শ্বে স্থান দেয় এমন সামাজিক দায়িত্ব-বোধকে, যার ভার ন্যাস্ত হয় ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের প্রতি। আর এহেন

দায়িত্ব শীলতাকেই আমরা 'সামাজিক পারস্পরিক দায়িত্ব শীলতা" নামে অভিহিত করি।

ইস্‌লাম সামাজিক জীবনের পারস্পরিক দায়িত্বশীলতার নীতিমালাকে পূর্ণ বিবরণ সহ নিজের সামনে বর্তমান রেখেছে। ব্যক্তি এবং তার সত্তা, ব্যক্তি ও তার নিকটতম পরিবার, ব্যক্তি ও সমাজ একজাতির সাথে অপর জাতি এবং একটি বংশ ও ভবিষ্যতে আগত বংশের সকলের মধ্যে সামাজিক জীবনের পারস্পরিক দায়িত্বশীলতার নীতিমালাই পথ প্রদর্শন রূপে ভূমিকা গ্রহণ করে।

দায়িত্বশীলতার এহেন মিলিত সামাজিক নীতিমালা ব্যক্তি ও তার সত্তার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার এবং তার উন্নতি ও সমৃদ্ধির নিমিত্ত ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তির দায়িত্ব হলো যে নফসকে লেগামহীন কামনার দৌরাত্মা থেকে বিরত রাখা। তাকে সর্ব প্রকার অপবিত্রতা থেকে মুক্ত রেখে তার পরিচর্যা সাধন করতঃ তাকে নিয়ে কল্যাণ মুক্তি ও সাফল্যের পথে অগ্রসর হয়ে ধ্বংসের হাত থেকে তাকে রক্ষা করা। ইত্যাদি কার্যাবলী সম্পাদন করার দায়িত্ব থাকে একমাত্র ব্যক্তির উপরই। ব্যক্তি নিজেই এ সফল কাজ সম্পাদন করে সাফল্যের দ্বার উম্মোচন করতে পারে। পবিত্র কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ـ وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ـ فَاِنَّ
الْجَحِيْمَ هِىَ الْمَاْوٰى ـ وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ـ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَوٰى ـ

"যারা আল্লাহর নীতির বিরুদ্ধাচরণ করে বিদ্রোহী হয়েছে এবং একমাত্র পার্থিব জীবনকেই প্রাধান্য দিয়েছে তাদের পরিণাম ফল হলো জাহান্নামে বাসস্থান। আর যারা আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে জবাবদিহি করাকে ভয় করে এবং স্বীয় নাফ্‌সকে কামনার দৌরাত্ম্য থেকে বিরত রাখে, তাদের স্থান হলো জান্নাত।" (সূরা নাযয়াত–৩৭–৪১)

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ـ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا
ـ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ـ

"নফ্‌স এবং তাকে যে ঠিক ঠিক রূপে সৃষ্টি করেছি এ কথার শপথ করে বলতেছি যে, আমি উক্ত নাফ্‌সের ভিতর পাপাচার ও আল্লাহ ভীরুতার মূল উপাদান সৃষ্টি করে রেখে দিয়েছি। সুতরাং যারা স্বীয় নফ্‌সের উৎকর্ষ সাধন করে, তারা সাফল্য অর্জন করতে পারবে। আর যারা তাকে অপবিত্র করবে, তাদের ভাগ্যলিপিতে ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নেয়। (সূরা আস শামস–৭–১০)

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ -

"তোমরা নিজেরা নিজেদের হাতকে ধ্বংসের অন্ধকারাচ্ছন্ন কুয়ায় নিক্ষেপ করো না।" (সূরা বাকারা–১৫৯)

ব্যক্তিকে সাথে সাথে তার এ দায়িত্ব সম্পর্কেও সচেতন করে দিয়েছে যে, সে তার নাফ্‌সকে একটি সীমারেখা পর্যন্ত তার প্রয়োজনীয় ও পছন্দনীয় দ্রব্য সামগ্রীর সংস্থান করে দিবে, যে পর্যন্ত তার স্বভাব প্রকৃতির উপর কোনরূপ খারাপ প্রভাব পতিত হবার সন্দেহ না থাকে। তার অধিকার ও দাবি অনুযায়ী কাজ করে যাওয়া এবং তার শান্তির জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালিয়ে তাকে ক্লান্ত করে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া তার উপর জুলুম বৈ আর কিছু নয়। পবিত্র কুরআন মজীদে এ বিষয় সচেতন করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا -

"আল্লাহ তায়ালা যা কিছু তোমাকে দান করেছেন তার ভিতর পরকালের স্থানকে লক্ষ্যবস্তুতে বানিয়ে নাও। আর পার্থিব জগতের বেলায় স্বীয় ন্যায্য অংশের কথ্য ভুলে যেয়ো না।" (সূরা কাসাস– "৭৭)

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ-

"হে আদম সন্তানগণ! তোমরা নিজদের সাজ-সজ্জার দ্রব্য-সামগ্রীকে প্রত্যেক নামাযের সময় ব্যবহার করো। আর নিয়মিতভাবে পানাহার করে। কিন্তু সীমা অতিক্রম করো না। কারণ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন না।" (সূরা আল আ'রাফ–৩০)

ব্যক্তির এহেন দায়িত্বশীলতা তার স্থানে পূর্ণরূপে বর্তমান আছে। প্রত্যেক মানুষ তার নিজস্ব কর্ম দ্বারাই আদান-প্রদান ও লেন-দেন করে। সৎ-অসৎ ভাল-মন্দ সে যা কিছুই করুক না কেন, তার একটি প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া তার প্রতিবেশীদের প্রতি পড়ে। দুনিয়া বা আখরাত যেখানে হোক না কেন কোথাও এ ব্যাপারে কেউ তার সাহায্য আসবে না। কুরআন বলছে ঃ

كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ـ

"প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্বীয় কর্মের মধ্যে বন্দী হয়ে আছে।" (সূরা মুদ্দাসির–৩৮)

ام لم ينبا بما فى صحف موسى ـ وابراهيم الذى وفى ـ الا تزر وازرة وزر اخرى ـ ان ليس للانسان الا ما سعى ـ وان سعيه سوف يرى ـ لم يجزه الجزاء الاوفى ـ

"হযরত মুসা (আঃ) এবং ইব্রাহীম (আঃ) এর কিতাবে কি কি বিষয় উল্লেখ ছিল সে বিষয় তারা কি কোনরূপ খবর রাখেনি? হযরত ইব্রাহীম (আঃ)এর প্রতি আল্লাহর যে বন্দেগী করার একটি প্রাপ্য অধিকার ছিল, সে অধিকার তিনি পূর্ণরূপে আদায় করেছেন। মনে রেখ! কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির (পাপের) বোঝা বহন করবে না। আর এ কথাও মনে রেখ যে, মানুষের জন্য ফলদায়ক কেবল সেই বস্তুটিই হবে যা পার্থিক জগতে থাকা কালীন সে স্বীয় চেষ্টা সাধ্য ও শক্তি সামর্থ দ্বারা অর্জন করে। আর পরকালে সকল চেষ্টার পরিণাম ফল তার সম্মুখে হাজির করা হবে এবং তাকে যথাযথ রূপে তার প্রতিদান দেওয়া হবে।" (সূরা নাজম–৩৬–৪১)

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ـ

"প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সে যে পরিমাণ নেক অর্জন করেছে, তার ফল তার জন্যই গচ্ছিত থাকবে। আর যা কিছু পাপ অর্জন করে তার প্রতিফলও তার প্রতিই বর্তাবে।" (সূরা বাকারা–২৮৬)

فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ

"যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথ অবলম্বন করে, সে তার নিজেরই উপকার সাধন করে। আর যে হেদায়েতের পথ ত্যাগ করে; সে গোমরাহ হয়ে নিজেরই ক্ষতি সাধন করে। (অপরের কিছু করে না) হে নবী! আপনি তাদের ঠিকাদার ওয়াকীল নন।" (সূরা আয্‌যুমুর ৪১)

وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ -

"যদি কোন ব্যক্তি পাপকার্যে লিপ্ত হয়, তবে তার মনে করতে হবে যে, সে তা নিজের জন্য অর্জন করতেছে।" (তার প্রতিফল তারই ভোগ করতে হবে অপরের নয়।) (সূরা নিসায়া–১১১)

ব্যক্তির উপর ইস্‌লামের আরোপিত এহেন বাধ্যতামূলক বিধান– সমূহের দ্বারা ব্যক্তির মধ্যে স্বাভাবিক রূপে এ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় যে, ব্যক্তি তার নাফ্‌সের রক্ষক সে নিজেই হয়। সে যখন গোমরাহীর পানে অগ্রসর হয়, তখন তাকে সে ঘাড় ধরে হেদায়েতের পথে নিয়ে আসে এবং সাথে সাথে তার একান্ত অপরিহার্য প্রাপ্য দাবী-দাওয়া ও অধিকার সমূহকে সর্বদা পুরণ করে। আর যদি নাফ্‌সের থেকে ভুলভ্রান্তি প্রকাশ পায়, তবে কেন পেল তার কড়ায় গণ্ডায় হিসাবও তার থেকে সে বুঝিয়ে নেয়। আর যদি সে নিজে কোনরূপ অলসতা প্রকাশ করে, তবে তার প্রতিফল সে নিজেই ভোগ করতে থাকে।

ইস্‌লাম ব্যক্তিকে এমনিরূপ পূর্ণ স্বাধীনতা ও মানবিক সাম্য দান করার সাথে সাথে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে এমন দুটি মহত গুণের ও ব্যক্তিত্বের জন্ম দেয়, যা সর্বদা একটি অপরটির প্রতি তীক্ষ্মদৃষ্টি রাখে। আর ভাল মন্দ কল্যাণ অকল্যাণের ব্যাপারে একে অপরের সাহায্য সহানুভূতি করার কর্তব্যও সম্পাদন করে। সুতরাং স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীলতা মর্যাদার দিক দিয়ে উভয়ই সম্মানের অধিকারী এবং একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল ও পরিপূরক।

ইসলাম যে ব্যক্তি এবং তার বংশের নিকটস্থ আত্মীয় স্বজনের মধ্যে পারস্পরিক রক্ষণাবেক্ষণ ও দায়িত্বশীলতাকে অপরিহার্য রূপে বাধ্যতামূলক বিধানে পরিণত করে দিয়েছে; কুরআনে করীমের নিম্নলিখিত আয়াতগুলিই তার জলন্ত প্রমাণ ঃ

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ـ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَاتَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ـ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ـ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ـ

"পিতা মাতার সাথে সর্বদা ভাল আদান প্রদান করো। যদি তাদের মধ্যে একজন অথবা উভয়ই বৃদ্ধতার শিকারে পরিণত হয়, তখনো তাদের সাথে এমন কোন ব্যবহার দেখাবে না, যাতে করে তাদের মুখ্য থেকে মনের দুঃখে "উহ" শব্দটি নিঃসৃত হয়। আর তাদের কথার উত্তরে ধমক ও ভৎসনা দিয়ে জবাব দিয়ো না। বরং আদবএহ্তেরামের সাথে তাদের সাথে কথোপকথন করো ও জবাব দাও। আর সর্বদা বিনয় ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে একান্ত অনুগত হয়ে তাদের সম্মুখে বাহুদয়কে অবনমিত কর। আর আল্লাহর দরবারে এ বলে মুনাজাত করো-দয়াময় রাব্বুল আলামিন! আমাদের শৈশবকালে যেরূপ স্নেহাশীষ দিয়ে আমাদেরকে লালন-পালন করেছে, ঠিক অনুরূপ স্নেহ ভালবাসা দিয়ে তাদের প্রতি আপনার অনুগ্রহরাশী বর্ষণ করুন, আমিন।" (সূরা বণী ইস্রাইল-২৩-২৪)

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهُ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ـ

"আমি মানুষকে তাদের পিতা মাতার সাথে ভাল আদান প্রদান করার নির্দেশ দিয়েছি। কারণ মাতা তাদেরকে গর্ভে ধারণ করে তারা কত না নির্মম কষ্ট সহিষ্ণুতার সাথে বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছে। (তার খবর কি তাদের জানা আছে?) (এমন কি) তার জন্ম হবার পর দু'টি বৎসর পর্যন্ত বহু দুঃখ কষ্ট বরণ করতঃ লালন-পালন করে তার দুগ্ধ পান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই তাদের উচিত আমার এবং তার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্যা প্রকাশ করা। (সূরা লোকমান-১৪)

وَاُولُوالاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ

"গর্ভাশয়ের দিক দিয়ে যারা আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ, তাদের কতিপয়কে কতিপয়ের তুলনায় আল্লাহর বিধানে নিকটতম ও প্রধান এবং অগ্রণীয় অধিকারী নিরূপণ করা হয়েছে। (সূরা আহযাব-৬)

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِاالْمَعْرُوْفِ ـ

"যে পিতা তার সন্তানকে পূর্ণ মুদ্দাৎ পর্যন্ত দুগ্ধ পান করাতে ইচ্ছুক, সেই সন্তানের মাতাগণ যেন পূর্ণ দু'টি বৎসর মুদ্দাৎ পর্যন্ত দুগ্ধ পান করায়। এমতাবস্থায় সন্তানের পিতাকে তাদের ভরণ-পোষণের সম্ভাব্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বহন করতে হবে।" (সূরা বাকারা-২৩৩)

পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক রক্ষণাবেক্ষণ ও দায়িত্বশীল হবার গুরুত্ব দানের ব্যাপারে শুধু এতটুকই বলা যায় যে, ইসলামের এহেন নীতিমালা এ সংস্থার বিভিন্ন গ্রুপের লোকদেরকে একই সুতায় সুসংগঠিত করে গড়ে তোলার একটি মৌলিক পদ্ধতি। পরিবার হলো সামাজিক সৌধ কাঠামোর ভিত্তি প্রস্তর স্বরূপ। তার মূল্যমানের স্বীকারোক্তি থেকে পলায়ন আদৌ সম্ভব নয়। পারিবারিক এ সংগঠনটি মানব প্রকৃতির গভীর তলদেশের সাথে সম্পৃক্ত। স্নেহ-ভালবাসা দয়া অনুগ্রহ প্রবণতা ও অন্তরংগতার পবিত্র চেতনাবোধ এবং প্রয়োজন ও উপযোগিতার স্বভাবগত পূর্ণ চাহিদার উপর এটি প্রতিষ্ঠিত। আর এ সংগঠনটি একটি দোলনা স্বরূপ, যেখানে মানব চরিত্রের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণাবলী তথা মহত্ব শিষ্ট্যচারিতা আদব আখ্‌লাক ইত্যাদির লালন-পালন হয়। আর প্রকৃত পক্ষে যদি গভীর ভাবে তলিয়ে দেখা হয়। তবে এটাকে সেই সমাজের আদব আখ্‌লাক ও রীতিনীতি বলতে হবে, যা জীব-জন্তুর সাধারণ আচরণ ও বন্য প্রকৃতির পশুত্বের বর্বরতাপূর্ণ আচরণ থেকে মানুষকে করেছে মহান ও উন্নত।

কমিউনিজমের উদ্দেশ্য ছিল "পারিবারিক" সংগঠনকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেওয়া। তাদের যুক্তি ছিল যে, পারিবারিক ব্যবস্তাপনার দ্বারা ব্যক্তিগত মালিকানা ও ব্যক্তিকে প্রধান্য দানের চেতনাবোধের লালন পালন হয়। আর

সম্পদের সামগ্রিক মালিকানা এবং ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের অধীনে সম্পূর্ণরূপে নিয়ে যাবার পথে বাঁধা ও অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আসল তথ্য অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, এ ব্যাপারে কমিউনিজম সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে এবং তার মুখে পড়েছে চুনকালি। কারণ, রুশীয় সমাজ এখনো পারিবারিক ব্যবস্থাপনার উপরই প্রতিষ্ঠিত। সেখানের মানুষের মনমগজে এবং তাদের তামাদ্দুনিক ইতিহাসে পারিবারিক সংগঠন একটি বিশেষ মর্যাদার আসন অধিকার করে আছে। উপরন্ত এটাও একটি সত্য কথা যে পরিবার সেখানে শুধু একটি সামাজিক সংগঠনই নয়, বরং তা সেখানে ব্যক্তিগত ও জীবন ভিত্তিক ব্যবস্থাপনাও বটে। সুতরাং একটি নারীকে শুধু একজন পুরুষের অধীনস্থ করে দেওয়া জীবন ভিত্তিকতার দিক দিয়ে খুব ভাল উপযোগী ব্যবস্থা এবং ভালশিশু জন্ম দেওয়ার ব্যাপারে একটি উত্তম পথ বিশেষও। বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, নারীদের পরপর কয়েকজন পুরুষের অধীনস্থ হয়ে জীবন-যাপন করার পরিণাম ফল খুবই মারাত্মক। কিছু দিন পর তাদের মধ্যে বন্ধ্যাত্বতা দেখা দেয়। অথবা শিশু যদি জন্ম নেয় তাও হয় রোগা। ব্যক্তিগত দিকের প্রতি লক্ষ্য করা হলে দেখা যায় যে, স্নেহ ভালবাসা ও দয়া অনুগ্রহের চেতনা অনুভূতি অন্যকোন ব্যবস্থাপনার তুলনায় পারিবারিক ব্যবস্থার মধ্যে উত্তম রূপে তার উৎকর্ষতা ও সমৃদ্ধি সাধন হয়। এমনি ভাবে ব্যক্তিত্বের পুনর্বিন্যাস ও উন্নয়ন এ সংগঠনের মধ্যেই অন্যান্য ব্যবস্থাপনার তুলনায় খুব উত্তম পথে ও পুর্ণরূপে সম্পাদন হয়ে থাকে।

বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় শিশু পালন কেন্দ্রে প্রতিপালিত শিশুদের উপর পরীক্ষায়-নিরীক্ষার অভিজ্ঞতা দ্বারা একথা প্রমাণ হয়েছে যে, যে সকল শিশুদেরকে পরপর কয়েকজন ধাত্রী দুগ্ধ পান করায় তাদের ব্যক্তিত্ব; চাঞ্চল্যপনা বিরক্তিবোধ দুর্ভাবনা ও বিক্ষিপ্ততার শিকারে পরিণত হয়। পুর্ণরূপে তাদের মধ্যে স্নেহ-মমতা ও সাহায্য সহানুভূতির চেতনাবোধের উন্মেষ হয় না। এমনি রূপে পিতৃহীন জারজ সন্তানরা নীচুতা ও হীনমন্যতার রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে কোন একজনকে খেয়ালী পিতা বানিয়ে সেই সত্য থেকে পলায়নের চেষ্টা করে যার আসল কোন অস্তিত্ব বলতে কিছুই থাকে না। বস্তুত; সে ধারণা জগতে বসেই কেবল তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। তার খেয়ালীপনা ও ধারণা তাকে বিভিন্ন রূপ দান করে। পারিবারিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা ও তাকে দৃঢ়করণের ব্যাপারে শুধু কেবল জীবন ভিত্তিগত ও ব্যক্তিগত কার্যাবলীই তার পেছনে ক্রিয়াশীল নয়। বরং প্রয়োজন ও উপযোগিতার এমন কতকগুলি দাবী ও অধিকার রয়েছে, যা একটি পুরুষ ও একটি নারীর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়ে একটি পরিবারের জন্ম দেয় এবং শিশুদের লালন-পালন ও রক্ষণা বেক্ষণের ব্যবস্থাপনা করে। এরপর সেই

সকল সম্পর্ক ও সম্বন্ধের কথা আলোচনা করতে চাই যার দ্বারা একটি পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তিকে একই সুতায় গেঁথে সকলকে মিলিয়ে একটি একাত্মরূপী মালা তৈয়ার করে এবং পরবর্তী জীবনে তার বংশানুক্রমে ও শিক্ষিত-অশিক্ষিত একে অন্যের বন্ধু ও সহযোগী রূপে জীবন সংগ্রামের বিস্তীর্ণ ময়দানের পানে অগ্রসর হতে থাকে। এটাই হলো সামাজিক জীবনে পারিবারিক সংগঠনের স্বাভাবিক গতিধারা। ইসলামী জীবন বিধানে পারিবারিক জীবনে একে অপরের সহযোগী, দায়িত্ববান ও একে অন্যের রক্ষা কবচ হবার যে বিধান করে দিয়েছে, তন্মধ্যে ইস্‌লামের মীরাসী বিধানগুলি বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ বিষয়। এখানে কুরআনে করীম থেকে এ বিষয় দু'টি আয়াত উল্লেখ করছি। আল্লাহ্ বলেন ঃ

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنْثَيَيْنِ ـ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ
ثُلُثَا مَا تَرَكَ ـ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا نِّصْفُ ـ
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ
كَانَ لَهُ وَلَدٌ ـ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ
الثُّلُثُ ـ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ـ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ـ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ـ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ـ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ
أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ ـ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ

لَكُمْ وَلَدٌ - فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا
تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْدَيْنٍ -

"পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তোমাদের সন্তানদের প্রাপ্য অংশের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে হেদায়েত দিচ্ছেন যে দু'জন নারীর একাত্রের সমপরিমাণ অংশ পাবে একজন পুরুষ। আর মৃত ব্যক্তির ওয়ারীসদের মধ্যে যদি মেয়ের সংখ্যা দু'এর অধিক হয়, তবে তাদেরকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ দিতে হবে। আর যদি শুধুমাত্র একটি মেয়েই ওয়ারীস থাকে, তবে এমতাবস্থায় সে পাবে সমুদয় সম্পত্তির অর্ধাংশ। আর মৃত ব্যক্তি যদি ছেলে সন্তান রেখে যায়, তবে মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতা প্রত্যেককে সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ দিতে হবে। ছেলে সন্তান না থাকা অবস্থায় পিতা-মাতাই তার ওয়ারীস হবেন এবং মাতাকে এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তি দিতে হবে। ওয়ারীসানদের এহেন অংশ কেবল তখনই তারা অবশিষ্ট সম্পদ থেকে পাবে, যখন মৃত ব্যক্তির ঋণশোধ এবং তার সমুদয় সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ দ্বারা অসীয়াত পুরণ করে দেওয়া হবে। তোমাদের পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে উপকার লাভের দিক দিয়ে কে তোমাদের নিকটতম সে বিষয় তোমরা অবগত নও–এ সকল অংশাবলী আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। নিশ্চয় তিনি সকল রহস্য ভেদ ও সমুদয় বিষয় সম্পর্কে ভালরূপে ওয়াকিফহাল রয়েছেন। আর তোমাদের স্ত্রীগণের পরিত্যক্ত সম্পত্তি তাদের সন্তান না থাকা অবস্থায় অর্দ্ধাংশ তোমরা পাবে। আর সন্তান-সন্ততি থাকা অবস্থায়, তাদের ঋণশোধ ও অসীয়াত পুরণ করার পর অবশিষ্ট সম্পদের এক চতুর্থাংশ তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর তোমাদের সন্তান-সন্ততি না থাকলে তারা তোমাদের সম্পদের এক চতুর্থাংশ পাবে। আর সন্তান থাকা আবস্থায় স্ত্রীদের অংশ হলো এক অষ্টমাংশ। এ অংশ তাঁদেরকে তখনই দেওয়া হবে, যখন তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে তাদের ঋণশোধ এবং অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে অসীয়াত পুরণ করে। অবশিষ্ট থাকবে।" (সূরা নিসায় -১১-১২)

يَسْتَفْتُونَكَ - قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ -
إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ
مَا تَرَكَ - وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ - فَإِنْ

كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ - وَاِنْ
كَانُوْا اِخْوَةً رِجَالاً وَّنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْاُنْثَيَيْنِ ط يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا - وَاللّٰهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ -

“(হে নবী) মানুষ আপনার নিকট কেলালা সম্পর্কে ফতুয়া জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন যে, আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কে এ ফতুয়া দিয়েছেন যে যদি কোন ব্যক্তি সন্তানহীন অবস্থায় মরে যায় এবং তার যদি একটি ভগ্নি থাকে, তবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি সেই ভগ্নিই পাবে। আর যদি সেই ভগ্নি সন্তানহীন অবস্থায় মারা যায়, তবে ভাই তার ওয়ারীস হবেন। আর যদি মৃত ব্যক্তির দু’জন ভগ্নি থাকে, তবে তারা পরিত্যক্ত সম্পদের দুই তৃতীয়াংশের অধিকারী হবে। আর যদি কয়েকজন ভাই বোন রেখে যায় তবে নারীরা সমস্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশ এবং পুরুষরা দুই তৃতীয়াংশ পাবে। তোমরা যাতে করে পথভ্রষ্ট না হও, সেজন্য তিনি তার বিধানকে বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করলেন। প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ওয়াকিফহাল রয়েছেন।

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ
خَيْرَا نِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ
بِالْمَعْرُوْفِ - حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ -

“যদি তোমাদের মধ্যে কাহারো মৃত্যু সময় উপস্থিত হয় এবং সে যদি ধন সম্পদ রেখে যায়, তবে তোমাদের প্রতি পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনের জন্য ন্যায়-নীতি মত অসীয়াৎ করে যাওয়াকে অবশ্য কর্ত্তব্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এটা আল্লাহ ভীরু মোত্তাকী লোকদের অবশ্য করণীয় কাজ।” (সূরা বাকারা-১৮০)

ইসলামের এহেন অসীয়াতের ব্যবস্থা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে ঋণশোধ করার পর অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশের অধিক হবে না। আর তা কোন ওয়ারীসদের বেলায়ও করা যাবে না। কারণ হাদীস শরীফে কোন

ওয়ারীসদের বেলায় অসীয়াত করাকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। (لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) পরিবারের যদি এমন কোন ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের সত্ত্বান হওয়া থেকে বঞ্চিত হয় যার সাথে ভাল আদান প্রদান করে এবং তার সাথে সৎ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা পারিবারিক সম্পর্কের অনিবার্য দাবী। কেবল এমতাবস্থাই ইস্‌লাম অসীয়াতের অবকাশ রেখেছে। এ ছাড়া অসীয়াতের সম্পদ দ্বারা সমাজের অন্যান্য কল্যাণ ও সেবামূলক কাজ সম্পাদন করারও সুবর্ণ সুযোগ দান করেছে।

ইস্‌লামের রচিত এহেন বিধানবলী পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি এবং পরস্পরা আগত বিভিন্ন বংশাবলীর মধ্যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহনুভূতিশীল দায়িত্ববান ও রক্ষাকবচ হবার একটি বাস্তব প্রদর্শন। এ মীরাসী বিধান দ্বারা একদিকে যেমন সম্পদ সমাজের মধ্যে সুষম ভাবে বন্টন হয়। অনুরূপ তা যাতে করে এক হাতে পঞ্জীভুত হয়ে সামগ্রিক সমাজের জন্য ভীতির ও অসুবিধার কারণ হয়ে না দাঁড়ায়, সে পথও রুদ্ধ করে। (সামনে ইস্‌লামী অর্থনীতির আলোচনায় বিশদ দ্রষ্টব্য) এখানে শুধু এতটুকু কথা বলতে চাই যে, ইস্‌লামের এহেন মীরাসী বিধান পারিবারিক জীবনের পরিমণ্ডলে পরিশ্রম, বিনিময়, অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে পারস্পরিক তুলনার একটি মধ্যস্থতার উপকরণে পর্যবসিত হয়। প্রত্যেক পিতাই এই মনে করেই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করে যাতে তার পরিশ্রম লব্ধ সম্পদ তার নিজ জীবনের স্বল্প পরিসরে সীমাবদ্ধ না হয়। তা যেন তার পরবর্তী জীবনে অবশিষ্ট রয়ে তার পুত্র পৌত্রদেরও কল্যাণ সাধন করতে পারে। যাকে তার ভবিষ্যৎ জীবনের “পাথেয়” নামে অবিহিত করা হয়। সে অধিক পরিমাণে সম্পদ অর্জন করার বেলায় এ জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে যে তার ভিতর যেমন তার দেশের কল্যাণও নিহিত রয়েছে, অনুরূপ সমগ্র মানবতার এবং তার দেশের কল্যাণও তাতে নিহিত। এ ছাড়া তার ব্যায় কৃত শ্রম ও তার প্রাপ্য প্রতিদানে একদিক দিয়ে একটি সমতাও সৃষ্টি হয়। কারণ, তার সন্তানগণ তারই একটি অংশ বিশেষ। তাদের স্থায়ীত্বতায় তার নিজের জীবনের স্থায়ীত্বতা এবং তার বংশানুক্রমিক ধারাই পরিদৃষ্ট হয়।

সন্তান সন্ততিগণ স্বীয় পিতা-মাতার পরিশ্রম লব্ধ ধনসম্পদ দ্বারা উপকৃত ও লাভবান হওয়া এটা ইন্‌সাফ ও সুবিচারের স্বভাবগত দাবী। কেননা ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী হবার সম্পর্ক যদি কেটে দেওয়াও হয়, তবুও পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যে একটি নিবিড় রক্তের সম্পর্ক বিরাজমান থাকে, তা

কখনো শেষ হয় না। পিতা-মাতাগণ সন্তানের মানসিক ও দৈহিক গঠন প্রকৃতির মধ্যে উত্তরাধিকারী সুত্র দ্বারা এমন সব গুণাবলী ও স্বাভাবগত ক্ষমতা ও দক্ষতার মূল উপাদান সম্প্রসারিত করে দেয়, যা জীবনভর কখনো তা তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না এবং তার ভবিষৎ জীবনের অবস্থাকে একটি সীমারেখা পর্যন্ত নির্দিষ্ট করে দেয়। আর তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে এ অবস্থা যেমন খারাপ হবার সম্ভাবনা আছে, অনুরূপ তা ভালও হতে পারে। রাষ্ট্র বা সমাজ সন্তানদের প্রতি যতই প্রবল চাপ সৃষ্টি করুক না কেন, কখনো উত্তরাধিকারী হবার গুণাবলীকে অস্বীকার করা অথবা তার মধ্যে কিছু রদ-বদল ও পরিবর্তন আনয়ন করার ক্ষমতা কোন সন্তানের নেই। তা তাদের শক্তির বর্হিভূত কাজ। কিন্তু যে সন্তানকে তার পিতা-মতা একটি খারাপ ধরনের উত্তরাধীকারী করে দিয়েছে, তাকে সর্বসুন্দর করে তোলাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। আর সে যখন উত্তরাধিকারীর মধ্যে দৃঢ়চেতাহীন ও অসামঞ্জস্যতা লাভ করেছে, তখন তাকে স্বভাব প্রকৃতির দিক দিয়ে সংযত চিত্ততা এবং দৈহিক দিকদিয়ে সুস্থ সাবলীলতা দান করতে পারে না। অনুরূপ ভাবে পিতা-মাতা স্বভাবগত রোগা হওয়া, তাড়াতাড়ি বৃদ্ধ হওয়া এবং অর্কমন্য হওয়ার মূল উপাদান যদি ভরে দেয়, তবে তারা তাকে কখনো দীর্ঘ বয়স ও সুস্থ সাবলীল আনন্দ মুখর স্বাস্থ্যও দান করতে পারে না। যখন তাকে এ সবকিছু বিনা ইচ্ছায় অপারগতঃ বাধ্য হয়ে গ্রহণ করে নিতে হয়, তখন সামাজিক সুবিচার ও ইন্‌সাফের স্বাভাবিক দাবী অনুযাই যাতে করে তার লাভ ক্ষতির মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমতা সৃষ্টি হয়, তার জন্য তাকে স্বীয় পিতা-মাতার জাগতিক জীবনের পরিশ্রম লব্ধ ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয়।

পিতা মাতা ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি দায়িত্ববান হওয়াকে কুরআনে করীম হযরত মুসা (আঃ) এবং খিজির (আঃ) এর মধ্যে সংঘঠিত ঘটনাটিকে একটি উদাহরণ দ্বারা পরিষ্কার রূপে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন– আমি তাকে আমার তরফ থেকে বিশেষ রহমত দান করেছি এবং একটি বিশেষ জ্ঞানে তাকে পারদর্শি করেছি।"

فَانْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا اَتَيَا اَهْلَ قَرْيَةِ نِ اسْتَطْعَمَا
اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْ هُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا

جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ ـ

"অতঃপর সে পথ চলতে চলতে একটি বস্তীতে গিয়ে উপস্থিত হলো। সেখানে অধিবাসীদের নিকট মেহমান হবার প্রস্তাব করলে তারা মেহমানদারী করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলো। উক্ত বস্তুর ভিতর ধ্বংসের মুখে নিপতিত প্রায় একটি প্রাচীর দেখে সে তা মেরামত করে আবার পূনঃ প্রতিষ্ঠিত করে দিল।" (সূরা কাহাফ-৭৭)

যখন বস্তীর অধিবাসীবৃন্দ মেহমানদারী করতে অস্বীকৃতি জানালো, তখন হযরত মুসা (আঃ) খিজির (আঃ) এর এ কাজ করে দেওয়ার প্রতিদানে তাদের নিকট মুজুরী দাবী করার অভিযোগ উত্থাপন করলো। তখন খিজির (আঃ) এ প্রাচীরটি পুনঃ নির্মাণ করার আসল তথ্য বর্ণনায় বললেন ঃ

وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِى الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ـ فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَا اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِىْ ـ

"এ প্রাচীরটি ছিল দু'টি এতীম শিশুর, যারা এ বস্তীরই অধিবাসী। এ প্রাচীরটির তলদেশে তাদের জন্য গুপ্তসম্পদ নিহিত রয়েছে। তাদের পিতা ছিল একজন সৎ ও আল্লাহ ভীরু লোক। এ জন্যই আল্লাহর ইচ্ছা হলো যে, শিশু দু'টি বালেগ হবার পর যেন উক্ত সম্পদ বাহির করে নিতে পারে। সুতরাং এ কাজ আমার ইচ্ছায় করিনি। বরং আল্লাহর রহমত ও গোপন ইশারার ভিত্তিতেই তা করেছি।" (সূরা কাহাফ-৯৮)

অবুঝ শিশু দুটি এমনিভাবে পিতার সদাচারণ দ্বারা লাভবান হওয়া এবং যে ধনসম্পদ তাদের জন্য রেখে গিয়েছে তার ওয়ারীস হয়েও ছিল। অতএব ইন্সাফের দৃষ্টিতে উক্ত প্রাচীরটি পুনঃনির্মাণ যে ঠিক কাজ হয়েছে, তাই কুরআনের বর্ণনা দ্বারা প্রতিভাত হয়। এ ছাড়া যখন ধন-সম্পদ কোন একটি বিশেষ সীমারেখার পরিমণ্ডলের মধ্যে নিহিত থাকার সন্দেহ হয়, সে ক্ষেত্রে

আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়াত মুতাবিক মুসলিম শাসকবর্গের জন্য অবস্থার পরিবর্তন করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ও পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ইস্‌লামে নির্দেশ রয়েছে। ব্যক্তি সে নিজস্ব বিশেষ উপকরণ দ্বারা কাজ করে নিজের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করে নেওয়ার জন্য ইস্‌লাম সকলকে সমভাবে নিশ্চয়তা দান করেছে। এখানেও ব্যক্তি এবং সমাজ এবং সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক দায়িত্বান হবার নীতিই ক্রিয়াশীল। এ নীতি উভয়ের উপরই কিছু কিছু দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার ন্যস্ত করে। আর উভয়কেই দান করে কিছু কিছু সম পরিমাণ অধিকার। এ ব্যাপারে ইসলাম উভয়ের স্বার্থ ও কল্যাণকে শেষ পর্যন্ত একটি অপরটির সাথে জুড়ে দিয়ে একাকার করে দেয়। আর এ দু'য়ের মধ্যে যে জীবনের জাগতিক আধ্যাত্মিক ও নীতিগত যে কোন দিকের সাথে সম্পর্কীয় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অবহেলা প্রর্দশন করে, তাকেই সে শাস্তি দেয়। বস্তুতঃ সর্বপ্রথম প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব হলো যে তার প্রতি যে কাজ সম্পাদন করার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে, সে কাজকে যথাযথ রূপে সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করা। কারণ তার পরিশ্রম লব্ধ সম্পদের আসল মালিকানা হলো সমাজিক মালিকানা। কেননা, তার ভালমন্দের প্রভাব পরিণতি শেষ পর্যন্ত সমাজের উপরই পতিত হয়।

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ -

"হে নবী আপনি বলুন যে, তোমরা কাজ করে যাও। তোমাদের কর্মধারা আল্লাহ্ তায়ালা, তার রাসুল এবং মুমিনগণ সকলেই অবলোকন করবেন।" (সূরা তাওবা–১০৫)

প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমাজের স্বার্থ ও কাল্যানের পানে এমনরূপে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন, তাকে তার পাহারাদার ও রক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। কেননা, জীবন হলো মহাসমুদ্রের স্রোত ধারার সাথে চলমান নৌকা স্বরূপ। যার নিরাপত্তার ব্যাপারে সকল যাত্রীর সমভাবে দয়িত্বান থাকতে হয়। স্বাধীনতার অজুহাত দেখিয়ে স্বীয় স্থানে ছিদ্র করে দেওয়ার অধিকার কাহারো নেই। এ বিষয়টি রাসুলে করীম (সাঃ) একটি উদাহরণের মাধ্যমে সুন্দর রূপে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

"আল্লাহর অঙ্কিত সীমারেখা যারা মেনে চলে, আর যারা তা অতিক্রম করে তাদের উদাহরণ হলো– যেমন কিছু লোক একটি জাহাজে আরোহণ করলো। তাদের কতক লোক জাহাজটির উপর তালাকে থাকার জন্য স্থান নির্বাচন করে

নিল। আর কতক লোক নিল নিচের তালাকে। যারা নীচের তালায় অবস্থান করে তাদের পানি পান করার জন্য উপর তালার লোকদের নিকট যেতে হয়। কারণ পানির পাত্র উপর তালায় রাখা হয়েছে। সুতরাং নীচের তালার লোকেরা মনে করলো যে, পানির কাজ সম্পন্ন করার জন্য উপরের যাওয়ার চেয়ে আমাদের নীচ তালা দিয়ে একটি ছিদ্র করে নিলে কতইনা ভাল হয়। উপর তালার লোকেরা আমাদের দৌরত্ম্যের কাষ্ট থেকে বেঁচে যায়। অতএব লোকেরা সকলে যদি নীচতালার লোকের ইচ্ছা পুরণ করার সুযোগ দান করে, তবে তারা সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি তাদেরকে এ কাজ থেকে বিরত রাখে, তবে তারা যেমন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায় অনুরূপ সকলেই মুক্তি পায়।" (বুখারী তিরমিযী)

ব্যক্তির স্বার্থ ও কল্যাণ পরস্পর বিজড়িত এবং একে অন্যের উপর নির্ভরশীল হওয়ার এটা এমনি একটি চিত্তাকর্ষক উদাহরণ, যা ব্যক্তি কেন্দ্রিক চিন্তাধারার মোকাবেলায় তুলে ধরা হয়েছে। আর যা নীতি ও দর্শনের বাহ্যিক ও উন্নত সমতল ভূমির আশ্রয় গ্রহণ করতঃ বাস্তব সত্যের গভীর তলদেশে অবতরণ করতে এবং ঘটনা জগতের বাস্তব পরিণামের দিকে লক্ষ্য রাখার তাকীদ বহন করে থাকে। আর এ উদাহরণটি খুব সুক্ষ্মভাবে ব্যক্তি এবং জামায়াতের তথা সমাজের প্রতি এমতাবস্থায় কি দায়িত্ব অর্পিত হয়, তাও সাথে সাথে আমাদেরকে বলে দেয়। সাধারণ মানুষের স্বার্থ ও কল্যাণের পানে লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব থেকে সমাজের কোন ব্যক্তিই মুক্ত নয়। একই সময় প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন সমাজের রক্ষক, অনুরূপ সে নিজে সমাজের সকলের পর্যবেক্ষণের অধীন ব্যক্তি। হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) বলেন।

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ -

"তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই রক্ষক, ও পাহারাদার। আর তাদের পর্যবেক্ষণ ও পাহারাদারীর অধীন করে যাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তাদের সম্পর্কেও তোমাদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" (মুসলিম ও বুখারী)

সমাজের লোকদের মধ্যে সৎ ও ন্যায় নীতির সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করে একে অন্যের সাহায্য সহানুভূতি করে যাওয়া সামাজিক স্বার্থ ও কল্যাণের মুল দাবী এবং একটি অপরিহার্য কর্তব্য। পবিত্র কুরআন মজীদে আল্লাহ বলেন ঃ

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ -

"সৎ, কল্যাণ ও আল্লাহ ভীরুতার কাজে একে অন্যের সাহায্য সহানুভূতি করো। অন্যায় ও খারাপ কাজে সাহায্য সহানুভূতি করো না।" (সূরা মায়েদা–২)

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ

"তোমাদের মধ্যে এমনকিছু সংখ্যক লোক অবশ্যই থাকা উচিত যারা মানুষকে সৎকাজের আহ্বান জানাবে। কল্যাণমূলক কাজের নির্দেশ দিবে। আর অন্যায় ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে।" (সূরা আলে ইমরাণ–১০৪)

আমরু বিল মায়া'রুফের (সৎকাজের নির্দেশ দান) ব্যাপারে প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট সতন্ত্ররূপে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সে যদি তার এ কর্তব্য সম্পাদন না করে, তবে সে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। তাকে অপরাধের বিনিময়ে শাস্তিও ভোগ করতে হবে। এ বিষয় কুরআনে করীমের ঘোষণা যে কত কঠোর তা সত্যই প্রাণিধানযোগ্য। আল্লাহ বলেন ঃ

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ـ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ـ ثُمَّ فِىْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ـ اِنَّهُ كَانَ لَايُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ـ وَلَايَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ـ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ـ وَّلَا طَعَامٌ اِلَّامِنْ غِسْلِيْنٍ ـ لَّا يَاْكُلُهٗ اِلَّاالْخَاطِئُوْنَ ـ

"তাকে গ্রেফতার করে তার গলদেশে তাওক ঝুলিয়ে দাও। তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে সত্তর গজ লম্বা জিঞ্জির দ্বারা বেঁধে দাও। নিশ্চয় এরা কখনো মহান আল্লাহ প্রতি ঈমান আনেনি, আর মিসকীন ও অভাবীদেরকেও পানাহার করাবার জন্য মানুষকে উৎসাহিত করতো না। অতএব এখানে তার কোন খাদ্য নেই; আর কোন বন্ধু বান্ধবও নেই। ক্ষতস্থানের বিগলিত পুঁজই হলো তাদের একমাত্র খাদ্য। এ খাদ্য পাবার উপযুক্ত কেবল ঐ সকল ব্যক্তিবর্গই যারা নাফরমান ও অপরাধী। (সূরা আল হাক্কাহ–৩০-৩৭)

গরীব মিসকীন ও অভাবীদেরকে খাদ্য খাওয়ার জন্য মানুষকে উৎসাহিত না করাকে ইসলামে কুফরী ও দ্বীনকে মিথ্যা জানার প্রকাশ্য নজীর রূপে গণ্য হয়। পবিত্র কুরআন করীমের ঘোষণা ঃ

أَرَءَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ـ فَذَالِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ـ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ـ

"(হে নবী) আপনি কি ঐ সকল লোকদেরকে দেখেছেন, যারা পরকালের দান প্রতিদান ও শাস্তিকে মিথ্যা জানে। তারা হলো সেই লোক, যারা এতিমদেরকে গলা ধাক্কা দিয়ে বাহির করে দেয়, এবং মিসকীন ও অভাবীদেরকে খাদ্য দেওয়ার জন্য মানুষকে উৎসাহিত করে না।" (সূরা আল মাউন)

সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব হলো যে সমাজের অনাচার অবিচার জুলুম অত্যাচার এক কথায় সকল প্রকার শরীয়ত গর্হিত কাজের অবলুপ্তি ও নিরসনের জন্য যথাসম্ভব সর্বপ্রকার শক্তি প্রয়োগ করা ও চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। এ ব্যাপারে ইস্‌লামের নির্দেশ হলো এই ঃ

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذَالِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ ـ

"তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি কোনরূপ অন্যায় কাজ হতে দেখে, তবে শক্তি প্রয়োগ করে তার অবলুপ্তি ঘোষণা করা উচিত। আর যদি শক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতা না থাকে, তবে মুখ দ্বারা তা নিবারণ করা উচিত। এটাও যদি সম্ভব না হয়, তবে মনে প্রাণে সেই কাজের প্রতি ঘৃনা পোষণ করা উচিত। এটাই হলো দুর্বল ঈমানের পরিচয়। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাই)

এ হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজে অনুষ্ঠিত সর্ব প্রকার অন্যায় অবিচার ও শরীয়ত বিরোধী কাজের জন্য সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই জবাবদিহি করার জন্য দায়ী থাকতে হয়– চাই সে উক্ত কাজের মধ্য নিজে অংশ গ্রহণ করে থাকুক কিম্বা নাই থাকুক তা ধর্তব্য হবে না। কারণ সমাজ হলো এমন একটি সম্মিলিত

প্রতিষ্ঠান, যার মধ্যে অনাচার অবিচার ও শরীয়ত গর্হিত কাজ খুবই ক্ষতিকর। আর সমাজকে এ সকল দুরাচার থেকে মুক্ত রাখা সকল ব্যক্তিরই দায়িত্ব ও কর্তব্য। অনুরূপ সমাজ নিজে যদি সমাজভুক্ত লোকদের থেকে প্রকাশিত শরীয়ত গর্হিত কাজের বেলায় কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব ক্ষমা প্রদর্শন বা লক্ষ্যের আড়ালে রেখে নীরব দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করে, তবে তারও জবাবদিহী করতে হবে এবং ইহাকাল পরকাল উভয় স্থানেই শাস্তি ভোগ করতে হবে। কারণ সমাজের প্রত্যক ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং তাদের চালক হিসেবে নিযুক্ত থাকা সরাসরি তাদের দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং তাদের থেকে কোনরূপ খারাপ কাজ প্রকাশ পেলে তা নিরসন না করার অর্থ হলো, তার উপর অর্পিত দায়িত্বকে অবহেলা করা। এ ব্যাপারে আল্লাহর স্বাভাবিক বিধানের প্রতি আমাদের সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا -

"আমি যখন কোন বস্তী বা এলাকাকে ধ্বংস করার ইচ্ছা পোষণ করি, তখন তার ধনাঢ্য ব্যক্তিদেরকে আমার নাফরমানীর নির্দেশ দেই। সুতরাং তারা যখন আমার নাফরমানীর কাজ করতে আরম্ভ করে, তখন উক্ত বস্তীর উপর আযাব নাযিল করার সিদ্ধান্ত হয়ে যায় এবং আমি তাকে ধ্বংস করে ধুলিস্যাত করে দেই।" (সূরা নবী ইস্রাঈল–১৬)

আল্লাহ এহেন নাফরমানীর কাজ থেকে যদি অধিকাংশ লোককেও বিরত থাকতে দেখা যায়; তা এখানে ধর্তব্য হবে না। বরং রক্ষক চালক ও নেতৃবর্গের এহেন নাফরমানী ও শরীয়ত বিরোধী কাজকে নীরবে সহ্য করে যাওয়াই তাদেরকে ধ্বংস ও বরবাদ করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে।

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً -

'তোমরা আল্লাহর সেই আযাব থেকে নিরাপদ থাকার চেষ্টা করো, যা বিশেষ রূপে শুধু ঐ সকল লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। –যারা সমাজের নাফরমান ও গুনাহগার।" (সূরা আনফাল–২৫)

কতক লোকের কারণে সমাজে আবাল বৃদ্ধ বণিতা পরহেজগার মুত্তাকী সকলের উপর আল্লাহর গজব নাযিল করা জুলুম বা বেইনসাফী বলতে কিছুই নয়। কারণ যে জাতির মধ্যে অশ্লীলতা নগ্নতা চরিত্রহীনতা ও নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপ বিপুল পরিমাণে প্রসার লাভ করে। আর প্রকাশ্য দিবালোকে যাদের মধ্যে শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ করার প্রবণতা অধিক মাত্রায় প্রবল থাকে, অথচ নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপ চিরতরে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য যাদের থেকে আদৌ কোন চেষ্টা চরিত্র চালান হয় না, সে জাতির সভ্যতা সংস্কৃতির মেরুদণ্ড সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। তারা যে অবশ্যই ধ্বংসের অন্ধকারাচ্ছন্ন গহীন কুয়ার তলদেশে নিপতিত হয়ে নিজেদের অস্তিত্বের অবলুপ্তি ঘোষণা করবে, তাতে কি আর সন্দেহ থাকতে পারে? তারা যে নীতি ও চরিত্র গ্রহণ করে নিয়েছে, তাই হলো তাদের ধ্বংসের অনিবার্য স্বাভাবিক পরিণাম ফল।

নৈতিকতা বিরোধী ও শরীয়ত গর্হিত কাজ থেকে বিরত না থাকা এবং তাকে চিরতরে খতম করার প্রচেষ্টা না করার দরুন বনী ইস্রাইলকে স্বীয় নবীদের দ্বারা অভিশপ্ত হতে হয়েছে এবং তাদের জাতীয় জীবনের জোয়ার ভাটা লেগে উন্নতি অবনতিতে পরিণত হয়েছে। এ বিষয় কুরআনে করীমের বর্ণনা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

لُعِنَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا مِنۡ بَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيۡسَى ابۡنِ مَرۡيَمَ ـ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوۡا وَّكَانُوۡا يَعۡتَدُوۡنَ ـ كَانُوۡا لَا يَتَنَاهَوۡنَ عَنۡ مُّنۡكَرٍ فَعَلُوۡهُ ـ لَبِئۡسَ مَا كَانُوۡا يَفۡعَلُوۡنَ ـ

"বণী ইসরাঈলদের মধ্যে যারা কুফরী ও আল্লাদ্রোহীতার পথ অবলম্বন করে নিয়েছে, তারা হযরত দাউদ (আঃ) ও ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ)-এর জবান দ্বারা অভিশপ্ত হয়েছে। কারণ তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। আর আল্লাহ প্রদত্ত সীমারেখা অতিক্রম করেছিল।" (সূরা মায়েদা ঃ ৭৮-৭৯)

لَمَّا وَقَعَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ فِى الْمَعَاصِىْ نَهَتْهُمْ عُلَمَاءُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوْا فَجَالِسُهُمْ فِىْ مَجَالِسِهِمْ وَاَكَلُوْهُمْ وَشَرِبُوْهُمْ هُزِبَ اللّٰهِ قُلُوْبَهُمْ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ وَلَعَنَهُمْ عَلٰى لِسَانِ دَاؤُدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ -

"বণী ইসরাঈলরা যখন আল্লাহর নাফরমানীর মধ্যে নিপতিত হলো, তখন ওলামায়ে কেরাম তাদেরকে নাফরমানী করতে নিষেধ করলেন। কিন্তু তারা তাদের কথায় কর্ণপাত করলো না। তারপর তাদের আলেমগণ তাদের সাথে উঠাবসা খানাপিনা সবকিছু পূর্ববৎ বহাল রেখে চললো। ওলামাদের এহেন ভূমিকার কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদের কতিপয়ের অন্তকরণকে অন্যান্য সাধারণ মানুষের অন্তরের ন্যায় (মুর্দা) করেছিলেন। আর তাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষিত হলো হযরত ঈসা (আঃ) ও দাউদ (আঃ) এর জবান দ্বারা।"

রসুলে করীম (সাঃ) হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। উঠে সোজা হয়ে বসে ইরশাদ করলেন ঃ

لَاوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ حَتّٰى تَاطَرُوْهُمْ عَلَى الْحَقِّ اَطْرًا -

"যার হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার নামে শপথ করে বলছি যে, যত সময় পর্যন্ত তোমরা এ সকল লোকদেরকে শক্তি প্রয়োগ করে সঠিক পথ গ্রহণ করতে বাধ্য না করবে, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তি পাবে না। (আবুদাউদ, তিরমিযী)

সত্যিকার মুসলমানদের জীবনের চরিত্র কিরূপ হবে এবং কোন পথে তাদের জীবনধারা প্রবাহিত হবে, সে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে করীমের বর্ণনা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ -

"মুমিন নরনারীদের চরিত্র হলো যে তরা সকলে পরস্পর অন্তরঙ্গ বন্ধু স্বরূপ। তারা একে অপরকে ভাল কাজের নির্দেশ দেয় এবং খারাপ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে।" (সূরা তাওবা-৭১)

একবার কিছু সংখ্যক লোক এ আয়াতটি পাঠ করে ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ج لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ -

("হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজের চিন্তা করো, তোমরা যদি হেদায়তের পথে থাকো তবে অন্য লোক গোমরাহ হলে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই।")-এই অর্থ অনুধাবন করলো, যে, এ আয়াত দ্বারা শরীয়ত গর্হিত কাজকে নির্মূল করণ এবং তাকে বাতেল ঘোষণা দেওয়া থেকে বিরত থাকা ও নিরবতা অবলম্বন করাকে বৈধ করা হয়েছে। এ কথা শূনে হযরত আবুবকর (রাঃ) তাদের সংকীর্ন মনার নিরসন ঘটাতে আসল তথ্য বর্ণনায় বললেন ঃ

"হে মানুষেরা! তোমরা এ আয়াতটি পাঠ করে তার ভুল অর্থ করো কেন? আমি রাসুলে করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে,-সমাজের মানুষের অবস্থা যখন এ হয়ে যায় যে, তারা সমাজের ভিতর জুলুম অত্যাচার ও নির্যাতন চলতে দেখেও তার প্রতিকার করে না, সে সমাজে আল্লাহর গজব নাযিল হতে বেশী সময় বিলম্ব হয় না। আমি নবী করীম (সাঃ) কে এও বলতে শুনেছি যে, যদি কোন জতীর অবস্থা এ হয় যে, তাদের মধ্যে আল্লাহর নাফরমানীর কাজ পুরোদমে চলছে, এবং এ অবস্থা পরিবর্তন করার মত শক্তি সেখানের মানুষের থাকা সত্ত্বেও যদি তার পরিবর্তন না করে, তবে তাদের প্রতি সাধারণ ভাবে আযাব নাযিল হতে আদৌ বিলম্ব হয় না।" (আবুদাউদ, তিরমিযী)

প্রকৃত প্রস্তাবে উল্লেখিত আয়াতের সঠিক তাফসীর হচ্ছে এটাই যা ইসলামের বুনিয়াদী লক্ষ্য বিন্দুর সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যশীল। এ আয়াতে শুধু ব্যক্তির উপর অর্পিত দায়িত্বের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আর এমন নিষিদ্ধ পথ ভ্রষ্টতার কথা বলা হয়েছে বৈধতার দিক দিয়ে যার কোনরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না। তা হলো উক্ত ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাপার। অপর লোকের বেলায় শুধু এতটুকু

দায়িত্ব অর্পিত যে সে তাকে সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা তদবীর চালাবে। যদি একান্ত রূপে তার কথা সে গ্রাহ্য না করে, তবে তাকে ছেড়ে দাও; সে তার কাজের প্রতিফল নিজেই ভোগ করবে। আর তার চেষ্টা চরিত্রের ফল সে পাবে।

সমাজকে স্বীয় দুর্বলতা দুরীকরণ এবং স্বীয় স্বার্থ ও কল্যাণের পানে দৃষ্টি রাখার ব্যাপারেও জবাবদিহি হতে হয়। সুতরাং তা যদি একান্ত ভাবে বাধ্যতামূলক বিষয় হয়, তবে তার রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত প্রয়োজন বোধে লড়াইয়ের ময়দানে অবতীর্ণ হওয়াও জরুরী। কুরআন মজীদে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَا لَكُمْ لَاتُقَاتِلُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ـ

"এমন কি কারণ দেখা দিল যে তোমরা আল্লাহর পথে সেই সকল দুর্বল নর নারী এবং শিশুদের জন্য লড়াইয়ের ময়দানে অবতীর্ণ হচ্ছ না, যাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে লোকেরা তাদের উপর শোষণ পীড়ন ও অত্যাচারের ষ্টিম রোলার চালাচ্ছে।" (সূরা নিসায়া-৭৫)

অনুরূপ ভাবে যত সময় পর্যন্ত তারা বালেগ না হবে, তত সময় পর্যন্ত তাদের ধন সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও তাদের উপরই অর্পিত। কুরআন মজীদে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ـ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ـ وَلَاتَأْكُلُوهَا اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوا ـ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ـ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ـ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ـ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ـ

"পিতৃহীন এতীম শিশুরা যত সময় পর্যন্ত তারা বিবাহ বয়সে পদার্পণ না করে, তত সময় পর্যন্ত তাদেরকে পরীক্ষা করতে থাকো। তারপর যদি তাদের ভিতর ধন সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের যোগ্যতা তোমাদের পরিলক্ষিত হয়, তবে তাদের সম্পদ তাদের হাতে সোপর্দ করে দাও। তারা বড় হয়ে নিজেদের প্রাপ্য অধিকার দাবী করার ভয়ে তোমরা ইন্‌সাফের সীমারেখা অতিক্রম করে তাদের ধন সম্পদ তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। এতীম শিশুদের যে সকল অভিভাবক ধনী ও সম্পদশালী হবেন, তারা যেন এতীমের বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে আল্লাহ ভীরুতা ও পরহেজগারীর সাথে কাজ করে। আর যারা দরিদ্র, তারা যেন তার ন্যায়ানুগ ও ইন্‌সাফের সাথে বৈধ পন্থায় ভক্ষণ করে। অতঃপর যখন তোমরা তাদের সম্পদ তাদের কাছে অর্পণ করবে, তখন কমপক্ষে দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলাকে সাক্ষী রেখে তাদের নিকট অর্পণ করবে। মনে রেখ, হিসাব নিকাশ নেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।" (সূরা নিসায়া–৬)

হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে ঃ

اَلسَّاعِىْ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكَالَّذِىْ يَقُوْمُ اللَّيْلِ وَيَصُوْمُ النَّهَارِ -

"বিধবা দারিদ্র ও মিসকীনদের উপকারার্থে যারা চেষ্টা চরিত্র করে, তারা স্বীয় কার্যের দিক দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদকারী এবং দিনভর রোযাদার আর রাত্রিভয় নফল নামায আদায়কারীর সমতুল্য ব্যক্তি।"

(বুখারী, মুসলম, তিরমিযী, নাসায়ী)

ইসলামের দৃষ্টিতে দরিদ্র ও গরীব মিসকীনদের প্রয়োজন পুরণ করণের দায়িত্বও থাকে সমাজের উপর অর্পিত। সে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের থেকে যাকাত আদায় করে তার নির্দিষ্টতম ব্যয়ের খাতে খরচ করবে। এ উদ্দেশ্য পুরণের জন্য তা যদি যথেষ্ট না হয়, তবে সে সমাজের বড় ধনী ও সামর্থবান লোকদের উপর এমন একটি সীমারেখা পর্যন্ত কর বসাবে যেন তা দ্বারা প্রয়োজনশীল অভাবী লোকদের প্রয়োজন পুরণ হয়। দরিদ্রদের প্রয়োজন পুরণ করা ব্যতীত কর ধার্য্যের ব্যাপারে দ্বিতীয় এমন কোন যোগ্য কারণ থাকতে পারে না, যা তার দরুন তার পথে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ সমাজের লোকেরা যদি দরিদ্রদের খাদ্য

দানের ব্যাপারে অপরকে উৎসহিত না করার দরুন একটি লোকও রাত্রি উপবাসে কাটায়, তবে সমাজের সমস্ত ব্যক্তিই অপরাধী ও অমার্জনীয় গুনাহগার রূপে পরিগণিত হবে। এ ব্যাপারে কুরআনে করীমের ভাষ্য যে কত কঠোর ও মর্মস্পর্শী তাই লক্ষ্য করুণ।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ـ وَلَا تَحٰضُّوْنَ عَلٰى
طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ـ وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ـ
وَتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ـ كَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا
دَكًّا ـ وَّجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ـ وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍ
بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى
يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ـ فَيَوْمَئِذٍ
لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗ اَحَدٌ ـ وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗ اَحَدٌ ـ يٰاَيَّتُهَا
النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ـ ارْجِعِيْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً
مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ـ

"কক্ষনো নয়। বরং তোমরা এতীমদেরকে মর্য্যদা দান করো না। আর করোনা উৎসাহিত একে অপরকে তোমরা দ্ররিদ্র ও অভাবীদেরকে খাদ্য দেওয়ার জন্য। তোমরা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত ধন-সম্পদ সমস্ত কুক্ষিগত করে খেয়ে ফেলো। ধন-সম্পদের দিকে মনের আর্কষণ এবং তার প্রতি ভালবাসা তোমাদের সীমাহীন। মনে রেখ। পৃথিবী যখন এক এক করে নীচে ধ্বসিয়ে দেওয়া হবে, আর তোমার প্রভু এবং ফিরেশতাগণ কাতারে কাতারে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে এবং সেখানে জাহান্নামকে আনয়ন করা হবে, সেদিন কেউই থাকবে না। সে দিন মানুষ নিজদের অলসতা ও অবহেলার কথা স্মরণ করবে বটে। কিন্তু চিন্তা গবেষণার সুযোগ পাবে কোথায়? তখন তাঁরা আফ্‌সুস করে বলবে আহ। দুনিয়ায়

থাকা কালীন আজ এই মহাবিপদের দিনের জন্য যদি কিছু সঞ্চয় করে রাখতাম, তবে কতই না ভাল হতো। সুতরাং আল্লাহর শাস্তির ন্যায় সেদিন কেউই শাস্তি দিবে না। আর তার ন্যায় কেউই কয়েদ করবে না। হে আত্মা। (পার্থিব জীবনে বসে) তুমি খুব সুখ-স্বচ্ছন্দে বসবাস করছিলে এখন তুমি আল্লাহর পানে এমন ভাবে মনোনিবশে করো; যেন, তুমি আল্লাহর মর্জিতে সম্পূর্ণ সম্মত আর আল্লাহ তোমার প্রতি খুশী ও মেহেরবান। অতএব তুমি আমার বান্দাদের কাতারে শামিল হয়ে জান্নাতে চলে যাও।" (সূরা আল ফজর ১৭-৩০)

হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে ঃ

أَيُّمَا اَهْلُ قَرْصَةٍ اَصْبَاحُ فِيهِمْ اَمْرُؤٌ جَائِعًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ

"কোন গ্রামের কোন লোক যদি এমন অবস্থার রাত্র কাটিয়ে দেয় যে, সে সমস্ত রাত্রি উপবাস থেকে ভোরবেলা নিদ্রা থেকে গা উত্তোলন করেছে। সে গ্রামের স্থায়ীত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণের কোন প্রকার দায়িত্বই আল্লাহর উপর ন্যস্ত থাকে না।" (মুসনদদে ইমাম আহমদ)

مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهٖ عَلٰى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهٗ ـ وَمَنْ كَانَ لَهٗ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهٖ مِنْ لَا زَادَ لَهٗ ـ (مسلم ابوداؤد)

"যদি কাহারো নিকট অতিরিক্ত সওয়ারী থাকে, তবে যার সওয়ারী নেই সে তাকে তা দান করবে। আর যার নিকট অতিরিক্ত পথ খরচ থাকবে, সেই ঐ লোকদেরকে তা দান করবে, যাদের নিকট পথ খরচ বলতে কিছুই নেই।" (মুসলিম, আবুদাউদ)

مَنْ كَانَ عِنْدَهٗ طَعَامُ اِثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ ......فَاِنْ اَرْبَعٌ فَخَامِسٌ اَوْسَادِسٌ ـ

"যার নিকট দু'জন লোকের খাদ্য থাকবে, সে তৃতীয় একজনকে মেহমান করে নিয়ে যাবে। আর যার নিকট চারজনের খাদ্য থাকবে, সে সাথে করে নিয়ে যাবে পঞ্চম এক ব্যক্তিকে অথবা ষষ্ঠ এক ব্যক্তিকে।" (মুসলিম, বুখরী)

সমগ্র মুসলিম জাতিটি একটি দেহ স্বরূপ, তার মধ্যে এখান থেকে ওখানে একই অনুভূতি ক্রিয়াশীল। কোন একটি অংগ যদি আঘাত প্রাপ্ত হয়, তবে যেমন সমুদয় শরীরে তার কষ্ট অনুভূত হয়, মুসলিম জতির অবস্থাও অনুরূপ। মুসলিম জাতির এহেন সুন্দরতম চিত্রটি খুবই চিত্তাকর্ষক চিত্র। রাসুলে করীম (সাঃ) তার নিজের ভাষায় রূপ দিয়ে এ চিত্রটি জন সমক্ষে এমনি ভাবে তুলে ধরেছেন ঃ

مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمِثْلُ الْجَسَدِ اِذَا شْتَكِىْ مِنْهُ عُضْوٌ تُدَامِىْ لَهٗ سَائِرَ الْجَسَدِ بِالسُّهْوِ وَالْحُمِىْ

"পরস্পর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা ও প্রেমপ্রীতির বেলায় মুসলিম জাতি একটি দেহের ন্যায়। দেহের একটি অঙ্গ যদি আঘাত প্রাপ্ত হয়, তবে এক এক করে সকল অঙ্গ প্রতঙ্গ তার মর্মস্পর্শী বেদনায় ব্যথিত হয়ে পড়ে।" (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিম সমাজ পরস্পর পরস্পরের প্রতি দায়িত্বান ও সহানুভূতিশীল হবার আর একটি আকর্ষণীয় মর্মস্পর্শী চিত্র যে নবী করীম (সাঃ) অংঙ্কিত করেছেন তা সত্যই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন ঃ

اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنَ كَالْبَنْيَانِ يَشُدُّ بِعْضُهٗ بَعْضًا۔

"একজন মুসলিম অপর মুসলিমের জন্য দালানের ইষ্ট স্বরূপ। দালানের ইটগুলি যেমন পরস্পর বিজড়িত থাকে এবং একে অপরকে আকর্ষণ করে টেনে রাখে, মুসলিম সমাজের অবস্থা ঠিক অনুরূপ।" (বুখারী, মুসলিম)

পারস্পরিক রক্ষণশীল ও সহনুভূতিশীল হবার ইস্‌লামের এহেন মহান নীতি যার শেষসীমা পর্যন্ত আমাদের এহেন নশ্বর মানব কায়ার জন্য উপনীত হওয়া অসম্ভব বলতে কিছুই নয়।

আর এ একই নীতির ভিত্তিতে সামাজিক অপরাধের শাস্তি বিধান নিরূপণ করা হয়েছে। আর তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কঠোরতম চরম সীমায়। কারণ যত সময় পর্যন্ত সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তির জান মাল ইজ্জৎ আবরুর হেফাজতের পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান না করা হবে, ততসময় পর্যন্ত পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতির নীতি বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে না।

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ ـ

"প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের রক্ত জান মাল ধন-সম্পদ ইজ্জত আবরুর প্রতি অন্যায় হস্তক্ষেপ সম্পূর্ণ হারাম।" (বুখারী ও মুসলিম)

এ জন্যই ইসলাম হত্যা ও যখম জনিত অপরাধের ব্যাপারে সমপরিমাণের শাস্তি বিধান করেছে। আর হত্যাজনিত অপরাধকে শাস্তির বেলায় কুফরীর সমপর্যায় গণ্য করেছে। কুরআন মজীদে এরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ـ

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন মুসলমানকে হত্যা করবে, তার শাস্তি হলো চিরদিন জাহান্নামে বসবাস করা–" (সূরা নিসায়া–২৩)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ـ

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا ـ

"তোমরা এমন কোন প্রাণকে হত্যা করো না, যার হত্যা আল্লাহ তায়ালা অবৈধ ঘোষণা করেছেন। তবে ন্যায়ানুগ পন্থায় আইনের আশ্রয় গ্রহণ করে করতে পারো। আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে অত্যাচারিত হয়ে নিহত হয়েছে, আমি তার ওয়ালীকে (অভিভাবক) আইনের সহায্যে প্রতিশোধ নেয়ার (কেসাসের) অধিকার দান করেছি।" (সূরা বনী ইস্রাইল–৩৩)

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ـ

"আমি তাওরাত কিতাবের মাধ্যেমে ইয়াহুদীদের প্রতি এ ফরমান জারি করেছিলাম যে, প্রাণের পরিবর্তে প্রাণ, চক্ষুর পরিবর্তে চক্ষু, নাসিকার পরিবর্তে নাসিকা, কানের পরিবর্তে কান আর দাঁতের বদলে দাঁত এবং সমুদয় যখমের সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারবে।" (সূরা মায়েদা-৪৫)

ইস্‌লাম কিসাসের বিধানকে সমাজ জীবনের মুক্তির পথ ও সমাজের জন্য জীবন লাভ আখ্যা দিয়ে ঘোষণা করছে ঃ

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَّاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

"হে জ্ঞানীগণ। তোমাদের জন্য "কিসাসের" বিধানের মধ্যে জীবন লাভ নিহিত রয়েছে। আশা করি তোমরা এ বিধানের বিরোধীতা পরিহার করে চলবে এবং তা দ্বারা সমাজ-জীবনে তোমরা মুক্তির পথ খুঁজে পাবে।" (সূরা বাকারাহ ১৭৯)

সামাজিক জীবনে শাস্তি প্রতিষ্ঠার এহেন বিধানের মধ্যে যে মানুষের জীবন নিহিত রয়েছে, তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। কারণ এহেন বিধান দ্বারা মানুষকে হত্যার অপরাধ থেকে বিরত রাখা হয়েছে। সুতরাং একজনের মৃত্যুদণ্ডের দ্বারা সামাজের বহু প্রাণ রক্ষা পাওয়ার সম্ভানা বিদ্যমান। এর দ্বারা যেমন মানব জীবন রক্ষা পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে, অনুরূপ সমাজের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব এবং তার মূল কাঠামো ছত্রভঙ্গ হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অবৈধ উপায় যৌন ক্রিয়াকলাপের জন্য যে শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে, তা খুবই কঠোরতম বিধান। কেননা তা মানুষের মান-সম্মান, ইজ্জত-আবরুর প্রতি প্রকাশ্য নগ্ন আক্রমণ এবং তাদের সতীত্ব ও পবিত্রতার জন্য ধ্বংসাত্মক কাজ। তার দ্বারা সমাজ জীবনে অশ্লীলতা প্রসার লাভ করে এবং তার কারণে অল্পদিনের মধ্যেই সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়। আর তা দ্বারা আত্মীয়তা ও বংশীয় সম্পর্ক গড়মিল হয়ে তা কল্পিত পিতৃত্বের দ্বারা পিতার স্নেহ ভালবাসা কে চুরি করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ইস্‌লাম এ শাস্তির বিধানকে কঠোরতার চরম সীমায় নিয়ে উপনীত করেছে। সে বিবাহিত নারী পুরুষদের জন্য মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তাদের প্রতি পাথর বর্ষণ করার বিধান দিয়েছে। আর অবিবাহিতদের জন্য নির্দিষ্ট করেছে এমন বেত্রাঘাত (কোরা মারার) করার বিধান, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধ্বংসাত্মক ও মারাত্মক প্রমাণিত হয়। কুরআনে করীমে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللّٰهِ -

"অবৈধ যৌন ক্রিয়াকলাপকারী (যিনাকারী) প্রত্যেক নর-নারীকে একশত করে দোর্‌রা লাগাও। এ দু'জনের প্রতি আল্লাহর আইন জারী করার বেলায় তোমরা কোনরূপ দয়া ও অনুগ্রহের বশবর্তি হয়ে কাজ করো না।" (সূরা নুর-২)

আর যে সকল লোক ভুলবশতঃ বা গোলক বাঁধায় পতিত হয়ে কিম্বা মানুষের প্রচারণার মুখে যদি কোন বিবাহিত নর-নারীর প্রতি যিনা করার মিথ্যা অপবাদ চাপায় অথবা এমনিভাবে তাদের মান-সম্মানের প্রতি মিথ্যা আঘাত হানে, তবে সে ক্ষেত্রে ইস্‌লাম তাদের শাস্তির জন্য আশি (৮০) দোর্‌রা নির্ধারিত করে দিয়েছে। কারণ মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে দেয়ার এহেন অপরাধ এবং মান সম্মানের প্রতি অন্যায় আক্রমণ আর ঈর্ষা বিদ্বেষ ঘৃনা ও শত্রুতার মূলকারণ হওয়ার দরুন তা যিনার সমপরিমাণ অপরাধ। এ ছাড়া তা দ্বারা অশ্লীলতার প্রচার ও প্রসার অনেক বেশী হয়। কুরআন মজীদে আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ج

"যারা বিবাহিত আযাদ রমণীদের প্রতি যিনার অপবাদ চাপায় আর যদি তার স্বপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, তবে তাদেরকে আশি (৮০) দোররা লাগাও। আর ভবিষ্যতে তাদের সাক্ষী কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না।" (সূরা নুর-৪)

চুরি যেহেতু অন্যের মালিকানায় অবৈধ হস্তক্ষেপ করার অপরাধ। সেহেতু ইস্‌লাম তার বেলায়ও হাত কেটে দেওয়ার কঠোরতম বিধান করে দিয়েছে। আর দ্বিতীয়বার চুরি করার বেলায় দ্বিতীয় হাত কেটে দেওয়ারও নির্দেশ-বিদ্যমান। কুরআন মজীদ এরশাদ হয়েছে ঃ

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ـ

"চোর সে নারী হোক বা পুরুষ হোক উভয়ের হাতই কেটে দাও এ হলো তাদের অর্জিত পরিণাম ফল। আর আল্লাহর তরফ হতে সতর্কীকরণ শাস্তি।" (সূরা মায়েদা-৩৮)

চুরির এহেন শাস্তি বিধান যখন কোন ব্যক্তির কিছু মাল চুরি হয়ে যাওয়ার দরুন তার প্রতিবিধান রূপে দেখতে পায়, তখন তা কতিপয় ব্যক্তির নিকট খুব কঠোরতম ও নির্দয়মূলক বিধান বলে অনুমিত হয়। কিন্তু আসল ব্যাপার হচ্ছে যে, ইস্‌লাম এহেন শাস্তি বিধান নিরূপণ কালে সমাজ ও রাষ্ট্রের শান্তি শৃঙ্খলা ও তার রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রেখেই তা নিরূপণ করেছে। এ ছাড়া তার সমানে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোনও রয়েছে। আর তা হচ্ছে যে, চুরি হলো একটি গোপন ভাবে করণীয় অপরাধ। আর যে অপরাধ গোপন ভাবে করা হয়, তা মূল প্রকৃতির দিক দিয়ে কঠিন প্রতিবিধানের দাবীদার হয়, যেন তা থেকে মানুষ বিরত থাকে। এহেন কঠিন শাস্তির ভয়ের কারণে অকস্মাৎ প্রকাশিত আন্তরিক ভীতি বা বাঁধার পরিণাম ফল স্বরূপ কোন না কোন একটি চিহ্ন যেন রেখে যায়, অথবা এমন কোন কাজ করে যা তার অনুসন্ধন কার্যে সাহায্য দান করতে পারে।

প্রকাশ থাকে যে, চোর যদি নিজের অথবা ছেলে সন্তানের উপবাস থাকার কারণে চুরি করতে বাধ্য হয়, এ মতাবস্থায় এহেন কঠিন শাস্তি বিধান তার প্রতি প্রযোজ্য হয় না। কারণ সাধারণ নিয়ম রয়েছে যে ওযর ও অপারগ অবস্থায় কোন বিধান প্রযোজ্যশীল নয়। পবিত্র কুরআন মজীদে উল্লেখ রয়েছে ঃ

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ ـ

"যদি কোন ব্যক্তি অপরাগ অবস্থায় বাধ্য হয়ে তার থেকে কোন বস্তু ভক্ষণ করে; কিন্তু তার মনে আইন ভঙ্গের যেমন কোন রূপ ইচ্ছা নেই, অনুরূপ প্রয়োজনের সীমারেখাও অতিক্রম করতে ইচ্ছুক নয়, তবে তার কোন গুনাহ হবে না। (সূরা বাকারা–১৭৩)

আর যদি সন্দেহ হয়, তবে শরীয়াত নির্ধারিত দণ্ডাদেশ প্রযোজ্য হয় না। কারণ হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ

ادرؤا الحدود بالشبهات "সন্দেহের কারণে দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করে নাও।" হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে যে এ নীতির উপরই দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করা হতো, তার বিশদ আলোচনা সামনে পাওয়া যাবে।

যে সকল লোক দ্বারা সমাজ জীবনের শান্তি শৃঙ্খলা ব্যাহত হবে; এবং সাধারণ মানুষের কাছে ভয় ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে, আর ফেৎনা ফাসাদ উশৃঙ্খলা বিশৃঙ্খলা করার চেষ্টা করবে, তাদেরকে কঠোর ভাবে শায়েস্তা করার জন্য ইসলাম মৃত্যুদণ্ড, শূলদন্ড হাত পা কেঁটে দেওয়া এবং দেশ থেকে বিতাড়িত করে নির্বাসিত করা ইত্যাদি আইন রচনা করে দিয়েছে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اِنَّمَا جَزٰؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْآ اَوْيُصَلَّبُوْا

اَوْتُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ اَوْيُنْفَوْا مِنَ

الْاَرْضِ ـ

"যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের সাথে লড়াইয়ের ময়দানে অবতীর্ণ হয় এবং দুনিয়ায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করে, তাদের শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড দেওয়া বা শূলদণ্ডে চড়ান, অথবা তাদের হাত পা বিপরীত নিয়মে কেটে দেওয়া কিম্বা দেশ থেকে বিতাড়িত করা।" (সূরা আল মায়েদা–৩৩)

কারণ উচ্ছৃঙ্খলা ও উৎপাতের গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকা এমন একটি জঘন্যতম মারাত্মক অপরাধ, যার প্রতিবিধান ও তার মূলোচ্ছেদ করণের প্রচেষ্টা চালান ব্যক্তিগত অপরাধের শাস্তি বিধানের চেয়ে কতখানি যে গুরুত্বপূর্ণ তা সত্যই প্রণিধানযোগ্য

বস্তুতঃ ইসলাম সামাজিক জীবনের পারস্পরিক দায়িত্বশীলতা ও সহানুভূতিশীলতাকে তার সমুদয় সম্ভাব্য পথে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। ব্যক্তি এবং সমাজ তথা রাষ্ট্র উভয়ের সমুদয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যে একই থাকবে এবং জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগগুলি যে, একটি অপরটির সাথে ওৎপ্রোত ভাবে জড়িত থাকবে, একে অপরের পরিপুরক রূপে কাজ করে যাবে, এ নীতিমালাই ক্রিয়াশীল থাকে তার এহেন প্রচেষ্টার পিছনে।

সুতরাং যে ব্যক্তিকে এমন একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা পর্যন্ত স্বাধীনতা দান করা হয়, যা তার নিজের জন্য যেমন ক্ষতিকারক হয় না, অনুরূপ তা সমাজ পথেও প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায় না। সে সমাজ তথা রাষ্ট্রও তার পূর্ণ অধিকার দান করে বটে। কিন্তু সাথে সাথে এ সকল অধিকার সমূহের মোকাবিলায় তার উপর এমন দায়িত্ব চাপিয়ে থাকে যেন, জীবনটি তার গতিপথে বিনা বাঁধা বিপত্তিতেই সামনে অগ্রসর হয়ে পরিশেষে সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে সক্ষম হয়, যার জন্য ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ই সমবেত ভাবে চেষ্টিত থাকে।

আত্মার পূর্ণ স্বাধীনতা পূর্ণ মানবিক সাম্য এবং সামাজিক জীবনে স্থায়ী ও নিবিড় পারস্পরিক দায়িত্ববোধ ও সহানুভূতি;– এই তিনটি বুনিয়াদের উপরই সামাজিক ইন্‌সাফ ও সুবিচারের সৌধ-এমারত দণ্ডায়মান হয় এবং পালন করে মানবিক সাম্যের কার্যকরি দার্শনিক ভূমিকা।

চতুর্থ অধ্যায়
ইসলামে সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার পথ

ইস্‌লাম সর্বদা সর্বক্ষেত্রে স্বীয় কার্যের সুচনা বাহ্যিক দিকটির পরিবর্তে আভ্যান্তরীণ দিক থেকে আরম্ভ করে। আর তার সমুদয় সংস্কারমূলক কার্যক্রমকে বাহ্যিক সমতল দিকটির দিগন্ত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ না রেখে মানবাত্মার গভীর তলদেশকে তার মূল লক্ষ্যরূপে নিরূপণ করে। কিন্তু সাথে সাথে সে জীবনের বাস্তব অবস্থায় বাস্তব সত্যটির প্রতি যেমন কখনো অবহেলা প্রদর্শন করে না, তেমনি করে না মানবাত্মার মূলতত্ত্ব এবং তার উপর নিপতিত ভাটা-জোয়ারের স্রোত ধারার প্রভাব এবং সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের বিভিন্নরূপ অবস্থাকে অবহেলা। অনুরূপ একদিকে উন্নত আশা-আকাঙ্খা সদিচ্ছা উন্নত চেতনাবোধ আর অপর দিকে পায়ে প্রয়োজনের শৃঙ্খল পড়া– এ সত্যকেও কখনো সে এড়িয়ে থাকতে পারে না। মানুষের আশা-আকাঙ্খা যতই উন্নত মানের হোক না কেন– এ দুর্বল মানুষ পূর্ণতার সাধারণ স্তরে উপনীত হতে সে অপারগ।

মানবাত্মার মূলতত্ত্ব সম্পর্কে স্বীয় আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের আলোকে ইস্‌লাম যেমন আইন ও বিধান রচনা করে, অনুরূপ উৎসাহ অনুপ্রেরণা এবং শিক্ষা প্রশিক্ষণেরও দায়িত্ব সম্পাদন করে। এ জ্ঞানের আলোকে সে মানুষর প্রতি কোন কাজের নির্দেশ দেয়, আবার কোন কোন কাজ থেকে বিরত থাকারও আহ্বান জানায়। আর এর দ্বারাই সে মানবিক বিবেকের সীমারেখা নিরূপণ করে তাকে কার্যে পরিণত করে। এ সকল কার্য সম্পাদন করার পরই তার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। বরং মানব আত্মার কর্মময় ভূমিকা যাতে আইন কানুনের সীমারেখা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ না রয়ে যতদুর উন্নত হতে পারে এবং তা দ্বারা যতদুর উন্নত মানের মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, সে তাকে তা করার জন্য উৎসাহ অনুপ্রেরণা দান করে।

এ দ্বীনের উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে কার্যক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করলেই জীবনের গাড়ী শুধু কেবল তার গতিপথে অগ্রসর হতে থাকে না, বরং তা দ্বারা মানব জীবন সর্বদিক দিয়ে সুন্দর ও সুসজ্জিত হয়ে উঠে পূণ্যত্ব ও সত্যবাদীতার অপূর্ব সমাবেশ হয়। আর হয় স্বভাবের উন্নত বিকাশ সাধন, মন মগজ ও চিন্তার প্রসার লাভ এবং সৎকার্যে প্রতিযোগিতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়ে মুসলমানের ব্যক্তিত্ব পূর্ণতার উচ্চ সোপান সমূহ অতিক্রম করতে সক্ষম হয়।

এ দ্বীনের ভিতর মন মেযাজ ও আত্মার প্রতি সংবেদনশীল হেদায়েত ও শিক্ষণীয় বিষয়াবলী হলো তাই যা অবশ্য করণীয় দায়িত্বকে পূর্ণতার শেষ সীমায় নিয়ে পৌঁছে দেয়। আর এ হেদায়েত ও উপদেশাবলীই আইনগত দায়িত্ব ও কর্তব্যকে মনের আগ্রহে খুশীর সাথে সম্পাদন করার নিশ্চয়তা দেয়। আর তা মানব জীবনকে এমন একটি মৌলিক মূল্যবান বস্তু দান করে, যা বাধ্যবাধকতা এবং প্রয়োজনের চাহিদা থেকে মুক্ত থাকা এবং আইন কানুনের ডাণ্ডা দ্বারা পিটিয়ে তাদেরকে হেদায়েতের পথে নিয়ে আসার প্রয়োজনেরও মুখাপেক্ষী হয় না। যেহেতু ইসলামের সামনে রয়েছে সামাজিক জীবনে পূর্ণ ইনসাফ কায়েম করার পরিকল্পনা। এ জন্যই সে শুধু কেবল অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সীমারেখার মধ্যে ইন্‌সাফের কার্যক্ষেত্র স্বতন্ত্ররূপে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকুক এ কথা যেমন পসন্দ করেনি, ঠিক অনুরূপ আইনগত দায়িত্বই এ ইন্‌সাফের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী হোক তাও সে ঠিক মনে করেনি। সুতরাং ইসলাম ইন্‌সাফের এহেন পরিকল্পনাকে সে একটি উদার ও সার্বজনীন মানবিক সাম্যের রূপ দিয়ে তাকে দু'টি মৌলিক ভিত্তির উপর দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ব্যক্তির অভ্যন্তরে মানবিক আত্মা এবং সমাজের বর্হিজগতে আইনগত রীতি। এ দু'ইকে সে ভালরূপে সংযোজিত করে দিয়েছে। এ দু'য়ের থেকে কাজ নেয়ার সময় একদিকে যেমন সে মানুষের স্বভাব প্রকৃতির মধ্যে নিহিত অনুভূতি ও চেতনাবোধকে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করে। অন্য দিকে থাকে না সে মানুষের প্রকৃতিগত দুর্বলতার বেলায় অনবহিত। সে খুব ভাল রূপেই অবগত আছে যে, মানুষ বর্হিজগতে এমন একটি বিরাট শক্তির মুখাপেক্ষী থাকে, যা তাকে ভুলভ্রান্তি থেকে বিরত রাখতে পারে। যেমন হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন "আল্লাহ তায়ালা যতটুকু তার কুরআন করীম দ্বারা সমাজ সংস্কার করেন, তাঁর চেয়ে তিনি সমাজ নেতা ও শাসক বর্গের দ্বারা অনেক বেশী পরিমাণে সমাজের পুনর্বিন্যাস ও সংস্কার সাধন করে থাকেন।"

يَزَعُ اللّٰهُ بِالسُّلْطَانِ اَكْثَرَ مِمَّا يَزَعُ بِالْقُرْاٰنِ -

যে ব্যক্তি এ ধর্মের বিধি বিধান ও কার্যক্রমকে পর্যালোচনা করনে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করবে, সে অনুধাবন করতে পারবে যে, সে আত্মার সংগঠন ও পরিচর্যার জন্য অনেক বেশী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং সমগ্র দিক দিয়ে সমস্ত ব্যাপারে সে আত্মার সংশোধন ও সংগঠনের উপর অনেক পরিশ্রম ব্যয় করেছে।

সুতরাং এ ধর্ম তার প্রিয় নবীর চরম প্রশংসায় যে বাণী উচ্চারণ করেছে তা হচ্ছে এই ঃ

وانك لعلى خلق عظيم -

"বাস্তবিকই আপনি উন্নততর মহান চরিত্রের অধিকারী।" (সূরা কলম) কারণ সচ্চরিত্র ও হোস্‌নে আখলাকই হলো স্থায়ী সমাজের সৌধ এমারতের প্রথম স্তম্ভ বিশেষ। নশ্বর ও সীমায়িত মানবাত্মার মাটির সাথে আসমানের সম্পর্ক জুড়িয়ে দেয়া, আর নশ্বর বস্তু অবিনশ্বর ও অসীমের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা তার উপরই নির্ভরশীল হয়। মানব আত্মার পুনর্বিন্যাস সংস্কার সাধন ও সংগঠনের পর ইসলাম তার উপর নির্ভরশীলতার বেলায় আদৌ কোন প্রকার কার্পণ্য প্রদর্শন করে না। এ জন্যই সে তার সমুদয় বিধনাবলী জারী করার ক্ষেত্রে মানবত্মাকে পর্যবেক্ষণকারী ও রক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করে। এ সকল বিধানাবলীর অধিকাংশ বিধান বাস্তবায়িত করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার উপরই সে ন্যস্ত করে। সুতরাং আমরা তার কার্যক্রমে অবলোকন করতে সমর্থ হয়েছি যে সে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাক্ষ্য দানকে দণ্ডাদেশ কায়েম করার মৌলিক ভিত্তি নিরূপণ করে দিয়েছে। অনুরূপ তাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ফয়সালার মাপকাঠি নিরূপণ করেছে। অধিকার প্রতিষ্ঠা করার বেলায়, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই যে মানবাত্মার পর্যবেক্ষণকারী, ব্যক্তির এহেন বিশ্বাস ও অনুভূতির উপরই যে তা নির্ভরশীল রয়েছে, সাক্ষ্য দানের সমুদয় বিষয়বস্তু দ্বারা তাই অবগত হওয়া যায়। পবিত্র কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاۤءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۔ اُولٰۤئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۔

"যারা সভ্য, ভদ্র ও সতীসাধ্বী নারীদের নামে (অবিবাহিত) যিনা করার মিথ্যা অপবাদ রটনা করে, তারা যদি নিজেদের দাবী ও কথার সমর্থনে চারজন সাক্ষী পেশ করতে না পারে তবে তাদের আশিটি দোরা মারা। আর ভবিষ্যতে কখনো তাদের সাক্ষী গ্রহণ করবে না। এহেন প্রকৃতি সম্পন্ন লোক যে পূর্ণ ফাসেক তাতে আদৌ কোন সন্দেহ নেই।" (সূরা নুর-৪)

والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا
انفسهم فشهادة احدهم اربع شهدت بالله انه
لمن الصدقين - والخامسة ان لعنت الله عليه
ان كان من الكاذبين - ويدراء عنها العذاب ان
تشهد اربع شهدت بالله انه لمن الكاذبين -
والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من
الصدقين -

"যারা নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি যিনা করার অপবাদ চাপায় তারা নিজেরা ব্যতীত যদি এ ব্যাপারে অন্য কোন এক লোক সাক্ষী না থাকে, তবে এ সকল ব্যক্তিদের থেকে কোন এক ব্যক্তি চারবার এ বলে শাহাদাত দিবে যে সে স্বীয় দাবীতে সম্পূর্ণ সত্যবাদী। আর পঞ্চমবার বলবে যে, যদি সে মিথ্যাবদী হয় তবে তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হবে। আর যদি চারবার আল্লাহকে সাক্ষী রেখে যে নারীর উপর অপবাদ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে সে যদি বলে যে, পুরুষটি তার দাবীতে মিথ্যাবাদী, আর পঞ্চমবার তাকে বলতে হবে যে, পুরুষটি যদি সত্যবাদী হয়, তবে আমার প্রতি আল্লাহর গজব নাযিল হোক। এমতাবস্থায় উক্ত নারীর থেকে দণ্ডবিধান মওকুফ হবে।" (সূরা নূর-৬-৯)

এমন কি যে সব ব্যাপারে ইসলাম দলিল পত্র লিখে রাখার হুকুম দিয়েছে, সেখানেও সে সাক্ষী নিরূপণ করাকে অবশ্য কর্ত্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। কুরআনে করীমে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى
اجل مسمى فاكتبوه - وليكتب بينكم كاتب
بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله
فليكتب - وليملل الذى عليه الحق وليتق

اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ـ فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْضَعِيْفًا اَوْلَا يَسْتَطِيْعُ اِنْ
يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوْا
شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ـ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاۤءِ اَنْ
تَضِلَّ اِحْدٰي هُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى ـ

"হে-ঈমানদারগণ! যখন তোমরা পরস্পরে নির্দিষ্ট একটি মেয়াদ পর্যন্ত ঋণ নেওয়া দেওয়ার আদান প্রদান করো, তখন তোমরা তা লিখে রাখ। আল্লাহ তায়ালা যাকে শিক্ষা-দীক্ষা, দান করেছেন তোমরা উভয় পক্ষ এমন একজন লোক নিয়োগ করে ইন্‌সাফের সাথে তার দ্বারা দলিল লিখিয়ে লও। উক্ত শিক্ষিত ব্যক্তির তা লিখতে অস্বীকৃতি জানান উচিত নয়। সে নিজে লিখবে আর যে ঋণ গ্রহণ করবে, সে তা পাঠ করবে। আর তাকে সর্বদা বিশেষ করে এ ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে কাজ করা উচিত। যে বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে তার ভিতর কোনরূপ কম বেশী করা ঠিক নয়। কিন্তু ঋণ গ্রহণকারী যদি নিরক্ষর ও দুর্বল হয়, অথবা যদি তার অধ্যয়নের জ্ঞান না থাকে, তবে তার ওয়ালী বা অভিভাবক ইন্‌সাফের সাথে তা পাঠ করিয়ে তাকে শুনাবে। আর এ বিষয় দুজন পুরষকে সাক্ষী রাখবে। যদি দুজন পুরুষ পাওয়া সম্ভব না হয় তবে একজন পুরুষ এবং দুজন রমণীকে সাক্ষী রাখবে। কেননা তাদের একজন যদি ভুলে নিপতিত হয়, তখন অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দিবে অথবা এমন লোক সাক্ষী রাখা উচিত যাদের সাক্ষী সাধারণতঃ তোমাদের নিকট গ্রহণীয় হয়ে থাকে।" (সূরা বাকারা–২৮১)

সাক্ষী হওয়া বা নিয়োগ করা যে আদান প্রদানের সময় কর্ত্তব্য সে বিষয় সম্পর্কে কুরআনের ইরশাদ হচ্ছে ঃ–

وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَاۤءُ اِذَا مَادُعُوْا

"সাক্ষীদেরকে যখন সাক্ষী থাকার জন্য বলা হবে, তখন সাক্ষী থাকতে তাদের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা উচিত নয়।" (সূরা বাকারা-২৮১)

আর যখন সাক্ষী দানের প্রয়োজন হবে,তখনো তাদের সাক্ষীদান থেকে বিরত থাকাও উচিত নয় কুরআন মজীদে আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ - وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ -

"(খবরদার) কখনো সাক্ষীকে গোপন করবে না। যে ব্যক্তি সাক্ষীকে গোপন করে, তার অন্তঃকরণ পাপকার্যে লিপ্ত থাকে।" (সূরা বকারা-২৮৩)

ইস্‌লাম মানবিক আত্মার উপর সেই সকল দণ্ডাদেশের ব্যাপারে পূর্ণরূপে নির্ভর করে যা বেত্রাঘাত, দোররা এবং পাথর নিক্ষেপ করণ পর্যন্ত গিয়ে উপনীত হয়। আর সম্পদের অধিকারের বেলায়ও এ একই অবস্থা অর্থাৎ তার বেলায়ও সে মানবিক আত্মার উপর পুর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছে। কারণ মানুষের মর্যাদা এবং তাকে তার চাহিদার মাপমাঠি পর্যন্ত সমুন্নত রাখার নিমিত্ত তার প্রতি নির্ভর করা একান্ত প্রয়োজন ছিল বলেই সে নির্ভর করেছে। এ নির্ভরশীলতা ছাড়া তার সঠিক মর্যাদা দানের অন্য কোন বিকল্প পথ তার জন্য ছিল না। তাই সে এ পথ বেছে নিয়েছে। কিন্তু এমনকি সে যে আত্মার উপর এত বড় কঠিন দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে যা তাকে আইন বিধান জারি করার জিম্মাদার এবং আইনগত সীমারেখার চেয়ে উন্নত মানের মানদন্ড গ্রহণ করার আহ্বান জানায়। সে তাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে ছেড়ে দিবে তা কখনো হতে পারে না। বরং সে আল্লাহর ভয়ভীতিকেই তার পাহারাদার নিযুক্ত করে রেখেছে এবং তার সামনে রেখে দিয়েছে আল্লাহর অহর্নিশি পাহারাদারীর একটি আকর্ষণীয় চিত্র, যা কুরআনে করীম আমাদের সামনে ভাবগম্ভীর ও হৃদয়গ্রাহী করে পেশ করছে ঃ

مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَالِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا - ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ - إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -

"তিন ব্যক্তির এমন কোন পরামর্শ মজলিস নেই, যেখানে চতুর্থ ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা উপস্থিত না থাকেন। অনুরূপ পাঁচ ব্যক্তির মিলিত এমন কোন পরামর্শ মজলিস হয় না, যেখানে আল্লাহ তায়ালা ষষ্ঠরূপে বর্তমান না থাকেন। এমনি ভাবে উক্ত সংখ্যার চেয়ে কম কিম্বা বেশী সংখ্যক লোক একত্রিত হয়ে যদি পরামর্শ করে, যেখানেই হোক না কেন আল্লাহ তায়ালা সেখানে উপস্থিত থাকেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাদের সমুদয় কার্যাবলী সম্পর্কে অবহিত করবেন। প্রকারান্তরে আল্লাহ তায়ালা সমুদয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন ও ওয়াকিফহাল থাকেন।" (সূরা মুজাদালা-৭)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ - وَنَعْلَمُ مَاتُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ - وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ - مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ -

"একমাত্র আমিইতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি। তার নফ্স তাকে কি মন্ত্রণা ও পরামর্শ দেয়, সে বিষয় আমি পূর্ণ ওয়াকীফহাল রয়েছি। আমি তাদের গরদানের প্রধান শিরাটির চেয়ে তাদের নিকটবর্তী। তার ডানে বামে তার কার্যবলীর নোট রাকার নিমিত্ত আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত দু'জন সি, আই, ডি ফিরিস্তা সর্বদা নিয়োজিত থাকে। তাদের মুখ থেকে এমন কোন কথা নিঃসৃত হয় না, যা লিখার জন্য তারা সর্বদা প্রস্তুত হয়ে দণ্ডায়মান না থাকে! (সূরা ক্বাফ ১৬-১৮)

فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى -

"তিনি তো খুব নীরবে কথিত কথাতো দূরের কথা তার চেয়েও বেশী গোপনীয় কথা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফ থাকেন।" (সূরা তহা-৭)

মোটকথা ইসলাম মানুষকে তার সৎ কার্যাবলীর শুভ পরিণামের সুসংবাদ যেমন দেয় অনুরূপ তাদেরকে অসৎ কার্যাবলীর ভয় ও পরিণাম সম্পর্কেও ভীতি প্রদর্শন করে। এ ছাড়া সে তাদের নিকট এ কথাও ভালরূপে পরিষ্কার করে যে, তাদেরকে নিজেদের প্রত্যেকটি কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে হিসাব দুনিয়া ও আখেরাতে দাখিল করতে হবে। তারা যেমন পারবে না স্বীয় কাজের পরিণাম

ফলকে এড়িয়ে চলতে, অনুরূপ বাঁচতে পারবে না তার প্রতিদান ও শাস্তি ভোগ থেকে। এ ব্যাপারে কুরআন মজীদের ভাষা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا - وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا - وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ -

"কিয়ামতের দিন আমি ইন্‌সাফের সাথে মীযান দ্বারা সকলের পাপ পূণ্য ওযন করবো। এ ব্যাপারে কাহারো উপর জুলুম বা পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করা হবে না। এমন কি যদি কোন ব্যক্তি সরিষার দানা পরিমাণ কোন কাজ করে সেদিন তাও আমি তার সামনে উপস্থিত করে ওযনের পাল্লায় রাখবো। (মনেরেখ) হিসাব নিকাশ নেয়ার জন্য আমি যথেষ্ট পারদর্শী ও ক্ষমতাশীল।" (সূরা আম্বিয়া-৪৭)

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا - وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا - وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَالَهَا - يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا - بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا - يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ - وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ

"যখন একাধারে ভূকম্পনের কারণে সমগ্র পৃথিবী থর থর করে প্রকম্পিত হয়ে উঠবে এবং পৃথিবী স্বীয় ভূগর্ভস্থ সমুদয় বস্তু উত্থিত করে ফেলবে, তখন মানুষ বলবে, আরে! পৃথিবীর কি হলো যে এমন করছে! এ দিন যখন আসবে তখন পৃথিবী স্বীয় প্রভুর নির্দেশ অনুযায়ী নিজের সমস্ত খবর প্রচার করতে থাকবে। আর এ দিনই মানুষ স্বীয় কার্যাবলী অনুপাতে বিভক্ত হয়ে দলে দলে পালে পালে হসরের ময়দানের পানে অগ্রসর হতে থাকবে। আর সেখানে তাদের

সামনে তাদের পার্থিব জগতে কৃত কার্যাবলীর লিখিত খাতা পেশ করা হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি একটি অণুপরিমাণ কল্যাণ মূলক কাজ করবে তাও সেদিন সে অবলোকন করতে পারবে। আর যদি কেউ একটি অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করে থাকে, তাও সে ওখানে দেখতে পাবে।" (সূরা যিলযাল)

এমনি রূপে ইসলাম তার পরিস্কার উপদেশ বাণী দ্বারা মানুষের মনে আল্লাহ ভীরুতা ও তাকওয়াকে পর্যবেক্ষক বানিয়েছে। এমনি ভাবে সমাজের বুকে ইসলামের শাসন বিধান প্রতষ্ঠার দায়িত্ব এবং শরীয়াতের আইন কানুন জারী করার দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করার জন্য তাকে সংগঠিত করে। সামাজিক জীবনে সুবিচার প্রতিষ্ঠার বেলায় একদিকে যেমন ইসলাম ট্রেনিং প্রাপ্ত মানবাত্মার উপর নির্ভরশীল হয়, অন্যদিকে শরীয়াতের বিধানাবলীকে সেই মৌলিক নীতি দু'টির উপর সে একটি পরস্পর বিজড়িত ভারসাম্যপূর্ণ কল্যাণময়ী মানবিক সমাজের সৌধ ইমারত নির্মাণ করে। আশা করি আগত অধ্যায় সমূহের কোন একটি অধ্যায় এর যৎকিঞ্চিৎ রূপরেখা অংকন করার চেষ্টা করবো। এখানে শুধু আইন প্রণয়ন ও হেদায়ত এবং উপদেশাবলীর নীতিমালাগুলোর কিছু নজীর পেশ করেই আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। আর এ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত যাকাত এবং সাদকার বিষয় বস্তুকে নির্বাচন করে নিয়েছি। কারণ এ পুস্তকে বিষয় বস্তুর সাথে এ দু'টি বিষয়ের সম্পর্ক খুব নিবিড় ও গভীর।

ইসলাম যাকাত ব্যবস্থাকে সমাজের প্রয়োজনশীল দরিদ্রদের অধিকার রূপে ক্ষমতাবান ধনাঢ্য ব্যক্তিদের প্রতি অবশ্য কর্তব্য নির্ধারণ করে। সে এ অধিকারকে শরীয়তের দিক দিয়ে এমন অনিবার্য রূপে আদায়শীল নিরূপণ করেছে, যা ইসলামী হুকুমাতের জন্য শক্তি প্রয়োগ করে আদায় করার বৈধতা বিদ্যমান। কিন্তু সাথে সাথে ইসলাম এ অধিকার আদায় দ্বারা যেমন মানবিক বুদ্ধি বিবেচনা অনুভূতি ও চেতনাবোধকে উজ্জীবিত করে তুলে; অনুরূপ ব্যক্তির অভ্যন্তরে এমন এক আন্দোলিত বিপ্লব সৃষ্টি করে যার ফলে ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ স্বেচ্ছায় তা আদায়ের জন্য সামনে এগিয়ে আসে।

বস্তুতঃ ইসলাম এ জন্যই যাকাতের বিধানকে ইসলামী সৌধ ইমারতের অন্যান্য স্তম্ভের ন্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ নিরূপণ করে ঈমানের আবশ্যকীয় শর্তাবলীর মধ্যে তার আদায়কে অন্যতম শর্ত করে দিয়েছে।

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ - الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ

خَشِعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ - وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ -

"এ সকল মুমিনদের সফলতা সুনিশ্চিত যারা নামাযের মধ্যে কোমলতা বিনয়ী নম্রতা প্রদর্শন করে আল্লাহকে হাজের নাজের মনে করে তা আদায় করে। আর যারা খারাপ কাজ ও কথাবার্তা থেকে দুরে থাকে, এবং নিয়মিত যাকাত আদায় করে।" (সূরা মুমিনুন ১-৪)

تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ - هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ - الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ -

"এ হলো কুরআনে করীমের এমন আয়াত যা পরিষ্কার একটি কিতাব এবং তা সেই সকল মুমিনদের জন্য আলোর পথের দিশারী স্বরূপ, যারা নিয়মিত নামায আদায় করে এবং যাকাত দান করে। আর পরকালের প্রতি রয়েছে যাদের দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যয়।" (সূরা নামল ১-৩)

আসলে ধন-সম্পদের যাকাত না দেয়া সেই সকল মুশরিকদেরর আচরণ স্বরূপ, যারা পরকালের প্রতি কোনরূপ বিশ্বাস রাখেনা ও আস্থাশীল হয় না। তাদের সম্পর্কে কুরআন মজীদে খুব কর্কশ ভাষার সর্তকবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ - الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ -

"সেই সকল মুশরিকদের ধ্বংস অনিবার্য যারা যাকাত আদায় করে না, আর পরকালকে অস্বীকার করে।" (সূরা হামিম সিজদাাহ ৬-৭)

যাকাত দানের মাধ্যমে যে আল্লাহর নৈকট্য লাভ এবং তার রহমতের অধিকারী হওয়া যায়, সে সম্পর্কে কুরআন মজীদ ঘোষণা করেছে ঃ

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ -

"নামায আদায় করো এবং যাকাত আদায় করতে থাকো, আর সমুদয় কাজে আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য মেনে চলো। এর দ্বারা হয়তো তোমরা আল্লাহর রহমত পাবার যোগ্যপাত্র হতে পারবে।" (সূরা নূর-৫৬)

যারা সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর এ অধিকার আদায় করে এবং সমাজ জীবনে সমুদয় অর্পিত দায়িত্বাবলী বিনা দ্বিধায় সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন করতঃ এই কথা দুনিয়ার সামনে দেখতে চায় যে, তারাই একমাত্র বিজয়ী ও শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার যোগ্য জাতি-কেবল শুধুমাত্র তাদের ভাগ্যেই আল্লাহর সাহায্য ও রহমত বর্ষিত হয়। এ ব্যাপারে কুরআন মজীদের সুস্পষ্ট ঘোষণা হচ্ছে এই ঃ

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِىٌّ عَزِيْزٌ - اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ -

"আল্লাহর সাহায্যের জন্য যারা কোমর বেঁধে দণ্ডায়মান হবে, আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে আবশ্যই সাহায্য করবেন। আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশীল ও ক্ষমতাশালী, (এসকল সাহায্য প্রাপ্তির যোগ্য লোক তারাই।) যদি আমি তাদেরকে ভূপৃষ্ঠে প্রভুত্ব শ্রেষ্ঠত্ব যোগ্য ও শাসন ক্ষমতা দান করি, তবে তারা সমাজে নামায প্রতিষ্ঠা করবে এবং মানুষকে কল্যাণমূলক কাজের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় কাজ থেকে তাদেরকে বিরত রাখবে।" (সূরাহজ্জ-৪০-৪১)

যাকাত ব্যবস্থা মানুষের জন্য একটি চিরস্থায়ী আইন বিশেষ। এ ব্যবস্থা শুধু কেবল বিশ্ব নবীর সময় হতেই জারি হয়নি। বরং দুনিয়ায় যত নবী আগমন করেছেন, তাদের সকলের তালীম ও শিক্ষার অনিবার্য বিশেষ অংশরূপে এটা পরিগণিত হয়ে আসছে। সুতরাং দ্বীন ইস্‌লাম কখনো এহেন সামাজিক দায়িত্ব বহির্ভূত ছিল না এবং বর্তমানেও নেই। যাকাত ব্যবস্থা যে সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানব সমাজে চিরস্থায়ী আইনরূপে প্রচলিত হয়ে আসছে, তার ঐতিহাসিক খতিয়ান বর্ণনা করনে কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ اِسْمٰعِيْلَ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ـ وَكَانَ يَأْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ـ

"এ কিতাবে হযরত ইস্‌মাইল (আঃ) এর কথা স্মরণ করো। সে ওয়াদা পালনের বেলায় যেমন পূর্ণ সত্যবাদী ছিলেন, তেমনি রাসুল ও নবী ছিলেন। তিনি স্বীয় পরিবার পরিজনের লোকদেরকে নামায আদায় করতে এবং যাকাত আদায় করতে নির্দেশ দিতেন। মোটকথা তিনি ছিলেন আল্লাহর নির্বাচিত মনঃপুত একজন মানুষ।" (সূরা মরিয়াম ৫৪-৫৫)

হযরত ইবরাহীম সম্পর্কে কুরআনে করীমে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَوَهَبْنَا لَهٗ اِسْحٰقَ ـ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ط وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ ـ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ـ

"তাকে ইস্‌হাক নামীয় একটি সন্তান দান করেছি। তারপর ইয়াকুব নামীয় একটি পৌত্র অধিক পুরস্কার স্বরূপ দিয়েছি। তাদের সকলকেই আমি পূণ্যবান, নেককার সৃষ্টি করেছি। আর করেছি তাদেরকে পথ প্রদর্শক, যেন তারা ইসলামের নির্দেশ মুতাবিক মানুষকে সত্য পথের সন্ধান দিতে পারে। আমি তাদেরকে ন্যায় কাজ করার, নামায আদায় ও যাকাত দান করার জন্যও হেদায়েত দিয়েছি। তারা সকলেই আমার আনুগত্যশীল ও বন্দেগীকারী বান্দা ছিল।" (সূরা আম্বিয়া–৭২-৭৩)

সুতরাং যারা যাকাত আদায় করার অবশ্য কর্তব্যের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে তা থেকে বিরত থাকবে, তাদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করনে নবী করীম (সাঃ) তাদের পরকালীন জীবনের একটি ভয়াবহ ও বিভৎসপূর্ণ দৃশ্য তুলে ধরে

বলেছেন ঃ

مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكٰوتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً اَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَاْخُذُ بِلِهْذِمَيْهِ يَعْنِىْ بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ ـ

–"যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা ধন-সম্পদ দান করেছেন সে যদি উক্ত সম্পদের যাকাত আদায় না করে, তবে আল্লাহ্ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার সম্পদকে এমন একটি ভয়ঙ্কর সর্পের আকৃতি দিয়ে তার সামনে প্রকাশ করবেন, যে সর্পটির মস্তকে থাকবে এক গুচ্ছ কেশ রাজি এবং চক্ষুর উপর থাকবে দু'টি কাল তিলক টিকা। এ সর্পটি তার গলদেশে হারের ন্যায় পরিয়ে দেয়া হবে। তখণ সর্পটি তার চোয়াল দু'টি আকড়িয়ে ধরে বলবে– আমি তোমার সেই ধন-সম্পদ, আমি তোমার সেই ধন সম্পদের গোপন ভান্ডার, যার যাকাত তুমি দেওনি।" (বুখারী, নাসায়ী)

এ দৃশ্যটি যে কত করুণ ও মর্মান্তিক দৃশ্য হবে, তা মুমিনদের নিকট বলার অপেক্ষা রাখে না।

যাকাত হলো মানুষের উপর শরীয়াত প্রবর্তিত এমন একটি দ্বীনি দায়িত্ব ও কর্তব্য, যা নির্দিষ্ট একটি ব্যাখ্যা অনুযায়ী ধন সম্পদের উপর প্রযোজ্য হয়। আর এরই পাশাপাশি রয়েছে সদকার ব্যবস্থা, যার নেই কোন সীমারেখা এবং নেই কোন নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা। বরং তা মানুষের বিবেক ও মনের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মূল তত্ত্ব অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে সদ্‌কা মানব আত্মার অনুভূতি ও চেতনাবোধের বহিঃপ্রকাশ এবং ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক স্নেহশীলতা দয়ার্দ্রতার বাস্তব প্রমাণ বিশেষ। এ বিষয়ে ইসলাম বেশ জোর দিয়াছে। ব্যক্তির কর্তব্য অনুভূতি এবং দয়ার্দ্রতা ও দানশীলতার প্রতি মনের আকর্ষণ ও প্রবণতাই তার উপকরণ হয়ে থাকে। এমনিভাবে একই সময় দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য এর দ্বারা সাধন হয়। একটি হলো আন্তরিক চেতনাবোধের ট্রেনিং ও সংগঠন হওয়া।

অপরটি হলো নিরঙ্কুশ মানবতার অধিকারী হওয়া এবং স্থায়ী ও নিবিড় সামাজিক সাহায্য সহানুভূতি ও দায়িত্ববোধের বাস্তব রূপ প্রকাশ পাওয়া।

ইসলাম পারস্পরিক স্নেহ দয়া ও বদান্যতার গুণাবলীকে ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের অনুগত না করে নিছক মানবিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ ব্যাপারে কুরআনে করীমের বর্ণনা হলো এই ঃ

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ -

"আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে সেই সকল লোকদের সাথে অনুগ্রহ প্রদর্শন এবং আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ইন্‌সাফের সাথে কাজ করাকে নিষেধ করেনি– যারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের মোকাবিলায় যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয় নি। আর তোমাদেরকে দেশ ও বাড়ী ঘর থেকে বিতাড়িতও করেনি।"

(সূরা মমতাহেনা–৮)

রাসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

اِرْحَمُوْا اَهْلَ الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ -

"যদি তোমরা ভু-পৃষ্ঠের জীবদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করো, তবে যিনি আসমানে রয়েছেন, তিনি তোমাদের প্রতি মোহেরবানী করবেন।" (তিরমিযী ও আবু দাউদ)

এমনিভাবে ইসলাম পারস্পরিক দয়া ও অনুগ্রহের এমন একটি উন্নত মানের উজ্জ্বল আদর্শ দুনিয়ার সামনে তুলে ধরেছে, যা প্রকৃতিগত দিক দিয়ে নিছক মানবিক ও ধর্মীয় গোড়ামী থেকে অনেক উর্দ্ধে।

ইসলামের কর্মক্ষেত্রের সীমারেখা এখানেই কেবল শেষ নয়! বরং সামনে এগিয়ে এমন একটি মহান ভূমিকা সে নিয়েছে, যার নজীর অন্য কোন ধর্মে বর্তমান নাই। সে সমুদয় সৃষ্টজীবকে স্বীয় রহমতের আবরণ দ্বারা ঢেকে ফেলেছে এবং একে অপরের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের আহ্‌বান জানিয়েছে। ইসলামের আগাগোড়া জীবন বিধানটি কেবল দয়া ও অনুগ্রহে ভরপুর। রাসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন–

"একবার কোন এক ব্যক্তি পথ অতিক্রম করতে গিয়ে খুব তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লেন। ইত্যাবসরে একটি জলাশয় পরিলক্ষিত হলে সে তার ভিতর নেমে পানি পান করতঃ উপরে চলে এসে দেখতে পেল যে, একটি কুকুর পিপাসার জ্বালায় হাঁপাইতেছে। সে চিন্তা করলো আমি যেমন পিপাসায় কাতর হয়ে ছট্‌ফট্‌ করতে ছিলাম কুকুরটিও অনুরূপ ছট্‌ফট করছে। সুতরাং সে জলাশয়টির ভিতরে নেমে স্বীয় চামড়ার মুজায় পানি ভরে তা স্বীয় মুখ দ্বারা কামড়িয়ে ধর উপরে চলে আসলো এবং কুকুরটিকে উক্ত পানি পান করিয়ে নিজের গন্তব্য পথে চলে গেল। তার এহেন ক্ষুদ্র কাজটি আল্লাহ তায়ালার খুব মনোপুতঃ হলে তার প্রতিদান স্বরূপ তিনি তার সমুদয় গুনাহরাশি মার্জনা করলেন।"

এ ঘটনাটির বিপরীতমুখী আর একটি ঘটনার বর্ণনায় নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন– এক রমণীকে দোযখে এ জন্য নিক্ষেপ করা হয়েছিল যে, সে একটি বিড়াল বেঁধে রেখে তার প্রতি এমন চরম জুলুম করেছিল যে বিড়ালটিকে সে নিজেও খাদ্য দান করেনি, উপরন্তু ওটি যাতে করে নিজে যমীনের পোকা মাকড় খেয়ে জীবন বাঁচাতে পারে, সে পথও সে রুদ্ধ করে দিয়েছিল।

বস্তুত ইসলামী জীবন বিধানে ঈমানের মৌলিকতা এবং তার পরিচয় দানের বাস্তব ভূমিকা হলো পারস্পরিক স্নেহ ভালবাসা দয়ার্দ্রতা ও বদান্যতা প্রদর্শন। কারণ এটা মন-প্রাণ ধর্মীয় চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হওয়া এবং মানবাত্মার মধ্যে ধর্মের মূল-প্রাণবস্তু অনুপ্রবেশ হবার বাস্তব প্রমাণ বৈ কিছু নয়। আর সাথে সাথে এটা মানুষের ভিতর মাবাত্মার সেই প্রাণান্তকর অবস্থা বর্তমান থাকার পরিচয় বহন করে, যা না হলে ইসলামের নিকট ব্যক্তির মধ্যে ধর্মকেই লুপ্ত মনে করা হয়।

ইসলাম এহেন মৌলিক ভিত্তির উপরই সদকা এবং ভাল আদান-প্রদানের জন্য উৎসাহ অনুপ্রেরণা দান করে এবং সম্পদ খরচ করাকে তার নিকট একটি পসন্দনীয় বিষয় মনে করে। প্রতিদান লাভের আশায় এবং পার্থিব জগতে আল্লাহর খুশী অর্জন এবং কল্যাণ লাভের জন্যই কেবল সম্পদ ব্যয় করুক এটাই ইসলামের উদ্দেশ্য। আর এর দ্বারা পরকালে একাধারে কল্যাণ লাভ অপর দিকে আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি অর্জন করাটাও তার উদ্দেশ্যের অন্তর্ভূক্ত বিষয়।

যে সকল আল্লাহর অনুগত নিঃস্বার্থ বান্দারা একমাত্র তাঁর সান্নিধ্য অর্জনের খাতিরেই কেবল দানের হস্ত সম্প্রসারিত করে স্বীয় কষ্টার্জিত সম্পদ ব্যয় করে ইসলাম তাদের জন্য মহান খুশীর স্বাগত বার্তা জানিয়ে ঘোষণা করছে ঃ

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ـ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصَّابِرِيْنَ عَلٰى مَا اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِى الصَّلٰوةِ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ـ

"বিনয়ী লোকদেরকে সুসংবাদ দিন। তাদের অবস্থা হলো যখন তাদের সামনে আল্লাহর যিকির করা হয়, তখন তাদের অন্তর আল্লাহর ভয়ের প্রাবল্যে থর থর করে কেঁপে উঠে। আর তাদের প্রতি বিপদ আপদ অর্পিত হল তারা ধৈর্য ধারন করে। তারা নিয়মিত নামায আদায়কারী লোক। আমি তাদেরকে যা কিছু দান করেছি; তা থেকে আল্লাহর পথে তারা ব্যয় করে।" (সুরা হজ্ব–৩৪-৩৫)

কুরআনে করীমে এ বাণীটি মনের উপর কত গভীর প্রভাব বিস্তারকারী ও মর্মস্পর্শী বাণী, তা সত্যই বিচার্যের বিষয়। এ বিষয়টিকেই কুরআন নতুনভাবে নতুন ভংঙ্গিতে পেশ করছে!

اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ـ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ـ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ـ جَزَاءً بِمَا كَانُوْ يَعْمَلُوْنَ

"আমার বর্ণিত আয়াতের প্রতি কেবল তারাই বিশ্বাস স্থাপন করে; যারা নসীহত সম্বলিত আয়াত শুনা মাত্রই সিজদায় গিয়া স্বীয় প্রতিপালকের প্রশংসা করতঃ তাঁর পবিত্রতা বর্ণনায় পঞ্চমুখ হয় এবং গর্ববোধ ও বিদ্রোহীতার আচরণ প্রদর্শণ করে না। তাদের দেহপার্শ্ব শয্যা থেকে বিচ্ছিন্ন রয়ে অর্থাৎ তারা রাত জাগরণ করে আশা আকাঙ্খা ভয় ভীতির মিশ্র চেতনা অনুভূতি নিয়ে স্বীয় প্রতিপালককে ডাকতে থাকে। আর আমি তাদেরকে যা কিছু সম্পদ দান করেছি, তা থেকে তারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে। তাদের পাথির্ব কার্যের বিনিয়ম গোপন ভাণ্ডারে তাদের চিত্ত বিনোদনের নিমিত্ত চোখ জুড়ানোর জন্য কি কি দ্রব সামগ্রী গোপন রাখা হয়েছে, সে বিষয় কেউই অবগত নয়।" (সূরা সিজাদাহ ১৫–১৭)

এমনি ভাবে মদীনাবাসীদের সম্মুখে ত্যাগ ও তিতিক্ষার এমন একটি সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হয়েছে যারা মুহাজেরীনদের আগমনকে জানিয়েছিল খোশ "আমদে", পূর্ণ প্রসন্নচিত্তে হাসিমুখে দিয়েছিল তাদেরকে স্থান। আর নিজেদের ঘর বাড়ি ও ধন সম্পদে স্বেচ্ছায় করে নিয়েছিল তাদেরকে অংশীদার। কুরআন মজীদে আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ - وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

"(আর এ গণীমতের সম্পদে তাদেরও অংশ রয়েছে) যারা এ সকল মুহাজেরদের আগমনের পূর্বেই দারুল ইসলামের নাগরিক হয়ে ঈমান গ্রহণ করেছে। এখন যারা হিজরত করে তাদের কাছে এসেছে, তারা তাদেরকে খুব ভালবাসে। আর তারা মুহাজিরদেরকে যা কিছু দান করে সে ব্যাপারে নিজেরা কোনরূপ গোপন আশা রাখে না। তারা নিজেদের স্বার্থের উপর তাদের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। নিজেরা যতই দুঃখ দৈন্যের মধ্যে থাকুক না কেন যারা স্বীয় স্বভাবকে লোভ লালসা ও কৃপণতার খপ্পর থেকে দূরে রেখেছে তাদের মুক্তি সুনিশ্চিত ওরাই সফলকাম।" (সূরা হাসর-৯)

কুরআন মজীদের এ আল্লাহর অংকিত এ চিত্রটি হলো উচ্চতর মানবতার একটি আকর্ষণীয় রূপরেখা। এ ছাড়া আল্লাহর আরও এমন কিছু বান্দা রয়েছে, যাদের জীবনের আদর্শ এ আচরণের চেয়েও আকর্ষণীয় ও প্রভাব বিস্তারের দিক থেকে কোন অংশে কম নয়। কতিপয় লোকের মতে ওরা হলো হযরত আলী (রাঃ) এবং তারা স্ত্রী এবং তার পরিবার পরিজনের লোকজন। তাদের সম্পর্কে কুরআন মজীদে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا - وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا - اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ

اللّٰهِ لَانُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَّلَاشُكُوْرًا ـ اِنَّا نَخَافُ مِنْ
رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ـ فَوَقٰهُمُ اللّٰهُ شَرَّ
ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ـ وَجَزٰهُمْ بِمَا
صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ـ مُّتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى
الْاَرَائِكِ لَايَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا ـ وَدَانِيَةً
عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ـ وَيُطَافُ
عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا ـ
قَوَارِيْرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا وَيُسْقَوْنَ
فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ـ عَيْنًا فِيْهَا
تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا ـ وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ
مُّخَلَّدُوْنَ ـ اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا ـ
وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا ـ عٰلِيَهُمْ
ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ ـ وَّحُلُّوْا اَسَاوِرَ
مِنْ فِضَّةٍ ـ وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا اِنَّ هٰذَا
كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ـ

"এ সকল নেক্‌কার লোকদের কর্মনীতি হলো যে, তারা নিজেদের মান্নৎকে যথাযথ রূপে আদায় করে। আর সেই দিনটি সম্পর্কে অন্তরে খুব ভয়ভীতি পোষণ করে যে দিন মানুষ চতুর্দিকে পর্বত সমান বিপদ আর বিপদ অবলোকন করতে থাকবে। (পরকালকে ভয় করার বাস্তব নজীর হিসেবে) তারা এতীম, মিস্‌কীন, এবং যুদ্ধবন্ধীদেরকে খাদ্য দান করে। অথচ অন্যান্যদের ন্যায় মালের প্রতি তাদেরও মনের আকর্ষণ রয়েছে। কিন্তু তাদের অবস্থা হলো যে নিজেদের আচরণ দ্বারা মনে হয় যেন এ কথাই বলতে চায় যে, আমরা তোমাদেরকে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তই খাদ্য খাওয়াতেছি। যেমন কোন প্রতিদান পাওয়ার আশা রাখি না; অনুরূপ আমরা এটাও চাইনা যে, তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। আমাদেরকে আন্দোলিত করার বস্তুটি হলো পরকালের ভয়ভীতি

যা সর্বদা আমাদের মনে আন্দোলিত হয় (তাদের এহেন মানসিকতা এবং কর্ম পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্যই) আল্লাহ তায়ালা পরকালের সর্বপ্রকার ভয়ভীতি ও আপদ বিপদ থেকে মুক্ত রেখে তাদের আনন্দ স্ফুতি ও সুখ শান্তির নয়ামত দান করবেন। অতঃপর ধৈর্য ধারণের বিনিময়ে তাদের থাকার জন্য সুসজ্জিত বাগান এবং পরিধানের জন্য রেশমী বস্ত্র দান করবেন। উক্ত বাগানে তাদের হেলানের জন্য এমন সুন্দর সজ্জিত গ্যালারীও রয়েছে, যেখানে নেই কোন রৌদ্রের প্রখরতা এবং নেই কোন হিমেলী হাওয়ার শীতলতা। অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত অটোমেটিক ব্যবস্থা। বরং এ বাগানের সবুজ বৃক্ষরাজি সর্বদা তাদের মাথার উপর ছায়া দান করবে। আপন হতেই তার ফল ফলাদি হাতে এসে পড়বে। আর সেখানে "সাকী" সর্বদা হাতে রৌপ্যের পিয়ালা নিয়ে চক্ষের ইশারা পাওয়ার জন্য থাকবে অপেক্ষমান রূপে দণ্ডায়মান। পিয়ালাটি রৌপ্যের বটে, কিন্তু তার কালাই হচ্ছে সীসার। আর সীসাটি হচ্ছে রৌপ্যের নির্মিত। অভিজ্ঞ কারিগরগণ নিজেদের সুনিপূণ দক্ষতা ও কারিগরির সমুদয় শক্তি ব্যয় করে তাদের জন্য তা নির্মাণ করেছে। এ মজলিসে এমন সুস্বাদু সরবত পান করান হবে যার শীরা হচ্ছে 'জানযাবীল'। আর উক্ত সরবতের এমন একটি নহর বেহেস্তে প্রবাহমানও রয়েছে, যা বেহেস্তবাসীদের নিকট "সালসাবীল" নাম পরিচিত। তাদের খেদমতের জন্য এমন সুন্দর বালক রয়েছে, যাদের যৌবন হচ্ছে কচি ডগার ন্যায় টলটলায়মান ও চিরস্থায়ী। তাদের দেখলে মনে হয় যেন মনিমুক্তা বিচ্ছুরিত রয়েছে। মোটকথা যখন এ সুন্দরতম মনমুগ্ধকর দৃশ্যটির প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়, তখন দেখবে যে অপরিসীম ও অগণিত নেয়ামতরাজির অভূতপূর্ব সমাবেশ। এ রাজ্যের সীমানার দিগন্তের শেষ নেই। এ সব বেহেস্তীদের পরিধানে অতি চিকন ও মিহিন সবুজ রেশমী কোর্ত্তা থাকবে যার দিবাজও হবে রেশমী নির্মিত। আর তারের হস্তযুগলে থাকবে রৌপ্যের নির্মিত বালা। তাদের প্রভূ তাদেরকে পবিত্র সরবত পান করিয়ে বলবেন এ সব জিনিস হলো তোমাদের প্রতিদান। ভাল ও কল্যাণমূলক কাজের বিনিময় তোমাদের পরিশ্রমের পূর্ণ মর্যদা দেওয়া হয়েছে।" (সূরা দাহার- ৭-২২)

আর পবিত্র কুরআন মজীদে সদ্‌কাকে ঋণ দেওয়া স্বরূপ উল্লেখ করে পরকালে তার যথার্থ প্রতিদানও আদায় করার নিশ্চয়তা দিয়ে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ -

"এমন কে আছে যে আল্লাহ তায়ালাকে "করজে হাসানা" দান করবে? সুতরাং আল্লাহ তায়ালা তার কয়েকগুণ বেশী দিয়ে তা ফিরৎ দিবেন! এমন কি তাকে তার যথার্থ প্রতিদানও দান করবে।" (সূরা আল্‌হাদীদ-১১)

إِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ـ

"যে সকল নর-নারী আল্লাহ তায়ালাকে (সদ্‌কার মাধ্যমে) "করজে হাসানা" দান করে আল্লাহ তায়ালা তা কয়েকগুণ বেশী দিয়ে আদায় করবে। এছাড়া তাদের জন্য এ কাজের যথার্থ প্রতিদান স্বতন্ত্র রূপে দেয়া হবে।" (সূরা আল্‌হাদীদ-১৮)

এছাড়া সদ্‌কা ও দানকে কুরআনে করীমে একটি লাভজনক ব্যবসা উল্লেখ করে তার প্রতিদান ও বিনিময় দেয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ـ لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ط اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ـ

"যারা আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করে এবং নামায আদায় করতঃ আমি যা কিছু তাদেরকে দান করেছি তাথেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে কল্যাণকর পথে ব্যয় করে, তারা এমন একটি লাভজনক ব্যবসা করতেছে; যে ব্যবসায় লোকসানের কোন সম্ভাবনা নেই। তাদের এ কাজের অনিবার্য পরিণাম ফল হলো যে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা এর পূর্ণ প্রতিদান দিবেন। এ ছাড়া তিনি স্বীয় রহমত দ্বারা তাদেরকে বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত করবেন। আল্লাহ তায়ালা হলেন গুনাহ্ মার্জনাকারী ও গুণের মর্যাদা দায়ক।" (সূরা ফাতের-২৯-৩০)

সদকা যে কিছু না কিছু একটি লাভজনক ব্যবসা বিশেষ, এর মধ্যে যে অপরের অধিকার হরণ বা ক্ষতি সাধানের কোন প্রশ্নই উত্থাপন হবার অবকাশ নেই, সে সম্পর্কে সূরা বাকারায় আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন ঃ

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ـ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ـ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ـ

"খয়রাত দিতে তোমরা যা কিছু দান করো, তা তোমাদের নিজেদের জন্যই। খয়রাত দানের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। সুতরাং খয়রাত দিতে যা কিছুই তোমরা দান করো না কেন, তার প্রতিদান তোমাদেরকে পুরুপুরিই দেয়া হবে। তোমাদের হক কখনো নষ্ট করা হবে না।"

(সূরা বাকারা-২০২)

পরকালের বেহেস্ত লাভ যে সদ্‌কা দানকারীদের জন্য একটি উপহার স্বরূপ, সে বিষয় কুরআনের ভাষা নিম্নরূপ ঃ

وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا
السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ - الَّذِيْنَ
يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ
وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ - وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

"সে পথে তোমরা দৌঁড়িয়ে চলো; যে পথ তোমাদেরকে প্রতিপালকের মাগ্‌ফিরাত এবং এমন বেহেস্তের পানে নিয়ে যায়, যার প্রশস্ততা হলো যমীন ও আসমানের প্রশস্ততার ন্যায়। ঐ বেহেস্ত সেই সকল আল্লাহভীরু বান্দাদের জন্য রাখা হয়েছে, যারা খুশী অখুশী ও ধনী গরীব সর্বাবস্থায় নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে আর গোস্বাকে সংম্বরণ করতঃ অপরের অন্যায় ক্রটিকে মার্জনা করে। এমন সব নেক্‌কার লোকদেরকেই আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন।"

(সূরা আলে ইমরাণ ১৩৩-১৩৪)

সদ্‌কার দ্বারা একদিকে যেমন আত্মার পরিচর্যা ও পবিত্রতা সুঁচিত হয়, অন্য দিকে ধন সম্পদও পবিত্র সাধন হয়। একবার কিছু সংখ্যক লোক নিজেদের দোষ ক্রুটি স্বীকার করতঃ তাওবা করার জন্য উদগ্রীব হলে তাদেরকে পবিত্র করণের নিমিত্ত তাদের ধন-সম্পদের একটি অংশ কল্যাণেকর কাজে ব্যয় করার জন্য রাসুলে করীম (সাঃ) এর প্রতি নির্দেশ দিয়ে আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا
صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ط عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ
عَلَيْهِمْ - اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ
صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ - اِنَّ

صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ـ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ـ اَلَمْ
يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ
وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ ـ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ

"এমন কিছু সংখ্যক লোক রয়েছে যারা নিজেদের কৃত অপরাধ স্বীকার করে। তাদের আমল হলো মিশ্র আমল, কিছু হলো নেক আমল এবং কিছু হলো বদ্ আমল। আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি মেহেরবান হবেন বলে আশা করা যায়। নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা গুনাহ মার্জনাকরী ও মেহেরবান। হে নবী! তাদের সম্পদ থেকে সদ্কা নিয়ে তাদেরকে পবিত্র করো। নেকের কাজে তাদেরকে অগ্রগামী করে দাও। আর তাদের জন্য রহমত কামনা করে দোয়া করো। কারণ নিশ্চয় আপনার দোয়া তাদের জন্য শান্তিদায়ক হবে। আল্লাহ্ তায়ালা সবকিছু শুনেন ও জানেন। "মানুষের কি এ কথা অবগত নেই যে, আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বান্দাদের তাওবা কবুল করেন। আর করেন তাদের সদ্কা কবুলিয়াতের মর্যাদা দান। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা গুনাহ্ মার্জনাকারী ও দয়াশীল।"

(সূরা তাওবা ১০২-১০৪)

আল্লাহর পথে ব্যয় করার চেতনা অনুভূতি ও উৎসাহ উদ্দীপনা, আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পুরণ করণ এবং তার ভয় ভীতির ভিতর নিমজ্জিত থাকা এবং অশুভ পরিণামকে ভয় করার সাথে সম্পূর্ণরূপে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। এ হলো বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশীলতার বাস্তব প্রমাণ। এটা মানুষের জ্ঞান বুদ্ধিকে সত্যিকারের শিক্ষা প্রদান করে। এর থেকে হাত গুটিয়ে নেয়ার অর্থ এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, আল্লাহ্ তায়ালা যা সংযোজিত রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন তাকে দ্বিধা বিভক্ত করা। এ থেকে হাত গুটানো এক প্রকার অঙ্গীকার ভঙ্গন এবং আল্লাহর যমীনে ঝগড়া-ফাসাদ প্রসার করার সমার্থবোধক কাজ। কুরআন মজীদে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اِنَّمَا يَتَذَكَّرُا وُلُوا الْاَلْبَابِ ـ اَلَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ
اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ـ وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا
اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَلفُوْنَ
سُوْءَ الْحِسَابِ ـ وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ

وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا
وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰئِكَ لَهُمْ
عُقْبَى الدَّارِ - جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ
مِنْ اٰبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ
عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ - سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ
فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ - وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ
مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ
يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ اُولٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ
وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ -

"বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে। এরা হলো সেই লোক, যারা আল্লাহর সাথে নিজেদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণরূপে পালন করে। তাকে দৃঢ়রূপে বাঁধানোর পর আর তা ছিন্ন করে না। তাদের গতিধারা হলো যে, আল্লাহ তায়ালা যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা তারা প্রতিষ্ঠিত রাখে। আর তারা আল্লাহ তায়ালাকে খুব ভয়ও করে এবং পরকালে যাতে করে তাদের হিসাব নিকাশ খারাপ না হয়, সে ভয়ও তারা অন্তরে পোষণ করে। তাদের অবস্থা হলো যে, স্বীয় প্রভুর সান্নিধ্য অর্জনের নিমিত্ত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে কাজ করে। আর নিয়মিত নামায আদায় করে এবং আমার দেয়া রিযিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে। আর অকল্যাণ ও খারাপ কাজকে কল্যাণ ও ভাল কাজ দ্বারা বিনিময় করে, এ হলো তাদের অবস্থা। কেবল এ সকল লোকদের জন্যই হচ্ছে পরকালের চিরস্থায়ী বাসস্থান। অর্থাৎ এমন জান্নাত যা তাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান হবে। তারা নিজেরা যেমন তাতে প্রবেশ করবে অনুরূপ তাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী পুত্র, ছেলে মেয়ে যদি পূণ্যবান হয়, তবে তারাও তাদের সাথে সাথে সেখানে প্রবেশ করবে। তাদেরকে সম্ভর্ধনা জ্ঞাপনের নিমিত্ত চর্তুদিক থেকে ফিরশতারা আস্-সালাম, আস্সালাম বলতে বলতে তাদেরকে খোশ আমদে জানাবার জন্য এগিয়ে আসবে। তারা বলবে তোমরা দুনিয়ার বসে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে যেমন কাজ করেছো তার প্রতিদান হিসেবেই আজ এসব তোমাদের সৌভাগ্যে হয়েছে। দেখ! কতইনা সুন্দর এ পরকালের স্থানটি। কিন্তু যারা আল্লাহর সাথে

পাকাপোক্ত অঙ্গীকার করার পর তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে এবং যারা সেই সম্পর্ককে বর্ত্তন করে যা জুড়ে রাখার জন্য আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন। আর যারা আল্লাহর যমীনে ঝগড়া ফাসাদ ও কলহ বিবাদ করে তারাই হলো আল্লাহর অভিশাপের উপযুক্ত পাত্র। পরকালে তাদের স্থান খুবই খারাপ ও বিভীষিকাপূর্ণ।" (সূরা আররয়াদ- ১৯-২৫)

আল্লাহর পথে ব্যয় বন্ধ করা অর্থাৎ ইন্‌ফাক ফি সাবিলিল্লাহ থেকে বিরত থাকার অর্থ হচ্ছে নিজের এবং সমাজের ধ্বংস ডেকে আনা। এ ব্যাপারে কুরআন মজীদে সর্তক বাণী উচ্চারণ হয়ে ঘোষিত হয়েছে ঃ

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَاتُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَي التَّهْلُكَةِ -

"আল্লাহর পথে ব্যয় করতে থাকো (এ পথে ব্যয় বন্ধ করে) নিজেদের হাতকে নিজেরাই ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না।" (সূরা বাকারা-১৯৫)

এহেন আচরণ প্রদর্শনের মধ্যে ব্যক্তি-সমাজ উভয়েরই ক্ষতি ও ধ্বংস নিহিত। ব্যক্তির ক্ষতি হচ্ছে এদিক দিয়ে যে, ব্যক্তি নিজে নিজেকে যেমন পরকালে কঠিন শাস্তির যোগ্য পাত্র বানায়, অনুরূপ এ পার্থিব জগতে মানুষের নিন্দনীয় পাত্র হয়। আর সামাজিক ক্ষতি হলো এদিক দিয়ে যে আল্লাহর পথে অর্থাৎ কল্যাণ মূলক কাজে ব্যয় বন্ধ করণের দ্বারা সমাজের মধ্যে জুলুম অত্যাচার দুর্নীতি দুষ্কার্য ঈর্ষা বিদ্বেষ ঝগড়া ফাসাদ আত্মকলহ এবং দুর্বলতা বিচ্ছিন্নতা অধিক পরিমাণে প্রসার লাভ করে। এজন্য এ কাজকে সামাজিক ধ্বংসের অন্যতম কারণ বলা হয়েছে। এ ছাড়া সমাজের অনাথ ও দীন দরিদ্রদেরকে তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করাও পরিষ্কার জুলুম।

اَلْقِيَا فِىْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ - مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبٍ -

"এমন সব অকৃতজ্ঞ কাফেরদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। যারা দীন দরিদ্র ও গরীবদেরকে ধন-দৌলত থেকে বঞ্চিত রেখে মানুষের উপর জুলুম করে এবং দ্বীনের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহবাদীতার মধ্যে নিপতিত।" (সূরা ক্বাফ-২৪-২৫)

وَلَاتُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ - هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ - مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ -

"হাল্‌কাপনা লোক যারা, তারা তোমাদের সামনে খুব ঘন ঘন কস্‌ম (শপথ) করে থাকে। তাদের কথায় তোমরা কর্ণপাত করো না। তারা হলো পরনিন্দুক ও চোগলখোর। এ ছাড়া তারা গরীবদেরকে ধন-দৌলত থেকে বঞ্চিত করে, মানুষের উপর জুলুম করে এবং তাদের হক্‌ ও অধিকার নষ্ট করে। সুতরাং এহেন প্রকৃতি সম্পন্ন লোকের কথায় কর্ণপাত করা উচিত নয়।" (সূরা আলকলম- ১০-১২)

এ অতিরিক্ত আচরণ দ্বারা যেমন আল্লাহর অধিকারের উপর খোদকারী করা হয়, অনুরূপ হয় তার দ্বারা তার প্রাপ্য অধিকার নস্যাৎ। অপরদিকে দেশ ও সমাজের হক ও অধিকারকেও নষ্ট করা হয়। ব্যক্তি, সমাজ ও দেশের একটি অঙ্গরূপে থাকার দিক দিয়ে ব্যক্তির নিজের উপরও জুলুম করা হয়। আর এর বিপরীত আচরণ হলো সৎকাজ ও ভাল আদান প্রদান। যার দ্বারা মানুষ তার নিজের ও বেহেস্তের মধ্যবর্তী কঠিনতম মনযিল সমুহ অতিক্রম করে বেহেস্তের অভ্যন্তরে পৌঁছতে পারে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আর সেই মনযিল সমুহকে কুরআনের ভাষায়-দান ও কয়েদীদের মুক্তিদান, বুভুক্ষদেরকে খাদ্যদান এবং গরীব দুঃখীদের প্রতি আন্তরিক বাস্তব সহানুভূতি প্রদর্শন ইত্যাদি কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ - فَكُّ رَقَبَةٍ - أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ - يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ - أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ -

"এ ঘাটি গুলো কি তা তুমি অবগত আছ কি? এগুলো হচ্ছে দাস-দাসী ও কয়েদীদেরকে মুক্তিদান, অথবা নিকটতম কোন এতিম বা নিম্ন শ্রেণীর মিস্‌কীনদের বুভুক্ষ অবস্থায় খাদ্য দান করা।" (সূরা আল্‌ বলাদ- ১২-১৬)

এ সব কাজ থেকে মানুষ দুরে সরে থাকার অর্থ হচ্ছে নিজেদেরকে জাহান্নামের করাল গ্রাসের মুখে ফেলে দেয়া। কাফেরদের কাতারে দণ্ডায়মান হওয়া। কুরআন মজীদে ঘোষণা হয়েছে ঃ

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ - قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ - وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ - وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ - حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ -

"(কেয়ামতের দিন তাদের নিকট জিজ্ঞেস করা হবে) কোন কারণে তোমাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হলো? তারা উত্তরে বললো—আমরা নামাযী ছিলাম না, মিসকিনদেরকে খাদ্য দিতাম না। উপরন্তু আল্লাহর আয়াতের সাথে যারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো, আমরা গিয়ে তাদের দলে শামিল হয়ে গুনাহে লিপ্ত হতাম। আর শেষ বিচারের দিনটিকেও অস্বীকার করে তাকে অলীক ও ফাল্‌তু কথা মনে করতাম। পরিশেষে সেই নিশ্চিত সত্য দিনটিই আজ আমাদের সামনে উপস্থিত যার আগমন নিশ্চিত ও অবধারিত ছিল। (এ কারণেই আমাদের জাহান্নামে প্রবেশ করতে হয়েছে)।" (সূরা আল্ মুদ্দাসের–৪২-৪৭)

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ
فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ـ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ـ
سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

"যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অনুগ্রহ (ধন-সম্পদ) দান করেন, আর যদি এর পর তারা কৃপণতা প্রদর্শন করে, তবে এ কৃপণতা যে তাদের জন্য কল্যাণকর হবে, তা যেন তারা ধারণা না করে। বরং-এর পরিণাম ফল খুবই খারাপ। তাদের কৃপণতা যাকিছু সঞ্চয় করে রাখবে, তা কিয়ামতের দিন তাদের গলায় তাওক হয়ে ঝুলতে থাকবে।" (সূরা আলে ইমরাণ-১৮০)

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ فَالذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
اَلِيْمٍ ـ يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ فَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى
بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ـ هٰذَا مَا
كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ـ

"যারা স্বর্ণ রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে রাখে, অথচ তার থেকে আল্লাহর পথে খরচ করে না, তাদেরকে আপনি বেদনা দায়ক আযাবের সুসংবাদ দিন। এ স্বর্ণ-রৌপ্যের তোড়াকে জাহান্নামের আগুন দ্বারা গরম করে তাদের পৃষ্ঠ দেশে, পাজরায় এবং ললাটে দাগ দেয়া হবে। তখনই এ আযাবের স্বাদ তারা অনুভব করতে পারবে। তখন তাদেরকে বলা হবে– "তোমরা যা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলে আজ তার স্বাদ গ্রহণ করো।" (সূরা তাওবা–৩৪-৩৫)

এখানে কান্‌জ শব্দ দ্বারা শুধু ঐ মালের কথাই বুঝান হয়নি যে মালের যাকাত দেওয়া হয় না। এ জন্যই কুরআন মজীদে যাকাতের কথা উল্লেখ করার পূর্বে উপরে অধিকাংশ সময় সদ্‌কা ও আল্লাহর পথে ব্যয়ের (ইন্‌ফাক) কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাই প্রমাণ করছে যে, যাকাত একটি নির্দিষ্টম কর্তব্য এবং সদ্‌কা ও ইনফাক ফি সাবীলিল্লাহ অনির্দিষ্ট– তা কোন নেসাব বা সীমারেখা কিম্বা পরিমাণের অনুবর্তী নয়। হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন– হে বনী আদম! তোমাদের জন্য প্রয়োজন অতিরিক্ত সম্পদ খরচ করা উত্তম কাজ। আর তাকে আকড়িয়ে ধরা অর্থাৎ খরচ না করা অশুভ পরিণাম বৈ কি? (মুসলিম, তিরমিষী)।

হযরত বিলাল (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন– তোমাকে যে রিযিক দান করা হয়েছে, তা তুমি গোপন করে রেখো না। আর যদি তোমার নিকট কিছু চাওয়া হয়, তবে সে ক্ষেত্রে তুমি কৃপণতা প্রদর্শন করো না। হযরত বিলাল (রাঃ) বলেন, হে আল্লার রাসুল! এটা কেমন করে করা যেতে পারে? নবী করীম উত্তর করলেন– হয়ত তুমি এ পথ গ্রহণ করে নিবে, নতুবা তোমাকে জাহান্নামের জালানী কাঠে পরিণত হতে হবে। (তাবারানী ফি কবীর, আবু শায়খ ইবনে হাব্বান)।

উল্লেখিত হাদীসটিতে কৃপণতা প্রদর্শন এবং কল্যাণ মূলক কার্যে বাধা প্রদানের পরিণাম ফল শুধু যে পরকালেই ভোগ করতে হবে তা নয়। বরং এ পার্থিব জগতেও কখনো কখনো তার কারণে শাস্তি পেতে হয়। এ বিষয় কুরআন মজীদে ছোট একটি ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে একটি বাস্তব উদাহরণ পেশ করেছে। যা সত্যই চিন্তা করার বিষয়। কিছু লোকের একটি বাগান ছিল, যার ফল ফলাদি থেকে তারা গরীব দুঃখীকে দান খয়রাত করতো। কিন্তু গরীব দুঃখীকে দান খয়রাত করার দরুন মাল কমে যাবার ভয়ে যখন তারা কৃপণতা প্রদর্শন করে তাদেরকে দান করা বন্ধ করে দিল, তখন তাদের বাগানে এমন আসমানী বালা নাযিল হলো, যার কারণে বাগান নষ্ট হল। আল্লাহ তায়ালা বলতেছেন ঃ

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ـ إِذْ
أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ـ وَلَا يَسْتَثْنُونَ
ـ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ـ
فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ـ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ـ أَنِ

غْدُوْا عَلٰى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ ـ فَانْطَلَقُوْا
وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ ـ اَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ
مِّسْكِيْنٌ ـ وَّغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ ـ فَلَمَّا رَاَوْهَا
قَالُوْا اِنَّا لَضَآلُّوْنَ ـ بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ـ قَالَ
اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ ـ قَالُوْا
سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ـ فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ
عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ ـ قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا
طٰغِيْنَ ـ عَسٰى رَبُّنَآ اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ اِنَّآ
اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ ـ كَذٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ
اَكْبَرُ ـ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ـ

"বাগানের মালিকদেরকে যেরূপ পরীক্ষা করে ছিলাম, তাদেরকেও অনুরূপ পরীক্ষার মধ্যে নিপতিত রেখেছি। বাগানের মালিকরা এ বলে শপথ নিয়েছিল যে, অতি প্রত্যুষে গিয়েই তারা বাগানের শস্য কেটে আনবে। গরীব ও দীন-দরিদ্রদেরকে শস্যের অংশ না দেয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। কারণ তারা শস্য কাটার সময় ভীড় করে। কাজেই অতি ভোরে ফসল কেটে নেয়া হলে আর তারা ভীড় করার সুযোগও যেমন পাবে না, তাদেরকে ফসলও দিতে হবে না। কিন্তু তখনো নিদ্রায় তারা বিভোর ছিল। এ দিকে তোমার প্রভুর তরফ থেকে ক্ষেতের উপর এমন গজব পতিত হলো, যার কারণে উক্ত ক্ষেত মৌসুমী ফসল কাঁটার পূর্বের অবস্থার ন্যায় পরিণত হলো। এ দিকে লোকেরা প্রত্যুষে উঠে একে অপরকে ডাকাডাকি করে বলতে লাগলো; আরে ফসল কাটতে হবে তাড়াতাড়ি চলো। ভোর বেলার মধ্যেই ফসল কাটা শেষ করতে হবে। তরা পরস্পরে কানাকানি করে পথ চলতে লাগলো যে, আজ আর কোন গরীবই তোমাদের ক্ষেতে আসার সুযোগ পাবে না। তাদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল যে গরীবদেরকে না দেবার বেলায় তারা পূর্ণ ক্ষমতাবান। যখন তারা ক্ষেত্রের নিকট পৌঁছলো, তখন তারা অবস্থা অনুরূপ দেখে বলতে লাগলো– "আরে! আমরা পথ ভুলে আসছি নাকি? নাতো পথতো ভুলি নি, আমাদের কপাল পোড়া আমরা বঞ্চিত হয়েছি। তখন তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সৎপ্রকৃতি ও আল্লাহভীরু

মানসিকতা সম্পন্ন ছিল, সে বলে উঠলো– আমি কি তোমাদেরকে বলেছিলাম না যে খারাপ নিয়াতের পরিণতিও খারাপ। এখন নিজেদের কৃত কার্য্যের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনায় মশগুল হও! তখন তারা অনবত মস্তকে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে লাগলো-দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ! তুমি ছাড়া আর কেউই ভুল ভ্রান্তির উর্ধে নয়; একমাত্র তুমিই এথেকে মুক্ত। আমরাতো আমাদের নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছি। সুতরাং তুমি আমাদের ক্ষমা করো। অতএব তারা এ ভুলের জন্য আর খারাপ চিন্তাধারা গ্রহণের নিমিত্ত একে অপরের উপর দোষ চাপিয়ে ভৎর্সনা আরম্ভ করে দিল। পরিশেষে তারা বললো– আমরা সকলেই সীমা অতিক্রম করেছি, সকলেই এ পরিণতির সমভাগী। অতএব এখন আমাদের আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। হয়ত আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রতি মেহেরবাণী হয়ে, এ ক্ষেতের পরিবর্তে সমধিক ভাল ফসল বিশিষ্ট ক্ষেত দান করতে পারেন। আমরা আল্লাহর পানে মনোনিবেশ করতেছি। পার্থিব জগতে আল্লাহর আযাব এমনি রূপেই অবতীর্ণ হয়। পরকালের আযাব এর চেয়েও অনেক কঠিন ও ভয়ানক। যদি মানুষ আমার এই কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করে আসল পথ গ্রহণ করতো, তবে তাদের জন্য কতই না সুন্দর হতো।" (সূরাআল্ কলম–১৭-৩৩)

এ জন্যই কুরআনে করীম সময় হাত ছাড়া হওয়ার পূর্বেই মানুষকে আল্লাহর পথে "ইন্‌ফাক" (ব্যয়) করার আহ্বান জানায়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ ـ

"হে নবী! আমার মুমিন বান্দাদেরকে বলুন তারা যেন সেই দিনের আগমনের পূর্বে নিয়মিত নামায আদায় করে এবং আমি যা কিছু রিযিক তাদেরকে দান করেছি, তাথেকে, কল্যাণকর পথে ব্যয় করে– যে দিন করা যাবে না ক্রয়-বিক্রয় ও বেচা-কিনা। আর হবে না কোন বন্ধু বান্ধবের খাতেরদারী।" (সূরা ইব্যাহীম–৩১)

اَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَا اَخَّرْتَنِيْ اِلٰى اَجَلٍ

قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ - وَلَنْ يُّؤَخِّرَ
اللّٰهُ اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا -

"আমি যা কিছু ধন-সম্পদ তোমাদেরকে দান করছি তোমাদের কাহারা মৃত্যু সময় আগমনের পূর্বেই (আল্লাহ পথে) তোমরা তা থেকে ব্যয় করো। (অন্যথায়) মৃত্যু সময় যখন তোমাদের সামনে উপস্থিত হবে, তখন আফসুস করে তোমরা বলবে– প্রভূ দয়াময়! আমার জন্য যদি সমান্য কিছু সময় সুযোগের অবকাশ হতো, তবে তোমার পথে কিছু দান সদ্‌কা করতাম এবং নেক্‌কার হয়ে যেতেম। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা কোনক্রমেই বিন্দু বিসর্গ পরিমাণ সময় সুযোগ বা অবকাশ দিবেন না। কষ্মিন কালেও নয়।" (সূরা মুনফিক–১০-১২)

মানুষ যাতে করে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিদের ভালবাসা মহব্বতের মোহজালে আবদ্ধ হয়ে লোভ-লালসা ও কৃপণতার শিকারে পরিণত না হয়, সে জন্য কুরআনে করীম তাদেরকে সংকীর্ণ মনা থেকে বেঁচে থাকার আহ্বান জানায়। কারণ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি হলো তাদের পরীক্ষার বস্তু। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ - وَاللّٰهُ عِنْدَهُ اَجْرٌ
عَظِيْمٌ - فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا
وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِاَنْفُسِكُمْ - وَمَنْ يُّوْقَ
شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

"প্রকৃত প্রস্তাবে তোমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান সন্ততি হলো পরীক্ষার বস্তু বিশেষ। আর (যদি তোমরা তার জালে আবদ্ধ না হয়ে সত্যিকার পথে ও মতে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পার, তবে তা দ্বারা) আল্লাহর নিকট মহান প্রতিদান পাবার বস্তুও বটে। অতএব যথাসম্ভব আল্লাহকে ভয় করে চলো এবং তাঁর আনুগত্য মেনে নিয়ে তাঁর কথায় কর্ণপাত করো। আর আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হয়ো না। এর ভিতর তোমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যারা স্বীয় স্বভাবকে লোভ লালসা এবং কৃপণতার খপ্পর থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে তারাই আসল সফলতার দ্বারদেশ উন্মোচন করতে সক্ষম হয়।" (সূরা তাগাবুন–১৪-১৬)

রাসূলে করীম (সাঃ) সদ্‌কা ও দান খয়রাতকে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য নির্ধারণ করেছেন। যদি গরীবও হয়, তবু এ কর্তব্যের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা উচিত নয়। উপরি বর্ণিত কুরআন মজীদের সংক্ষিপ্ত বিশদ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে নবী করীম (সাঃ)-এর নিম্নলিখিত এ বাণীটির মধ্যে। তিনি বলেন– "প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সদ্‌কা করা একান্ত আবশ্যক। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো-হে আল্লাহর নবী! যে ব্যক্তির নিকট সাদ্‌কা করার মত কিছু না থাকবে সে কি করবে? তিনি উত্তর করলেন– নিজের হস্ত দ্বারা কাজ করে নিজের উপকার সাধন করবে এবং তা দ্বারা অপরকে সদ্‌কা করবে। লোকেরা আবার জিজ্ঞেস করলো; তাও যদি তার পক্ষে সম্ভব না হয়, তখন সে কি করবে? নবী করীম (সাঃ) উত্তর করলেন– কোন বিপদগ্রস্ত লোককে সাহায্য করবে। লোকেরা আবার জিজ্ঞেস করলো, যদি তাও সম্ভবপর না হয়? নবী করীম (সাঃ) তখন উত্তর করলেন– এমতাবস্থায় নিজের কর্ম পদ্ধতি ঠিক রেখে খারাপ কাজ থেকে দুরে থাকবে। এটাই তার জন্য সদ্‌কায় পরিণত বে।" (বুখারী মুসলিম)

এ হাদীসের বিবরণ অনুযায়ী সদ্‌কার ব্যাপারে সকল লোক সমভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে। যদি কাহারো সদ্‌কা করার মত কোন কিছুর সংস্থান না হয়, তবু উক্ত হদীস অনুযায়ী তার উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়। সুতরাং যার পক্ষে যতটুকু সম্ভব; ততটুকুই তার করা উচিত।

প্রয়োজন কোথায় এবং কতটুকু, এর উপরই হচ্ছে সদ্‌কার ব্যয় ভারের সমুদয় সময়সীমা নির্ভরশীল। নিকটতম আত্মীয়-স্বজনরাই হলো ভাল আদান-প্রদানের সর্বপ্রথম হকদার। কিন্তু অন্যান্যদেরকেও এ ব্যাপারে তাদের সাথে সাথে গণ্য করা হয়ে থাকে। দান ও সৎকাজের বেলায় উৎসাহ দানের দিক দিয়ে তাদের নামও নিকটতম আত্মীয়দের সাথে লেখা হয়। ভাল আদান-প্রদান ও সৎকাজ হলো প্রথমতঃ একটি সাধারণ মানবিক চেতনাবোধ। নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সৌজন্য মূলক আদান-প্রদান আর শোভনীয় ব্যবহার এবং দান ও বদান্যতার স্বভাবগত দাবীর উল্লেখ ঈমানের সাথেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়। কারণ এ সৎকাজগুলো হচ্ছে ঈমানের আলামত। যেমন কুরআন মজীদে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ
اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ

وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ - إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا - الَّذِينَ
يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا
آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ - وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا
مُّهِينًا -

"তোমরা সকল আল্লাহর বন্দেগী করো। তাঁর বন্দেগীতে কাহাকেও অংশীদার করো না। পিতা-মাতার সাথে শালীনতা বজায় রেখে শোভনীয় আচরণ করো। আর নিকটতম আত্মীয়-স্বজন এতিম মিস্‌কীনদের সাথেও ভাল আদান প্রদান করো। আর নিকট প্রতিবেশী দূরতম প্রতিবেশী বিদেশীয় বিজাতীয় প্রতিবেশী নিজের সঙ্গী সাথী মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাধীন দাসীদের সাথেও সুন্দর ও শোভনীয় ব্যবহার দেখাও। তোমরা নিশ্চিত রূপে জেনে রাখো যে, যারা স্বীয় চিন্তা কল্পনায় গর্ববোধ করে, ও নিজের মান মর্যাদা নিয়ে খুব গর্ব অহংকার করে এবং যারা নিজেরা কৃপণতা প্রদর্শন করে এবং অপরকে কৃপণতা করার পরামর্শ দেয় এবং আল্লাহ তায়ালা যা কিছু ধন সম্পদ ও নিয়ামতরাজি দান করেছেন, তা তারা গোপন রাখে;- এমন বেঈমান কাফেরদের জন্য আমি অপমানজনক শাস্তি ঠিক করে রেখেছি।" (সূরা নিসায়া-৩৬-৩৭)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ - قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ
خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ - وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ -

"লোকেরা আপনার নিকট তাদের ধন সম্পদের ব্যয়ের পাত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে তারা কোথায় ব্যয় করবে। আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, তোমরা যা কিছু ধনসম্পদ খরচ করো, তা নিজেদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী এতীম-মিস্‌কীন এবং পথিক মুসাফিরদের জন্য খরচ করবে। তোমরা যা কিছু কল্যাণমূলক কাজ করো না কেন আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে বেশ ওয়াকিফহাল আছেন। (সূরা বাকারা-২১৫)

এমনি ভাবে সঙ্গী-সাথী ও প্রতিবেশীদেরকেও দানের ব্যাপারে পিতা মাতা ও নিকটতম আত্মীয় স্বজনের সাথে গণ্য করা হয়। আর এতিম মিস্কিন ও পথিক মুসাফিররাও তাদের সাথে এসে মিলিত হয়; অর্থাৎ সকলেই এ ব্যাপারে সমান। এমনকি যদি কাহারো থেকে কোন প্রকার কষ্টদায়ক ব্যবহার প্রকাশ পায়, তাদের বেলাও এ একই নির্দেশ প্রযোজ্য। যেমন হযরত আবুবরকর (রাঃ)-এর একান্ত প্রিয় মাস্তাহ (রাঃ) হযরত আবুবকরের আদরের দুলালী রাসুলে করীম (সাঃ)-এর প্রিয়তমা পত্নী বিদুষী মহিলা হযরত আয়শা (রাঃ)-এর নামে মিথ্যা অপবাদ রটানোর ব্যাপারে অন্যতম একজন ছিল। এহেন লোকদের প্রতি ইস্লাম সর্বদা ক্ষমার আদর্শ প্রদর্শন করতে নির্দেশ দেয় এবং তাদের সাথে ভাল আদান-প্রদান ও তাদেরকে এহ্সান অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত রাখতেও নিষেধ করে। সুতরাং হযরত আবুবকর (রাঃ) নিজেদের মান সম্মান ইজ্জৎ আবরু মিথ্যা অপবাদের কারণে সম্পূর্ণ রূপে নষ্ট হতে দেখে গোশ্বায় হয়ে এ বলে কসম করলো যে মাস্তাহর (রাঃ) সাথে যা কিছু ভাল আদান-প্রদান এবং তাকে যা কিছু দান সদ্কা করতাম, তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করলাম। তখন আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে এ নির্দেশ নামা জারি হলো ঃ

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا - أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ -

"তোমাদের মধ্যে যারা সম্পদশালী এবং ধন দৌলতের দিক দিয়ে প্রাচুর্যের অধিকারী, তাদের জন্য আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী মিস্কিন ও আল্লাহর পথে মুহাজিরদেরকে সাহায্য সহানুভূতি না করার শপথ করা ঠিক নয়। বরং ক্ষমা সহনশীলতার আদর্শ গ্রহণ করাই সমীচীন। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের গুনাহ ও ভুল ত্রুটি মার্জন করে দিক তা কি তোমরা পছন্দ করো না? (সূরা নুর-২২)

এমনি ভাবে ইসলাম মানবিক অনুভূতি ও চেতনাবোধকে এমন একটি মহান উন্নত পর্যায় নিয়ে পৌঁছে দেয়, যা একদিকে মানবতার জন্য গৌরবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, এবং অপরদিকে ভূত বর্তমান ও ভবিষ্যতে যতদিন আল্লাহর মর্জি হয় গর্ববোধ করার সুযোগ করে দেয়। অতঃপর সে নিজে এহসান ও বদান্যতার ধ্যান

ধারণায় এমন একটি মহত্ত্ব সৃষ্টি করে যা আল্লাহর সাথে এহ্সান করার সমপর্যায় নিরূপণ করা হয়েছে। অথচ আল্লাহ তায়ালার সত্তা এর তুলনায় কত উন্নত ও মহান। দান বদান্যতাও সৎকাজের একটি সুন্দরতম চিত্তাকর্ষক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে নিম্নলিখিত এ হাদীসে কুদ্সীতে।

রাসুলে করীম (সাঃ) বলেন– "আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন সব বনী আদমকে লক্ষ করে বলবেন– হে বনী আদম! আমি রোগাক্রান্ত ছিলাম। কিন্তু তোমরা আমার সেবা শুশ্রূষা করোনি! তখন আদম সন্তান উত্তর করবে– দয়াময় প্রতিপালক আমরা কেমন করে আপনার সেবা-যত্ন করতে পারি। আপনি হলেন সমুদয় সৃষ্টিলোকের প্রভু। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন– তুমি কি অবগত ছিলে না যে আমার অমুক বান্দা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তুমি তার সেবা শুশ্রূষা করতে যাও নি। যদি তুমি তার সেবা করতে যেতে, তবে তার নিকট আমাকে পেতে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আবার বলবেন– হে আদম সন্তান! আমি তোমাদেরকে আমাকে খাদ্য খাওয়াতে বলে ছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে খাদ্য দান করোনি। তখন সে উত্তর করবে– প্রতিপালক আমি কেমন করে আপনাকে খাদ্য দান করতে পারি। কেননা আপনি হচ্ছেন সারে জাহানের মালিক। আল্লাহ তায়ালা উত্তর করবেন– তুমি কি জাননা যে আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট খাদ্য চেয়েছিল; কিন্তু তুমি তাকে খাদ্য দান করোনি। তুমি যদি তাকে খাদ্য দান করতে তবে সেই খাদ্য আমার নিকট পেতে। আবার আল্লাহ তায়ালা অভিযোগ করে বলবেন– হে আদম তনয়! আমি তৃষ্ণার্ত হয়ে তোমার নিকট পানি চেয়েছিলাম; কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাও নি। আদম সন্তান তখন উত্তর করবে– আল্লাহ! আমি তোমাকে কিরূপে পানি পান করাতে পারি। কেননা তুমি হচ্ছো সারে জাহানের লালন কর্তা। আদম তনয়ের এ কথা শুনে আল্লাহ তায়ালা বলবেন– আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পানি চেয়েছিল;– কিন্তু তুমি তাকে পানি পান করাওনি। যদি তুমি তাকে পানি পান করাতে, তবে তুমি আজ আমার থেকে পানি পেতে। (মুসলিম)

সদ্কা দানের ব্যাপারে ইসলাম এমন সুন্দর নীতিমালা নিরূপণ করে দিয়েছে, যার কারণে সদ্কা দানকারীর জন্য গরীবদের উপর কোন রূপ উৎকৃষ্টতা শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার সুযোগ থাকে না। অতঃপর এ নীতিমালাগুলো অপবিত্র মনোবৃত্তির সাথে লোক দেখানোর জন্য অথবা নিজকে সমাজে দানশীল করে প্রকাশের মনোবৃত্তি নিয়ে সদ্কা দানের হীন প্রচেষ্টা থেকেও রেহাই দেয়। আর যাকে সদ্কা

দান করা হয় সে যদি নিচু ও নিম্ন শ্রেণীর লোকও হয় এবং যদি সদ্‌কা দানকারী মানুষের নিকট তা বলে বেড়ায়, তবে এ সদ্‌কা দান একটি নিতান্ত খারাপ ও অপমানজনক কাজে পরিণত হয়। উক্ত ব্যক্তির নিজের স্বভাব প্রকৃতি ও তার নৈতিকতার উপর একটি খারাপ প্রভাবও পড়ে। এমনিরূপে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের উপর এবং লোকদের পারস্পরিক সম্পদের উপরও এহেন সদকা দ্বারা একটি খারাপ প্রভাব পতিত হয়। মানব স্বভাবের জন্য লোকের উপকার করে তা লোকের কাছে বলে বেড়ানোর চেয়ে বড় মুশকিল জনক তিক্ততা এবং অপমানজনক কাজ উপকার গ্রহণের জন্য বাধা দানকারী দ্বিতীয় কোন বস্তু নেই। এমনিভাবে নৈতিকতার দিক দিয়ে লোক দেখানো সদ্‌কার চেয়ে জঘন্যতম কাজ আর নেই, নেই এর চেয়ে মানব আত্মার জন্য ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকারক দ্বিতীয় কোন বস্তু। ইস্‌লাম সর্বদা দাতা ও গৃহীতা উভয়ের স্বভাবে ও মনে উচ্চ মনোবৃত্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। এ ব্যাপারে সে খুবই চিন্তিত ও ব্যস্ত। আল্লাহ্ বলেন ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ
مِّائَةُ حَبَّةٍ ـ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ـ وَاللّٰهُ
وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ـ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ ثُمَّ لَايُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى لَّهُمْ
اَجْرُهُمْ عِنْدَرَبِّهِمْ ـ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ
يَحْزَنُوْنَ ـ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ
يَّتْبَعُهَآ اَذًى ـ وَاللّٰهُ غَنِىٌّ حَلِيْمٌ ـ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا لَاتُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى كَالَّذِىْ
يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَايُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ ـ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ
وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ـ لَايَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ مِّمَّا
كَسَبُوْا ـ وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ـ وَمَثَلُ
الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ

وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ
اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ج فَاِنْ لَّمْ
يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ -
اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ
الثَّمَرٰتِ وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَاَصَا
بَهَا اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ - كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ
اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ -

"যারা নিজদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাদের ব্যয়ের উদাহরণ হলো এমন যেন একটি বীজ রোপন করা হলো, এবং তা থেকে এমন সাতটি ছড়া বহির হলো, যার প্রতিটি ছড়ায় এক শতটি বীজ নিহিত রয়েছে। এমনি ভাবে আল্লাহ তায়ালা যার কাজকে ইচ্ছা উন্নত করেন। তিনি যেমন প্রশস্ত হস্ত তেমন তিনি মহাজ্ঞানী। যারা আল্লাহর রাহে ধন-সম্পদ খরচ করে মানুষের নিকট বলে বেড়ায় না এবং দুঃখও দেয় না, তাদের জন্য তার প্রতিপালকের নিকট বিরাট প্রতিদান রয়েছে। তাদের জন্য দুঃখ-কষ্ট বা ভয়ের কোন কারণ নেই। একটি মিষ্টি কথা এবং ক্ষমা প্রদর্শন যে সদ্‌কার পিছনে দুঃখ কষ্ট রয়েছে, তা থেকে অনেক উৎকৃষ্ট। আল্লাহ্ তায়ালা যেমন কারো মুখাপেক্ষী নন বরং মহান, তেমনি ধৈর্য সহিষ্ণুতা তাঁর মহৎ বৈশিষ্ট্য। হে ঈমানদারগণ! নিজদের দান খয়রাত ও সদ্‌কাকে দুঃখ কষ্ট দিয়ে মানুষের নিকট প্রচার করে সেই ব্যক্তিদের ন্যায় ধূলিসাৎ করে দিও না, যারা শুধু মানুষকে দেখানোর জন্য সুনাম অর্জনের নিমিত্ত সদ্‌কা ও দান খয়রাত দেয়। তাদের আল্লাহর প্রতি নেই কোন ঈমান এবং পরকালের প্রতি নেই কোন বিশ্বাস। তাদের ব্যয়ের উদাহরণ হলো এই যে যেমন একটি ময়দানে মাটির স্তুপ আছে। তার উপর প্রবল আকারে বৃষ্টি বর্ষণ হয়ে সম্পূর্ণ রূপে ধুয়ে মুছে তা খালি ময়দানে পরিণত হয়। এরা দান খয়রাত করে যা কিছু সওয়াব নিজেরা অর্জন করে তাথেকে কিছু মাত্র তাদের হাতে আসে না। সুতরাং কাফেরদেরকে সরল সহজ পথ প্রদর্শন করা আল্লাহর নিয়ম নয়। আর অপর দিকে যারা পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে শুধু কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের

নিমিত্ত নিজেদের ধন সম্পদ ব্যয় করে, তাদের ব্যয়ের উদাহরণ হলো এমন যে, কোন একটি উচ্চ মালভূমির উপর একটি ফসল ক্ষেত রয়েছে, তার উপর প্রবলরূপে বৃষ্টি বর্ষণ হয়ে দ্বিগুণ ফসল ফলে থাকে। আর প্রবলরূপে বর্ষণ না হলেও একটি সাধারণ বর্ষণ তার জন্য যথেষ্ট। মনে রেখ! তোমরা যদি কিছুই করো না কেন, তা আল্লাহর দৃষ্টির সামনে রয়েছে। তোমাদের কাহারো নিকট একটি উর্বরা ফসল ক্ষেত থাকুক যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হচ্ছে। আংগুর খেজুর ও নানাবিধ ফুলফল দ্বারা সুশোভিত হোক। আর যখন সে বৃদ্ধ হবে এবং তার সন্তান এখনো যদি উপযুক্ত না হয়ে থাকে, এমন মুহূর্তে যদি প্রখর রৌদ্রের প্রচণ্ড তাপে তা ভষ্মীভূত হোক; –এটা তোমাদের কেউ পছন্দ করে কি? এমনি রূপে আল্লাহ তাঁর নিজ আয়াত তোমাদের কাছে পেশ করেন।"

(সূরা বাকারা ২৬১-২৬৬)

এই জন্যই দান খয়রাত ও সদ্কার ব্যাপারে গোপনীয়তা অবলম্বন করা, এবং অপ্রকাশ্যে অনাথ গরীবদের নিকট তা পৌঁছিয়ে দেয়া খুবই উৎকৃষ্ট পথ। কেননা, এর দ্বারা একদিকে যেমন গরীব বেচারার মান-সম্মান ও ইজ্জৎ-আব্রুর নিরাপত্তা বিধান হয়, অনুরূপ অন্যদিকে ব্যক্তি নিজে অলীক গর্ব অহংকারের হাত থেকে রেহাই পায়। কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ـ وَإِنْ تُخْفُوهَا
وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ط ـ

"যদি তোমরা নিজেদের সদ্কা প্রকাশ্যে দান করো তবে তো ভাল কথা। কিন্তু যদি গোপনে দীন দরিদ্রদেরকে দাও তবে তোমাদের জন্য তা খুবই উত্তম কাজ।" (সূরা বাকারা–২৭১)

যে ব্যক্তি এমনরূপে গোপনীয়তা রক্ষা করে গরীবদেরকে সদ্কা দান করেছে যে তার বাম হাত জানেনা যে তার ডান হাত দ্বারা সে কি দিয়েছে। এমন ব্যক্তির প্রশংসায় নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন– "তুমি এমনভাবে গোপনীয়তা রক্ষা করে দান করো, যেন তোমার বাম হাত না জানে যে ডান হাত দ্বারা তুমি কি দান করেছো।"

নেক কাজের বেলায় গোপনীয়তা রক্ষা করা এবং পার্থিব জগতে খ্যাতি অর্জন ও গর্ব অহংকার হতে দুরে থেকে একমাত্র আল্লাহর জন্য করে যাওয়া যে কত সুন্দর ও সাফল্যজনক কাজ, তা ধারণার অতীত। স্বীয় সত্তা ও ধন-সম্পদের

প্রতি যে মানুষের স্বভাবগত মায়া-মোহ এবং তার প্রতি মূলগত দিক দিয়ে মনের আকর্ষণ ও প্রবণতা বিদ্যমান রয়েছে, ইস্‌লাম সর্বদা তার প্রতি লক্ষ্য রাখে। ইস্‌লামের দর্শন হলো যে লোভ লালসা মানব স্বভাবের একটি প্রকৃতিগত বস্তু। সকল সময়ই মানুষের মধ্যে তা বর্তমান থাকে, ক্ষণিক কালের জন্যও তা মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। কুরআন মজীদে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ - "নাফস্‌ কৃপণতার বেড়াজালে আবদ্ধ।"

সুতরাং ইস্‌লাম সর্বদা মানুষকে দান ও খয়রাতের পানে উৎসাহ অনুপ্রেরণা দান করে, সর্ব প্রকার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে পরকালের ভীতি প্রদর্শন করে; তার সামনে একটি উন্নত চরিত্র বৈশিষ্ট্যের রূপরেখা এবং উন্নত ধ্যান-ধারণা উপস্থিত করে থাকে। মোটকথা সর্বপ্রকার চেষ্টা চরিত্র চালিয়ে মুলগত দিক দিয়ে তার প্রতিকার বিধান করতঃ স্বীয় উদ্দেশ্য অর্জন করে নেয়। অতএব সে সেই কৃপণ স্বভাবের নিকট স্বীয় প্রাণের প্রিয়তম বস্তু, যা দান করা তার জন্য খুবই কষ্টদায়ক, এহেন বস্তু আল্লাহর পথে বিলিয়ে দেওয়ার নিমিত্ত দাবী উত্থাপন করে। কুরআনে করীমে এরশাদ হচ্ছে " ঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ -

—"আল্লাহর পথে যত সময় পর্যন্ত তোমাদের প্রিয়তম বস্তুর একটি অংশ দান না করবে, ততসময় পর্যন্ত আল্লাহর ভালবাসা ও পূণ্য পাবে না।"

(সূরা আলে ইমরাণ—৯২)

অতএব মানুষ কুরআনে করীমের এ দাওয়াতে লাব্বায়েক বলে সাড়া দিয়ে তল্লাসী করে করে আল্লাহর রাহে প্রিয় বস্তুগুলো উৎসর্গ করে এবং পূর্ণ আন্তরিকতা ও চেতনাবোধের সাথে প্রিয়তম পবিত্র বস্তুগুলো দান করে দান-দক্ষিণার এমন উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারে যেখাতে উপনীত হওয়া সাধারণতঃ খুবই অসম্ভব হয়। আর উচ্চ আশা-আকাঙ্খার চেতনা ও অনুপ্রেরণা যেমন প্রয়োজন বোধের উপর করে প্রাধান্য লাভ, অনুরূপ স্বভাবের চাহিদার উপর বিজয়ী হয় আত্মার চাহিদা অনুভূতি। এ মর্যাদার স্থানটি তার স্বীয় স্থানে এমন একটি উচ্চ মানবিক উদ্দেশ্য যা অর্জনের জ্রন্য সকলেরই সাধনা করা উচিত। এটা দরিদ্রতার মোকাবিলা করণ, সামাজিক জীবনে ভারসাম্য স্থাপন, বঞ্চিত শোষিত ও সকল শ্রেণীদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য সহযোগীতা স্থাপন, বঞ্চিত শোষিত ও সকল শ্রেণীদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতি ও

দায়িত্বশীলতার নীতিমালাকে বাস্তবায়িত করার জন্য আমাদের সামগ্রীক লক্ষ্যস্থল। আর এ পথেই একটি সুস্থ সাবলীল সমাজ প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব।

এহেন নীতিমালা ও কার্য পদ্ধতির নমুনা স্বরূপ যা কিছু বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করেছি, ইসলাম তাই ব্যবহারিক জীবনের সমুদয় ক্ষেত্রে গ্রহণ করেতে এবং তাকেই আইনগত রূপ দিয়ে অবশ্য কর্তব্য নির্ধারণ করতঃ তার উপরই মানব আত্মাকে শান্ত থাকার ব্যবস্থা করে। যতটুকু পরিমাণ সামাজিক জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার সহায়ক ও পরিপুরক হয়, আর মানুষের সাধারণ ভাবে যতটুক ধৈর্য শক্তি বিদ্যমান রয়েছে তার সাহায্যে যাতে করে তারা ভার উত্তোলন করে অর্থাৎ দায়িত্ব পালন করে শান্তিপূর্ণ ভাবে জীবন যাপন করতে পারে, ইসলাম ততোটুকু পরিমাণ আইনগত রূপে কর্তব্য নির্ধারণ করে। অতঃপর মানবাত্মা যাতে করে আইনের সীমারেখার প্রতি সন্তুষ্ট রয়ে তাকে কায়মনাবাক্যে বরণ করে নিতে পারে এবং তার চেয়েও যথাসম্ভব সামনে অগ্রসর হবার চেষ্টা চালাতে পারে, তার জন্য সে আত্মাকে সম্বোধন করে তার দাবী উত্থাপন করে। কারণ মানব জীবনকে উন্নত হতে উন্নততর উচ্চ শিখরে আরাহণ করিয়ে দেয়া এবং ক্রমাগত ভাবে উন্নতির পানে পরিগণিত করাই হলো তার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইসলাম কমপক্ষে বাধ্যবাধকতার অপরিহার্য সীমারেখা এবং উন্নতর মনঃপুত সীমারেখা এ দু'টির ভিতর পর্যাপ্ত পার্থক্য ও ব্যবধান এ জন্য রাখে, যেন তার ভিতর অবস্থান করে বিভিন্ন ব্যক্তির এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রত্যেক যুগে পরস্পরে প্রতিযোগিতার ময়দানে অবতীর্ণ হবার সুযোগ পায়।

ইসলাম সামাজিক সুবিচার কায়েম করার বেলায় এ কর্ম পদ্ধতিই গ্রহণ করে নিয়েছে। আগত দু'টি অধ্যায় যে আমি ইসলামের রাজনৈতিক কার্যক্রম ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমের বিশদ আলোচনা করবো, তাতে এ কথাই প্রতীয়মান হবে যে, ইসলাম সর্বদা স্বীয় কর্মনীতি গ্রহণ করার বেলায় এ মৌলিক নীতি দু'টির উপরই নির্ভরশীল হয়। আইন প্রণয়ন এবং তালীম ও অনুপ্রেরণা দানের বেলায় এহেন নীতি দু'টি থেকে সাহায্য গ্রহণ করেই জীবনের সকল ক্ষেত্রে সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। ইসলামের প্রথম সোনালী যুগে এ নীতিমালাই সর্ব প্রকার উন্নতির পিছনে কার্যরত ছিল। আর এখনো তার মধ্যে এমন যোগ্যতা নিহিত রয়েছে, যাদ্বারা ইসলামের সোনালী যুগের ন্যায় আমাদের বর্তমান ভবিষ্যতকে গড়ে তুলতে পারা যায়। কিন্তু তা কেবল তখনই সম্ভব, যখন তাকে যথার্থরূপ অনুধাবন করা যাবে এবং তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে সমগ্র মানুষ স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে তার নির্দেশিত পথে পরিচালিত হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

"ইসলামের সামাজিক সুবিচার" এ বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা তার রাষ্ট্রীয় বিধান ও ব্যবস্থাপনা ব্যতিরেকে অসম্পূর্ণ থাকে বলে এখানে তার রূপরেখার যতকিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন বোধ করছি। এহেন সুবিচারের গতিধারা ও স্বরূপ সম্পর্কে উপরে যে নীতি উল্লেখ করেছি, তারই দাবী হলো ইসলামের রাষ্ট্রীয় বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা। জীবনের প্রত্যেকটি দিক ও বিভাগ এবং প্রত্যেকটি কাজের সাথে ইসলামের গভীর ও জোড়ালো সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। এ বিধান অধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় প্রকার মূল্যবোধের উপরই প্রযোজ্যমান। আর এ উভয় দিকটিকে ওৎপ্রোতভাবে সংযোজিত করেই এ বিধান কার্যকরি হয়। এহেন দার্শনিক পটভূমিকার দৃষ্টিতেই ইসলামী রাজনীতির প্রকৃতি ও গতি ধারার উপর কিছুটা আলোক পাত করা প্রয়োজন। কেননা রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান এ সকল মূল্যবোধের সাথে গভীর রূপে সম্পৃক্ত। এছাড়া আইন ও বিধানকে বাস্তবায়িত করা, সমাজের বিভিন্ন দিক ও বিভাগগুলোর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা এবং তাতে আদল ইন্‌সাফ কায়েম ও ভারসাম্য বজায় রাখা এবং ইসলামী নীতি অনুযায়ী সম্পদ সুষম রূপে বন্টনের কাজ পরিশেষে রাষ্ট্র ব্যবস্থার দয়িত্বেই অর্পণ করা হয়েছে।

অবশ্য ইসলামের রাষ্ট্রীয় আদর্শ বা ব্যবস্থাপনার বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন, আর তার জন্য স্বতন্ত্র পুস্তক ও রচনা করা যায়। কিন্তু অত্র পুস্তকে সামাজিক ক্ষেত্রে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার বেলায় যতদুর সীমা পর্যন্ত রাষ্ট্রের সাথে সংশ্লিষ্ট, ঠিক ততদুর সীমা পর্যন্ত আমরা আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। যেহেতু ইসলামী জীবন বিধান সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে অধিকাংশ সময় একটি বিরাট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তার সমুদয় দিক ও বিভাগগুলি পরস্পর সংশ্লিষ্ট ও সংযোজিত এবং একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা পর্যন্ত একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল। এ বিভিন্ন দিকগুলো কখনো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয় না। কারণ এ দ্বীনটি একটি পূর্ণাংগ ও অভিভাজ্য বস্তু বিশেষ। ইবাদত বন্দেগী, পারস্পরিক লেন-দেন আদান-প্রদান, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক বিধি বিধান, আইন কানুন, হেদায়েত উপদেশ, আমল, আকীদা, দুনিয়া আখেরাত সব কিছু একটি পূর্ণাংগ সামগ্রিক জীবনাদর্শেরই অবিচ্ছিন্ন অংশ বিশেষ। এর ভিতর থেকে কোন একটি বিষয়ের উপর স্বতন্ত্ররূপে আলোচনা করা খুবই মুশকিল হয়ে পড়ে-

যত সময় পর্যন্ত তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়টির উপর আলোকপাত না করা হয়। সুতরাং ইসলামের রাষ্ট্রীয় আদর্শ সম্পর্কে আমার প্রতিপাদ্য বিষয়ের সীমারেখা পর্যন্তই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করবো।

ইসলামী আদর্শ সম্পর্কে কোন কোন লেখক তাঁরা ইসলামের সামাজিক বিধান সম্পর্কে আলোচনা করুক; কিম্বা তার রাষ্ট্রীয় আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করুক, ইসলাম এবং অন্যান্য জীবন বিধানের মধ্যে যে সব বিধানের সাথে মানুষ পূর্বকালে অথবা বর্তমান যুগে ইসলামের আগমনের পূর্বে অথবা পরে পরিচয় লাভ করেছে তার সাথে কিছু সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য দেখাবার অথবা তাদের মধ্যে একটি সম্পর্ক প্রমাণিত করার অপচেষ্টা চালায়। তাদের মধ্যে কতিপয় লোক যে ইসলামী আদর্শ হোক এবং অন্যান্য আদর্শ-চাই তা নতুন হোক কিম্বা পুরাতন আদর্শ হোক, সে কোন কথা নয়, একটি সম্পর্ক প্রমাণিত করে তারা ইসলামের জন্য শক্তিশালী দলিল সংগ্রহ করে দিয়েছে বলে মনে করে। তাদের এহেন চেষ্টা আসলে আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে পাশ্চাত্য আদর্শ ও সভ্যতা সংস্কৃতির সামনে পরাজয় অনুভূতির গ্লানি ছাড়া কিছু নয়। এ সকল আদর্শ ও জীবন বিধানের সাথে সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য হওয়ার কারণে যেমন ইসলামের সম্মান বাড়ে না; তেমনি এমন কিছু না হবার অবস্থায়ও তার সম্মানে কোনরূপ আঘাত করে না। ইসলাম মনবতার জন্য এমন একটি পূর্ণাংগ জীবনাদর্শের নমুনা উপস্থিত করে, যার নজীর ইসলামের পূর্বাপর পরিচিত কোন জীবনাদর্শের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। ইসলাম কখনো অন্য আদর্শের অনুসরণ করে না– করে না তার সাথে স্বীয় সাদৃশ্য প্রদর্শনের কোন অপচেষ্টা। বরং সে গ্রহণ করে নিয়েছে এর পরিপন্থী একটি স্বতন্ত্র মত ও পথ এবং মানবতার সমুদয় সঙ্কট অবসানের নিমিত্ত পেশ করেছে একটি পূর্ণাংগ সার্বজনীন ব্যবস্থাপত্র।

মানব রচিত আদর্শের আবর্তন বিবের্তনের স্বাভাবিক অবস্থা হলো যে, তা কখনো কখনো তার স্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। কিন্তু ইসলাম তায় স্বীয় স্থানে একটি পূর্ণাংগ ও স্বতন্ত্র আদর্শরূপে বহাল থাকে। সে তাদের সাথে গিয়ে কোন মিতালী করে না এবং তাদের সাথে তার কোন সম্পর্কও নেই। তারা যখন তার সাথে চলে তখনো তার সাথে কোন সম্পর্ক নেই– নেই কোন বন্ধুত্ব। যখন তারা তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র পথ গ্রহণ করে তখনো থাকে না কোন বন্ধুত্ব। আসলে এ মিলন ও বিচ্ছিন্নতা হচ্ছে একটি অস্থায়ী অভিনয় বিশেষ। আবার তাও হলো শাখা উপশাখা ও আনুষঙ্গিক বিষয়ের বেলায়। ঐক্যমত হওয়া বা অনৈক্য

হওয়ার ভিতর কোন গুরুত্ব নেই। এ ব্যাপারে শুধু মৌলিক চিন্তাধারা ও বিশেষ দর্শনের উপরই নির্ভরশীল হওয়া যেতে পারে। ইসলামের একটি নিজস্ব মৌলিক চিন্তাধারা ও দর্শন রয়েছে। যার উপর শাখা প্রশাখা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এ মৌলিক চিন্তাধারা ও দর্শনের আলোকেই নিতান্ত ক্ষুদ্রতিক্ষুদ্র বিষয়গুলির ব্যাপারেও নীতি নির্ধারিত হয়। মোটকথা মিলন হোক বা বিচ্ছেদ হোক ঐক্যমত হোক বা অনৈক্য হোক ইসলাম সর্বদা তার নিজস্ব রচিত স্বতন্ত্র মত ও পথ ছাড়া অন্য কোন পথের আশ্রয় সে কখনো গ্রহণ করে না।

ইসলামী জীবনাদর্শের মৌলিক নীতিমালা মানব রচিত জীবনাদর্শের মৌলিক নীতিমালা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার বুনিয়াদী নীতি হচ্ছে যে, হাকেমীয়াৎ তথা সার্বভৌম শাসনত্বের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা এবং তিনিই শরীয়াত রচনা করেন। আর অন্যান্য জীবনদর্শের বুনিয়াদী নীতি হচ্ছে সার্বভৌমত্ব শাসনত্ব মানুষের ও জনগণের। জনগণই নিজেদের জন্য নিজেদের শরীয়াত রচনা করবে। এ মৌলিক নীতি দুটি কখনও পাস্পরিক মিতালী হতে পারে না। আর এ কারণেই ইসলামী জীবনাদর্শ কোন জীবনাদর্শের সাথে বন্ধুত্ব বা সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না এবং তাকে ইসলামী নামকরণ ছাড়া অন্য কোন নামকরণের কোনরূপ বৈধতার অবকাশ রাখে না।

কোন ইসলামী চিন্তাবিদ যখন ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করবে, তখন অন্য কোন জীবনাদর্শ থেকে তা নতুন হোক কিম্বা পুরাতন হোক উদাহরণ বা তার সাথে সমাঞ্জস্যের দিকটি অনুসন্ধান করা তার কাজ নয়। কারণ এ সাদৃশ্যতা ও সামঞ্জস্যতা যেমন শুধু কেবল শাখা প্রশাখার বেলায় হয় না, অনুরূপ মৌলিক চিন্তাধারা ও ধ্যান ধারণার বেলায়ও নয়। বরং শাখা প্রশাখার ক্ষেত্রে তা আকস্মিক মিলনের ফল বিশেষ। এর দ্বারা ইসলামের শক্তি সঞ্চয় হয়ে থাকে বলে যেমন কতিপয় লোকের ধারণা; তেমন কোন শক্তিও বাড়ে না এবং তার সম্মান মর্যাদা ক্ষেত্রটিও সম্প্রসারিত হয় না। তাদের জন্য সঠিক পথ হল যে, মনে সর্বদা দৃঢ়রূপে পোষণ করতে হবে যে দ্বীনের মৌলিক বুনিয়াদ সমূহ অন্যান্য আদর্শের সাথে যতই বিরোধী বা মৌলিক হোক না কেন, সে নিজ স্থানে স্বয়ংসম্পূর্ণ অবস্থায় বহাল আছে। এ বিশ্বাস নিয়েই তার বুনিয়াদী নীতিমালা সমূহ উপস্থাপিত করতে হবে। এখন রয়ে গেল ইসলামী জীবনাদর্শ এবং অন্যান্য আদর্শের মধ্যে সাদৃশ্যতা ও সামঞ্জস্যতার কেন্দ্রবিন্দু অনুসন্ধান করে ইসলামকে সাহায্য সহানুভূতির চেষ্টা করা। এ বিষয় উপরে আমি বলেছি যে এটা হলো

অধিকার সংরক্ষণ করে স্বায় মতবাদ প্রকাশ করতে ইচ্ছুক, তাঁরা কখনো এহেন মনোভাব ও কার্যধারাকে স্বীয় চিন্তা গবেষণার রীতি-নীতিতে পরিণত করতে পারে না।

জগত তার প্রথম সুচনা থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী বিভিন্ন যুগে বহু ধর্ম আদর্শ ও জীবন বিধানের সাথে পরিচয় লাভ করেছে। কিন্তু ইসলাম এ সকল ধর্ম ও আদর্শের ন্যায় কোন জীবন দর্শন নয়। নয় সে তাদের আবর্তন বিবর্তনের সমষ্টিগত রূপ। আর তাদের সাথে বেঁধেও তাকে সংগঠিত করা হয়নি। সে একটি স্বতন্ত্র জীবন বিধান। তার একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র চিন্তাধারা ও দর্শন এবং আলাদা উপকরণ বর্তমান রয়েছে। সুতরাং তাকে একটি আলাদা স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন বিধান রূপেই আমাদের পেশ করা উচিত। কেননা অন্যান্য আদর্শ ও জীবন বিধানের বিষাক্ত প্রভাব হতে বিমুক্ত ও স্বাধীন থেকেই তার ক্রমবিকাশ সাধিত হয়েছে। আর সর্বদাই সে নিজের পথকে অন্যান্যদের থেকে স্বতন্ত্র ভাবে সংরক্ষিত রেখেছে। এ কারণেই আমি ডক্টর হায়কল কর্তৃক "আলম-ই ইসলামীকে" "ইসলামী সাম্রাজ্য" দ্বারা ব্যাখ্যা করা এবং তাঁর কথা "ইসলামের আন্তর্জাতিক রূপ হলো "সাম্রাজ্য" বিশেষরূপ এটাকে সঠিক রূপরেখা মনে করি না। কারণ ইসলামের আন্তর্জাতিক সংগঠনকে "সাম্রাজ্য" নামে অভিহিত করা ইসলামের মূল চেতনা অনুভূতি ও বোধোপলব্ধি থেকে অনেক দূরে। এর চেয়ে দুরত্বতম বস্তু দ্বিতীয়টি আর নেই। আমরা "ইসলামী সাম্রাজ্য" আর সাম্রাজ্য বলতে যা কিছু জগতে প্রসিদ্ধ আছে তার ভিতর পার্থক্য রেখা অংকন করার যতই অপচেষ্টা করি না কেন, কোন ক্রমেই ইসলামের আন্তর্জাতিক সংগঠনকে তার সাথে তুলনা করা যায় না। তা ইসলামের মজ্জাগত গতি-প্রকৃতি থেকে অনেক দুরে। এমননি ভাবে" "ইসলাম জগতের" দ্বারা ব্যাখ্যা করা সত্যিকারের উপলব্ধি ও চেতনাবোধের সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না।

আরো বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে যে, ডক্টর হায়কল কর্তৃক লিখিত "হায়াতে মুহম্মদ" "আস-সিদীক এ আবু বকর (রাঃ)" "আল ফারুক ওমর (রাঃ)" প্রভৃতি পুস্তক সমূহে ইসলামের রাষ্ট্রীয় বিধান আলোচনা করতে গিয়ে ইসলাম এবং অন্যান্য জীবনাদর্শের মধ্যে ভিতরগত যে পার্থক্য ও বৈসাদৃশ্য বর্তমান রয়েছে,

যার সাথে জগতকে প্রতিনিয়ত সম্মুখীন হতে হচ্ছে, সে বিষয় তার চেতনা অনুভূতি সজাগ থাকলেও কিন্তু যে সকল অনৈসলামিক শক্তির সাথে বর্তমানে

× ডক্টর মুহম্মদ হোসাইন হায়কল হলেন মিশরের একজন খ্যাতনামা লেখক ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা সম্পন্ন ব্যক্তি। রাসুলে করীম (সাঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদার জীবন চরিত্রের উপর লিখিত তার পুস্তকাবলী লেখক সমাজে ও সুধী মহলে খুব সমাদৃত।

ইসলামের সম্পর্ক রয়েছে বলে দৃশ্যমান হয়, সেই সকল শক্তির দ্বারা সে কিছু কিছু প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইসলাম এবং রাজতন্ত্রের মধ্যে কতিপয় শক্তির সীমারেখা পর্যন্তত যে, সাদৃশ্য রয়েছে তা থাকার কারণে এহেন উভয় প্রকার ব্যাখ্যার পানে তিনি ঝুকে পড়েছে। এর একমাত্র কারণ হলো যে, তিনি শুধু কেবল আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও শাসনত্বের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠা জীবনাদর্শ এবং মানুষের শাসনত্বকে ভিত্তি করে রচিত বিধানের আভ্যন্তরীণ মৌলিক পার্থক্যের পানে আদৌ খেয়াল রাখেন নি, যার দরুন তিনি এহেন অপব্যাখ্যা দেয়ার অবকাশ পেয়েছেন।

হয়তো এহেন সাদৃশ্যতা ও সামঞ্জস্যতার সব চেয়ে বড় বাস্তব রূপরেখা হবে ইসলাম জগতের বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন সভ্যতা সংস্কৃতির সংমিশ্রণে গঠিত দেশ সমূহের একটি সম্মিলিত এমন সংগঠন, যা সকল দেশের রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান ও আইন শৃঙ্খলা একই কেন্দ্রের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবে। এ ব্যাপারে আমাদের বিচার্য বিষয় হলো দু'টি। এ কেন্দ্রটি বিভিন্ন দেশগুলিকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখবে? আর এ সকল দেশ সমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের মৌলিক গতি-প্রকৃতি হবে কি ধরণের?

ইসলামের প্রাণ-আত্মা ও আধ্যাত্মিকতা এবং রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ সম্পর্কে গবেষক প্রতিটি ছাত্র চুড়ান্ত রূপে এ মতবাদই পোষণ করে যে, "সাম্রাজ্য" নামে ইসলামের যে আন্তর্জাতিক সংগঠনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে তা কথিত "সাম্রাজ্য" ব্যবস্থাপনা থেকে অনেক দুরে। তার সাথে এর কোনই সম্পর্ক নেই। ইসলাম বিশ্বের সমগ্র অংশের মুসলমানদেরকে সমান দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখে। আর দান করে সমান মর্যাদা। সাম্প্রদায়িকতা আঞ্চলিকতার সম্পর্ককে আদৌ কোন গুরুত্ব প্রদান করে না। বরং কোন কোন সময় সে দ্বীনী সম্পর্ককেও দূরে ঠেলে দিয়ে দৃষ্টির আড়ালে ফেলে যায়। এহেন দৃষ্টি কোণের ভিত্তিতেই সে বিভিন্ন দেশসমূহকে উপনিবেশে পরিণত করার পক্ষপাতি নয়। আর উক্ত দেশসমূহকে অন্যায় রূপে কর বা খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে সম্মত নয় যে, শুধু কেবল একটি কেন্দ্রের স্বার্থের খাতিরে চুর্তুদিকে থেকে ধন-সম্পদ আহরণ করে তার উদর পুর্তি করা হবে। প্রত্যেকটি দেশ হলো ইসলাম জগতের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বরূপ। কেন্দ্রে বসতি স্থাপনকারী লোকদের যেমন সর্ববিধ অধিকার রয়েছে, অনুরূপ অধিকার রয়েছে ঐ সকল দেশে বসবাসকারী লোকদের জন্য। যদি কেন্দ্রের তরফ হতে কোন একটি দেশের শাসনকার্য ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শাসনকর্তা

স্বরূপাঢ উপলাব্ধ করতে পেরেছে এবং যারা এর উপর পণ আলোচনা করার

নিযুক্ত করা হয়, তবে একজন সম্রাট রূপী শাসক হিসেবে নয়, বরং এ পদের যোগ্যতম ব্যক্তি হিসেবেই নিযুক্ত করা হয়েছে। আর এটাও সত্য কথা যে, বিজিত দেশসমূহের অধিকাংশ দেশের শাসন ভার সেই দেশীয় লোকদের মধ্যে কাহারো হাতে অর্পণ এই হিসেবে করা হয় যে, তিনি শাসনকার্য পরিচালন করার মত যোগ্যতম ব্যক্তি। দেশীয় হিসেবে তাকে এ পদে নিয়োগ করা হয়নি। এ সকল দেশ থেকে কর-খাজনা হিসেবে যা কিছু আদায় করা হয়, তা প্রথম সেই দেশের জন্য ব্যয় করা হবে। ব্যয় করার পর কোষাগারে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে তা কেন্দ্রীয় "বায়তুল মালে" এ জন্য পাঠাতে হবে যেন প্রয়োজন মত সমগ্র মুসলমানের প্রয়োজন মাফিক তা ব্যয় করতে পারে। এ জন্য নয় যে তা কেন্দ্রের একটি বিশেষ অংশ। অন্যান্য দেশের যতই প্রয়োজন থাকুক না কেন, সে জন্য প্রেরণ করা যাবে না। যেমন আজ কাল সাম্রাজ্যরূপী দেশসমূহে এ নীতি কার্যকরি দেখা যায়।

এ সকল নীতি "ইসলাম জগত" বা এর চেয়ে অধিক উপযোগী বাক্য "মিল্লাতে ইসলামীয়া" এবং রাজতন্ত্রের মধ্যে (ইমপ্রেলিজম) বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করে। আর ইসলামের মূলগত প্রেরণা ও ঐতিহাসিক পটভূমি উভয়ের উপরই জুলুম ছাড়া আর কিছু নয়। এ মতবাদ পোষণ করার অর্থ হচ্ছে একটি অভিনব পরিভাষা ইসলামের মাথায় জোড় করে চাপিয়ে দেয়া। ইসলাম তার স্বাভাবিক গতি প্রকৃতির দিক দিয়ে একটি "মানবিক সংগঠন" এ কথাটি বলাই সার্বিক উপযোগী কথা। কারণ তার নিকট মানবতার একত্বতার একটি পুর্ণাংগ শক্তিশালী দর্শন বর্তমান রয়েছে। আর এ নীতিকে কার্যকরি করণের নিমিত্ত সে সমগ্র মানুষকে সমান মর্যদা দিয়ে ভাই ভাই আখ্যা দিয়ে একটি পতাকার নিচে সমবেত করতে চায়।

ডক্টর তোহা হোসাইন তার "আল ফিতনাতুল কুবরা-ওসমান" পুস্তকে ইসলামের রাষ্ট্রীয় আদর্শ এবং অন্যান্যদের রাষ্ট্রীয় আদর্শের তুলনামূলক আলোচনার সময় যে মতবাদ প্রকাশ করেছেন তা এথেকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও কঠিন দৃষ্টিভংগী সম্পন্ন মতবাদ। সুতরাং তার মতে ইসলামী আদর্শ তার গতি-প্রকৃতির দিক দিয়ে অন্যান্য আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। রাষ্ট্রীয় আদর্শের শাখা প্রশাখা ও বাহ্যিক প্রদর্শন দ্বারা নয় বরং ইসলামের অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিকতা এবং তার গতিপ্রকৃতির গভীর পর্যালোচনা দ্বারা যে সত্য উপলব্ধি করা যায়, তাও এটাই। আর এহেন নীতি আদর্শই হলো তার আসল ব্যাখ্যা। ডক্টর তোহা

হোসাইন সাহেব তার এ কথাটিকে অপর একটি মর্ম গ্রহণ করার ভিত্তিরূপে যে নিরূপণ করেছে, তা হচ্ছে রাসুলে করীম (সাঃ) এবং হযরত আবুকর ওমর (রাঃ) প্রমুখ মনীষীদের যুগে ইসলাম যে অবস্থায় বাস্তব রূপলাভ করেছে, তা হলো এমন একটি অতি প্রাকৃতিক খুব দুর্লভ ব্যাপার। যার উপর মানবতা বেশী দিন টিকে থাকতে পারেনি। এটা হলো সেই রংয়ের বাস্তব রূপরেখা, যার দ্বারা সাধু মহাজন ও সুফীগণ এবং বিভিন্ন মুসলিম দেশের তাদের সাগরেদগণ ক্রমাগত ভাবে নিজেদেরকে রঞ্জিত করে চলছে! আর এর উপর ভিত্তি করেই তারা এ মতবাদ প্রকাশ করছে যে, বর্তমান যুগে ইসলাম বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না।

এমনি ভাবে সেই সকল ব্যক্তির লেখনীর ধরণকেও আমরা সঠিক পন্থা বলে মনে করি না, যারা "ইসলামী শোসালিজম" অথবা "ইসলামী গণতন্ত্র" ইত্যাদি পরিভাষা ব্যবহার করে। অথবা এমনিরূপে যারা আল্লাহ কর্তৃক রচিত জীবনাদর্শ এবং মানব রচিত জীবনাদর্শের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন ও জোড়া-তালি লাগানোর অপচেষ্টা করে, তাদেরকেও আমরা পছন্দ করি না। কারণ মানব রচিত বিধানের মধ্যে মানবিক রঙ্গ ও প্রভাবের ছাপ বিদ্যমান থাকে। পূর্ণতা, অপূর্ণতা ভূল নির্ভূল, দুর্ব্বলতা, সবলতা মানব ইন্দ্রীয়ের আনুগত্য ও সত্যের আনুগত্য ইত্যাদি বিষয় মানুষ যেসকল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, সেই সকল বৈশিষ্টের আলোকবর্তিকা তার ভিতর বিচ্ছুরিত হয়। আর আল্লাহর বিধান এ সকল অপূর্ণতা থেকে সম্পূর্ণ দোষমুক্ত। এটা এমন একটি বিশ্বজনীন পূর্ণাংগ জীবনাদর্শ, যার পূর্বাপর কোথাও বাতিলের সংমিশ্রণ বা প্রলেপ নেই।

ইসলাম মানবতার বিভিন্ন সমস্যার এমন সুন্দরতম সমাধান তাদের সামনে পেশ করে, যা তার স্বীয় স্থানে স্বাধীন ও দৃঢ় অটল এবং স্বীয় মহত্বে অদ্বিতীয়। আর এ সব সমাধান সমূহকে সে স্বীয় মৌলিক চিন্তাধারা, নীতিগত ভিত্তি এবং নিজস্ব স্বতন্ত্র কর্ম পদ্ধতি থেকে গ্রহণ করে। যখন আমরা এ সব সমাধান গুলির উপর গবেষণা পরিচালনা করি, তখন জোর জবরদস্তী মুলক অন্যান্য দর্শন ও মতবাদের সাথে অনার্থক তার এমন সম্পর্ক জুড়ে দেয়া উচিত নয়, যা তার জন্য ব্যাখ্যাকারী বা টীকা হিসেবে ব্যবহার হয়। এ নিজে একটি পূর্ণাংগ জীবন ও পরস্পর বিজড়িত একাত্বতা বিশ্বেষ রূপ। কোন বহিরাগত ও অভিনব উপাদানকে তার ভিতর স্থান দেয়া পরিণামে গোলমাল ও ফাসাদ ছাড়া অন্য কোন অবস্থা প্রকাশ পাবার নয়। যেমন মনে করুন একটি পূর্ণাঙ্গ অথচ খুব সুক্ষ কারিগরিপনা

শিল্প যন্ত্রের কোন একটি স্থানে যদি বাহিরের কোন একটি পার্টস এনে জুড়ে দেওয়া হয়; তবে সেই শৃঙ্খলাপূর্ণ ব্যবস্থাপনা স্বাভাবিক ভাবেই পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়। আর সেখানে সেই পার্টসটিকে একটি বিশৃঙ্খলপূর্ণ গিরা বিশেষ ও অপ্রয়োজনীয় অর্থহীন সংযোজনা ছাড়া কিছুই দেখা যায় না।

এতগুলো কথা এখানে এ জন্য আলোচনা করলাম যে, এমন অনেক লোক রয়েছে, যাদের চিন্তা-কর্মের গতিধারা ও নিয়ম-পদ্ধতি অপরিচিত পথের বিষাক্ত প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। তারা মনে করে যে, ইসলামের ভিতর সকল বিধানসমূহ জুড়ে দিয়ে ইসলামের জন্য নবতর শক্তির সঞ্চয় করে দিয়েছে। এ ধারণা নিতান্ত অমূলক ও বাতিল ধারণা এবং ইসলামের জন্য খুবই মারাত্মক কথা। এটা ইসলামের প্রাণ আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে অকেজো ও অকমর্ণ্য করে দেয়। আর এটা এক প্রকার পলায়নী মনোবৃত্তিও বিশেষ; যদিও পরিষ্কার ভাবে তা স্বীকার করা হয় না। ইসলামী জীবন বিধান এমন দু'টি মৌলিক চিন্তাধারার উপর প্রতিষ্ঠিত, যা তাঁর নিজস্ব স্থানে আল্লাহত্ব জীবন জগত আর মানুষ সম্পর্কে তার পূর্ণাংগ চিন্তাধারা থেকে সংগৃহীত। তার প্রথম দর্শনটি হচ্ছে জাতীয়তার দর্শন। অর্থাৎ সমগ্র মানুষ স্বভাবপ্রকৃতি ও ক্রমবিকাশের দিক দিয়ে এক হওয়া। আর দ্বিতীয়টি হলো, জগত থাকা অবধি বিশ্বজনীন ও চিরস্থায়ী বিধান একমাত্র ইসলামই। এ বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধান আল্লাহ তায়ালা কাহারো থেকে গ্রহণ করবেন না। কারণ তিনি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন জীবন বিধান কাহারো থেকে গ্রহণ করবেন না বলে তার পরিষ্কার ঘোষণা রয়েছে। আর দ্বীন শব্দ ইসলামের পরিভাষায় সেই সাধারণ বিধানেরই নাম, যা মানব জীবনের উপর শাসক হিসেবে প্রয়োজ্য হয়।

এখন দুনিয়ার অবস্থান অবধি চিরস্থায়ী ও বিশ্বজনীন রূপে ইসলামই যে একমাত্র জীবন বিধান হিসেবে থাকবে, যাকে ছাড়া অন্য কোন নব বিধান আল্লাহ তায়ালা কাহারো থেকে গ্রহণ করবেন না, এ দর্শনটির বিশদ আলোচনায় ব্রতী হবো। এ দর্শনটির বুনিয়াদ হচ্ছে হযরত রাসুলে করীম (সাঃ) দুনিয়ার সমগ্র মানুষের জন্য আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত হয়ে এসেছেন, তিনিই হলেন একমাত্র শেষ নবী। তারপর আর কোন নতুন নবীর আগমন হবে না। আর তিনি যে জীবন বিধান নিয়ে এসেছেন, তা সকল বিধানের চেয়ে উত্তম ও উৎকৃষ্ট-

ন মূলগত কথাগুলি। এ বিষয় কুরআন মজীদের ভাষ্য হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ -

"আমি আপনাকে জগতের সমগ্র মানুষের জন্য প্রেরণ করেছি।"

(সূরা সাবা–২৮)

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

"আমি আপনাকে সারে জাঁহানের জন্য রহমতের বিমুর্ত্ত প্রতীক রূপে প্রেরণ করেছি।" (সূরা আম্বিয়া–১০)

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلاَمَ دِيْنًا ـ

"আজ আমি তোমাদের দ্বীন তথা জীবন বিধানকে তোমাদের জন্য পূর্ণ করে দিলাম। আর শেষ করে দিলাম তোমাদের উপর আমার দ্বীনরূপী নেয়ামতকে। আর একমাত্র ইসলামকেই তোমাদের জন্য জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করলাম। (সূরা মায়েদা–৩)

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَامُ ـ

"আসলে কুরআনে করীম সেই পথই প্রদর্শন করে যে পথটি হলো সম্পূর্ণরূপে সরল ও সোজা পথ।" (সূরা বনী ইসরাঈল– ৯)

ইসলামের নিজস্ব বোধগম্য ব্যাখ্যা ও ভাবধারার দিয়ে বিচার করলে "নেজাম" শব্দটি "দীন" শব্দটিরই সমার্থবোধক নতুন পরিভাষা। অবশ্য "নেজাম" শব্দটির ভাবধারার মধ্যে অন্তরে পোষণকৃত আকীদা বিশ্বাস, জীবনে মানুষের গতিধারা, নৈতিকতা এবং সমাজে আইন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কথাগুলো নিহিত। কারণ এ সকল বিষয় ও ইসলামে দ্বীন শব্দের অর্থের ভিতর শামিল রয়েছে। এ জন্য কোন জীবন বিধানই আল্লাহ তালার নিকট গ্রহণ যোগ্য এবং ইসলামের নিকট সঠিক বলে নিরূপণ হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তা ইসলামের মৌলিক ধ্যান ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং নীতিমালা রচনার নিজস্ব নীতি গ্রহণ না করবে। এ সকল কথার চেয়ে আরো গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে যে এ জীবন বিধানের পরিচালক আল্লাহ তায়ালার আল্লাহত্ব ও প্রভূত্বের সামনে নিজের মস্তক অবনত করে দেয়া এবং নিজের জন্য আইন প্রণয়ন ও জীবন বিধান রচনা করার অধিকারের দাবীদার না হওয়া। কারণ ইসলামী জীবন বিধানে এ অধিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যই সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। কোন জীব অধিকার ইসলাম দান করেনি। এ কথাগুলিই ইসলামী জীবন বিধান

বিধান থেকে মূলগত রূপে পার্থক্য সূচিত করে আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বানিয়ে রেখেছে।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও ইসলাম অন্যদের বেলায় তাকে গ্রহণ করে নেয়ার জন্য জোর-জবরদস্তী করার পক্ষপাতি নয়। কুরআন মজীদে ঘোষণা হচ্ছে ঃ

لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

"ধর্মীয় ব্যাপারে অর্থাৎ ধর্ম গ্রহণ করা না করার বেলায় কোনরূপ জোর জবরদস্তী নেই। (কারণ) সঠিক পথকে বাতেল ও ভেজালপূর্ণ কথা থেকে ছাঁট কাট করে সম্পূর্ণ আলাদা করে রাখা হয়েছে। (সূরা বাকারা-২৫৬)

ইসলাম শুধু এতটুকু কথা বলেই তার কর্তব্য শেষ করেনি। বরং নিজেদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে কার্যে পরিণত করার পূর্ণ স্বাধীনতা দান করেছে। এ স্বাধীনতার সীমারেখা ও রূপরেখা হচ্ছে- সে শুধু কেবল মুসলমানদের উপর যাকাত দান ও জেহাদে অংশ গ্রহণ ফরজ করে দিয়েছে। আর এরই মোকাবেলায় অমুসলমানদের থেকে কর বা জিজীয়া আদায় করার বিধান দিয়েছে। কারণ তারাও ইসলামী হুকুমতের ভিতর পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে বসবাস করে তারা মুসলমানদের ন্যায় সমভাবে লাভবান হচ্ছে। আর এ ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় পর্যায় উৎপাদনের দায়িত্ব সমভাবে সকলের উপরই অর্পিত হয়। অবশ্য এ সব উৎপন্ন দ্রব্যদি অমুসলমানদের থেকে যাকাত হিসাবে আদায় করে না, যেমন করে না সে তাদের জন্য জেহাদ ফরজ। কেননা যাকাত দান হচ্ছে একটি ইসলামী দায়িত্ব কর্তব্য এবং মুসলমানদের জন্য একটি বিশেষ ইবাদত স্বরূপ। আর জেহাদের বেলায়ও তার একই বক্তব্য। সুতরাং ইসলাম অমুসলমানদেরকে মুসলমানের কোন ইবাদতে শামিল করার জন্য বাধ্য করে না। তাই সে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, তাদের থেকে ধন-সম্পদ কেবল সম্পদ হিসাবেই গ্রহণ করা হবে। আর যাকাতের ভিতর ইবাদতের দিকটির পানে যে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে তা এ ক্ষেত্রে সে টেনে আনে না। এমনি রূপে ইসলাম তাদেরকে 'দারুল ইসলামের' প্রতিরক্ষার ক্ষেত্র থেকেও অব্যাহতি দান করেছে। অথচ তারা এর শান্তি ও নিরাপত্তামূলক সার্বিক ব্যবস্থা থেকে উপকৃত হয়ে থাকে। ইসলাম অমুসলমানদের প্রতি এহেন আচরণ প্রদর্শন করে, তার ন্যায় ও ইন্‌সাফী মনোবৃত্তির তীব্র গতিশীলতাকে পূর্ণতার উচ্চ শিখরে পৌঁছিয়ে দিয়ে জগতের সামনে একটি উজ্জ্বল আদর্শ তুলে ধরেছে।

বিধর্মীদেরকে এ সীমারেখার ভিতর স্বাধীনতা প্রদান করার আসল কারণ হচ্ছে ইসলাম তার এহেন ভাবধারা ও অনুপ্রেরণা দ্বারা প্রভাবিত হবার পরিণাম ফল। এর সাথে সাথে এ সত্যের প্রতিও সে গভীর আস্থা পোষণ করে যে, যখন এ সকল লোকেরা ভুল চিন্তাধারা ও কোন জড় শক্তিকে মধ্যে না রেখে গাম্ভীর্যের সাথে ইসলামের গবেষণা ও পর্যালোচনার সুযোগ পাবে, তখন তাদের স্বভাবের মূল চাহিদা অনুযায়ী আস্তে আস্তে ক্রমান্বয় সেই ইসলামের পানেই তাদের মনের অনুরাগ ও আকর্ষণ চলে আসবে, যে ইসলাম এ সকল উদ্দেশ্যকে পূর্ণ ভারসাম্যের সাথে একত্র করে আক্‌ড়িয়ে রেখেছে। আর এ উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্তই ইসলামের পূর্বেকার ধর্মগুলো সচেষ্ট ছিল। আর ইসলাম মানব প্রকৃতির মধ্যে নিহিত সমুদয় অনুপ্রেরণা চেতনাবোধ ও প্রবণতাকে এমন সমপর্যায় করে রেখেছে, যা সাধারণ সাম্য ও পূর্ণ পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতি ও দায়িত্ববোধের নিশ্চয়তা বিধান করে। সেই ইসলামই "ওহদাতে ইন্‌সানী" অর্থাৎ মানবকুলের সাম্যবাদী নীতিকে সভ্যতা সংস্কৃতি ও তামদ্দুনিক জীবনে এবং অনুভূতি ও চেতনাবোধের আভ্যন্তরীণ জগতের উভয় ক্ষেত্রেই প্রচলিত দেখতে চায়।

এ দুটি মৌলিক চিন্তাধারার উপর ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে তার গঠন আকৃতি ও চলমান গতিধারার দিকটির উপর তার প্রভাব পড়ে। সে আইন প্রণয়ন, উপদেশ ও হেদায়েত দান রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতি এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যবস্থাপনার বেলায়ও এ কথাটির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখে যে, সে কোন বিশেষ জাতি, সম্প্রদায় বা কোন বংশের জন্য নয় বরং সমগ্র জাতি ও সমগ্র বংশের জন্য আইন প্রণয়ন করতে যাচ্ছে। সুতরাং এ পরিপ্রেক্ষিতেই সে তার সমগ্র আইন কানুনের বেলায় বিশ্বজনীন উদারতাপূর্ণ মহান মানবিক বুনিয়াদ সমূহকে সামনে রেখে কাজ করে। সে সাধারণ আইন ও ব্যাপক অর্থবোধক মূল কাঠামো সংগঠিত করে তা বাস্তবায়িত করণের কাজকে ছেড়ে দিয়েছে যুগের গতিধারা ও আবর্তন বিবর্তন এবং নতুন নতুন প্রয়োজন দেখা দেবার উপর।

যেহেতু অত্র অধ্যায় বিশেষ একটি দৃষ্টিভঙ্গীতে ইসলামী রাষ্ট্রের সংগঠন ও পরিচালনা পদ্ধতির বিবরণ দানই আমার আসল বিষয়বস্তু। সেহেতু এ বিষয়ের মৌলিক নীতিগুলির আলোচনা এবং শাখা প্রশাখা সমূহের আলোচনা বর্জন করে চলাও আমার কাজের অন্তর্ভূক্ত কাজ। কারণ ইসলামী রাষ্ট্র দর্শনের খুটিনাটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হলে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়েই আমি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি।

ইসলামে রাষ্ট্রীয় দর্শনের বুনিয়াদ হলো এ কথার সাক্ষ্যদান ও ঘোষণা দেয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, –"আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই।" এ সাক্ষ্যদান দ্বারা যেমন এটা পরিষ্কার হয় যে, প্রভুত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্যই বিশিষ্ট। অনুরূপ মানব জীবনের উপর শাসন পরিচালনা করার অধিকারও একমাত্র তার জন্য সংরক্ষিত। আল্লাহ তায়ালা মানব জীবনের উপর এ শাসন পরিচালনা এক দিকে স্বীয় ইচ্ছা ও তাকদীর (নির্ধারিত নীতি) দ্বারা ব্যবহারিক জীবনে বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অপর দিকে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তাদের পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্বশীলতা এবং তাদের রীতি-নীতির বিশেষ সংগঠনের নিমিত্ত একটি জীবন বিধান ও শরীয়াত দান করেন। ইসলামী জীবন বিধানে কোন বস্তু আল্লাহ তায়ালার অংশীদার হতে পারে না। অনুরূপ যেমন পারে না তার ইচ্ছা ও তাক্‌দীরের মধ্যে কেউ অংশীদার হতে। তার দেয়া জীবন বিধান ও শরীয়াতের বেলায় যদি এমনটি হয় তা হবে পরিষ্কার রূপে শিরক ও কুফরের পর্যায়ভূক্ত। এ নীতির ভিত্তিতে মানুষ নিজে রাষ্ট্রীয় বিধান ও আইন কানুন রচনা করার কাজ করতে পারে না। কারণ এমন করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর প্রভূত্ব অস্বীকার করে প্রভুত্বের বিশেষ গুণাবলী নিজের মধ্যে বর্তমান থাকার দাবী করা। আর এটা পরিষ্কার রূপে শিরক।

এ নীতির দৃষ্টিভংগীতে মূলগত দিক দিয়ে ইসলামের রাষ্ট্রীয় বিধান মানব রচিত সমুদয় বিধান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা– তা শুধু কেবল রাষ্ট্রের জন্য রচনা করা হোক অথবা সমগ্র মানব জীবনের জন্য তৈয়ার করা হোক না কেন। আর এ কারণেই নাম ও পরিভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রেও ইসলাম ও অন্যান্য বিধানের মধ্যে জোড়াতালী দেয়া ঠিক নয়– বরং ভূল পথ।

আল্লাহ তায়ালার প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেয়ার পর ইসলামের রাষ্ট্রীয় বিধান শাসকবর্গের তরফ থেকে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, জনসাধারণের পক্ষ থেকে আনুগত্য প্রদর্শন এবং এ উভয় গ্রুপের মধ্যে শুরা (পরামর্শ) কায়েম করা; এই তিনটি মৌলিক নীতির উপর পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত। এটাই হলো সেই মোটা মোটা মৌলিক নীতিমালা যার উপর অবশিষ্ট সমুদয় আইন-কানুন ও বিধানসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। আর তার ধরণ ও স্বরূপ উপরি বর্ণিত নীতি সমূহ নির্ধারণ করে।

১। শাসকবর্গ কর্তৃক ইন্‌সাফ কায়েম হওয়া

এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআন মজীদে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ -

"আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে ইন্‌সাফের আচরণ গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।" (সূরা নহল-৯)

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ

"যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার ফয়সালা করবে, তখন তা আদ্‌ল ইন্‌সাফের সাথে করো।" (সূরা নেসায়া-৫৯)

وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانُوا ذَاقُرْبٰى

"যদি সমস্যা নিজেদের পাড়া প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনের মধ্যে হয়, তবুও ইন্‌সাফের সাথে সেখানে কথা বলো।" (সূরা আল্ আনয়াম-১৫২)

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى -

"কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ শত্রুতা পোষণ তোমাদেরকে যেন এমন না করে যে, তোমরা ইন্‌সাফের কথা ভুলে যাও। বরং সে ক্ষেত্রেও ইন্‌সাফকে কায়েম রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করবে। কারণ এটা তাক্‌ওয়া ও আল্লাহ ভীরুতার বেশী নিকটবর্তী।" (সূরা আল মায়েদা-৮)

পবিত্র হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে-

اَنَّ اَحَبَّ النَّاسَ اِلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَقْرَبِهِمْ مَجَالِسًا اِمَامُ عَادِلٌ - وَاَنَّ اَبْغَضَ النَّاسَ اِلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَشَدَّهُمْ عَذَابًا اِمَامُ جَائِرٌ -

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে প্রিয়তম নিকটতম হবেন সেই ব্যক্তি যিনি হলেন, ইন্‌সাফগার শাসক বা ইমাম। আর সবচেয়ে বেশী শত্রু ও কঠিনতম শাস্তির উপযোগী হবে সেই শাসকরা, যারা জনগণের উপর জুলুম শোষণ ও অত্যাচার করে।" (বুখারী মুসলিম তিরমিযী)

এটা এমন একটি সাধারণ ইন্‌সাফের বিশেষ নিদানিক মানদণ্ড, যে মানদণ্ডকে ভালবাসা ও শত্রুতা কখনো অবনমিত করতে পারে না। পারে না তার আইন কানুন ও নিয়ম নীতিকে পরিবর্তন করতে। এটা হলো সেই ইন্‌সাফেরই প্রতীক, যা সমাজের নাগরিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক বা জাতি ও সম্প্রদায় সমূহের পারস্পরিক ঘৃণা বিদ্বেষ ও শত্রুতার কোন একটি উপকরণ দ্বারা প্রভাবিত

হয়ে পাড়ে না। বরং তা দ্বারা মুসলিম জাতির সমগ্র ব্যক্তি সমভাবে উপকৃত হয়। বংশীয় কৌলিন্য ও আভিজাত্যের পার্থক্য যেমন তার ভিতর কোন বিশেষত্ব ও পার্থক্য আনয়ন করতে পারে না, পারে না তদ্রূপ ধন-সম্পদ ও ইজ্জত সম্মানের পার্থক্য কোনরূপ পরিবর্তন আনয়ন করতে। এমনি ভাবে তার দ্বারা অন্যান্য জাতিও উপকৃত হয় যদিও ও তাদের এবং মুসলমানদের মধ্যে শত্রুতা থাকুক না কেন?

এটা আদ্ল ইন্সাফের ও ন্যায় বিচারের এমন একটি মহান উচ্চ স্তর, যার সমকক্ষ মর্যাদা আজ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক কোন আইন লাভ করতে পারে নি- পারেনি কোন আইন তার আসনে সমাসীন হতে। মোটকথা কোন আইনই তার নিকটে পৌঁছতে সক্ষম হয় নি।

যারা এ সত্যকে উপলব্ধি ও সমর্থনে কুণ্ঠাবোধ করে তাদের উচিত বর্তমানে সবল ও দুর্বল জাতিসমূহের মধ্যে যে রাজনীতি প্রচলিত রয়েছে, সে সম্পর্কে পর্যালোচনা করা এবং অনুরূপ ভাবে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ ও যুদ্ধ বিগ্রহের ভিতর লিপ্ত জাতিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের একটি হিসাব নিকাশ নেয়া। শুধু এতটুকু করলেই হবে না বরং তাদের সেই ইন্সাফ সম্পর্কেও পর্যালোচনা করা উচিত, যা আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ লোকেরা কৃষ্ণকায় লোকদের প্রতি এবং দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ বংশীয়রা কৃষ্ণকায় ও রংগীন বংশীয়দের সাথে করে। আর কমিউনিষ্ট মহল, মুর্ত্তিপূজক ও ক্রুশ জাতিসমুহ, চীন রাশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ও ভারত এবং ইথিওপিয়ার মুসলমানদের সাথে কি আচরণ প্রদর্শন করে সেদিকেও একটু নয়ন উন্মীলিত করে দেখা উচিত। এ ব্যাপারে এতটুকু ইঙ্গিত দানই যথেষ্ট। কারণ এটা এই যুগেরই অবস্থা যে সম্পর্কে সকল মানুষই জ্ঞাত।

ইসলামী আদ্ল-ইন্সাফের ব্যাপারে একটি বিশেষ কথা হচ্ছে যে, তা কেবল দর্শন ও নীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং ইসলাম তাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে দেখায়। তার অনেক উদাহরণ ইতিহাসের পাতায় ভরপুর। এ বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা যথা সময় করা হবে। এখানে শুধু আমরা কুরআন হাদীসের আলোকে ইসলামী নীতি ও দর্শনকে বিশ্লেষণ করবো।

২। জনগণের আনুগত্য প্রদর্শন।

ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দ্বিতীয় মৌলিক নীতিটি হলো শাসকবর্গের প্রতি নাগরিকদের আনুগত্য প্রদর্শন। এ বিষয় পবিত্র কুরআন মজীদের দাওয়াত হচ্ছে এই ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ -

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য মেনে চলো, আর মেনে চলো তোমাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত নেতৃবর্গ ও শাসকবর্গের আনুগত্য।" (সূরা নিসায়া-৫৯)

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসুল আর নেতৃবর্গ ও শাসকবর্গের কথা একত্রে উল্লেখ করে আনুগত্যের সীমারেখা এবং তার গতি-প্রকৃতির বিশ্লেষণের কাজ করে দিয়েছে। এর দ্বারা পরিষ্কার রূপে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, নেতৃবর্গ ও শাসকবর্গের আনুগত্য তাদের ব্যক্তিত্বের কারণে নয়। বরং তারা আল্লাহর শাসনত্ব ও সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে তাঁর শক্তির সামনে মাথা নত করে দিয়েছে এবং আল্লাহ ও রাসুলের আইন কানুন ও শরীয়াতের রক্ষক হিসেবে তাদের এ মর্যাদা। আর শুধু কেবল এ কারণেই তাদের আনুগত্য করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাদের আনুগত্য মেনে চলা, এ অধিকার শুধু তারা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার শাসনত্ব ও সার্বভৌমত্বের স্বীকারোক্তি দেয়া এবং তাঁর শরীয়াতকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার দরুনই অর্জন করতে পেরেছে। যদি তাঁরা এ স্বীকারোক্তি ও প্রয়োগকে এক ধারে ঠেলে রাখে, তবে তাদের আনুগত্য পাবার অধিকারও নস্যাত হয়। তখন আর তাদের নির্দেশ মেনে চলার দায়িত্ব থাকে না। পবিত্র হাদীস শরীফে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) ঘোষণা করেছেন ঃ

"নেতৃবর্গ ও শাসকবর্গের হুকুম ও নির্দেশ পছন্দ হোক কিম্বা না হোক প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তা মেনে চলা এবং বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা একান্ত কর্তব্য। কিন্তু তাদেরকে যদি শরীয়াত বিরোধী কোন গুনাহর কাজের নির্দেশ দেয়া হয় তবে তা শুনা যেমন ফরজ নয়, অনুরূপ ফরজ নয় তা বাস্তবায়িত করা।" (বুখারী ও মুসলিম)

আর একটি হাদীসে উল্লেখ রয়েছে ঃ

اَسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا اِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ كَاَنَ رَاْسَهٗ زَبِيْبَةٌ مَا اَقَامَ فِيْكُمْ كِتَابُ اللّٰهِ تَعَالٰى

"রাষ্ট্রের নেতৃবর্গ ও শাসকবর্গ যত সময় পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে কুরআন হাদীসের আইন-কানু জারী করে, ততো সময় পর্যন্ত তোমরা তাদের নির্দেশ ও

বিধান মেনে চলো, বাস্তব জগতে প্রয়োগ করো। তারা যদি আবিসিনিয়ার দাসও হয় এবং তাদের মাথা যদি কিসমিসের দানার ন্যায় ছোট ও কালও হয়, তবু তোমরা এ ব্যাপারে কুণ্ঠাবোধ করো না। বরং শরীয়াতের গণ্ডীর ভিতর থাকা অবধি তাদের আনুগত্য করো।" (বুখারী)

এ হাদীসে এ কথা পরিষ্কার রূপে বলে দেয়া হয়েছে যে, শাসকবর্গ ও নেতৃবর্গের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন এবং তাদের নির্দেশকে বাস্তবায়িত করা শুধু কেবল ঐ সময় পর্যন্ত, যতক্ষণ তারা আল্লাহর আইন বিধান বাস্তবায়িত করার কাজে নিয়োজিত থাকবে। এখানে শাসনকর্তাদের নির্দেশকে সাধারণ নির্দেশ এবং তাদের আনুগত্যকে শর্তহীন আনুগত্য করে দেয়া হয় নি। আর এটাও করে নি যে, নেতৃবর্গ ও শাসকবর্গ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আইন-কানুন ও শরীয়াতকে এক পার্শ্বে ঠেলে রেখে দিবে। আর তাদের প্রতি নাগরিকদের আনুগত্যও বহাল থাকবে; –এমনটি নয়।

এখানে দু'টি বিষয়ের মধ্যেকার পার্থক্য পরিষ্কার রূপে দেখিয়ে দেয়া একান্ত আবশ্যক। একটি বিষয় হচ্ছে– শাসনকর্তাগণ শরীয়াতকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার কাজ নিজ হাতে গ্রহণ করেন এবং তার জন্য তারা দায়িত্ববানও থাকেন। আর দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে সম্পূর্ণ এর ব্যতিক্রম। আর তা হলো যে শাসকবর্গ তাদের নিজেদের ক্ষমতা ও অধিকার শূধু কেবল নিজেদের আভ্যন্তরীণ কোন ধর্মীয় বিশেষত্বের কারণে পায়। বিনা মাধ্যমে আসমান থেকে তারা এ ক্ষমতা ও অধিকারের মালিকে মোখতার হবেন, এমন অথারিটি ও পাওয়ার তাঁদের নেই। যেমন পূর্বকালে শাসন কর্তাদেরকে এরূপ মনে করা হতো, যাকে থিওক্রিসি নাম দেয়া হয়েছে। এখানে শাসনকর্তাগণ হচ্ছেন– মুসলমানদের সাধারণ স্বাধীনতার ও পূর্ণ নাগরিক অধিকার ভোগ করার বাস্তব অভিব্যক্তি স্বরূপ। আর তাদের দ্বারাই তাঁরা শাসক নির্বাচিত হন। এ ব্যাপারে সাবেক শাসকবর্গ কৃত বা ইজারা দেয়া কোন ওয়াদা অঙ্গীকার মুসলমানদেরকে বিশেষ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায় বাধ্য করতে পারে না;– পারে না অনুরূপ এ পদকে উত্তরাধিকার সুত্রে কোন বংশের জন্য বিশেষরূপে সংরক্ষিত রাখার জন্য বাধ্য করতে। বরং এ ব্যাপারে তাঁরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাদের ইচ্ছা মাফিক যে কোন লোককে শাসক নির্বাচন করার অধিকার তাদের আছে। আর তারা যে এ পদের অধিকারী হয়, তাও হয় এ হিসাবে যে, তারা তাদের ক্ষমতার মূল উৎস "শরীয়াতে এলাহীকে" জারী করার জন্য দায়িত্ববান হবেন। তারা নিজস্ব ক্ষমতার দ্বারা নিজেরাই

আইন-কানুন রচনা করার দাবীদার হবেন সে হিসেবে নয়। অতঃপর মুসলমানরা যদি তাকে না চায়, বা তাকে পসন্দ না করে, তবে তারা কোন ক্রামেই এ পদের অধিকারী হতে পারে না। তাদের সম্মতি দানের পরে এ পদে নির্বাচিত হয়ে যদি নেতারা আল্লাহর আইন-কানুন ও শরীয়াতকে ভবিষ্যতে পরিত্যাগ করে তবে যখনই পরিত্যাগ করবে, তখনই তাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের দুয়ারেও তালাবন্ধ হবে।

এখান থেকে আমরা এটা উপলব্ধি করতে পারি যে, রাসুলে করীম (সাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় কোন খলীফা মনোনিত করে না যাওয়ার মধ্যে কি রহস্য নিহিত ছিল। তিনি যদি বাস্তবিকই কোন খলীফা মনোনিত করে যেতেন, তবে তা দ্বারা ইসলামে খলীফারূপী এক প্রকার ধর্মীয় রাজতন্ত্রের প্রচলন হবার আশঙ্কা প্রবলরূপে বিদ্যমান থাকতো।

ইসলাম খ্রীস্টান যাজক শ্রেণীদের ন্যায় কোন ধর্মীয় আকৃতির প্রবক্তা নয় এবং বিশেষ কোন সংস্থা অথবা বিশেষ শ্রেণীর লোকদের দ্বারা পরিচলিত হুকুমতের নামও "ইসলামী হুকুমত" নয়। সেই প্রত্যেকটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা যেখানের শাসকবর্গ একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই প্রকৃত শাসক বলে স্বীকার করে এবং এ সত্যের স্বীকারোক্তির সাথে সাথে ইসলামী শরীয়াত মোতাবিক রাষ্ট্র পরিচালনা করা এবং শরীয়াতকে জারী করা ছাড়া তাদের আর কোন কাজ নেই বলে মনে করে তাই "ইসলামী হুকুমাত" নামে অভিহিত হতে পারে। যদি কোন ধর্ম মতে ধর্মীয় রাষ্ট্র দ্বারা কেবল মাত্র সেই রাষ্ট্রকেই বুঝান হয়, যার ক্ষমতার চাবিকাঠি একটি বিশেষ শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের হাতের মুঠায় থাকে, তবে ইসলামী মতে এ রাষ্ট্র কখনো "ইসলামী রাষ্ট্র" হবার যোগ্যতা রাখে না। আর ইসলামে এহেন বিকৃত অর্থেরও কোন অবকাশ নেই। এমনিভাবে সার্বভৌমত্ব ও শাসনত্ব একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যই বিশেষ রূপে রক্ষিত-এ কথা মনে করে ইসলামী আইন-কানুনকে বাস্তবে প্রয়োগ করা ব্যতিরেকে "ইসলামী রাষ্ট্র" অন্য কোন শর্ত পূর্ণ করার দায়িত্ব দ্বারা দায়িত্ববান মতবাদকেও কোনক্রমে সঠিক মতবাদ বলা যায় না। যে রাষ্ট্র এ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, সার্বভৌমত্ব ও শাসনত্বের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা; আর ইসলামী শরীয়াতকে সেখানে বাস্তবায়িত করা হয়, আসলে সেই রাষ্ট্রটিকেই "ইস্লামী রাষ্ট্র" বলা যায়। অপর দিকে যে রাষ্ট্র সার্বভৌমত্ব ও শাসনত্বকে একমাত্র আল্লাহর জন্য বিশিষ্ট রূপে রক্ষিত থাকার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এবং সেখানে শাসন কার্য ইসলামী

আইন-কানুন মোতাবিকও হয় না, সে রাষ্ট্রকে ইসলাম নিজের রাষ্ট্র বলে পরিচয় দিতে রাজী নয়। তার শাসনভার যদি দ্বীনদার শ্রেণীর লোকদের হাতেও থাকে এবং যদি তার নাম ইসলামী নাম রাখা হয়, তবু তাকে "ইসলামী রাষ্ট" বলা যাবে না।

শাসন ক্ষমতার মূল চাবিকাঠির অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, আর শরীয়াতকে সেখানে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা, শাসকবর্গের এ কথা গুলোর স্বীকারোক্তির উপরই রাষ্ট্রের নাগরিকদের আনুগত্য প্রদর্শন নির্ভরশীল। আর তা কেবল ততসময় পর্যন্ত- যত সময় তাদের মধ্যে এ গুণ বর্তমান থাকবে। শাসকবর্গের তরফ থেকে জনগণের প্রতি ইন্‌সাফ প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ছাড়া তা অন্য কোন শর্তের আয়ত্তাধীন নয়।

৩। শাসকবর্গ ও জনগণের মধ্যে পরামর্শ মজলিশ।

ইসলামী রাষ্ট্রের তৃতীয়তম মৌলিক নীতিটি হলো, শাসক ও শাসিতের মধ্যে পরামর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হওয়া। এ ব্যাপারে কুরআনে করীমের সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই ঃ

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ -

"কোন কাজ করার ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ করে নিন।" (সূরা আলে ইমরাণ-১৫৯)

اَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ -

"তাদের সমুদয় কাজ পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে হয়।" (সুরা শোয়ারা-৩৮)

এ ভাবে ইসলামী জীবন পদ্ধতির মধ্যে সর্ব ক্ষেত্রে শুরা বা পরামর্শের ভিত্তিতে সমস্ত কাজ ও সমস্যার সমাধান করা ইসলামের একটি মৌলিক নীতি রূপে নির্ধারিত। তার কার্যক্রমের সীমারেখা সুদুর প্রসারী। কেননা কুরআন মজীদের ভাষ্য দ্বারা বুঝা যায় যে, এটা মুসলিম জাতির জীবনের একটি অন্যতম মুলনীতি বিশেষ! তবে এখন কথা হলো এ পরামর্শের স্বরূপ ও নিয়ম-পদ্ধতি হবে কি ধরণের? এ ব্যাপারে ইসলাম কোন নিয়ম পদ্ধতিকে ধরাবাঁধা রূপে নির্দিষ্ট করে দেয়নি। সে এ নীতিকে অবস্থা পরিবেশ পাত্র ও প্রয়োজনের স্বাভাবিক

গতিধারা ও চাহিদার উপর ছেড়ে দিয়েছে। সুতরাং যে সব কাজ ও সমস্যার ব্যাপারে আল্লাহর অহী দ্বারা পথ নির্দেশ করা হতো না, সে সব কার্যাবলী ও সমস্যার ব্যাপারে নবী করীম (সাঃ) মুসলমানদের সাথে পরামর্শ করে তার সমাধান করতেন। আর তাদের যে সকল পার্থিব বিষয় তারা খুব পারদর্শি ও ওয়াকিফহাল ছিলেন, সে বিষয় তাদের মতামত অনুযায়ীই কাজ করতেন। যেমন যুদ্ধক্ষেত্র এবং তার আনুষঙ্গিক কার্যাবলী। এ ব্যাপারে তাদের মতামতকেই তিনি গ্রহণ করতেন। সুতরাং বদরের যুদ্ধের ব্যাপারে মুসলমানদের মতামত অনুযায়ীই তিনি বদর কুয়াটির নিকট শিবির স্থাপন করেছিলেন। অথচ নবী করীম (সাঃ) এর পূর্বে বদর থেকে কিছু দুরে প্রথমে তিনি শিবির স্থাপন করে ছিলেন। এমনিভাবে তিনি খন্দকের যুদ্ধ কালেও মুসলমানদের মতামত গ্রহণ করেছিলেন। আর বদরের 'যুদ্ধের বন্দী কয়েদীদের ব্যাপারে হযরত ওমর (রাঃ)-এর মতের মোকাবিলায় মুসলমানদের মতামতকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। অথচ আল্লাহর তরফ থেকে হযরত ওমরের উক্তির সমর্থনেই অহী নাযিল হয়েছিল। অবশ্য যে সকল ব্যাপারে আল্লাহর তরফ থেকে অহী নাযিল হয়ে নিশ্চিত রূপে পথের নির্দেশ দেয়া হতো, সে সব ব্যাপারে যে, পরামর্শ করার কোন প্রশ্নই উঠে না, তা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। কারণ অহীর মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত দেয়া হয় তা হচ্ছে ধর্মীয় দায়িত্বের একটি অন্যতম অবশ্যরূপী পালনীয় দায়িত্ব। যেমন মুল বিষয়ের দ্বারা প্রকাশ পায়।

ইসলামের সোনালী যুগে খোলাফায়ে রাশেদীনও পরামর্শ গ্রহণের বেলায় এ পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে যারা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, তাদের সাথে যুদ্ধ করার সমস্যার ব্যাপারে হযরত আবুবকর (রাঃ) স্বীয় মতকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। অবশ্য প্রথম দিকে হযরত ওমর (রাঃ) এ মতের পক্ষপাতি ছিলেন না। কিন্তু যখন তিনি হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে স্বীয় মতের প্রতি খুব জোর প্রদান করতে দেখলেন এবং আসল সমস্যা ও বিষয়বস্তু যখন তার হৃদয়ঙ্গম হল তখন তিনি হযরত আবুবকরের মতকে জোর সমর্থন জানিয়ে তার প্রতি সর্ববিধ সহানুভূতি প্রদান করেছিলেন। এমনিভাবে তিনি মক্কাবাসীকে সিরিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য হযরত ওমর দ্বিমত পোষণ করা সত্ত্বেও পরামর্শ ও মতামত গ্রহণ করেছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বাজদা এলাকায় যাওয়ার জন্যও জনসাধারণের

থেকে পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য পরে যখন দেখা গেল যে, তাদের মতামতের সমর্থন সুন্নাতে নববীর থেকে পাওয়া যাচ্ছে, তখন তিনি বাধ্যতামূলক রূপে তা গ্রহণ করেছিলেন। সে যুগে পরামর্শ গ্রহণ করার এ পদ্ধতিই বর্তমান ছিল, তখন তার কোন নির্দিষ্টতম নিয়ম-পদ্ধতি ছিল না। কারণ প্রত্যেক যুগে বাস্তব অবস্থা পরামর্শ ও মতামত দাতাদেরকে এমন করে নির্দিষ্ট করে দিত যে, তাদের ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহবাদীতা ও সংশয়ের অবকাশ থাকতো না। অবশ্য সমস্যার সাধারণ গতি-প্রকৃতির দৃষ্টিভংগীতে এ বিষয়ের পূর্ণ অবকাশ রয়েছে যে, পরামর্শ গ্রহণের বেলায় বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করা যায়। কারণ ইসলাম এ ব্যাপারে তার সাধারণ নীতির কথা উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হয়েছে। তার নিয়ম-পদ্ধতি আকৃতি-প্রকৃতি ও গতিধারা সম্পর্কে কোন সীমারেখা বা শর্ত আরোপ করেনি।

উপরন্তু কথা হচ্ছে যে, প্রত্যেক যুগেই অধিকার ভোগ ত্যাগ তিতিক্ষা বরণকারী, উৎসর্গকারী ও আন্দোলনের অগ্রগামী সেনা এবং মতামত দানের অধিকারী ও মজলিশে শুরার (পরামর্শ সভার) সদস্য থাকার উপযুক্ত ব্যক্তি কাহারা? তা ইসলামী আন্দোলনের উন্নতি ও উৎকর্ষতার গতিশীলতার ধারার মধ্যে দিয়েই নিশ্চিতরূপে চিহ্নিত হয়। বাস্তবতার কষ্টিপাথরের এহেন নির্দিষ্ট করণের কাজ এমন সহজ সরল ও সুন্দরতম পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়, যে বিষয় মানব রচিত জীবন বিধান সমূহ সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত।

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শাসকদের জন্য ইসলামের নীতি বিধান ও কর্মসূচীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন এবং মুসলমানদের কল্যাণ কামনা ও তাঁদের সাথে প্রকৃত ওয়াদা রক্ষা করা এবং শরিয়তের বিধান কায়েম করার বেলায় তাদেরকে সাহায্য সহানুভূতি করা ব্যতীত এমন কোন অধিকার নেই, যা সাধারণ মুসলমানদের জন্য রক্ষিত না থাকে।

প্রকাশ থাকে যে, রাসুলে করীম (সাঃ) শুধু কেবল শাসকই ছিলেন না। বরং তিনি আইন প্রণেতাও ছিলেন। সুতরাং ইসলাম কর্তৃক প্রদত্ত অধিকার সমূহের গণ্ডীর মধ্যে শাসকদেরকে যে সীমারেখা মেনে চলতে হয়, তা নবী করীম (সাঃ) বাস্তবতার মধ্যদিয়ে দেখিয়ে গেছেন। অতঃপর তাঁরই নীতি বিধান ও পদাঙ্ক অনুসরণ করেই খেলাফায়ে রাশেদীন সর্বক্ষেত্রে চলতেন।

এ সংক্ষিপ্ত বিষয়ের বিশদ আলোচনা আমার “নদুও মুজতামেউল ইসলামী” গ্রহের “শুরাই সমাজ অধ্যায়” অনুসন্ধান করুন।

বিষয়ে বিশদ আলোচনা আগত ঐতিহাসিক উদাহরণ সমূহের মধ্যে পাওয়া যাবে। নবী করীম (সাঃ)-এর অবস্থা এমনিতর ছিল যে, তিনি নিজের কেসাস

বিচার নিজেই নিতেন। অবশ্য কেসাসের দাবীদারগণ যদি মার্জনা করে দিতেন, তবে তা করতে যেতেন না। একবার একজন ঋণদাতা নবী করীম (সাঃ)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে খুব কঠোর ভাষায় তাঁকে মন্দ বলতে লাগলেন। এমতাবস্থায় সাহাবায় কেরাম তার প্রতি রাগান্বিত হয়ে তাকে মারধর করার জন্য উদ্যত হলে। তখন নবী করীম (সাঃ) ইশারা দ্বারা তাকে ছেড়ে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। কারণ হকদারের বলার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। নবী করীম (সাঃ) এমনি ভাবে হাদীস শরীফে এরশাদ করেছেন ঃ

لَايَحِلُّ لِيْ مِنْ غَنَائِمِكُمْ اِلَّاهٰذَا الْخُمُسَ وَالْخُمُسَ عَلَيْكُمْ-

–"তোমাদের গণীমত স্বরূপ প্রাপ্ত সম্পদ থেকে এক পঞ্চমাংশ সম্পদের বেশী সম্পদ গ্রহণ করা আমার জন্য বৈধ নয়। আর এ অংশও তোমাদের জন্যই ব্যয় করা হবে। (আবু দাউদ নাসাই)

তিনি (সাঃ) স্বীয় পরিবার পরিজন ও নিকটতম আত্মীয় স্বজনকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

"হে কুরইশগণ! নিজেদের পথের সম্বল সংস্থান করে রাখো, আল্লাহর সামনে আমার দ্বারা তোমাদের কোনই উপকার সাধিত হবে না। হে আব্‌দে মনাফ! আমি আল্লাহর দরবারে তোমাদের কোনই উপকারে আসবো না। "হে আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব! আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে কোন উপকার করতে পারবো না। হে আল্লাহর রাসুলের ফুফু সুফিয়া! আমি আল্লাহর সামনে তোমাদের কোনই কাজে আসবো না। হে ফাতিমা বিনতে মুহম্মদ (সাঃ)! আমার ধন-সম্মদ থেকে যা কিছু ইচ্ছে, চেয়ে নিয়ে যাও। মনে রেখ! আমি কিন্তু আল্লাহর দরবারে তোমার কোনই উপকার করতে পারবো না।" (বুখারী–মুসলিম)

রাসূলে করীম (সাঃ) তাঁর একান্ত প্রিয়জন হযরত ফাতিমা ও হযরত আলী (রাঃ)-কে সম্বোধন করে অন্য একস্থানে বলেছেন ঃ

لَااُعْطِيْكُمْ وَاَدَعْ اَهْلُ الصُّفَّةِ تَلْوِىْ بُطُوْنُهُمْ مِنَ الْجُوْعِ –

"আহ্‌ল সুফফারা ক্ষুধার্ত আবস্থায় গড়াগড়ি করতে থাকা অবস্থায় আমি তোমাদেরকে কিছু দান করবো, তা আমার দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। (মসনদে ইমাম আহমদ)

আর একস্থানে তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ

لَا أَخْدُمُكُمَا وَأَدَعُ أَهْلَ الصُّفَّةِ تَطْوِى -

"আহ্‌লে সুফফাদের ক্ষুধার্ত অবস্থায় রেখে আমি তোমাদের খেদমত করবো, তা কখনো হতে পারে না।" (মসনদে ইমাম আহমদ)

আর একটি হাদীসে নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ بَنِى إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ قَطَعُوْهُ لَوْكَانَتْ فَاطِمَةَ لَقُطِّعَتْ يَدَهَا -

বনী ইস্‌রাঈলীদের অবস্থা ছিল এমনি যে, তাদের ভিতর কোন অভিজাত সম্প্রদায়ের সম্মানিত লোকেরা চুরি করলে তাকে তারা ছেড়ে দিত। আর যদি কোন সাধারণ ও দুর্বলপনা লোকেরা চুরি করত, তখন এ অপরাধের প্রতিবিধানে তাদের হাত কেটে দেয়া হত। কিন্তু আমার বেলায় এর ব্যতিক্রম অর্থাৎ আমার আদরের দুলালী ফাতিমা (রাঃ) থেকেও যদি এ অপরাধ প্রকাশ পায়, তবে আমি তার হাত কেঁটে দিব। (রওয়াহুল জামায়াত)

বস্তুতঃ শাসকবর্গের জন্য শরীয়াতের সীমারেখা এবং রাষ্ট্রের ধন সম্পদের মধ্যে বিশেষ কোন অধিকার নেই। নেই কোন অধিকার সাধারণ মুসলমানের তুলনায় তাদের পরিবার-পরিজন ও আত্মীয় স্বজনের জন্য। অনুরূপ তাদের সাধারণ মুসলমানদের মন-প্রাণ দেহ আত্মা ধন-মাল বিত্ত-সম্পদ মান ইজ্জৎ সম্মান-সম্ভ্রমের উপর অবৈধ রূপে অন্যায় ভাবে হস্তক্ষেপ করারও কোন অধিকার ইসলাম দেয়নি। যখন তারা শরীয়াতের বিধানকে বাস্তব জীবনে কায়েম করে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে, তখন আর তাদের প্রতি কোন পদক্ষেপ নেয়ারই প্রয়োজন করে না। এখানে এসেই তাদের অধিকার খতম হয়ে যায়। এর চেয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে মানুষের উপর কোনরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করারও অধিকার তদের নেই। মন প্রাণ, দেহ, আত্মা, ইজ্জৎ-সম্মান সর্বদিক দিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এ সীমারেখা অতিক্রম করে ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্মদক্ষতা

প্রদর্শন থেকে রেহাই দান করেছেন। ইসলাম এত সুন্দর ও পরিষ্কার অথচ সাধারণ আইন ও বিধান দ্বারা মন প্রাণ দেহ আত্মা ধন-সম্পদ ও মান সম্মানের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দান করেছে, যার পর আর এ সত্য সম্পর্কে কোনই সংশয় ও সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না যে, ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তা এবং সকল মানুষের জন্য মান-সম্মানের সাথে জীবন যাপনের সুযোগ করে দেয়ার বেলায় তার সম্ভাব্য চেষ্টার প্রতি সে অবহেলা প্রদর্শন করেছে। পবিত্র কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ـ

"হে মুমিনগণ! কোন গৃহে প্রবেশ অনুমতি না নিয়ে এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না জানিয়ে প্রবেশ করো না।" (সূরা নুর--২৭)

لَيْسَ الْبِرُّبِاَنْ تَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ـ

গৃহের দিকে = ফিরিয়ে প্রবেশ করায় কোন পুণ্যের কাজ নয়। বরং গৃহের ভিতর তার দুয়ারের পথ দিয়ে প্রবেশ করো।" (সূরা বাকারা-১৮৯)

অন্য আয়াতে অপরের দোষক্রটি অনুসন্ধান না করার নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ হয়েছে- ولاتجسسوا "অপরের দোষক্রটি অনুসন্ধান করে ফেরো না।"

(সূরা হুজুরাত-১২)

পবিত্র হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهٗ وَعِرْضُهٗ وَمَالُهٗ

-"মুসলমানের প্রত্যেকটি বস্তু অপর মুসলমানের জন্য অপহরণ করা হারাম। বিশেষ করে তাদেরকে হত্যা বা আহত করা এবং তাদের ধন-সম্পদ ও মান-ইজ্জত নষ্ট করাও অপর মুসলমানের জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম। (বুখারী, মুসলিম)

এর সাথে সাথে ইসলাম হত্যার পরিবর্তে হত্যা এবং যখমের বেলায় সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করার নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে।

ইসলাম তাঁর নিজস্ব সংশ্লিষ্ট কাজের ব্যাপারে যেখানে শাসকবর্গের জন্য অধিকারসমূহের সীমারেখা সংকুচিত ও সীমায়িত করে দেয়, সেখানেই সে দেশ ও সমাজের কল্যাণ ও উপকারের বেলায় তাকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত করে। আর কল্যাণমূলক কাজ হলো যে বিষয় কুরআন হাদীসে নির্দেশ জারি করা হয়নি তা যুগের আবর্তন ও অবস্থার বিবর্তনের সাথে সাথে পর্যায়ক্রমে নতুন নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। এ ব্যাপারে মূলনীতি হচ্ছে যে, শাসকবর্গ ও নেতৃবর্গের জন্য ব্যক্তি সমষ্টি ও মানবতার কল্যাণের নিমিত্ত সর্ব প্রকার পন্থা গ্রহণ করার অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ -

"দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের উপর কোন কষাকষি ও সংকীর্ণতা আরোপ করেননি।" (সূরা হজ্জ্ব-৭৮)

পবিত্র কুরআন মজীদের এ ঘোষণা অনুসারে আর ব্যক্তি ও সমষ্টি তথা সমাজের সংশোধন ও পূর্ণগঠন এবং সমগ্র মানুষের অবস্থার উৎকর্ষ সাধন ও পবিত্র করণের নিমিত্ত দ্বীনের সামনে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্তমান রয়েছে তা অর্জনের নিমিত্ত সম্মুখে যে সকল অসুবিধা ও বিপদ দেখা দেয় তার মূল্যমান ও বিস্তীর্ণতা অনুযায়ী নতুন নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নবপর্যায় কর্মসূচী উদ্ভাবনের অধিকার শাসকবর্গের রয়েছে। তবে সকল কাজ তাদেরকে ইসলামের নির্দিষ্টতম নীতির আলোকেই সমাধা করতে হবে। এ অধিকার তাঁরা এ শর্তাধীনে পায় যে, শাসকবর্গ ও নেতৃবর্গের মধ্যে আদল ইন্‌সাফের যে অনুপ্রেরণা ও চেতনাবোধ থাকা প্রয়োজন, তা তাদের মধ্যে অনিবার্য রূপে অবশ্যই বর্তমান থাকতে হবে। নতুবা তাঁরা কখনো এ অধিকার পাবার যোগ্য নয়। সুতরাং রাষ্ট্রীয় নেতৃবর্গ ও শাসকবর্গের কর্তব্য হলো, সেই সকল কাজ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা যা জাতীয় জীবনের জন্য খুবই ধ্বংসাত্মক। আর যে সকল কাজ কর্ম কোন না কোন দিক দিয়ে জাতীয় জীবনের জন্য ফলপ্রসু ও কল্যাণকর, সেই সকল কাজেরও সুযোগ-সংস্থান করে দেয়া। অবশ্য এ কাজ করার বেলায় শর্ত হচ্ছে যে, তা যাতে শরীয়াতের কোন দিক দিয়ে খেলাফ ও তার সাথে সংঘর্ষপূর্ণ না হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। মোটকথা কোন ক্রমেই শরীয়াতের বিরুদ্ধাচরণ করা চলবে না।

শাসকবর্গের এ অধিকারগুলো এত বড় দিগন্ত বিস্তৃত অধিকার যা জীবনের সমগ্র দিক গুলোর উপর প্রযোজ্যশীল। এ অধিকারগুলোর মধ্যে সামাজিক

ইন্‌সাফ ও সুবিচার স্বীয় সমুদয় রূপাকৃতিগুলো সহ বর্তমান থাকার নিশ্চয়তাও নিহিত রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে যাকাত আদায়ের কর্তব্য ছাড়া যাতে করে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা এবং তাদের মধ্যে সাম্যতা স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে সৃষ্টি হওয়া, বঞ্চিত শ্রেণীসমুহের অন্তরে পোষণকৃত দীর্ঘ দিনের হিংসা বিদ্বেষের খারাপ প্রভাব বিদুরিত হওয়া এবং জাতীয় জীবনের উপর ভোগ-বিলাস ও আরাম আয়েশের ডাট ঠাটও সীমাতিরিক্ত দুঃখ-দৈন্য ও রিক্ততা এবং গুটি কয়েক লোকের হাতে সম্পদ পঞ্জীভুত হবার কারণে যে খারাপ প্রভাব বিস্তার হয় তা দূরীকরণের নিমিত্ত জনসাধারণের উপর অন্যান্য ট্যাক্স ধার্য করার অধিকারও তাদের রয়েছে। কিন্তু তাদের এ উদ্দেশ্য এমনি করে অর্জন করতে হবে, যেন শরীয়াতের কোন বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করা না হয় এবং ইসলামের জীবন পদ্ধতির বুনিয়াদী নীতিসমূহের কোন নীতি যেন ক্ষত বিক্ষত না হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।

অতএব ইসলাম তাদেরকে এমন কোন অধিকার দান করেনি যে, তারা জনসাধারণর সমুদয় ধন-সম্পদ নিজেদের করায়ত্ত করে তাদেরকে চিরতরে গোলাম বানিয়ে রাখবে। আর তাদেরকে স্বাধীনভাবে উপদেশ দান এবং বন্ধুসুলভ মনোভাব নিয়ে পর্যবেক্ষণ এবং সেই সকল সমাজ বিরোধী কাজ; তা যার থেকেই প্রকাশ হোক না কেন, চিরতরে নির্মুল করার কর্তব্য পালনের যোগ্যতা থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত রাখবে এমন অধিকার ইসলাম কখনো শাসকবর্গকে দিতে পারে না। মূলকথা হলো যে, রাষ্ট্রের নাগরিকগণ তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব সেই সময় পর্যন্ত সম্পাদন করতে পারে না, যত সময় পর্যন্ত রাষ্ট্রের শাসকবর্গ তাদের নিয়োগকৃত কর্মচারীদের করায়ত্ত থেকে তাদের খাদ্যের উপায় উপাদান সমূহ মুক্ত হয়ে নিজেদের আয়ত্তাধীনে না আসে। মোটকথা রুটি রুযীর ভান্ডার যাদের করায়ত্তে থাকে, তাদের সামনে মানুষের মস্তক অবনত না হয়ে উপায় নেই। এহেন ব্যবস্থার প্রতি ইসলাম কখনো সমর্থন দান করতে পারে না।

ইসলামী জীবন পদ্ধতির মৌলিক নীতিসমূহকে বিনষ্ট না করেও যে জন সাধারণের জন্য কল্যাণমূলক কাজ করা যায় মুসলিম জতির ইতিহাসে তার ভুরি ভুরি নজীর বিদ্যমান। এ কাজ প্রত্যেক যুগেই করা সম্ভব। কেননা ইসলামী জীবন পদ্ধতি এমন কোন জীবন বিধান নয় যে, তা সর্বদা অচল অবচিল রূপে থাকে। বরং ইসলাম একটি গতিশীল জীবনাদর্শ তার বিধানসমূহকে বাস্তব অবস্থার সাথে সামাঞ্জস্য বিধানের কাজ কোন যুগ বা অবস্থার প্রেক্ষিত বন্ধ হয়ে যায় না। বরং সবর্দা অবিরাম গতিতেই চলে আসছে। ইসলাম সর্বদা যে সকল বস্তুকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে চায়, তা হচ্ছে তার সেই মৌলিক নীতিগুলি যা তার প্রভূত্বের বৈশিষ্ট্যকে চিরস্থায়ী রূপে বহাল রাখতে প্রয়াসী। এ সকল নীতিগুলি ইসলামিক

সোসাইটিকে জাহেলী সমাজের কবলে পড়ে দুর্বল অথবা বিলুপ্ত হবার হাত থেকে রক্ষা করে। যদি সে এ কাজ না করতো, তবে ইসলাম যে সমাজের নেতৃত্ব ভার নিয়ে আগমন করেছে, সে সমাজের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব থেকে চিরতরে বঞ্চিত হতো।

এখানে বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য যে, আমার এ আলোচনা ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার রস্‌মী অর্থাৎ আইন ও বিধানের আয়ত্তাধীন দিকগুলির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। এর পিছনে ঐচ্ছিক বিষয়সমূহ অর্থাৎ ব্যক্তির অধিকার ও পছন্দের উপর অর্পিত দায়িত্বসমূহের সেই দিকগুলির আলোচনা সামনে পাওয়া যাবে, যা উপদেশ ও প্রেরণাদায়ক আইনগত শক্তি হিসেবে অর্পিত দায়িত্ব সমূহ থেকে অনেকখানি সম্মুখ পানে অগ্রসর করিয়ে দেয়।

বস্তুতঃ ইসলামের রাষ্ট্রীয় বিধান আইনগত ভিত্তির সাথে সাথে মানুষের অন্তরের ভিত্তিক উপরও প্রতিষ্ঠিত। আর মানুষের মনের সে ভিত্তিমূলটি হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তায়ালা সর্বক্ষণ প্রতিটি পলে পলে শাসক শাষিতবর্গের উভয়েরই নিকটবর্তি রয়েছেন, তিনি উভয়কেই ভালরূপে দেখন।

পবিত্র হাদীস শরীফে রাসুলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعَيْهِ اللّٰهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيْحَةٍ لَايَجِدُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ـ

"যে বান্দাকে আল্লাহ তায়ালা সমাজের নেতৃত্ব কর্তৃত্ব ও পরিচালনার দায়িত্ব দান করেন, সে যদি বাস্তব ক্ষেত্রে জনসাধারণের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করতে না পারে, তবে বেহেস্তে যাওয়াতো দূরের কথা তার সুগন্ধীর সাথেও পরিচিত হতে পারবে না।

وَلَاتَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْابِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ ـ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ

"একে অপরের ধন-সম্পদ অন্যায় ভাবে ভক্ষণ করো না। আর জেনে শুনে সজ্ঞানে মানুষের ধন-সম্পদ জুলুম করে নেয়ার জন্য মিথ্যা মোকাদ্দমা নিয়ে হাকিমদের দরবারে উপস্থিত হয়ো না।" (সূরা বাকারা-১৮৮)

এখানে রাজা প্রজা, শাসক ও শাসিত উভয় শ্রেণীকে প্রতি পদে পদে আল্লাহ তায়ালাকে হাজির মনে করে তার প্রতি লক্ষ্য রাখার দাবী উত্থাপন করা হয়েছে। আসল কথা হচ্ছে আদল ইন্‌সাফ ন্যায় ও সততা প্রতিষ্ঠার শেষতম নিশ্চয়তা হচ্ছে শুধু আল্লাহ ভীরুতা ও তাক্‌ওয়া পরহেজগারী। আমি উপরে একথা আলোচনা করেছি যে, ইসলাম মানবিক অন্তরের উৎকর্ষ সাধন ও পবিত্রতা বিধানের পর শাসন বিষয়ক ও অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট বড় বড় কার্যবলীর সমুদয় দায়িত্ব তার উপরই অপর্ণ করে। এখন যদি এহেন অন্তঃকরণে পরকালের আযাব ও আল্লাহর ভয়ভীতি বর্তমান না থাকে, তবে সামাজিক জীবনে তার দ্বারা সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্টার প্রশ্নই আসতে পারে না। কারণ আইনের আবেষ্টনী থেকে বেঁচে থাকা এবং জনসাধারণ সহ উপরস্থ শাসকবর্গের সাথে প্রতারণা করার অবকাশ এ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবে বিদ্যমান থাকার কথা।

উপরের আলোচনা দ্বারা কেউ যেন এ কথা মনে না করে যে, ইসলামের সামাজিক বিধান শুধু মানবিক অন্তঃকরণের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে কায়েম হয়। বরং তা দ্বারা এ মর্মই গ্রহণ করা উচিত যে, ইসলাম শুধু আইনগত বিধানের উপরই নির্ভরশীল নয় বরং যে সব ক্ষেত্রে মানবাত্মা সজাগ অনুভূতি শুন্য এবং নিন্দাও ভৎসনার পাত্র হয়, সেসব ক্ষেত্রে ইসলাম তার বিধানকে বাস্তব জগতে প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে অন্যান্য সকল জীবন বিধানের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। এহেন মানবিক আত্মার সংগঠন ও উৎকর্ষ সাধনের সকল ব্যবস্থা ইসলাম নিজ হাতে গ্রহণ করেছে। আমরা আগত আলোচনায় তার মাহাত্ম্যপূর্ণ দীপ্তিময় ঐতিহাসিক কার্যাবলী অবলোকন করতে পারবো। সে এমন একটি মাহাত্ম্যপূর্ণ কাজ করেছে, যা যুগ যুগান্তর অতিবাহিত হবার পর আজো মুসলমানদের জীবনে আলৌকিক ও অস্বাভাবিক ঘটনা বলে অনুমিত হচ্ছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামে অর্থনৈতিক কার্যক্রম

বর্তমান যুগে সামাজিক জীবনের ইন্‌সাফ প্রতিষ্ঠার কথা আলোচনা করা হলেই সাধারণতঃ অর্থনৈতিক দিকটির প্রতি খুব বেশী গুরুত্ব প্রদান করা হয়। আর এ কারণেই অধিকাংশ পাঠক অনুভব করে যে, অত্র পুস্তকে এ বিষয়টিকে পশ্চাতে স্থান দেয়া হয়েছে। কিন্তু আসলে ব্যাপার হচ্ছে যে এ বিষয়টিকে আমাদের অনিচ্ছা বা ভুল ত্রুটির কারণে পশ্চাতে স্থান দেয়া হয় নি। বরং এটা আমাদের ইচ্ছাকৃতই ব্যাপার। কেননা আমরা যে বস্তুটাকে সামাজিক সুবিচার বলি তা অর্থনৈতিক কার্যক্রম থেকে যে কত উন্নত ও মহান, তা আমার ইতিপূর্বের আলোচনায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এ জন্যই আমরা বিশেষভাবে অর্থনৈতিক কার্যক্রম আলোচনার পূর্বে সেই মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ পূর্ণাংগ চিন্তাধারাটিকে সর্ব প্রথম পাঠকদের সামনে তুলে ধরা আবশ্যক মনে করছি, যা ন্যায়-নীতি ও আদ্‌ল ইন্‌সাফের ব্যবস্থাপনার প্রতিটি শিরা উপশিরায় প্রবাহমান রয়েছে। অতঃপর আমি তার স্বভাবগত গঠন-প্রকৃতি, মৌলিক বিধানবলী এবং তার সেই কর্মপদ্ধতি বিশদরূপে আলোচনাও করেছি, যা সামাজিক জীবনে ন্যায়নীতি ও সুবিচারের বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে ইসলাম গ্রহণ করেছে। যে সকল জীবন বিধান শুধু বস্তুতান্ত্রিক মৌলিক উপাদানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এবং যারা মানবিক জীবনে অর্থনৈতিক মূল্যবোধ ছাড়া আর কোন মূল্যবোধকেই গুরুত্ব দেয় না, কেবল অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে সর্বাগ্রে স্থান ও প্রাধান্য দানই হলো সেই সকল জীবন বিধানের বৈশিষ্ট্য।

ইসলাম অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে কর্মসূচী গ্রহণ করে তা হচ্ছে তার পূর্ণাঙ্গ চিন্তাধারা এবং বুনিয়াদী দর্শনের বাস্তব অভিব্যক্তি। ইসলাম তার অর্থনৈতিক কর্মসূচীর অধীনে সর্ব প্রথম আল্লাহর আনুগত্য ও বন্দেগীর নীতি প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আর তার বাস্তব পন্থা হচ্ছে ধন-সম্পদের ব্যবহার আল্লাহর আইনের অধীন হতে হবে। সে আইন হচ্ছে এমন আইন, ব্যক্তি ও সমষ্টি তথা সমাজ ও দেশ উভয়েরই স্বার্থ ও কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রেখে এ ব্যাপারে এমন একটি যুক্তিযুক্ত ও সঠিকতম মাধ্যমিক পন্থা গ্রহণ করে, যার ভিতর না হয় ব্যক্তির অধিকারের কোন ক্ষতি সাধন এবং না হানা হয় দেশ ও সমাজের স্বার্থের

প্রতি কোনরূপ আঘাত। সে যেমন স্বাভাবিক পথের সামনে প্রতিবন্ধক রূপে দণ্ডায়মান হয় না, অনুরূপ দাঁড়ায় না জীবনের সত্যিকার নীতি ও বিধান অথবা তার মহান উদ্দেশ্য অর্জনের পথে বাঁধা হয়ে।

এ কর্মসূচীকে সাফল্যের সাথে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত নেয়ার নিমিত্ত ইসলাম তার সেই মৌলিক নীতি দু'টিকেই গ্রহণ করে যার একটি হলো আইনগত আবেষ্টনী এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে হেদায়েত ও উপদেশের পথ। আইনগত আবেষ্টনী দ্বারা সে এমন বাস্তব উদ্দেশ্য অর্জন করে যা তার স্বীয় স্থানে একটি সৎ উন্নয়নশীল ও সমৃদ্ধিশালী সমাজ গঠনের জন্য যথেষ্ট। আর হেদায়েত নসীহত ও উপদেশমালা দ্বারা সে করে প্রয়োজনের দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে উন্নত। আর জীবনকে উন্নততর ধ্যান ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গীর পানে গতিশীল করে এবং সর্বদিক দিয়ে জীবনকে আদর্শের শীর্ষ চূড়ায় উপনীত করে মহত্ত্বের রাজ মুকুট পড়িয়ে দেয়। যেমন কোন উন্নততর উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্তি যথাপোযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া। এ উদ্দেশ্যগুলো এমন পর্যায়ের; যা সমগ্র মানুষের জন্য সর্ব প্রকার অবস্থায় তার পাদপ্রান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য সে উন্নতি সমৃদ্ধি মহত্ত্ব এবং পূর্ণতা অর্জনের পথ সর্বদাই খোলা রাখে।

অর্থনৈতিক কর্মসূচীর বিশদ আলোচনার পূর্বে আমি এখানে এমন একটি উদাহরণ পেশ করতে যাচ্ছি যার দ্বারা স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে ধন-সম্পদের মূল তত্ত্বটি আপন থেকেই প্রতিভাত হয়। ধন-সম্পদ থেকে যাকাত আদায়কে একটি অত্যাবশ্যক নীতি হিসেবে নিরূপণ করে সে তা মানুষের উপর আইনগত আবেষ্টনী দ্বারা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য করে দিয়েছে। আর তা অনাদায়ের অবস্থায় যেমন সে শাসকবর্গকে দণ্ডাদেশ জারী করার নির্দেশ দেয় অনুরূপ নির্দেশ দেয় তাদের বেলায় যুদ্ধ ঘোষণার জন্য, যারা তা আদায় করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। উপরন্তু রাষ্ট্রের নেতৃবর্গ ও শাসকবর্গকে জনগণের প্রতি এমন পরিমাণ ট্যাক্স ধার্য করা, যার দ্বারা সমাজের সর্ব প্রকার অসুবিধা ও দরিদ্রতা বিদুরিত হয় এবং সামগ্রিক দিকদিয়ে মুসলমানদের স্বার্থ ও কল্যাণ রক্ষিত হতে পারে, এমন অধিকারও সে তাদেরকে দান করেছে। এটাও প্রয়োজন বোধে যাকাতের ন্যায় এমন একটি অধিকার হয়, যে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইসলামী জীবন বিধানের সাধারণ নীতি, জাতীয় স্বার্থ ও কল্যাণ এবং নেতৃবর্গ ও শাসক বর্গের সুবিচার ও সততাপূর্ণ মনোভাবের উপর নির্ভরশীল। বস্তুতঃ সমস্যার আইনগত দিকটা এ সীমা পর্যন্ত ছিল কিন্তু হেদায়েত নসীহত এবং উপদেশমালা দ্বারা যাতে তাঁরা

নিজেদের সমুদয় ধন-সম্পদ থেকে হাত গুটাইয়া নেয়, আর সব কিছু বিত্ত সম্পদ আল্লাহর রাহে অকাতরে দ্বিধাহীন চিত্তে বিলিয়ে দেয়, সেজন্য মানুষের মধ্যে উৎসাহ অনুপ্রেরণা দানের চেষ্টা করা হয়। সুতরাং এ ব্যাপারে হযরত আবুযার গাফ্‌ফারী (রাঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত হাদীসটি এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

"হযরত আবুযার গাফ্‌ফারী (রাঃ) বলেন-একদিন রাসুলে করীম (সাঃ) ওহুদ প্রান্তের পানে যেতে ছিলেন, আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তিনি আমাকে সম্মোধন করে বললেন– "হে আবুযার। আমি উত্তর করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ লাব্বাইক, তিনি এরশাদ করলেন– যারা এমনটি করবে অর্থাৎ প্রয়োজন অতিরিক্ত সম্পদ রাখবে তারা কিয়ামতের দিন দরিদ্রদের ন্যায় রিক্ত হস্ত হয়ে পড়বে। তিনি স্বীয় হস্তযুগলকে ডানে বামে, ও অগ্র পশ্চাতে সঞ্চালন করে বললেন, এ ধরণের লোক খুবই কম সংখ্যক হবে। অতঃপর তিনি ডাক দিলেন, হে আবুযার! আমি উত্তর করলাম ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার প্রতি কোরবান, আমি উপস্থিত। তিনি বলেন– ওহে! আমার নিকট ওহুদ পাহাড় সম ধন-সম্পদ হোক এবং আমি তা আল্লাহর রাহে অকাতারে বিলিয়ে দেই। কিন্তু আমি মরে যাবো এবং বিনা খরচে দু'টি কিরাৎ পরিমাণ সম্পদ রেখে যাবো, তা আদৌ আমার ইচ্ছা হয় না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! দু'টি কিরাৎ দ্বারা কি আপনি দু'টি কিন্তার পরিমাণ সম্পদের কথা বুঝিয়েছেন? তিনি উত্তর করলেন না দু'টি কিরাতের কথাই বলছি। আমি কমের কথা বলছি, আর তুমি বেশী বলছো। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাই)।

প্রথম ছিল আইনগত কথা, আর এটা হলো হেদায়াত ও নসীহতগত কথা। আর এ উভয় দিক দু'টি মিলিয়েই অর্থনীতির কর্মসূচী রচনা হয়। ইসলাম সমুদয় কার্যক্রম ও কর্মসূচীর অবস্থা এ একই ধরণের। আসুন। এখন আমরা এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনায় অনুপ্রবেশ করি।

ব্যক্তিগত মালিকানা

ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার

ইসলাম মালিকানা অর্জনের যেই বিশেষ দিকগুলির সাথে সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকারের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন দান করে, তা আইনগত দিক দিয়ে বৈধ। এ সকল দিকগুলির বিবরণ সামনে আসছে। আর সে এহেন ব্যক্তিগত মালিকানায় স্বীয় জীবন বিধানের মৌলিক ভিত্তি নিরূপণ করে থাকে। অতঃপর সে এ অধিকারকে সমর্থন দেয়ার পর শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে অনিবার্য রূপে যে পরিণাম দেখা দেয়, তাকেও সমর্থন করে। যেমন হক্কদারের হক্ক রক্ষা করা, চুরি, ডাকাতি, লুটতরাজ ও অন্যায়ভাবে সম্পদ হরণ করে নেয়া ইত্যাদি সমুদয় দিকগুলিকে জালেমের হাত থেকে রক্ষা করা। এর সাথে সাথে সে কোন সামাজিক প্রয়োজন ব্যতিরেকে এবং পূর্ণ ক্ষতিপুরণ না দেয়া ছাড়াই কাহারো মালিকানা ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া, বা হরণ করাকেও অবৈধ ঘোষণা দেয়। এ রক্ষণাবেক্ষণের বাস্তব নিশ্চয়তা দান হিসাবে সে এ সকল দিকগুলোর উপর অবৈধ হস্তক্ষেপ করার জন্য কঠিনতম শাস্তিও নির্ধারণ করেছে। আর সেই সকল সংস্কারমূলক হেদায়েত ও অনুপ্রেরণা মূলক উপদেশ মালা, যার দ্বারা অন্যের মালিকানা ভুক্ত সম্পদের পানে মানবিক বৃত্তি নিচয়ের লোভ লালসাকে দমিয়ে রেখে তা থেকে নফসের মুক্তি সাধন করা হয় তা তার নিজ স্থানেই বহাল রয়েছে। ইসলাম ব্যক্তির নিজস্ব মালিকানার অন্যান্য উপাদানকেও সমর্থন করে। যেমন নিজ সম্পদকে ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যবহার করা, তা ভাড়া দেয়া, ধার দেয়া, দান করা এবং মৃত্যুর পূর্বে কাহাকেও দেয়ার জন্য অসীয়াৎ করা, ব্যয়ের খাতের এ সকল বৈধ দিকগুলির উপর ব্যক্তির পূর্ণ অধিকার ইসলাম সর্বদা সংরক্ষণ করে বটে। কিন্তু এ সকল ব্যয়ের খাতগুলির জন্য ইসলাম যে আইন কানুন ও সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে তার আয়ত্তাধীনে থেকেই ব্যক্তিকে তার অধিকার প্রয়োগ করার ক্ষমতা দেয়া হয়। এ সীমারেখাকে কোন ক্রমেই আগ্রাহ্য করা চলবে না।

ইসলামী জীবন বিধানে এ সকল সুস্পষ্ট অধিকারগুলিকে সমর্থন করার বেলায় যেমন কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। তেমনি এ অধিকার ইসলামী জীবন পদ্ধতির একটি মৌলিক নীতি। আর এটা ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মূল ভিত্তি হবার বেলায়ও দ্বিমত বা সন্দেহের উর্দ্ধে। এটা এমন একটি বুনিয়াদী নীতি, যার বিরুদ্ধাচরণ শুধু কেবল প্রয়োজন মুহূর্তে ও প্রয়োজনীয়

সীমারেখা পর্যন্ত করাই সম্ভব, তার চেয়ে বেশী নয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলাম যে ব্যক্তিগত মালিকানাকে শুধু সমর্থনই নয়, বরং তা যে তার বিধানের মৌলিক নীতি, সে বিষয় পবিত্র কুরআন মজীদে উল্লেখিত তার ঘোষণা শুনুন।

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ـ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ط

–"পুরুষদের আয়কৃত সম্পদে যেমন তাদের অংশ রয়েছে অনুরূপ অংশ রয়েছে নারীদের জন্য তাদের আয়কৃত সম্পদে।" (সূরা নিসায়া–৩২)

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰى اَمْوَالَهُمْ وَلَاتَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ـ

"এতীমদের ধন-সম্পদ ও মালামাল তাদেরকে দিয়ে দাও। খবরদার খারাপ বস্তুকে ভাল বস্তুর দ্বারা বদলিও না। (সূরা নিসায়–২)

وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِى الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ـ فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَا اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ج ـ

"এখন হলো সেই প্রাচীরটির কথা। উক্ত প্রাচীরটির ছিল শহরের দু'টি এতিম শিশুর। এ প্রাচীরটির তলদেশে তাদের জন্য ধন-সম্পদ লুকায়িত করে রাখা হয়েছিল। তাদের পিতা ছিল একজন সৎ প্রকৃতির লোক। সুতরাং আপনার প্রভুর ইচ্ছে হলো যে, তারা বালেগ হবে, তারপর তাদের সম্পদ তারা নিজেরাই বাহির করে নিবে। (এ জন্যই আমি তা মেরামত করে দিয়েছি) আর আমার এ কাজ হচ্ছে তাদের প্রতি আল্লাহর রহমতেরই বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ।" (সূরা আল কাহাফ–৮২)

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

مَنْ قَتَلَ دُوْنَ مَالِهٖ فَهُوَ شَهِيْدٌ

"যারা, নিজস্ব ধন সম্পদ রক্ষা করনে নিহত হয় তাঁরা শহীদ।" (বুখারী ও মুসলিম)

চুরির ক্ষেত্রে ইসলাম যে কঠোরতম শাস্তির বিধান করে দিয়েছে, তার এ অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তার উপর অবৈধ হস্তক্ষেপকে নিষিদ্ধ ঘোষণারই জ্বলন্ত প্রমাণ। কুরআন মজীদে ঘোষণা হচ্ছে ঃ

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللّٰهِ ط

"চুরির অপরাধে অভিযুক্ত নর-নারীদের জন্য হুকুম হচ্ছে তাদের হাত কর্তন কর। এ বিধানটি হচ্ছে তাদের জন্য আল্লাহর তরফ থেকে শাস্তি স্বরূপ।" (সূরা আল্‌মায়েদা-৩৭)

অপরের ধন সম্পদ জবর দখল, আত্মসাৎ ও লুণ্ঠন করে নেয়া ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবৈধ ও হারাম। ইসলাম এহেন অপরাধীকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করেছে। রাসূলে করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ ظَلِمَ مِنَ الْاَرْضِ شَيْئًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ -

"যারা অন্যায় ভাবে অপরের জমির সাধারণ কিছু অংশও জবর দখল করে রাখবে, তাঁদের গলায় সপ্ত যমীনের তাওক ঝুলিয়ে দেয়া হবে।"

مَنْ اَقْطَعَ مَالَ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لَقِىَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانِ -

"যারা অন্য কোন মুসলমানের ধন-সম্পদ ও মালামাল বিনা স্বত্বে অন্যায় ভাবে জবর দখল করে রাখবে, তাঁরা আল্লাহর দরবার এমন অবস্থায় হাজীর হবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি ভীষণ রূপে রাগান্বিত। (মুসনদে আহমদ-৩৯৪৬)

ইসলাম ব্যক্তিকে যেমন তাঁর সম্পদের মালিকানা অধিকার দান করেছে, অনুরূপ তাকে অপরের সম্পদের ওয়ারীস হওয়া এবং অপরকে ওয়ারীস বানানোরও অধিকার দান করেছে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ -

–"পিতামাতা ও নিকটস্থ আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদে উত্তরাধিকারী সুত্রে পুরুষদের যেমন অংশ রয়েছে, অনুরূপ একটি অংশ রয়েছে নারীদের জন্য তার পিতামাতা ও নিকটস্থ আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে।"

(সূরা নিসায়া)

يُوصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ -

"আল্লাহ তায়লা তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিকানার বেলায় তোমার সন্তান-সন্ততিদের জন্য এ নির্দেশ দিচ্ছেন যে, পুরুষদের অংশ হবে, দু'জন নারীর অংশের সম পরিমাণ

يَسْتَفْتُوْنَكَ - قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلَالَةِ - اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَّلَهُ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ -

"লোকেরা আপনার নিকট কালালা সম্পর্কে ফতুয়া জিজ্ঞেস করছে! আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, তোমাদেরকে আল্লাহ তায়ালা কালালা সম্পর্কে এ নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি ধন-সম্পদ এমতাবস্থায় রেখে মরে যায় যে, তার কোন সন্তান নেই। আর যদি তার ভগ্নী জীবিত থাকে, তবে সে ভ্রাতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ পাবে।" (সূরা নিসায়া–১১৬)

ইসলাম ব্যক্তিগত মালিকানাকে সমর্থন দান এবং তার হেফাজত শ্রম এবং পারিশ্রমিক দানের ভিতর ইন্সাফ প্রতিষ্ঠার কাজ করে। আর এ দিকদিয়েই প্রাকৃতিক বিধানের সাথে সমঝোতা ও সম্পর্ক স্থাপন করা এবং মানব স্বভাবের ভিতর নিহিত গতি-প্রবণতার স্বাভাবিক চাহিদাকে পুরণ করা ও সম্ভব। সেই গতি প্রবণতাগুলি এমন প্রবণতা, যার প্রতি ইসলাম তার সামাজিক বিধানের রূপরেখা

অঙ্কন কালে পূর্ণ দৃষ্টি রাখে। আর সাথে সাথে এমনটি করায় সমাজ ও দেশের স্বার্থ ও কল্যাণের সাথে পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যশীলও হয়। কেননা এর দ্বারা ব্যক্তিকে জীবনের উৎকর্ষ সাধন ও উন্নতি বিধানের নিমিত্ত তার শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী যা কিছু করা সম্ভব, তা করার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দান করা হয়। পক্ষান্তরে তা ব্যক্তির মধ্যে এমন স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদা সৃষ্টি করে এবং তাদের ব্যক্তিত্বকে উন্নতির এমন পর্যায় নিয়ে যায় যে, তারা দ্বীনের নিশানবরদার হয়ে সামাজিক জীবনে সর্ব প্রকার অশ্লীল ও সমাজ বিরোধী কার্যের গতি স্তব্ধ করে এবং শাসকবর্গের পূর্ণ সমালোচনা করতঃ তাদেরকে হেদায়াত নসীহত করার মত যোগ্য ব্যক্তি হতে পারে। খাদ্যদ্রব্য শাসক বর্গের আয়ত্তাধীনে থাকলে ব্যক্তির মনে খাদ্য দ্রব্যের সংস্থান না হওয়ার যে সংশয় হয়, সেরূপ সংশয়ও উদয় হয় না। কারণ ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ব্যক্তির মালিকানাকে হরণ করে সব কিছু রাষ্ট্রের হাতে চলে যাওয়ার কোন বিধান নেই। তাই ব্যক্তির জন্য নির্ভয়ে শাসকবর্গের সমালোচনা করে তাদেরকে উপদেশ দেয়ার মত সুযোগ বিদ্যমান রয়েছে।

সুতরাং ব্যক্তির স্বভাব প্রকৃতির ভিতর যে, "কল্যাণ" কামনার স্বাভাবিক চাহিদাকে স্থান দেওয়া হয়েছে, তার প্রমাণ বহন করেছে কুরআন পাকের এ আয়াতটি - وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ "সে কল্যাণ কামনার বেলায় খুবই লোভাতুর ও আগ্রহী।"

আর ব্যক্তির মালিকানায় যা কিছু থাকবে, তা যেন তার আয়ত্তাধীনে থাকে। ধন-সম্পদ ব্যক্তি স্বীয় মালিকানাধীন রাখার জন্য আগ্রহী থাকাটা তার স্বভাবগত চাহিদা। কুরআন মজীদে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قُلْ لَوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّىْ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ ـ

"হে নবী! আপনি বলে দিন যে, যদি তোমরা আমার প্রভুর রহমত ভান্ডারের মালিক হতে তবে তা খালি হয়ে যাবার ভয়ে খরচ করা থেকে হাত গুটিয়ে নিতে। (সূরা নিসায়া-১০০)

وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ـ

"অন্তকরণ সংকীর্ণতার পানে ধাবিত হয়ে থাকে। (সূরা নিসায়া - ১২)

স্বীয় সন্তান-সন্ততিদের প্রতি মহব্বত এবং তাদেরকে স্বীয় পরিশ্রমলব্ধ সম্পদের ওয়ারীস বানিয়ে যাওয়ার আকাঙ্খাও মানুষের স্বভাগত প্রবৃত্তি। মানুষ তাদের জন্য যে সম্পদ রেখে যায়, তা তাদেরই পরিশ্রম, যা সে সম্পদের আকারে

গচ্ছিত করে রাখে। আর তারা যে স্বীয় জীবনে সুখভোগ ও আরাম আয়েশ করার পরিবর্তে নিজের সন্তানদেরকে প্রাধান্য দিয়ে তাদের জন্য সব কিছু রেখে দেয়, তাও তাদের স্বভাবগত চহিদা ও প্রবণতা বৈ কিছু নয়।

এ স্বভাবগত অভীপ্সার সহযোগীতা করায় এবং তার চাহিদা পুরণে কোনরূপ অসুবিধা নেই। সুতরাং মানুষ যেন পরিশ্রম ও সম্পদ উৎপাদন করার ব্যাপারে যাতে করে স্বীয় প্রয়োজনের তাগিদে স্বীয় স্বভাবগত অনুপ্রেরণা ও চেতনার বশবর্তী হয়ে পূর্ণ উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে কর্মময় জীবনে সামনে অগ্রসর হবার সুযোগ প্রদান করাই তার লক্ষ্য। অথচ সে নিজেকে পরিশ্রমের যাতাকলে নিষ্পেষিত করতে যেমন বাধ্য দেখে না, 'অনুরূপ তার নিকট আন্তরিকতাহীন ও নৈরাশ্যতার কোন চেতনাবোধই ধরা দেয় না। তার সর্ববিধ চেষ্টা চরিত্র ও পরিশ্রম লব্ধ সম্পদ শেষ পর্যন্ত সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছেই এসে যায়। উপরন্তু ইসলাম এমন আইন-কানুন ও বিধান রচনা করে যার কল্যাণকারীতা থেকে সমাজ ও রাষ্ট্র উপকৃত হওয়া ছাড়াও সেই সকল আশংঙ্কিত ক্ষতির পথকে রুদ্ধ করে দেয়, যা ব্যক্তির সাধারণ স্বাধীনতা এবং তাকে দেয়া মালিকানা অধিকারের অনিবার্য পরিণাম ফলরূপে দেখা দেয়।

এ কথা আদ্‌ল ইনসাফের সর্ব প্রাথমিক দাবী যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বার্থে কোনরূপ আঘাত না আনে ততোক্ষণ পর্যন্ত সামাজিক বিধানাবলী ব্যক্তির মনের স্বাভাবিক অভীপ্সা এবং তার গতিধারার সাথে সামাঞ্জস্য বিধান এবং তার মর্জি মাফিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য যেরূপ শক্তি ব্যয় করে তার সর্ববিধ কল্যাণের নিমিত্ত মাথার ঘাম পায় ফেলে, যেরূপ দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম করে, তার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির বেলায় এতটুকু করা তার জন্য একান্ত প্রয়োজন। কেননা আদল ইন্‌সাফই হলো ইসলামের মূল কথা। সামাজিক জীবনে ইন্‌সাফ কয়েম করা এবং তাকে স্থায়ীভাবে দৃঢ় করা এরূপে সম্ভব নয় যে, এ ব্যাপারে যাবতীয় ত্যাগ তিতিক্ষা যা কিছু প্রয়োজন, তা সম্পুর্ণরূপে ব্যক্তির উপর এসেই বর্তিবে। যদি আমরা মধ্যম পথ ধরে সামাজিক সুবিচারকে তার সমুদয় অবস্থার সাথে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই, তবে তার বোঝা ব্যক্তি ও সমষ্টি তথা রাষ্ট্রের উপরই সমভাবে চাপিয়ে দেয়া অনিবার্য কর্তব্য।

যথোপযুক্ত স্বাভাবিক কর্মচাঞ্চল্য ও তৎপরতাকে দমিয়ে রাখা যে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের বেলায় কল্যাণময়ী প্রমাণিত হবে, তা কেউ হলফ করে বলতে

পারে না। স্বভাবগত এহেন অভীপ্সা দমিয়ে রাখা এবং তার গতিপথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা ইন্‌সাফ কায়েমের একমাত্র পন্থা নিরূপণ করার আসল অর্থ-মানব প্রকৃতির প্রতি বিনা কারণে অনাহুত খারাপ ধারণা পোষণ বৈ কিছু নয়। এ হেয়ালীপনা দৃষ্টিভংগী, কখনোই আসল সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে না। বর্হিজগতের আইন শৃঙ্খলা এবং সামাজিক বিধানাবলীকে দাবিয়ে রেখে এক আধা পুরুষ অথবা কয়েক পুরুষ যাবৎ তার কর্ম তৎপরতাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারে। কিন্তু ইসলাম মানব প্রকৃতির প্রতি এহেন খারাপ ধারণা কখনো পোষণ করে না। আর সে আসল সত্য থেকে চোখ বন্ধ করে হেয়ালীপনা ভিত্তির উপর স্বীয় সৌধ ইমরাত নির্মাণের ধারণাও কখনো মনে আনে না। এখন আমরা এ কথা জোড় গলায় বলতে পারি যে, মানব প্রকৃতির আসল স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের নিমিত্ত তার স্বভাবের মূল বস্তুটা কি এবং তার মূলদেশ বা কত গভীরে ইত্যাদি বিষয় অবগত হবার নিমিত্ত তার প্রতি গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করা মানবতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অন্যতম দাবী। এমনিরূপে আমাদের জন্য মানবতার পথ প্রদর্শন এবং তার পূর্ণবিন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ কাজে খুব বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা ও সহিষ্ণুতার সাথে পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব। লাখো কোটি বছর ব্যাপী মানব জীবন যে প্রমাণপঞ্জী আমাদের সামনে পেশ করে তাকে এত হাল্‌কা মনে করা উচিত নয় যে, আমরা মানব জীবনের স্বাভাবিক ও তার আসল স্বরূপ এবং তার অভীপ্সা ও গতিধারা সম্পর্কে নিজেদের তরফ থেকে কোন মতবাদ রচনা করে তার ঘাড়ে জোর জবরদস্তীমূলক চাপিয়ে দিব।

ওয়ারীস হওয়া ও করার অধিকার সম্পর্কে আমরা সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সহানুভূতি ও দায়িত্বশীলতার অধ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখন আমরা যে মূলকথার উপর আলোচনা করছি, এ অধিকার তারই মূল মর্মের সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং একই সাথে সামাজিক সুবিচারের সাথে তার উচ্চতর পটভূমিকার এবং সমাজের স্বার্থ ও কল্যাণের বিরাট কর্মময় ভূমিকার সাথেও সম্পূর্ণরূপে সংশ্লিষ্ট ও বিজড়িত। এহেন ধ্যান-ধারণা মানব জাতির এক পুরুষ অপর পুরুষের মধ্যে কোন কাল্পনিক প্রাচীর স্থাপন করে না। সুতরাং এ অধিকারই সম্পদ বন্টনের উপায় এ মাধ্যমসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বিশেষ।

ব্যক্তি মালিকানার স্বরূপ

পুঁজিবাদী অর্থনীতি ব্যক্তি মালিকানার অধিকারের উপর কোন বাধ্যবাধকতার নীতি ও আইন কানুন আরোপ করা ব্যতিরকেই যে তাকে এমনি ছেড়ে দেয়; ইসলামের বেলায় তেমনি নয়। সে ব্যক্তি মালিকানার অধিকারকে সমর্থন করে বটে। কিন্তু তার উপর এমন কতকগুলো আইন-কানুন ও বিধান আরোপ করে যার দ্বারা একদিকে যেমন ব্যক্তির স্বার্থ পূর্ণরূপে রক্ষা হয়, অনুরূপ অপর দিকে তা সমাজের ও সমষ্টিগত স্বার্থ অর্জনের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। সে এ অধিকারকে আইনগত রূপে সমর্থন দানের সাথে সাথে সম্পদ বৃদ্ধি ও ব্যয় এবং আদান-প্রদান ও লেন-দেনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যয় বহনের নিমিত্ত নির্দিষ্ট একটি নিয়ম-নীতিও দেয়। এ সকল বস্তুর পিছনে যে বস্তুটি সক্রিয় তা হচ্ছে ব্যক্তিস্বার্থ ও সমাজের সমষ্টিগত স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দান। ইসলাম এহেন স্বাভাবিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করেই জীবনের সৌধ ইমারত রচনা করার প্রয়াসী।

মালিকানার স্বত্বাধিকারের ব্যাপারে ইসলামের সর্ব প্রথম বিধান হলো যে, ধন-সম্পদ ও মালিকানার ব্যাপারে ব্যক্তির পদ মর্যাদা হচ্ছে সমাজেরই একজন প্রতিনিধি স্বরূপ। তার উপর তার অধিকার ও দখল থাকা মালিকানার চেয়ে অনেক বেশী দায়িত্বপূর্ণ কাজ। সমাজ যখন সেই আল্লাহর আনুগত্যের জন্য আদিষ্ট, যিনি ছাড়া অন্য কোন সত্তা কোন বস্তুর আসল মালিক নয়, তখন সাধারণ দৃষ্টিতে সমাজই হচ্ছে ধন দৌলতের আসল স্বত্বাধিকারী। ব্যক্তি মালিকানা কেবল তখনই বাস্তবে রূপ লাভ করে যখন ব্যক্তি স্বীয় শ্রম ও মেহনত দ্বারা সেই সকল বস্তুর থেকে কোন বস্তু নিজের অধিকারে নিয়ে আসে, যে বস্তুর উপর আল্লাহ তায়ালা মানব গোষ্ঠীকে নিজের প্রতিনিধি বা খলিফা নিয়োগ করে একটি সাধারণ মালিকানা অধিকার দান করেছেন। পবিত্র কুরআন মজীদে নির্দেশ হচ্ছে ঃ

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ -

"আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান আন এবং যে ধন-সম্পদের উপর তোমাদেরকে প্রতিনিধি বা খলীফা নিয়োগ করা হয়েছে, তা থেকে খরচ করো।" (সূরা আল্‌হাদীদ–৭)

পবিত্র কুরআন মজীদের এ আয়াতটির কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন করে না। বরং এর ভাষ্য দ্বারা আমাদের বক্তব্যেরই জোড়ালো সমর্থন পাওয়া যায়। অর্থাৎ মানুষের হাতে যে ধন-সম্পদ রয়েছে তার প্রকৃত মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্ তায়ালা। এখানে মানুষকে প্রতিনিধি বা খলীফার পদমর্যাদা দান করা হয়েছে, আসল মালিকের নয়। এ কথারই সমর্থন কুরআন মজীদের আর একটি আয়াতে মুকাতিব বিশিষ্ট গোলামের বর্ণনায় পাওয়া যায়। আল্লাহ বলেন ঃ

وَاٰتُوْهُمْ مِنْ مَالِ اللّٰهِ الَّذِىْ اٰتٰكُمْ -

"তোমাদেরকে আল্লাহ তায়ালা যে ধন-সম্পদ দান করেছেন তাথেকে তোমরা তাদেরকে দাও।" (সূরা নূর-৩৩)

মনে হচ্ছে তারা যা কিছু ধন-সম্পদ দিচ্ছে, তা নিজেদের মালিকানা থেকে নয়। বরং আল্লাহর মাল ও মালিকানা থেকেই দিতেছে। এখানে তাদের মর্যাদা হচ্ছে মধ্যস্থতার সম্বন্ধ বিশেষ।

ধন-সম্পদের ব্যক্তি মালিকানার মূলগত তত্ত্ব বর্ণনা এর চেয়ে অন্য কিছু হতে পারে না যে, তার অর্থ হলো-ব্যয় ও উপকৃত হবার অধিকার লাভের চেয়ে আর বেশী কিছু নয়। আর বাস্তব অবস্থাও তা-ই। কেননা ব্যয় ও উপকৃত হবার অধিকার লাভ করা ব্যতীত ব্যক্তিগত মালিকানাই প্রমাণ হয় না। সুতরাং ব্যয় করণের যোগ্যতাকেই এ অধিকার স্থায়ীত্বের পূর্বশর্ত নিরূপণ করা হয়েছে। আর যখন কোন ব্যক্তি ব্যয়ের বেলায় অজ্ঞতা ও অনুপযুক্ততা প্রদর্শন করবে, তখন সমাজের বা কোন পৃষ্ঠপোষক দায়িত্বশীল মুরব্বী ব্যক্তিদের জন্য এ অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার অধিকার থাকবে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَاتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ -

"তোমাদেরকে যে ধন-সম্পদ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জীবন অতিবাহিত করা নিমিত্ত মাধ্যম করেছেন, তা বোকা ও কমবুদ্ধি সম্পন্ন লোকের হাতে ছেড়ে দিয়ো না। অবশ্য তার থেকে তাদের জন্য খাদ্য বস্ত্রের ব্যবস্থা করবে।" (সূরা নিসায়া-৫)

ব্যয়ের ন্যায়সঙ্গত অধিকার এ দায়িত্বকে যথাযথ রূপে পালন করার উপরই নির্ভরশীল করা হয়েছে। মালিক যখন এ দায়িত্বকে সুচারু রূপে পালন করতে পারবে না, তখন মালিকানার স্বাভাবিক যে পরিণতি রয়েছে অর্থাৎ সমূদয়

অধিকার মূলতবী হবে। এ নীতিটির সমর্থন আমরা ইসলামের এ বিধানটি থেকে পেতেছি যে, যখন কোন ব্যক্তির ওয়ারীস বলতে কেউই থাকবে না, তখন তার ওয়ারীস হবেন রাষ্ট্রের পরিচালক। কারণ সম্পদের আসল মালিক হলো সমাজ বা রাষ্ট্র। কিন্তু ব্যক্তির পরবর্তিকালে উক্ত দায়িত্ব সম্পাদনের যখন কোন ওয়ারীস পাওয়া যাচ্ছে না, তখন যেখানের সম্পদ সেখানেই স্বাভাবিক রূপে প্রত্যাবর্তন করে আসবে। এ মূলনীতির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান দ্বারা "সম্পদের" রাষ্ট্রীয় মালিকানা অথবা "জতীয়করণ" নীতিকে প্রমাণ করা আমাদের ইচ্ছা নয়। ইসলামী জীবন বিধানে ব্যক্তি মালিকানা হচ্ছে এমন একটি মৌলিক অধিকার, যা প্রকাশ্য রূপে সমর্থন করা হয়েছে। বরং এর উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের কারণ হচ্ছে– ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পর্ক একটি সঠিক ধারণা কায়েম করার নিমিত্ত এ মূল নীতিটির থেকে সাহায্য গ্রহণ করা। এতে করে একদিকে ধন-সম্পদ সম্পর্কে ইসলামের সেই মৌলিক চিন্তাধারাটি, যার অনুগত হচ্ছে মালিকানা অধিকার, তা যেমন পরিস্ফুট হয়ে উঠে; অনুরূপ এ কথাও দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয় যে, ব্যক্তি মালিকানার ইসলামী দর্শন এবং ব্যক্তি মালিকানার পুঁজিবাদী দর্শন, এ দুটি বস্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ও দ্বিমুখী জিনিস। ব্যক্তির মধ্যে এ অনুভূতি ও চেতনাবোধ একান্ত রূপে থাকা বাঞ্ছনীয় যে, এ সম্পদের উপর যার প্রকৃত মালিক হচ্ছে সমাজ, শুধু একজন দায়িত্বশীল হওয়ারই পদমর্যাদা সে রাখে। সে যেন এ অনুভূতি দ্বারা নিজের ব্যয়ের বেলায় সমাজ কর্তৃক আরোপিত নিয়ম কানুনকে খুশীচিত্তে সমর্থন জানিয়ে তার প্রদত্ত্ব দায়িত্ব মনে প্রাণে গ্রহণ করে কর্মময় জীবনের বিশেষ ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারে। এমনিভাবে সমাজের মধ্যে এ সম্পদের আসল মালিক যে সে নিজেই এ অনুভূতি তার থাকা উচিত যাতে সে ব্যক্তির উপর দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া বা তার প্রতি বাধ্য বাধকতার সীমারেখা আরোপ করার বেলায় খুব বেশী নির্ভীক ও বেপরওয়া না হয়। অবশ্য সমাজ এ কাজ করনে ইসলামী জীবন বিধানের সেই মৌলিক নীতিগুলির প্রতি কোনরূপ আঘাত হানবে না, যার প্রতি আমি ইতিপূর্বে ইঙ্গিত দান করেছি। পরিশেষে এমন একটি নিয়ম-কানুন রচনা করা যায় যার অধীনস্থ হয়ে এ ধন-সম্পদ থেকে উপকার লাভ করতঃ তা দ্বারা সামাজিক জীবনের পূর্ণাংগ সাম্য ও ইন্‌সাফ প্রতিষ্ঠা হয়।

ধন-সম্পদ থেকে উপকার লাভের বেলায় ইসলামের দ্বিতীয় নীতি হচ্ছে যে, এ সম্পদ সমাজের গুটি কয়েক লোক বা বিশেষ শ্রেণীদের হাতে পঞ্জিভূত হয়ে না থাকা এবং তা যাতে করে তাদের মধ্যেই এমনিভাবে ঘুরাফেরা অবস্থায় থাকে

যে, অন্য লোক তা থেকে উপকৃত হতে পারে না, এটা ইসলামের নিকট নিতান্ত জঘন্যতম কাজ। বিপুল সম্পদ বিশেষ শ্রেণী বা গুটি কয়েক লোকের করায়ত্তে চলে যাওয়াকে সে কখনো সমর্থন করে না। কুরআন মজীদে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ -

"ধন-সম্পদ যাতে করে তোমাদের ধনী লোকদের হাতের মুঠায় ঘুরাফেরা করতে না পারে, (সেই জন্য বন্টনের এ নীতি গ্রহণ করা হয়েছে)।"

(সূরা হাশর-৭)

এ আয়াতের সারমর্ম হলো যে, ধনীদের থেকে তাদের সম্পদের একটি অংশ নিয়ে তা গরবীবদের মালিকানায় দিয়ে দেয়া। কুরআনে করীমের এ আয়াতের সাথে যে ঐতিহাসিক ভূমিকা সংশ্লিষ্ট রয়েছে, সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করা ইসলামের এ মৌলিক বিধানটিকে সঠিক রূপে অনুধাবন করার বেলায় যথেষ্ট সহায়তা করে।

ঘটনা হলো যে, মোহাজেরগণ রাসূলে করীম (সাঃ)-এর সাথে মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় এসেছিলেন। গরীব মোহাজেরদের নিকট কোন ধন-দৌলত ছিলনা বলে তা সাথে করে নিয়ে আসার কোন প্রশ্নই উঠে না। আর যারা ধনী ছিলেন, তারাও ধন-সম্পদ ও বিষয়-সম্পত্তি সব কিছু মক্কায়ই রেখে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। মদীনায় এসে গরীব-ধনী সকলেই পরের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়লেন। এ সময় মদীনার আনসারগণ মোহাজেরদের প্রতি দানশীলতা ও বদান্যতার যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন, তা ইসলামী ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল আদর্শ স্বরূপ এখনো ঝলমল করছে। তাঁরা যে প্রকৃতিগত কৃপণতার বেড়াজাল অতিক্রম করে মহানুভবতার শীর্ষে উপনীত হয়েছেন, তা বলাই বাহুল্য। তারা নিজদের ধন-সম্পদ থেকে মোহাজেরদেরকে আপন ভাইয়ের ন্যায় অংশ দান করেছিলেন। এমনকি নিজেদের জন্য যে সকল বস্তু নির্দিষ্টরূপে রেখেছিলেন, তাও তারা দ্বিধাহীন চিত্তে প্রফুল্লে মনে তাদেরকে দান করেছিলেন। দুনিয়ার ইতিহাসে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের এহেন নজীর খুব বিরল। তাদের প্রশংসায় কুরআনে করীমে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ -

"যারা হিজরত করে তাদের নিকট আসে, তাঁদের প্রতি তারা আন্তরিক ভালবাসা প্রদর্শন করে। আর তাদেরকে যা কিছু দান করা হয়, সে ব্যাপারে তাদের মনে কোনরূপ লোভ লালসা বা দ্বিধার সৃষ্টি হয় না। আর তারা যদি দরিদ্রতার শিকারেও পরিণত হয়, তবুও সর্বদা তাদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়।" (সূরা হাশর-৯)

মনের আকীদা বিশ্বাসকে কিরূপে পরিপাট্য ও দৃঢ় করে তুলতে হয়, তারা তারই জীবন্ত নজীর ছিলেন। তারা সর্বহারাদের জন্য জীবিকার প্রয়োজনের দলন থেকে মুক্ত হয়ে উন্নত স্পৃহা ও চেতনাবোধ এবং মহত্বের ধ্যান-ধারণার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার একটি বাস্তব উদাহরণ রূপে জগতের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও মদীনার আমীর ওমরাহ এবং গরীব মোহাজীরদের মধ্যবর্তি ময়দান খুবই প্রশস্ত ছিল। আনসারদের আন্তরিকতা ও মহানুভবতা এবং তাদের দানশীলতার বাস্তব অবস্থাটি রাসুলে করীম (সাঃ)-এর সম্মুখে ছিল। এ জন্যই তিনি তাদের থেকে এর চেয়ে বেশী কিছু দাবী করার প্রয়োজন মনে করেননি। আর তাদের ধন-দৌলত থেকে একটি অংশ দান করতেও নির্দেশ দেননি। কেননা তারা নিজেরাই নিজেদের সমুদয় মালিকানার ভিতর তাদেরকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে ইচ্ছাকৃত ভাবেই অংশীদার করে নিয়েছিলেন। আর এমতাবস্থা বিরাজমান কালেই বনী নজীরের ঘটনা সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে সন্ধি অবশ্য হয়নি, তবে তারা সন্ধির মাধ্যমে নবী করীম (সাঃ)-এর দখল ও বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল। সাধারণ যুদ্ধ ব্যতীত যে সকল যুদ্ধে মাত্র চার পাঁচজন লোক লড়াইয়ের ময়দানে অংশ নিতেন এবং তার গনীমত লব্ধ ধন-সম্পদ থেকে শুধু মাত্র এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর রাসুলের জন্য রেখে দেয়া হতো। কিন্তু এ যুদ্ধটিতে অর্থাৎ বনী নজীরের বেলায় সমস্ত গনীমতের সম্পদ আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসুলের জন্য নির্ধারিত হয়েছিল। নবী করীম (সাঃ) মুসলমানদের মধ্যে সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে এটাকে এক পর্যায়ে ভারসাম্য স্থাপনের সুবর্ণ সুযোগ মনে করেছিলেন। সুতরাং তিনি বনী নজীর থেকে প্রাপ্ত সম্পদ (ফায়ের মাল) দু'জন গরীব আন্‌সার সহ সমগ্র মোহাজিরদের জন্য নির্দিষ্ট রূপে বন্টন করেছিলেন। এখানে আন্‌সার দু'জনকে তাদের সাথে শামিল করে নেয়ার পিছনে সেই যুক্তিই কার্যকর ছিল যা মোহাজিরদের জন্য নির্দিষ্ট রূপে এ সম্পদ পাবার কারণ ছিল। এ ঘটনার প্রতি ইংগিত করেই কুরআনে হাকীমে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَىْ لَايَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ـ وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ـ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ـ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ـ لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ـ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ـ

—"যেসব বস্তির ধন-সম্পদ আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর রাসুলকে বিনা যুদ্ধে দান করেছেন, তা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ্, তাঁর রাসুল আর রাসুলের নিকটস্থ্ আত্মীয়-স্বজন এবং এতীম, মিস্‌কিন ও মুসাফিরদের জন্য বিশেষ রূপে নির্ধারিত। এ ব্যবস্থা শুধু কেবল যাতে করে সম্পদ ধনাঢ্য শ্রেণীদের মধ্যে ঘুরাফেরা করতে না থাকে, সেই জন্যই এটা গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং রাসূল তোমাদেরকে যে নির্দেশ দেয়; সেই নির্দেশ তোমরা মেনে চলো। আর যে কাজ থেকে তিনি তোমাদেরকে বিরত থাকতে বলেন, সেই কাজ থেকে বিরত থাকো। আর আল্লাহ্ তায়ালাকে ভয় করে চলো। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা কঠিনতম শাস্তিদাতা, আর উপরি বর্ণিত ধন-সম্পদ সেই সকল মোহাজিরদেরকেও দান করা হবে, যাদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়ীতে ও ধন-সম্পদ থেকে বেদখল করে জোর জবরদস্তীমূলক দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তারা যেমন রহমত ও সান্নিধ্য কামনা করে। (আর এ কারণেই তাদের নিদারুণ অবস্থার ভিতর কালাতিপাত করতে হচ্ছে) তেমনি তারা আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসুলের (জামায়াত তথা মিশনের) মদদগারও বটে। আসলে এরাই হচ্ছে সঠিক সত্যব্যদী লোক।" (সূরা হাশর ৭-৮)

রাসুলে করীম (সাঃ) এর এহেন ব্যয় সম্পর্কে কুরআনে করীমের উল্লেখ কৃত বর্ণনা দ্বারা যে নীতি আমাদের সামনে পরিস্ফুট হয় তা নিতান্ত সুস্পষ্ট, তা কোন

ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এটা পরিষ্কাররূপে ইসলামের একটি মৌলিক বুনিয়াদী নীতি হিসেবে নির্ধারিত হয়। আর এর দ্বারা একদিকে যেমন সম্পদ সমাজের গুটি কয়েক লোকের করায়ত্ত হয়ে যাওয়াকে সাধারণ মানুষের জন্য ক্ষতিকর বলা হয়েছে, অনুরূপ যেখানে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়, সেখানে যাতে করে এক পর্যায় সর্ব সাধারণের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি হতে পারে, তার জন্য অবস্থার সংশোধনের নিমিত্তও জোর তাগিদ দেয়।

আসল কথা হচ্ছে যে, একদিকে সম্পদের প্রাচুর্য্য, আর অপর দিকে তার স্বল্পতা ও হীনতার এ অবস্থা সমাজের কিছু সংখ্যাক মানুষের মনে হিংসা বিদ্বেষের আগুন প্রজ্বলিত ছাড়াও অন্যান্য বহু প্রকার সমাজ বিরোধী ধ্বংসাত্মক কাজ এবং ঝগড়া বিবাদের জন্ম দেয়। মানব দেহের অতিরিক্ত জীবন শক্তিকে কোন না কোন প্রকার কাজে ব্যয় করা যেমন প্রয়োজন, অনুরূপ অবস্থা সেখানে বিরাজমান; -যেখানে প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ বর্তমান পাওয়া যায়। মানুষ যে সর্বদা তাকে ন্যায় পথে পবিত্রতার সাথে ব্যয় করবে, তা কোন জরুরী ব্যাপার নয়। অন্যায় পথেও সে ব্যবহার করতে পারে। এ কথা একান্ত অনিবার্য সত্য কথা যে সম্পদের প্রাচুর্য্য ও অতিরিক্ততা, সত্ত্বাকে ধ্বংস করে ধংসাত্মক বিলাসিতা অথবা মানবিক কুবৃত্তি নিচয়ের আনুগত্যের পথ গ্রহণ করে। সমাজের অভাবগ্রস্ত দরিদ্র শ্রেণী লোকদের মধ্যে তারা নির্লজ্জভাবে প্রকাশ করার জন্য পথ খোলাসা করে যারা ধনাঢ্য ব্যক্তিদের কামনা পূরণের নিমিত্ত এবং তাদের গর্ব অহংকারের নিদারূণ তৃষ্ণা নিবারণের খাতিরে মান ইজ্জৎ বিক্রয়, নারী ব্যবসা এবং চাটুকারিতা ও মিথ্যার বেসাতী গ্রহণ করে স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও আমিত্তকে বিলীন করে তারা তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। দরিদ্রের অভিশাপে অভাবের তাড়নায় মানুষ কিনা করতে পারে? যারা প্রচুর সম্পদের অধিকারী তারা অতিরিক্ত সম্পদ শক্তি ব্যয়ের জন্য ইচ্ছামত একটি পথ বেছে নেয়ার বেলায় কোন কিছুই পরওয়া করে না। যাবতীয় দুষ্কর্ম যেমন জুয়া, পাশা খেলা, মদ পান করা, দাস দাসি বিক্রয় করা, আর মান ইজ্জৎ ও পৌরষত্বকে বিসর্জন দেয়া। এ সব কিছু একদিকে সম্পদের প্রাচুর্য্যতা অপর দিকে তার অভাবেরই পরিণাম ফল বৈ আর কি? সমাজ জীবনের সর্ব প্রকার বৈষম্য ও ভারসম্যহীনতা এ পার্থক্য ও ব্যবধানের পরিণাম ছাড়া আর কিছুই নয়।

যারা অগাধ ধন-সম্পত্তির অধিকারী, তারা সমাজের বুকে যে ধরণে চলাফেরা করে এবং যারা অভাবী ও দারিদ্রতার তাড়নায় যাদের অন্তঃকরণ

জর্জরিত তাদের নিম্নতম প্রয়োজন পূরণের জন্য যে কয়টি পয়সার প্রয়োজন যা তাদের প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম, তাও তারা পাচ্ছে না। এমতাবস্থায় হিংসার তুষাণলে রয়ে রয়ে ছাড়খার হওয়া বা তাদের স্বভাব চরিত্র এদিক সেদিক ছুটাছুটি করা এবং নিজেদেরকে সর্ব প্রকার অপমান করা ছাড়া তাদের জন্য কোন পথ থাকতে পারে? তাদের মান মর্যাদা তাদের নিজেদের চক্ষেই কম অনুমিত হতে থাকে। সম্পদ ও শক্তির ঔদ্যত্ব প্রদর্শনীর সম্মুখে বাস্তবিকই তারা নিজেদের ইজ্জৎ আবরুকে ছোট মনে করতে থাকে। মোটকথা তারা পরিশেষে মাংস পিণ্ডের একটি মুর্ত্তি ছাড়া আর কিছুই থাকে না। তাদের অন্তর থাকে সর্বদা ধনাঢ্য ব্যক্তিদেরকে কিরূপে খুশী রাখা যায় এ চিন্তা কল্পনায় ব্যতিব্যস্ত। পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থার এই হলো বাস্তব চিত্র। সে সমাজে এ ধরণের কাণ্ড কারখানাই ঘটে।

ইসলাম যদিও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ ও দার্শনিক ধ্যান-ধারণার মূল্যায়নের প্রতি খুববেশী জোড় দেয়। কিন্তু সে অর্থনৈতিক মূল্যবোধের প্রভাবকে একেবারে দৃষ্টির আড়ালে ফেলে রাখে না। সে মানুষকে তাদের সাধারণ প্রয়োজনের উর্ধে দেখতে চায় বটে, কিন্তু তাদের উপর মানবিক ধৈর্য ও সহিষ্ণু শক্তির চেয়ে বেশী বোঝা চাপানোর পক্ষপাতি নয়। এ জন্যই সম্পদ শুধু মাত্র ধনাঢ্য ব্যক্তিদের মধ্যে ঘোরাফেরা করুক, তা কখনো সে চায় না। বরং সে স্বীয় অর্থনীতিকে স্বাতন্ত্র্য রূপ দান করে আলাদা নীতির মর্যাদা দিয়েছে। সে সম্পদের একটি নির্দিষ্টতম অংশ এ জন্য গরীবদেরকে দান করা অবশ্য কর্তব্য নিরূপণ করেছে, যাতে করে তা তাদের জীবন ধারণের এমন একটি উপজীব্যে পরিণত হয়, যা তাদের নিজেদেরই করায়ত্তে থাকবে এবং তারা মান সম্মানের সাথে স্বাধীনভাবে জীবন ধারণ করতঃ সমাজ দেহের সকল অনাচার অবিচার ও দুষ্কার্য্যের উচ্ছেদ করণের সেই দায়িত্ব পালনে সমর্থ হবে, যা তাদের প্রতি এ দ্বীন কর্তৃক আরোপিত হয়েছে। চাই এ সমাজ বিরোধী দুষ্কর্ম শাসক গোষ্ঠীর মধ্য থেকে প্রকাশ হোক বা জনসাধারণের থেকে, সে কোন কথা নয়;- যে ক্ষেত্রেই তা পাওয়া যাবে, সেখানেই তাদের দায়িত্ব প্রযোজ্য হবে।

কতিপয় সম্পদ এমন ধরণের হয় যার মালিকানা সমগ্র জনসাধারণের জন্য। তাকে নিজেদের দখলে নিয়ে আসা ব্যক্তির জন্য ইসলাম অবৈধ ঘোষণা করেছে। এ সকল সম্পদ থেকে রসূলে করীম (সাঃ) তিনটির নাম উল্লেখ করেছেন, আর তা হলো, আগুন পানি ও ঘাস। তিনি বলেন ঃ

اَلنَّاسُ شُرَكَاءُ فِىْ ثَلَاثٍ فِى الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ -

"আগুন, পানি, আর ঘাস এ তিনটি বস্তুর বেলায় জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র মানুষ সম মালিকানার অধিকারী।" (মিশ্‌কাতুল মাসাবীহ্)

যেহেতু তখনকার যুগে এ বস্তুগুলি আরবের সমাজ জীবনে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় বস্তুর মধ্যে গণ্য করা হতো বলেই তার থেকে উপকৃত হবার বেলায় সকলকে সমপরিমাণ অধিকার দান করা হয়েছে। সমাজ জীবনের আবশ্যকীয় প্রয়োজনশীল বস্তুগুলির অবস্থা পরিপার্শ্বিকতার কারণে ক্রমিকপর্যায় পরিবর্তন হতে থাকে। ইসলামী শরীয়াতে "কিয়াসকে" যে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদী নীতি হিসেবে মর্যাদা দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে এমন উদারতাপূর্ণ প্রশস্ততার অবকাশ বর্তমান রয়েছে যে, অন্যান্য সেই সকল বস্তুর উপর প্রযোজ্যমান হতে পারে, যা তার নির্দেশের অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু শর্ত হলো এমনটি করনে ইসলামের মৌলিক নীতির কোনরূপ ক্ষতি সাধন না হয় সে দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। এমন হতে পারবে না যে, সমস্ত লোককে মালিকানা অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাষ্ট্রের ভাতাধারী করা হল। কেননা এর দ্বারা রাষ্ট্র তাদেরকে গোলাম বানিয়ে রাখা এবং সর্বদিক দিয়ে তাদেরকে দমিয়ে রাখার এমন সুবর্ণ সুযোগ পায় যে সুযোগ পুজিবাদী ব্যক্তিদের চেয়ে অনেকটা প্রশস্ত। কারণ এর দ্বারা রাষ্ট্রের হাতে শক্তি ক্ষমতা এবং সম্পদ উভয়টাই একত্রিভূত হয়। কিন্তু পুঁজিবাদীদের হাতে শুধু মাত্র সম্পদ থাকে। শক্তি ও ক্ষমতা থাকে না বলেই তাদের তুলনায় রাষ্ট্র অনেকখানি সুযোগের অধিকারী হয়।

সম্পদের একটি অংশ সমাজের কতিপয় প্রয়োজনশীল লোকদের প্রাপ্য অধিকার। এ অংশটি হলো সেই অংশ, যা ইসলামে যাকাত নামে অভিহিত করে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের প্রতি ফরজ করা হয়েছে। কুরআনের ভাষায় বলা হয়েছে ঃ

فِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ-

"তাদের ধন-সম্পদে বঞ্চিত থাকার কারণে প্রয়োজনশীল হয়ে পড়ায় গরীব দুঃখী-এককথায় অভাবীদেরও অধিকার রয়েছে।" (সূরা মায়ারেজ-২৪-২৫)

সম্পদ যে, যাকাত দাতাদের মালিকানা থেকে বাহির হয়ে যাকাত প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মালিকানায় চলে যায়, সে বিষয়ে কুরআনের বর্ণনাই জ্বলন্ত প্রমাণ ঃ

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنَ -

অভাবীদের জন্য এটা এমন একটি স্বত্বাধিকার যা সমাজ বা রাষ্ট্র আদায় করে, তা তার প্রাপ্য ব্যক্তিদের হাতে তুলে দেয়। অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকানাকে

একদিক থেকে অপর দিকে একহাত থেকে অন্য হাতে স্থানান্তরিত করাই হচ্ছে তার কাজ!

বস্তুতঃ ইসলামে ব্যক্তিগত মালিকানার আসল স্বরূপ ও গতি-প্রকৃতির সংক্ষিপ্ত চিত্রটি হচ্ছে নিম্নরূপ।

সাধারণ দিক দিয়ে সম্পদের সার্বভৌম আসল মালিকানা হচ্ছে সমাজের ও রাষ্ট্রের-ব্যক্তির নয়।

ব্যক্তি মালিকানা একটি শর্তাধীন ও নিয়মিত দায়িত্ব।

সম্পদের মধ্যে কোন কোন মালিকানা সাধারণ ও শরীকানা (সমবায় ভিত্তিক বা সমাজের সকল মানুষের সম অংশীদার ভিত্তিক) গণ্য হয়। কোন ব্যক্তি নিজের তা করায়াত্ত করার অধিকার নেই। সমস্ত মানুষ সম মালিকানা ভিত্তিতে তা থেকে উপকৃত হতে পারবে।

সম্পদের নির্দিষ্টতম এমন একটি অংশ সমাজের স্বত্বাধিকার ভূক্ত, যা সে আদায় করে তার আসল প্রাপকদের হাতে তুলে দেবে; যাতে একই সাথে ব্যক্তির এবং সমাজের উভয়ের অবস্থার উন্নতি হয়।

ব্যক্তি মালিকানার উপকরণ

মালিকানা ও দখল স্বত্বের মূল তত্ত্বগত দৃষ্টিভংগীর উপরই ইসলাম তার বিজ্ঞান সম্মত অভিজ্ঞতা প্রসূত বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করে। সে দখলী স্বত্বের শর্ত নির্দিষ্ট করে যেমন ব্যয়ের ক্ষেত্রে নিয়ম কানুনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করে, তেমনি তার থেকে উপকার লাভের জন্যও একটি সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেয়। এ দিক দিয়ে মালিকানা সর্বদাই সেই গণ্ডীর ভিতর অবস্থান করে, যা সমাজ ও ব্যক্তির স্বার্থের থেকে দূরে সরে পড়ে না।

সর্বপ্রথম এ ঘোষণাই সে দেয় যে মালিকানা অর্থাৎ যে বস্তুর মালিক হয়, সে বস্তু থেকে উপকার লাভের অধিকার আইন রচনাকারীর (শরীয়াতী আদালতের) অনুমতি ব্যতিরেকে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কেননা আইন রচনাকারীর উপরই হলো সমাজের সমুদয় সমস্যাবলী তদারক করার দায়িত্ব। আর প্রকৃত প্রস্তাবে এ-ই হচ্ছে সেই আইন রচয়িতা, যে তাকে শরীয়াত সম্মত কারণ ও প্রয়োজনের উপর নির্ভশীল নিরূপন করে মানুষকে মালিকানা অধিকার দান করে। সুতরাং মালিকানার বিভিন্নতম সংজ্ঞার মধ্যে এটাও একটি সংজ্ঞা যে, "মালিকানা" কোন বস্তুর স্বত্ব অথবা তার থেকে উপকার লাভ সম্পর্কীয় এমন একটি শরীয়াতী অনুজ্ঞা যার দাবী হচ্ছে যে, ব্যক্তির পানেই এ অনুজ্ঞাটি উপযোগ করা হবে। আর

তাকে এ বস্তু থেকে উপকৃত হবার এবং তা দিয়ে তার পরিবর্তে মূল্য আদায় করার অধিকারীও মনে করা হবে।

ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদদের সম্মিলিত মতে আইন রচয়িতা যখন মালিকানার অধিকার দান অথবা তাকে অনুমোদন করবে কেবল তখনই মালিকানার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এ জন্যই মানব জীবনের সমুদয় অধিকার, যার ভিতর মালিকানা অধিকারও শামিল রয়েছে, আইন রচয়িতার ঘোষণা ব্যতিরেকে অথবা তার উপকরণকে সমর্থন দান করা ছাড়া কোনক্রমেই প্রমাণ হতে পারবে না। এ অধিকার বস্তুর স্বভাব প্রকৃতি থেকে সৃষ্টি হয় না, বরং আইন রচনাকারীর অনুমতি এবং তার এ কথা থেকে বাস্তব রূপ লাভ হয় যে, সে শরীয়াত অনুযায়ী মূল বস্তুকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রকাশ করার নিমিত্ত তার উপকরণকে মাধ্যম হিসেবে সমর্থন করে।

মালিকানা অধিকার সম্পর্কে ইসলামের নীতি ও দৃষ্টিভংগী বর্ণনার জন্য আমাদের এতটুকু আলোচনাই যথেষ্ট ও গুরুত্বপুর্ণ। কেননা এর আলোকেই সমাজের মালিকানা প্রতিনিধি রূপে আদালতের তরফ থেকে প্রদত্ত কোন বস্তুর উপর এমন একটি অধিকার নিরাপদ হয়, যা সে কোন ব্যক্তিকে দান করে। যদি এখানে তার মালিকানা না থাকতো, তবে এ ব্যক্তির জন্য তাকে নিজ দখলী স্বত্বে নিয়ে আসাও বৈধ হতো না। কারণ সম্পদের আসল সার্বভৌম মালিকানা হলো আল্লাহ তায়ালা, আর তার উপর প্রতিনিধি রূপে মানব জাতির ব্যয়ের অধিকার রয়েছে। সুতরাং কোন বস্তুকে বিশেষ রূপে কাহারো মালিকানাধীন করার অনুমতি দানের অধিকার একমাত্র শরীয়াতী আদালতেরই এখতিয়ার; সে অনুমতি কোন সাধারণ নীতি বিধানের অধীনে হোক কিম্বা কোন বিশেষ অনুমতি দ্বারা হোক, এ ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

ইসলামে সকল প্রকার কর্মই হলো মালিকানার অধিকার পাবার একমাত্র মাধ্যম। এদিক দিয়ে শ্রম এবং তার প্রতিদানের মধ্যে সমতা বিধান করা হয়েছে। অর্থাৎ সম্পদ অর্জন করার এবং তার মালিক সাব্যস্ত হওয়া যে সকল কার্যক্রমকে ইসলাম সঠিক পথ বলে ঘোষণা দিয়েছ, ক্রমিক পর্যায় তা হচ্ছে এই ঃ

১। শিকার

শিকার করা আদিকাল থেকে মানব জীবনের জীবিকা অর্জনের একটি অন্যতম বিশেষ পন্থা হিসাবে চলে আসছে। বর্তমান যুগেও উন্নয়নশীল সভ্য দেশসমূহে বিভিন্ন প্রকার সম্পদ অর্জনের উপজীবিকা হিসাবে পরিণত হচ্ছে। মৎস্য মনি মুক্তা, প্রবাল পাথর আর স্পঞ্জ এবং এ ধরণের অন্যান্য বস্তুর শিকারের

মাধ্যমে জাতীয় জীবনে ও ব্যক্তির জন্য উপার্জনের একটি অন্যতম সংস্থান হয়ে থাকে। ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য চিত্তবিনোদন ও আনন্দ উপভোগের জন্য পাখি ও অন্যান্য প্রাণীকে শিকার করা হয় এবং তার দ্বারাও জাতীয় জীবনে এবং ব্যক্তি পর্যায় জীবিকা নির্বাহের একটি পথ হয়।

২। মালিকবিহীন পতিত জমি আবাদ করা

এ ব্যাপারে ইসলাম এ নীতি নির্ধারণ করেছে যে, জমি দখলে নেয়ার পর তিন বৎসরের মধ্যে উক্ত ব্যক্তি তা আবাদ করে শস্য ক্ষেতে পরিণত করতে হবে। অন্যথায় তার মালিকানা অধিকার আপন থেকেই নস্যাত হবে। কেননা পতিত জমি যাতে করে আবাদ হয় এবং তার থেকে লাভবান হবার মধ্যে যে উপকার নিহিত রয়েছে, তা বাস্তব ক্ষেত্রে অর্জন করাই হলো এ নীতি নির্ধারণের মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি বৎসরের মেয়াদে দখলকারী এ জমি কার্যোপযোগী করে তুলতে সক্ষম কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য যথেষ্ট অবকাশ। এতদীর্ঘ সময়ের মধ্যে ব্যক্তি এ কাজের জন্য সক্ষম, তা প্রমাণের জন্য যদি সামনে এগিয়ে না আসে, তবে পতিত জমি দ্বিতীয়বার তা সমাজের মালিকানায় অর্থাৎ রাষ্ট্রের মালিকানায় চলে আসবে। কোন ব্যক্তিকেই তার মালিক বলে মনে করা হবে না।

عَادِى الْاَرْضِ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَكُمْ مِنْ بَعْدِ فَمَنْ اَحْيَا اَرْضًا مَيْتًا فَهِىَ لَهٗ وَلَيْسَ لِمُحْتَجِرٍ حَقٌّ بَعْدَ ثَلَاثَ سِنِيْنَ -

"পতিত জমির আসল মালিক হচ্ছেন-আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূল। তারপর হচ্ছে তা তোমাদের মালিকানাতো। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন পতিত জমি কার্য্যোপযোগী করে তুলবে, তা তারই হবে। অবশ্য তিন বৎসর পর কোন হস্তক্ষেপকারীর অধিকার সমর্থন করা হবেনা। (কিতাবুল খারাজে তাউ, (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে এ হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে,

এ ব্যাপারে বর্তমানে আমাদের দেশে ফরাসী আইনের আলোকে যে আইন রচনা করা হয়েছে তার তুলনায় ইসলামের আইন খুবই বাস্তবানুগ ও কল্যাণকর। সে আইনে শুধু পনের বছরের দখলীয় মেয়াদকে এ কাজের জন্য যথেষ্ট বলে সমর্থন দেয়া হয়েছে। পনের বছর যাবৎ উক্ত জমি দখল কারীরই মালিকানায় থাকবে। তাই সে এ মেয়াদের মধ্যে উক্ত জমি কার্যোপযোগী করে তুলুক কিংবা পতিত অবস্থাই ফেলে রাখুক, তা তার ইচ্ছাধীন। এখানে মালিকানা অধিকার

দেয়ার পিছনে যে রহস্য কাজ করতেছে, তা নিতান্ত, একটি অমুলক অস্বীকার বোধক কারণ। এখানে শুধু "বাস্তব অবস্থাকে" আইনগত সমর্থন দানের দৃষ্টিভঙ্গিকেই মীমাংসাকারীর মর্যাদার আসন দেয়া হয়েছে। এখানে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানব রচিত আইনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান।

৩। ভু-গর্ভস্থ সম্পদ বাহির করা

ভু-গর্ভ থেকে যে খনিজ সম্পদ বেড় করা হয়, ইসলামের মতে তার পাঁচ অংশের চার অংশই খননকারীর মালিকানা নির্ধারিত হয়। আর অবশিষ্ট একাংশ বায়তুল মালে যাকাত স্বরুপ জমা হয়। কেননা খনিজ সম্পদ, এমন একটি মালিকানা বিহীন সম্পদ যা ব্যক্তি নিজে স্বীয় মেহনত ও শ্রম ব্যয় কর উত্তোলন করে। অতএব এ ক্ষেত্রে তার ব্যয় যখন অধিক তখন মালিকানার বেলায়ও অধিক হওয়া উচিত।

এখানে বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য যে, ইসলাম যখন তার এ নির্দেশ নামা জারি করেছে, তখনকার দিনে ভুগর্ভ থেকে যে সকল খনিজ সম্পদ উত্তোলন করা হতো, তা খুবই কম ব্যবহার্য খনিজ পদার্থ ছিল। যেমন স্বর্ণ রৌপ্য। আর তা কয়লা বা পেট্রোলের ন্যায় তেমন বস্তু নয়, যে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের প্রয়োজনশীল বস্তু এবং তাঁরা তার মুখাপেক্ষী। এখানে একটি প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে, কয়লা পেট্রোল লোহা এবং এ ধরণের অন্যান্য বস্তুকে আগুন পানি গ্যাস; যা সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তু, তার উপর কি কিয়াস করা হবে?? না সেই সকল খনিজ সম্পদের উপর কিয়াস করা হবে, যা ইসলামের প্রথম যুগে প্রসিদ্ধ ছিল।

এ বিষয় আমরা মালেকী মাযহাবের অভিমতকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকি। কারণ এ মতবাদ দ্বারা এক দিকে যেমন এ সকল সম্পদের মালিকানা ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ না হয়ে সাধারণ মালিকানায় পর্যবসিত হয়, অনুরূপ যে জমি থেকে এ সম্পদ বাহির হয়, সে জমির মালিকের আয়ত্তাধীনে মালিকানা চলে যাওয়ার পথ রুদ্ধ করে দেয়।

কেননা জমির মালিকানা অথবা তার দাবি যখন সাধারণত; খনিজ সম্পদের জন্য হয় না, তখন জমির মালিক হলেই যে, তার গর্ভস্ত প্রাপ্ত সম্পদের মালিকানা স্বত্বকে অপরিহার্য করবে তেমন কোন কথা নয়। সাধারণতঃ জমি রাখা হয় ফসল ফলানোর জন্য, খনিজ দ্রব্যের জন্য নয়। খনিজ দ্রব্য প্রকাশ পাওয়া হচ্ছে একটি আকস্মিক ব্যাপার।

৪। ধাতব পদার্থ থেকে বিভিন্ন বস্তু তৈয়ার করা

এটাও মানব জীবনের জীবিকা অন্বেষণের একটি বিশেষ পথ। এর মাধ্যমে জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন পুরণ হয়। এর দ্বারা এমন লাভবান হওয়া যায়, যা ধাতব পদার্থ থাকা কালীন অবস্থায় তা পাওয়া সম্ভব নয়। অথবা এর সাথে যদি অন্য কোন বস্তুর সংমিশ্রণ বা সংযোজন করে নেয়া হয়, তবে প্রথমোক্ত অবস্থায় উপকার লাভের তুলনায় অনেক বেশী লাভবান হবার সম্ভাবনা থাকে। এ কাজের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের শ্রমের গুরুত্বের কথা যে সুস্পষ্ট, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৫। ব্যবসা-বাণিজ্য

এর বিভিন্ন ধরন প্রকার ও শ্রেণী রয়েছে! এক ব্যক্তির জন্য তা সবগুলো অতিক্রম করা যেমন সম্ভব, অনুরূপ কয়েকজন একত্রে মিলে অতিক্রম করাও সম্ভব। পরিশেষে এর দ্বারা যে উদ্দেশ্য সাধন হয়, তা হলো মূল পদার্থ বা তৈয়ার কৃত বস্তু এক হাত থেকে অন্য হাতে স্থানান্তরিত হওয়া। যার পরিণতি স্বরূপ এ পদার্থ বা তার থেকে তৈয়ার কৃত বস্তু দ্বারা অধিক পরিমাণে উপকৃত হওয়া সম্ভব।

৬। মজুরীর বিনিময় পরিশ্রম করা

মানব জীবনের জীবিকা নির্বাহের নিমিত্ত শ্রমের বিনিময় পারিশ্রমিক দেয়াও একটি অন্যতম পথ বিশেষ। ইসলাম এ ধরণের শ্রমকে খুব সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে এবং তার পারিশ্রমিক বা মজুরীকে কোন প্রকার কাল বিলম্ব না করে পুরাপুরি ভাবে আদায় করার জন্য নির্দেশ দেয়। পবিত্র কুরআন মজীদ স্বয়ং নিজেই মানব সমাজকে পরিশ্রমের নিমিত্ত উৎসাহ দিয়ে তাকে দৃষ্টির কেন্দ্র বিন্দু ও চিন্তা গবেষণার বস্তুতে নিরূপিত করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ اِعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ -

"হে নবী! আপনি বলে দিন যে, তোমরা পরিশ্রম করে যাও। আল্লাহ তায়ালা এবং তার রাসূল আর মুমিনগণ তোমাদের শ্রমের হিসাব-নিকাশ নিবেন।" (সূরা তাওবা–১০৫)

কুরআন মজীদের এ আয়াতে কাজকে যথাযথ ভাবে সুন্দররূপে সম্পন্ন করার নিমিত্ত উৎসাহ দেয়া হয়েছে এবং তার ভিতর শ্রমের প্রতি সম্মান প্রদর্শনেরও ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। আর তা নিয়ে চিন্তা গবেষণা করা এবং তার প্রতিদান পাবার আশায় অপেক্ষমান থাকার জন্যও বলা হয়েছে। কুরআন মজীদের আর

একটি স্থানে কাজ এবং তার জন্য আল্লাহর যমীনের বুকে বিচরণ করার নিমিত্ত জন গণকে অনুপ্রাণিত করে বলা হয়েছে ঃ

فَامْشُوا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ -

—"তোমরা যমীনের উপর বিচরণ করো এবং তাতে উৎপাদিত খাদ্য-দ্রব্য ভক্ষণ করো।"

পরিশ্রমের মর্যাদা যে কত উন্নত ও মহান সে সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) বিভিন্ন হাদীসে ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفِ

"যারা কোন পেশা গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহের উপায় করে নেয়, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে মহব্বত করেন।" (করতবী)

مَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِّنْ عَمَلِ يَدِهٖ

"স্বীয় হস্ত দ্বারা উপার্জিত খাদ্য-দ্রব্য থেকে ভাল খাদ্য তোমাদের জন্য আর কিছুই থাকতে পারে না।" (বুখারী)

ইসলাম শ্রমের মর্যাদা ও মহত্ত্বের এহেন দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তির উপরই শ্রমিকদের মজুরীর অধিকারকে একটি পবিত্রতম অধিকার নির্ধারিত করে। সুতরাং সে সর্ব প্রথমেই তা ঠিক ঠিক ভাবে আদায় করার জন্য নির্দেশ দেয় এবং যারা শ্রমিক সমাজের এহেন ন্যায্য অধিকারকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করবে, তাকে পরিষ্কার ভাবে আল্লাহদ্রোহী ঘোষণা দিয়ে তার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণা করে। রাসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন— "আল্লাহ বলেন এমন তিন প্রকার লোক রয়েছে, যাদের সাথে আমি নিজেই কিয়ামতের দিন শত্রুতা পোষণ করবো। তদের মধ্যে প্রথম প্রকার হচ্ছে ঐ সকল লোক যারা আমার নামে শপথ করে কোন ওয়াদা করার পর আমার সাথে প্রতারণা করে। আর দ্বিতীয় প্রকার হল ঐসব লোক, যারা কোন আযাদ নর-নারীকে বিক্রয় করে তার মূল্য গ্রহণ করে। আর তৃতীয় প্রকার হলো তারা, যারা কোন শ্রমিককে মজুরী প্রদানের আশা দিয়ে কাজ করাবার পর তার মজুরী দান করে না। এসব লোকেরা অবশ্যই কিয়ামতের দিন আমার কোপানলে পড়বে।" (বুখারী)

উল্লেখিত হাদীসটিতে এক সাথে তিনটি গুনাহের কথা এবং তার জন্য একই ধরণের শাস্তি দেয়ার ঘোষণার মধ্যে একটি তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। প্রথম

গুনাহটি হচ্ছে প্রকাশ্যরূপে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এবং আল্লাহর দেয়া জামানতের অমর্যাদা করা। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে মানবতার অসম্মান জনক কাজ। কেননা একটি স্বাধীন মানুষ বিক্রি করে তার মুল্য ভক্ষণ করা হয়। আর তৃতীয়টি হচ্ছে শ্রমিকদের ঘর্মাক্ত পরিশ্রমের ফলকে পদদলিত।এটাও স্বাধীন ব্যক্তির বিক্রয় লব্ধ মূল্য ভক্ষণ করার ন্যায় মানবতার সাথে একটি বিশ্বাস ঘাতকতা এবং আল্লাহর সাথে শপথ করার পর তা ভঙ্গ করার ন্যায় আল্লাহর দয়া নিশ্চয়তার অপমানও বটে।

এর ভিতর প্রত্যেকেই স্বীয় দুষ্কার্য্য এবং নিজেদের ভিতর যে বিশ্বাস ঘাতকতা বর্তমান রয়েছে, এর কারণে আল্লাহর তরফ থেকে সংগ্রাম ঘোষণার এবং তার নিকট জবাবদিহী করার পাত্রে পরিণত হয়। শ্রমিকের মজুরী না দেয়াতো দূরের কথা, তা যখন তখন আদায় করার জন্য জোড় তাগিদ দেয়া হয়েছে। শুধু পূর্ণরূপে আদায় করলেই হবে না, কাল বিলম্ব না করে তা আদায় করা একান্ত আবশ্যক। আল্লাহর রাসূল ইরশাদ করেছেন ঃ

اِعْطُو الْاَجِيْرَ حَقَّهُ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَّ عَرَقُهُ

"শ্রমিকদের মজুরী তাদের শরীরের ঘর্ম শুকানোর পূর্বেই দিয়ে দাও।" (মিশ্‌কাত)

ইসলাম এহেন উপদেশাবলীর ভিতর শ্রমিকদের জন্য শুধু জাগতিক প্রয়োজনেরই ব্যবস্থা করে দেয়নি, বরং তাদের আধ্যাত্মিক ও মানসিক প্রয়োজনের পানে পূর্ণ খেয়াল রেখেছে। আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে সন্তুষ্ট থাকার জন্য ইসলাম এ ব্যবস্থা নিয়েছে যে, তার সমস্যার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দান করে তাকে যে একটি অন্যতম সমস্যারূপে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে, এ অনুভূতি তাদের ভিতর জাগিয়ে তোলা। আর তাদের পারিশ্রমিক যখন তখন আদায় করে দেবার তাগিদের মধ্যেও তাদের আন্তরিক তুষ্টতার আভাস পাওয়া যায়।

এমনিভাবে তাদের মনের কোঠায় এ অনুভুতিও জাগিয়ে তোলা হয় যে, তাদের শ্রমের প্রতি যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে সমাজ জীবনে তাদেরকে একটি বিশেষ স্থান দান করা হয়েছে। যতদুর পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবনে একান্ত আবশ্যকীয় বস্তুর প্রশ্ন বিদ্যমান, সেক্ষেত্রে শ্রমিকগণ সাধারণ ও স্বীয় পরিবার পরিজনের প্রয়োজন পূরণার্থে স্বীয় পারিশ্রমিকের মুখাপেক্ষী হয়। এ কারণেই মজুরী পাবার বেলায় বিলম্ব হওয়াটা তার পক্ষে খুবই কষ্টদায়ক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তার মজুরীর যখন বেশী প্রয়োজন অনুভুত হয়, তখন বিলম্বটাই তাকে মজুরী থেকে

বঞ্চিত রেখে দেয়। সুতরাং এ কারণে যেমন কাজের মধ্যে তার কোন আন্তরিকতা আসে না, তেমনি আসে না কোন আনন্দ স্ফূর্তি। মানুষ যে কাজই করুক না কেন, সে কাজ যাতে করে আন্তরিকতার সাথে তাড়াতাড়ি সমাধা হয় এবং মনের দিক দিয়ে যাতে তার ভিতর তার সদিচ্ছা আন্তরিকতা বিদ্যমান থাকে এবং জাগতিক দিক দিয়ে যাতে সে যথাপোযুক্ত প্রতিদান ও উপকার লাভ করতে পারে, সে জন্য ইসলাম খুব ব্যাতিব্যাস্ত থাকে। যার বহিঃপ্রকাশ আমরা তাঁর উপরোক্ত নির্দেশাবলীতে দেখতে পাই।

শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণ করার বেলায় এতটুকু সচেতনার পর ইসলাম তাদের দ্বারা যাতে করে কাজটি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন হতে পারে, সেই দাবি উত্থাপন করে। কেননা ইসলামী জীবন বিধানে কোন না কোন কর্তব্যের পরিবর্তেই মানুষ অধিকার লাভ করে। আর পরিশ্রম এবং তার প্রতিদানের মধ্যে সমতা বিধান করার নীতিটিও যেমন একটি স্বভাবগত দাবি, তেমনি নৈতিকতার দিক দিয়েও তা করা একান্ত আবশ্যক। ইসলাম নৈতিকতাকেই জীবনের ভিত্তিমূল করার প্রয়াসী। ধোকাবাজী ও প্রতারণা, কাজের ভিতর অমনযোগী তা এবং দায়িত্ববোধ না থাকাটা অন্তর আত্মা নিস্প্রাণ ও মুরদা হয়ে যাবার প্রমাণ বহন করে। এহেন দুশ্চরিত্রের মধ্যে নিপতিত থাকা এবং বার বার তা প্রকাশ পাওয়া মানুষের দায়িত্ববোধকে চিরতরে খতম করে দেয়া এবং অন্তরকে মুরদা বানিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। সমাজের সমুদয় চরিত্রবান লোক এমনি রূপ যে বিরাট সংকট লোক বিশৃঙ্খলার শিকারে পরিণত হয় তার আলোচনার একটি ভিন্ন বিষয়।

শ্রমিকদের মজুরী কি পরিমাণ হওয়া উচিত এবং তার নির্দিষ্টতা কি নীতির উপর ভিত্তি করে হবে; সে আলোচনা এখানে আমরা করবো না। তার দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করতে যে সময়ে প্রয়োজন হয়, তাই এ ব্যাপারে মূল গুরুত্বের অধিকারী, না মার্কাসবাদীদের পরিভাষায় সামাজিক প্রয়োজনের আবশ্যকতার নিরিখে হয় সে বিষয় এখানে কিছুই আলোচনা করবো না। এর বিশদ আলোচনার জন্য ইসলামী অর্থনীতির উপর স্বতন্ত্র পুস্তক প্রণয়ন আবশ্যক।

৭। যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ প্রাপ্ত হওয়া।

যুদ্ধের ময়দানে প্রতিপক্ষ শত্রুকে নিধন করা হলে তার সঙ্গের সমুদয় বস্তু লাভ করা দ্বারা মালিকানার অধিকারী হওয়া যায়। কিন্তু শর্ত হচ্ছে যে, নিধনের সময় যে বস্তু তার সাথে থাকবে, কেবল তা নিধনকারীর মালিকানায় চলে যাবে।

আর যে নিধন করে, তার মুসলমান হতে হবে। হাদীস শরীফ এ বিষয় উল্লেখ রয়েছে যে ঃ

مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَسَلَبُهُ لَهُ (بخاری مسلم)

–"যদি কোন ব্যক্তি যুদ্ধের ময়দানে প্রতিপক্ষের কোন লোককে হত্যা করে, তবে তার সাথের সমুদয় বস্তু হত্যাকারীরই মালিকানায় চলে যায়। কিন্তু শর্ত হচ্ছে যে, সে যে নিহতকারী তার প্রমাণ তাকে পেশ করতে হবে।" (বুখারী, মুসলিম)

এ ছাড়া যুদ্ধের মাধ্যমে যে, অন্যান্য বস্তু হস্তগত হয় তাকে ইসলামের পরিভাষায় গণীমতের সম্পদ বলা হয়। এ ব্যাপারে ইসলামের বিধান হলো সিপাহীদের জন্য সমুদয় সম্পদের পাঁচ ভাগের চার ভাগ থাকবে। আর অবশিষ্ট একভাগে থাকবে আল্লাহ এবং তার রাসুলের জন্য অর্থাৎ বায়তুল মালের। কুরআন মজীদে কথাকে আল্লাহ তায়ালা তার ভাষায় এভাবে বলেছেন ঃ

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ -

"মনে রেখ! গণীমত স্বরূপ যে সম্পদ তোমাদের হস্তগত হয়, তার এক পঞ্চমাংশ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের এবং রাসূলের নিকটতম আত্মীয়-স্বজন এতীম মিশকিন ও মোসাফিরদের জন্য।" (সূরা আনফাল–৪১)

৮। মালিক বিহীন জমি থেকে রাষ্ট্র পতি কাহাকেও কিছু দান করা–

যে সকল লাওয়ারীস জমি যা মুশরিদের থেকে হস্তগত হয়ে রাষ্ট্রপতির দায়িত্বে বায়তুল মালে চলে আসবে, অথবা যে সব পতিত জমির কোন মালিক নেই, সব জমি রাষ্ট্র কাহাকেও দান করলে তার মাধ্যমেও মানুষের জীবিকার সংস্থান হয়। যেমন হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-কে বায়তুল মালের মালিকানার জমি থেকে কিছু জমি দান করেছিলেন। নবী করীম (সাঃ)-এর পর খোলাফায়ে রাশেদার যুগেও যে তারা বিভিন্ন লোককে যে জমি দান করতেন ইতিহাসে তার ভুরিভুরি প্রমাণ বিদ্যমান। তাদের এ সকল দান ইসলামের বিশেষ কোন খেদমত অথবা বিশেষ কোন

উল্লেখযোগ্য কাজের বিনিময় করা হতো, কিন্তু অপরিমিত নয় খুবই কম পরিমাণ দিতেন। আর তা কেবল ঐ সকল মালিক বিহীন অথবা পতিত জমি থেকেই দেয়া হতো। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যখন বনী উমাইয়ার করতলগত হলো, তখন তারা মানুষের উপর জুলুম ও লুটতরাজ আরম্ভ করে দিল। আর ঐ সকল জমি নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেই বন্টনের বেলায় সীমাবদ্ধ রাখতো। এর বিশদ আলোচনা সামনে আসতেছে। তাদেরকে খোলাফায়ে রাশেদার মধ্য গণ্য করা হতো না। বরং ইতিহাসের পাতায় তারা জালেম শাসক হিসেবেই পরিচিত।

৯। দীর্ঘায়ু হবার দরুন ধন-সম্পদের মুখাপেক্ষী হওয়া

এ ব্যাপারে যাকাতের সম্পদকে একটি নির্দিষ্টতম সময় সীমার ভিতর ব্যয় করাকে অবশ্য কর্তব্য করে দিয়েছে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنَ السَّبِيْلِ -

"যাকাতের ধন-সম্পদ পাবার যোগ্যতম ব্যক্তি হলো ফকীর মিসকীন এবং যারা যাকাত আদায় করে তারা। আর যাদের অন্তর জয় করার উদ্দেশ্য থাকবে তাদের জন্য এবং দাস-দাসীদেরকে গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্ত করার নিমিত্ত। আর ঋণ গ্রস্তদেরকে ঋণ মুক্ত করার জন্য এবং আল্লাহর পথের বিভিন্ন কাজে আর যারা মুসাফির তাদের জন্যও যাকাতের মাল ব্যয় করা যায়।

(সূরা তাওবা–৬০)

উপরি বর্ণিত শ্রেণীসমুহের মধ্যে কোন ব্যক্তি শামিল থাকিলেই তাকে কোন ব্যক্তি যাকাতের মালের একটি অংশের মালিক হবার অধিকারী করে দেয়। এ সকল লোকদের মধ্যে কতিপয় এমন লোকও রয়েছে, যাদের বেলায় প্রয়োজনশীল ও অভাবী হওয়া ব্যতীত আর কোন কারণই কার্যকরি নয়। এখানে মনে হচ্ছে যেন প্রয়োজনকেই ব্যস্ততা ও দুর্ভাবনার রূপ দিয়ে পরিশ্রেমের এমন একটি মজুরী নির্ধারণ করা হতেছে, যাকে ইসলাম একটি উন্নত মানের দান নিরূপন করে মালিকানা লাভের একটি প্রথম ও শেষ উপায় করে দিয়েছে।

১০। দৈহিক ও মানসিক পর্যায় বিভিন্ন ধরণের পরিশ্রম।

এ পথেও পরিশ্রম করে সম্পদের মালিক হয়ে জীবিকার সংস্থান করা হয়। এটা জীবন ধারণের এমন একটি উপকরণ, যাকে ইসলাম প্রাথমিক মালিকানার বেলায় বৈধ সমর্থন করে নিয়েছে। এ ছাড়া উপার্জনের যত পন্থাই থাকুক না কেন, ইসলাম তার বৈধতাকে কোনক্রমেই স্বীকার করতে পারে না। বরং প্রকাশ্যে সে তাকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। যেমন চুরি ডাকাতি লুটতরাজ অথবা জবর ধখল। এহেন পন্থা কখনো মালিকানা লাভের মাধ্যম হতে পারে না। এ ব্যাপারে কুরআন মজীদের বক্তব্য হলো এই ঃ

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسَرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ -

–"মদ-শরাব পান করা, জুয়া-পাশা খেলা আর মাটিতে রেখো টেনে জুয়া খেলা, ভাগ্য নির্ধারক তার এবং মূর্তি ইত্যাদির কাজগুলো হচ্ছে শয়তানের চক্রান্ত মূলক কাজ। সুতরাং তোমরা এ থেকে দূরে থাকো। হয়তো তোমরা মুক্তি পাবে।" (সূরা মায়েদা–৯০)

যে ধন-সম্পদ অবৈধ উপায় ও হারাম পথে আয় করা হয় তাও হারামের মধ্যে গণ্য হয়। আসলে জুয়া-পাশা কোন কাজ নয়। বরং এসব হচ্ছে একটি জুলুম জরবদস্তী ও প্রতারণা। এর দ্বারা জুয়ারীদের মধ্যে এমন হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়, যা ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সৌভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সহানুভূতির মূল প্রেরণাকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দেয়। কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ -

–"শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করতে চায়।" (সূরা মায়েদা–৯১)

এ সকল উপকরণ সমূহের মূল রহস্য প্রকাশ্য ভাবে "পরিশ্রমের" উপরই নির্ভরশীল। সর্বাবস্থায়ই প্ররিশ্রম প্রতিদান বা মজুরীর অধিকারী করে। কেননা তার উপরই জীবন বাঁচা মরা উন্নতি অবনতি ও দায়িত্ব নির্ভরশীল হয়। জমি আবাদ করে তাকে ফসল ফলাবার উপযোগী করে তোলা এর মাধ্যমে সমাজের

উপকার সাধন করা; আত্মার পরশুদ্ধি ও মনের পরিচর্যা সকল কিছুই তার উপরই নির্ভরশীল হয়। আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধতা করণ, দৈহিক সবলতা আনয়ন এবং অসুস্থতাও দুর্বলতার যাবতীয় উপকরণ থেকে মুক্তি পাওয়ার কাজ যেভাবে পরিশ্রমের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হতে পারে; অন্য কোন উপায়ে তা সম্ভব নয়।

মালিকানা অর্জনের একমাত্র উপায় "পরিশ্রমের" বিভিন্ন রূপ ও অবস্থা যত সময় পর্যন্ত বর্তমান থাকবে, তত সময় পর্যন্ত ব্যক্তিগত মালিকানাকে সেই সকল শর্ত ও সীমারেখার পরিমন্ডলে সমর্থন দান করে; (যা ইতিপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি,) তা কাহারো জন্য ক্ষতি কারক হতে পারে না। বরং এর দ্বারা ব্যক্তিকে তার সর্বশক্তি উজাড় করে কাজ করার প্রেরণা দান করা হয়। এমনিভাবে নির্দিষ্টতম সীমারেখার পরিমণ্ডলের মধ্যে অবস্থান করে অপরের কোনরূপ ক্ষতি সাধন না করে নিজের দখলে ও মালিকানার সম্পদ রাখার স্পৃহাকে পূর্ণ সুযোগ করে দেয়। যদি সে এ সীমারেখাকে অতিক্রম করে তবে তাকে উক্ত সীমারেখার মধ্যে নিয়ে আসার জন্য বাধ্য করাই হচ্ছে ইন্সাফের পথ। তাকে সর্বপ্রকার কর্মতৎপরতা থেকে বিরত রেখে ভগ্ন উৎসাহ করে দিয়ে স্বল্প যোগ্যতা সম্পন্ন লোকের সমপর্যায় করে দেয়া ঠিক নয়। আর অন্যায় পথে সম্পদ ব্যবহার থেকে বিরত রাখার বাহানা দেখিয়ে ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ রূপে মালিকানা অধিকার থেকে বঞ্চিত করাও সঠিক পথ নয়। কারণ সম্পদের অবৈধ ব্যবহারের চিকিৎসা সম্ভব। আর প্রয়োজনবোধে তার উপর হস্তক্ষেপ করেও তা থেকে বিরত রাখা যায়, কিন্তু ব্যক্তির মূল প্রেরণাকে ধ্বংস করে দেয়া কষ্মিনকালেও উচিত নয়।

মালিকানা সত্ত্বেও এহেন দর্শন দৃষ্টিভঙ্গির পরিণাম ফল হিসেবে ইসলাম মালিকানা হস্তান্তরের পন্থার মধ্যেও হস্তক্ষেপ করে। এ ব্যাপারে সে ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয় না। ক্রয়-বিক্রয় ও অন্যান্য চুক্তি এবং ইসলামের ওয়ারীসী ও অসীয়াতী আইন-কানুনের মাধ্যমে এ তথ্যটি উদঘাটন হয়। ইসলাম শুধু ব্যক্তিকে হাদীয়া উপঢৌকন এবং দানের বেলায়ই স্বাধীন করে দিয়েছে। সেখানে নিয়ম-কানুনের কোন বাধ্যবাধকতাই আরোপ করেনি। ব্যক্তিকে সে নিজের জীবনে স্বীয় ধন-সম্পদ নিজ ইচ্ছামত যাকে ইচ্ছে দান করার পূর্ণ অধিকার ও স্বাধীনতা দান করেছে। ইসলামের এ অবকাশ দান করার কারণ হচ্ছে যে, মানব স্বভাব নিজেই একটি প্রতিবন্ধকতা রূপে প্রতীয়মান হয়। ব্যক্তি সে নিজের সম্পদের একটি অংশ হাদীয়া বা দান করে। এতে ওয়ারীসের কোনই ক্ষতি সাধন হয় না। আর অসীয়াত করার বেলাও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। এখানে যদি সে নিজ সম্পদ অপব্যয় করে তবে ইসলাম তাকে অপব্যয়কারী ঘোষনা দেয় এবং তার উপর আইনগত বাধ্য-বাধকতাও আরোপ করতে পারে।

অর্থাৎ স্বীয় মালিকানার মধ্যে ব্যয় করার অধিকার থেকেও তাকে বঞ্চিত রাখা যায়।

মালিকের দখল স্বত্ব উঠে যাওয়া এবং তার মৃত্যুর পর ওয়ারীসদের মধ্যে এবং যাদের বেলায় অসীয়ত করেছে তাদের নিকট সম্পদ হস্তান্তরিত হওয়া এমন একটি নির্দিষ্টতম আইন-কানুনের পদ্ধতিগত ভিত্তিতে সম্পন্ন হয় যারমূল কারণ রহস্য সম্পূর্ণ আলাদা। সুতরাং যেমন কোন ওয়ারীসদের বেলায় অসীয়াত বৈধ হয় না, অনুরূপ এক তৃতীয়াংশের বেশী সম্পদ দানের ও অসীয়াত করতে পারবে না। এ বিষয় ইতিপূর্বে আমি বিশদ আলোচনা করেছি। ইসলাম অসীয়াত করার অনুমতি বিশেষ করে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই দান করেছে। কোন কোন সময় এমনো হয় পড়ে যে, এমন অতি নিকটতম আত্মীয়-স্বজন ওয়ারীস থেকে বঞ্চিত হয় যাদের কিছু সম্পদ পাওয়াটা আত্মীয়তার সম্পর্কেরই স্বাভাবিক দাবি। কিন্তু আত্মীয়তার ক্ষেত্রে এমন হয়ে পড়ে যে, অন্যান্য ওয়ারীসগণ তাদের পর্যন্ত ওয়ারীসী সম্পদ পৌঁছানোর পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এ দিক দিয়ে অসীয়াত এক ধরণের দানেরই শামিল।

ওয়ারীস সূত্রে ধন সম্পদ এমন সব নিয়ম-কানুন অনুযায়ী হস্তান্তরিত হয় যার আলোচনা মিরাসের আয়াত সমুহে করা হয়েছে। অংশীদারত্বের ব্যাপারে যে সকল সাধারণ আইন-কানুন অনুসরণ করা হয় তা হচ্ছে এই যে একজন পুরুষ দু'জন রমণীর সম পরিমাণ পাবে। এ নীতিটির পিছনে কি গূঢ় রহস্য নিহিত রয়েছে, তা আমি ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। পিতৃব্যের আত্মীয়তার সূত্রে যারা ওয়ারীস হয়, তারা মাতৃত্বের আত্মীয়তার সুত্রে তাদের উপর ওয়ারীস হবার বেলায় প্রাধান্য পায়। আবার কোন কোন সময় মাতৃত্বের আত্মীয়গণও অনেক বেশী অংশের মালিক হয়। দায়িত্বশীলতার দিক দিয়ে স্বত্বকে বন্টন করার নীতিই এ দু'-এর মধ্যে ব্যবধান ও পার্থক্যের অন্যতম কারণ। কেননা পিতার দিক দিয়ে যারা ওয়ারীস হয়, মৃত্যু ব্যক্তির বেলায় তাদের উপর অধিকতর দায়িত্ব চাপিয়ে থাকে। এমনিভাবে পরিবারের মধ্যে ছেলে দাদা-দাদীর অংশ আলাদা করে দেবার পর সমুদয় সম্পদের মালিক হয়। কেননা প্রয়োজন হলে পিতার জীবদ্দশায়ই তার লালন-পালন ও ব্যয়ভার তার দায়িত্বই থাকে। আপন ভাই বিমাতা ভাইকেও ওয়ারীস হওয়া থেকে বঞ্চিত করে। কারণ আপন ভাই যদি আয় উপার্জন করতে অক্ষম হয় তবে তার লালন-পালন ও যাবতীয় ব্যয় ভার তার দায়িত্বেই অর্পিত হয়। সুতরাং আপন ভাই-ই ওয়ারীস হবার অগ্রাধিকারী। এমনিরূপে ইসলামের এহেন মিরাসী নিয়ম-কানুনের মধ্যে একটি ন্যায়ানুগ ইন্‌সাফপূর্ণ বন্টন ব্যবস্থা দ্বারা উপকার ও দায়িত্বশীলতা এবং অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে একটি যথাপোযুক্ত ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

ইসলামের ওয়ারিসী নিয়ম-কানুনের যৌক্তিকতা এবং তার সুদুর প্রসারী প্রভাব সম্পর্কে আমরা সামাজিক জীবনের পারস্পরিক দায়িত্বশীলতা অথবা আত্মীয়তার এবং বিভিন্ন বংশের মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ় করণের অন্যান্য নীতি সমুহের সাথে এ আইনের কি সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে, তাও উল্লেখ করেছি। আর এ বিধানাবলী ব্যক্তি ও সমষ্টি তথা সমাজের কল্যাণ ও প্রয়োজনাবলী এবং স্বভাব প্রকৃতির প্রবণতার সাথে কিরূপে সামঞ্জস্য বিধান করে তাও বর্ণনা করেছি।

এখন আমরা ওয়ারিসী ব্যবস্থাপনার সেই সকল যুক্তিকতার প্রতি আলোক পাত করতে যাচ্ছি, যা বিশেষভাবে সামাজিক জীবনের সাথে ওৎপ্রোত ভাবে জড়িত।

উপরে আমরা এ কথাও উল্লেখ করেছি যে ইসলাম সম্পদকে জমা করে রাখা এবং একটি শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাওয়াকে আদৌ সমর্থন করে না। আর ইসলামের ওয়ারীসী বিধান পুরুষানুক্রমে পঞ্জীভূত সম্পদকে সুষমভাবে বন্টনের একটি অন্যতম কার্যকরি উপায়। বস্তুতঃ এ বিধান অনুযায়ী একজন মালিকের মৃত্যুর পর তার সমুদয় সম্পদ তার একাধিক সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয় -স্বজনের মধ্যে হস্তান্তরিত হয়ে ছোট ছোট ও মধ্যম শ্রেণীর অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মিরাসী আইন থাকা সত্ত্বেও মালিকানা বিভক্ত হয় না, এমন অবস্থা খুব কমই হয়। যদি কোন ক্ষেত্রে দু' একটি অবস্থা কদাচিৎ প্রকাশও পায়, তবে তার জন্য কোন আইন রচনা করা সম্ভব নয়। (যেমন এক ব্যক্তি শুধু একটি ছেলে রেখেই মৃত্যু বরণ করলে তার সমুদয় সম্পদের মালিক ঐ ছেলেই হয়। কেননা মৃত্যু ব্যক্তির পিতা-মাতা স্ত্রী কন্যা বলতে কেউই জীবিত নেই, সুতরাং সে একাই তার মালিক।

আমরা যখন ইসলামের এহেন বিধানকে অন্যান্য বিধানের সাথে তুলনা করি: –যেমন ইংরেজদের বিধানে মৃত ব্যক্তির পরিত্যাক্ত সমুদয় সম্পদের মালিকানার অধিকারী তার বড় ছেলেকেই করা হয়, তখন আমাদের সামনে ইসলাম যে পঞ্জীভুত সম্পদকে ছোট ছোট অংশে বন্টন করে, তার মূল রহস্য প্রতিভাত হয়ে উঠে। ইসলামের ওয়ারীসী বিধানে ওয়ারীসদের মধ্যে আদল ইন্‌সাফের পানে যে লক্ষ্য রাখা হয়েছে সে ইন্‌সাফ প্রতিষ্ঠা একমাত্র এহেন বন্টন নীতির উপরই নির্ভরশীল। ইসলামের ইনসাফ শুধু বড় ছেলের বেলায় নয়, বরং মৃত ব্যক্তি ও নিকটতম সকল আত্মীয়দের জন্য।

সম্পদ বৃদ্ধির উপায়

ধন সম্পদের মালিকানার ব্যাপারে ইসলাম যে নীতিমালা ঘোষণা করেছে তার অধীনেই যে ধন-সম্পদ দ্বারা আরো অধিক পরিমাণে সম্পদ অর্জনের এবং তা ব্যবহার করার নিয়ম-কানুনের মধ্যে সে হস্তক্ষেপ করে। সে মালিককে এ ব্যাপারে তার ইচ্ছে মত চলার স্বাধীনতা দান করে না। কেননা ব্যক্তি স্বার্থের পাশে পাশেই সেই সামাজিক স্বার্থের প্রতি মনযোগী হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়, যার সাথে ব্যবহারিক জীবনে সে ওৎপ্রোত ভাবে বিজড়িত। সুতরাং ধন-সম্পদ দ্বারা মুনাফা অর্জনের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই পূর্ণ স্বাধীনতা ইসলাম স্বীকার করে বটে। কিন্তু আল্লাহর আইন কানুন দ্বারা নির্ধারিত সীমারেখার পরিমণ্ডলের মধ্যে অবস্থান করে হতে হবে। জমি চাষাবাদ করা ধাতব পদার্থ দ্বারা শিল্পজাতীয় দ্রব্যাদী তৈয়ার করা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সমূদয় উপায়ই তার জন্য গ্রহণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা বিদ্যমান। শর্ত হচ্ছে আল্লাহর আইনের সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করে হতে হবে।

এ জন্যই ইসলাম কারবারের মধ্য ধোকাবাজী ও প্রতারণার প্রশ্রয় নেয়া; স্যাধারণ মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাবার অপেক্ষায় জমা করে রাখা অথবা সুদের ভিত্তিতে সম্পদ ঋণ দেয়া কিম্বা শ্রমিকদের মজুরী প্রদানের বেলায় জুলুম অত্যাচারের আশ্রয় নিয়ে নিজের মুনাফা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি অবৈধ উপায়কে সে হারাম করে দিয়েছে। সম্পদ বৃদ্ধির জন্য ইসলাম শুধু পাক পবিত্র ও ইন্‌সাফ ভিত্তিক পন্থাকেই বৈধ ঘোষণা দেয়। বৈধ ও ন্যায়ানুগ পথের বিশেষত্ব হচ্ছে যে, সম্পদ যাতে শ্রেণীভেদে ক্রমিক পর্যায় বৃদ্ধি পেতে থাকে এতটুকু সীমারেখা পর্যন্ত উপনীত হবার সুযোগ তাকে দেয় না। বর্তমান যুগে আমরা যে, সম্পদের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি অবলোকন করছি তার আসল কারণ হচ্ছে কারবারে প্রতারণা ও ধোকাবাজীর আশ্রয় নেয়া; তা সুদের ভিত্তিতে পরিচালনা করা; আর শ্রমিকদের হক নষ্ট করা এবং সাধারণ মানুষের দৈনান্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী জমা করে রাখা, চুরি ডাকাতি ও পকেটমারী ইত্যাদি কাজ তা এমনিই অপরাধ। অথবা বর্তমান যুগে সম্পদ বৃদ্ধি করণের যে সকল প্রসিদ্ধ উপায় রয়েছে, তার মধ্যে তা সবই বর্তমান পাওয়া যায়। ইসলাম সম্পদ বৃদ্ধির জন্য এ ধরণের খারাপ পথ অবলম্বনের অনুমতি কখনো দেয় না। আসুন এখন আমরা সম্পদ বৃদ্ধির নিয়ম-নীতি নিয়ে বিশদ আলোচনা করি।

১। ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অসাধুতাকে হারাম ঘোষণা করে
ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্য ও কাজ কারবারের মধ্যে ধোকাবাজী ও প্রতারণাকে সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করেছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّىْ

"যে ব্যক্তি কাজ কারবারে ধোকাবাজী করে সে আমার অনুগামী নয়।"

اَلْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَافَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِىْ بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحَقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ـ

"ক্রেতা ও বিক্রেতা যত সময় পর্যন্ত একে অপর থেকে দূরে-চলে না যায় ততসময় পর্যন্ত তাদের জন্য সদায় করা না করার স্বাধীনতা রয়েছে। যদি তারা সততা ও সাধুতার আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে তাদের কাজের ভিতর বরকত হবে। আর যদি মালের দোষক্রটিকে গোপন রাখার পথ অবলম্বন করে, ও মিথ্যার আশ্রয় নেয় তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয় কাজ থেকে বরকত উঠিয়ে নেওয়া হবে।"

(বুখারী, মুসলিম)

এ হাদীসটিতে আপনাকে ক্রয় বিক্রয় করার পূর্ণ স্বাধীনতা দান করা হয়েছে। অবশ্য শর্ত রাখা হয়েছে যে, যেমন মালের মধ্যে কোনরূপ ধোকা বাজীর আশ্রয় গ্রহণ করা যাবে না, তেমনি করা যাবে না মূল্যের বেলায়। যদি কোন বস্তুতে দোষক্রটি থাকে, তবে তা বিক্রয়ের সময় বলতে হবে। নতুবা আপনি ধোকাবাজ সাব্যস্ত হবেন। আর আপনি এ ক্ষেত্রে যে মুনাফা অর্জন করবেন তাও হারাম হবে। এ হারাম মুনাফাকে যদি আপনি দান করেও দেন, তথাপিও আপনি আল্লাহর নিকট জবাবদিহি থেকে রেহাই পাবেন না। কারণ আপনার আমল নামায় সেই দান খয়রাতই লেখা হবে, যা আপনি হালাল মাল থেকে দান করেছেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন– "তিনি এরশাদ করেছেন– কোন ব্যক্তি হারাম পথে ধনসম্পদ উপার্জন করে তা থেকে দান করবে, আর তা আল্লাহ তায়ালা কবুল অথবা তা থেকে ব্যয় করবে এবং তাতে বরকত হবে, এমনটি কখনো হতে পারে না। এমন ধন সম্পদ রেখে যদি সে মৃত্যু বরণও করে যায়। আল্লাহ তায়ালা কখনো গুনাহর ক্ষতিপুরণ গুনাহর কাজের দ্বারা করেন না। বরং গুনাহকে নেক কাজের দ্বারা বিদুরিত করেন। অপবিত্রতা কখনো অপবিত্রতার দ্বারা দূর করা যায় না। (মিশ্‌কাতুল মাসাবীহ)

আর একটি হাদীসে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন যে, হারাম ভক্ষণ করে যে শরীয় গঠন হয় , তা কখনো পুষ্টি সাধন হয় না। বরং তার আসল ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। (তিরমিযী, নাসাই)

এ ব্যাপারে ইসলাম যে নীতি গ্রহণ করেছে, তা তার মৌলিক নীতিমালার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। সে সর্ব প্রকার ক্ষতি সাধনের পথ বন্ধ করা এবং মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতির অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যকেও এখানে নিজের সামনে রাখে। তাই যদি বিচার করা হয়, তবে ধোকাবাজী ও প্রতারণা দ্বারা একদিকে যেমন অন্তরে কালিমা পড়ে যায়, অন্য দিকে তা দ্বারা পরিশেষে সমাজ জীবনে এমন একটি শূন্যতার সৃষ্টি হয় যে, মানুষ একে অপরের উপর থেকে আস্থা ও বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলে। আর এ কথা ধ্রুব সত্য যে, সমাজ জীবনে পারস্পরিক আস্থা স্থাপন ব্যতীত কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাহায্য সহানুভূতির কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। আর ধোকাবাজী ও প্রতারণা দ্বারা যে অবৈধ উপায় পরিশ্রম ব্যতিরেকে ধন-সম্পদ অর্জন করাই যে মূল উদ্দেশ্য তা বলাই বাহুল্য। অথচ ইসলামের সাধারণ বিধান হল চেষ্টা ও পরিশ্রম ব্যতীত কোন প্রতিদান নেই। এমনি ভাবে এমন কোন পরিশ্রম নেই যা বিফল হতে পারে এবং স্বীয় প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হতে পারে।

২। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের দ্রব্য-সামগ্রী আট্‌কিয়ে রাখা ইসলাম বিরুদ্ধ কাজ

মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী জমা করে রাখাকে ইসলাম ধন-সম্পদ অর্জনের এবং তা বৃদ্ধি করনের বৈধ পথ বলে কখনো স্বীকার করে না। বরং এ পথকে সম্পূর্ণরূপে অবৈধ ঘোষণা করেছে। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

“যে ব্যক্তি দ্রব্য-সামগ্রী উচ্চমূল্যে বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে আট্‌কিয়ে রাখবে, সে অপরাধী।” (মুসলিম, আবুদাউদ, তিরমিষী)

এর কারণ হলো যে, সম্পদ জমা করা বা আট্‌কিয়ে রাখা শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মারাত্মক সংকট ডেকে আনে। কেননা ইজারাদারগণ (Monopolist) অপর লোক তাদের ন্যায় দ্রব্য-সামগ্রী বাজারে আমদানী করুক বা শিল্প-দ্রব্য তৈয়ার করুক, তা কখনো চায় না। বরং তারা মানুষের থেকে নিজের ইচ্ছামতো মূল্য আদায় করার উদ্দেশ্যে বাজারের উপর নিজেদের নিযন্ত্রণ ও কণ্ট্রোল কামনা করে। ফলে মানুষ সর্ব প্রকার দুঃখ দৈন্যের করাল গ্রাসে নিপতিত হয়ে তাদের ভাণ্ডার পূর্ণ করে দিতে বাধ্য হয়। তাদের ন্যায় যাতে করে মানুষ ধন-সম্পদ আয় করতে পারে অথবা এ ব্যাপারে যাতে তারা পূর্ণ তৎপরতা

দেখাবার সুযোগ পায়;- সে সুযোগের পথকেও তারা বন্ধ করে দেয়। কোন কোন সময় এও হয় যে, পুঁজিপতিরা ধন-সম্পদের স্তুপের উপর পূর্ণ রোষানলে সাপের ন্যায় ফনা ধরে বসে থাকে এবং কোন না কোন পন্থায় মানুষের উপর বিশেষ একটি বাজার দর চাপিয়ে দেবার নিমিত্ত অতিরিক্ত মাল ধ্বংস করে দেয়। এ কর্মনীতি প্রকাশ্য রূপে জীবন ধারণের সেই সামাজিক ভাণ্ডারকে বিনষ্ট করার পথ, যা আল্লাহ তায়ালা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন।

ধন-সম্পদ আয় করার এহেন অবৈধ পথকে বন্ধ করার বেলায় ইসলাম অত্যাধিক পরিমাণে গুরুত্ব দান করেছে যে, দ্রব সামগ্রী জমাকারী বা আট্‌কিয়ে রাখাকারীকে দ্বীনের গণ্ডী থেকে বহিস্কৃত হওয়ার অপরাধ বলে আখ্যা দিয়েছে। হাদীস শরীফে ঘোষণা হচ্ছে ঃ

مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللّٰهِ بَرِئَ اللّٰهُ مِنْهُ ـ

"যে ব্যক্তি খাদ্য-দ্রব্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীকে চল্লিশ দিন যাবৎ আট্‌কিয়ে জমা রাখে আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই এবং আল্লাহ তায়ালারও তার জন্য কোন উৎকণ্ঠা নেই।" (মস্‌নদে আহ্‌মদ)

যে ব্যক্তি সমাজের শত্রুতা করনে এতখানি এগিয়ে যায় যে, স্বীয় ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এবং নিজের ধন-সম্পদ বাড়ানোর খাতিরে সামাজিক স্বার্থে আঘাত হেনে জন-জীবনে একটি কল্পিত ভীতি ও ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে, এমন ব্যক্তিদেরকে মুসলমান বলে সমর্থন করা যায় না। তারা সমাজের দুশমন, রাষ্ট্রের তথা আল্লাহ রাসুলের দুশমন। তদের জন্য শাস্তির বিধান থাকা বাঞ্ছনীয়।

৩। সুদ ভিত্তিক কাজ কারবার কারা নাজায়েয।

সুদ ভিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজ কারবার ধন-সম্পদ আয় উপার্জনের একটি অবৈধ হারাম পথ; যাকে ইসলাম প্রকাশ্য রূপে ধন উপার্জনের নিন্দনীয় অবৈধ পন্থারূপে আখ্যা দিয়েছে। সে তার অনিষ্টতার বর্ণনা দিয়ে এ পথ গ্রহণকারীর ভয়াবহ পরিণামের কথা উল্লেখ করে বলেছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَاتَأْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُضٰعَفَةً وَاتَّقُو اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

"হে ঈমানদারগণ। দ্বিগুণ চৌগুণ করে সুদ খেয়ো না। দুনিয়া আখেরাতে মুক্তি পাবার নিমিত্ত আল্লাহকে ভয় করো।" (সূরা আলে ইমরাণ-১৩)

এখানে দ্বিগুণ চৌগুণ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রেখে সুদের সাধারণ নিয়ম নীতির বৈধতার সার্টিফিকেট দেয়া আসল উদ্দেশ্য নয়। বরং এখানে শুধু বাস্তব

অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তৎকালীণ যুগে আরবের মাটিতে যা কিছু বাস্তবে ঘটতো, তারই বিশদ আলোচনা। যেমন কুরআন মজীদের অন্য আয়াতে সুদ সম্পূর্ণরূপে হারাম উল্লেখ করে ঘোষণা হচ্ছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَايَقُوْمُوْنَ اِلَّاكَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ـ ذَالِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ـ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ـ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ ـ وَاَمْرُهٗ اِلَى اللّٰهِ ـ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ـ

"সুদ খোরদের অবস্থা হলো সেই ব্যক্তির ন্যায়, যাকে শয়তান (জ্বিন) তার নিজ প্রভাব দ্বারা মস্তিষ্ক বিকৃত করে পাগল বানায়। এর কারণ হলো যে তারা ব্যবসা বাণিজ্যের ন্যায় সুদকেও একটি ব্যবসা মনে করে অথচ আল্লাহ সুদের আদান-প্রদান করেছেন হারাম ও অবৈধ, আর ব্যবসা বাণিজ্যকে করেছেন হালাল ও বৈধ। সুতরাং এখন যারা আল্লাহর এ আদেশ মুতাবিক ভবিষ্যৎ জীবনে সুদের আদান প্রদান থেকে বিরত থাকবে, তারা পূর্বে যা কিছু নিয়েছে, তা তাদেরই থাকবে। (ফিরত দিতে হবে না) এ ব্যাপারে তাদের সমস্যা আল্লাহর উপর সোপর্দ। আর এখনো যারা এ আদেশের পর সুদের আদান প্রদান পূর্ববৎ বহাল রাখবে, তারা জাহান্নামী। জাহান্নামই হবে তাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান।" (সূরা বাকারা–২৭৫)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ـ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ـ لَاتَظْلِمُوْنَ وَلَاتُظْلَمُوْنَ ه

عَنْ جَابِرٍ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰكِلَ الرِّبٰوا وَمُوْكِلِهٖ وَكَاتِبِهٖ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ - (مسلم)

"হযরত জাবির (রাঃ) বলেন রাসূলে করীম (সাঃ) সুদ খোর ও সুদ দাতা আর সুদের দলিল দস্তাবীজ লেখার মুহুরী এবং তার সাক্ষ্যদানকারী সকলের প্রতিই অভিশাপ দিয়েছেন। আর বলছেন, তারা সকলেই সমান অপরাধী। (মুসলিম)

এ সব ব্যাপারে ইসলাম সেই সকল মৌলিক বিধান মতেই কাজ করে যা সে ধন-দৌলত নৈতিকতা এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণের বেলায় তার সামনে রয়েছে। তার মতে ব্যক্তির হাতের সম্পদ হচ্ছে একটি আমানত বিশেষ। সে ব্যক্তিকে এ সম্পদের উপর সমাজের পূর্ণ স্বার্থ রক্ষার জন্য তাঁকে পাহারাদার রূপে নিয়োজিত করে রেখেছে। মানুষের ক্ষতি সাধন করে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে তার এ দায়িত্বকে অবহেলা করার কোনই অধিকার নেই যে, সে তার প্রয়োজন মুহূর্তের অপেক্ষায় থাকবে। তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করবে, অথবা তারা মূল্য বাবাদ যা কিছু দেয়, তার চেয়ে অধিক মূল্য তাদের থেকে আদায় করবে। এ অধিকার ইসলাম কখনো তাকে দান করেনি। মানুষের প্রয়োজন বহু প্রকার হয়। কখনো খাদ্যের প্রয়োজন হয়, যার উপর জীবনের গাড়ী সামনে অগ্রসর হওয়া সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এমনি ভাবে রোগমুক্ত হবার নিমিত্ত ঔষধের প্রয়োজন হয়। আবার জ্ঞান অর্জন অথবা কোন প্রয়োজনীয় কাজের জন্য উৎপন্ন দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এমনিভাবে হয়ত সমুদয় কাজ এমনিই পড়ে থাকবে অথবা ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর উপর নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি চালায়ে তাদেরকে অল্প দান করে অনেক বেশী পরিমাণে তাদের থেকে আদায় করবে এবং তাদের পরিশ্রম লব্ধ মজুরী যথার্থরূপে না দিয়ে দাবিয়ে রাখবে। আর গরীব বেচারারা শুধু কেবল হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম করেই জীবনটি অতিবাহিত করবে। ফলে অবস্থা এ দাঁড়াবে যে, হয়ত তাদের সমগ্র আয় উৎপন্ন সুদ দানের বেলায় সুদখোরদের জন্য নিয়োজিত থাকবে, অথবা বছরের পর বছর ধরে তাদের ঋণের বোঝা বাড়তেই থাকবে।

ধন কুম্ভীরদের প্রয়োজন অতিরিক্ত সম্পদ, যার দ্বারা তারা মুনাফা অর্জন করে, আসলে তারা কিছুই করে না, মুলধন বহাল তবিয়াতেই থাকে। আসলে এটা

হচ্ছে সমাজের দরিদ্র শ্রেণী লোকদের শরীরের সেই ঘর্ম ও রক্তধারা , যা তারা পূর্ণ পাশাবিকতার সাথে বসে বসে আস্তে আস্তে লোভাতুরদের ন্যায় চোষণ করতে থাকে।

ইসলাম শ্রমের যে মান মর্যাদা ও মহত্ব দান করে তাকে মালিকানা ও মুনাফা লাভের মূল প্রাণের বস্তুতে পরিণত করে দিয়েছে, সে তা কখনোই বৈধ মনে করে না। হাত-পা গুঠায়ে যারা বসে থাকে, তারাই সম্পদের স্বত্ববান হবে অথবা ধনের জন্ম দিবে। এটা ইসলাম সমর্থন করে না। একমাত্র শ্রমই ধন-সম্পদ জন্ম দিতে পারে। অন্যথায় ঐ সম্পদ সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়। ইসলাম ব্যক্তির নৈতিক পবিত্রতা এবং সামাজিক জীবনে পারস্পরিক মিল-মহব্বত সৌহার্দ্য ভ্রাতৃত্ব উভয়কেই পূর্ণ গুরুত্ব সহকারে সামনে রাখে। আসলে কোন ভদ্র সম্ভ্রান্ত শরীফ লোক সুদ খোরদের মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দিতে পারে না এবং তাদের সাথে মিশে থাকতেও পারে না। আর এটাও সম্ভব নয় যে, কোন সমাজ সাধারণ ভাবে সুদের অভিশাপে ভরপুর হয়ে যাবে এবং সে সমাজের লোকদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্বও বর্তমান থাকবে। এ দু'টি দ্বিমুখী বস্তু, কোন ক্রমেই তা একই সাথে কোন সমাজে বর্তমান থাকা সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি আমাকে শুধু এ উদ্দেশ্যে একটি টাকা ধার দেয় যে, আমার থেকে দু'টাকা আদায় করবে সে শত্রু ছাড়া বন্ধু কোন ক্রমেই হতে পারে না। আমার অন্তর কখনোই তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। আর তার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসাও আমার অন্তরে স্থান পাওয়া সম্ভব নয়। শত্রু যেমন বন্ধুরূপে এসে থাকে, আমাদের বেলায় তারও একই অবস্থা। পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতি হচ্ছে ইসলামী সমাজের মৌলিক নীতিমালা সমূহের মধ্যে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নীতি। আর সুদ প্রথা তার প্রতি সম্পূর্ণরূপে বৈরিতা ও শত্রুতার ভূমিকা পালন করে। সে ইসলামের এ মৌলিক নীতিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। আর এ কারণেই ইসলাম তার কঠোর নিন্দা করে।

ইসলামে সুদ প্রথাকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ও বেআইন ঘোষণা করার পিছনে আর একটি এমন রহস্য নিহিত রয়েছে, যা বর্তমান যুগে আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়ে উঠছে। এর পূর্বে এ রহস্য ভেদের কথা আমাদের জ্ঞাত ছিল না। তা হচ্ছে সুদ প্রথা এমনি একটি কারবার, যার দ্বারা পুঁজি অপরিমিত ভাবে অস্বাভাবিক রূপে বৃদ্ধি পায়। পুঁজির ভিতর এ বৃদ্ধি কোন চেষ্টা তদবীরের ফল নয়। আর তা শ্রমলব্ধ আয়ও নয়। সুদের এহেন বৈশিষ্টতা এমনিই যে, হাত-পা

গুঠিয়ে অকর্মণ্য হয়ে বসে থাকা একটি শ্রেণীকে সম্পদ বাড়ানোর এমন একটি সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয়, যার উপর তারা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হয়। ফলে এ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে অকর্মন্যতা দুর্বলতা বেহুদা বিলাসিতা ও বিভিন্ন প্রকার দুষ্কর্মের প্রসারতা দেখা দেয়। এ সকল কাজ সমুদয়ই সেই সব মেহনতী জনতা, যারা সর্বদাই ধন-সম্পদের মুখাপেক্ষী থাকে, দরিদ্রতার অভিশাপে জর্জরিত হয়ে অপারগ অবস্থায় সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করে, তাদের উপর ভর করেই তাদের কাজ সম্পন্ন করতে হয়। এমনিভাবেই দু'টি বীভৎস পূর্ণ সামাজিক ব্যাধি মাথাচাড়া দিয়ে উঠে যার প্রথমটি হচ্ছে, পুঁজি অপরিমিত ও অস্বাভাবিক রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া। আর অপরটি হচ্ছে মানবতার দু'টি মহান ও উন্নত শ্রেণীর মধ্যে দিন দিন এমন বিরাট ব্যবধান ও পার্থক্য সৃষ্টি হওয়া, যা কোন একটি বিশেষ সীমায় গিয়ে থেমে যাওয়ার নামও উল্লেখ করে না। উপরন্তু সমাজের বুকে এমন একটি দুর্বল অলস ও অকর্মন্য শ্রেণীর সৃষ্টি হয়, যারা বিলাসিতা ও আরাম প্রিয়তা ছাড়া আ কিছুই জানে না। দুনিয়ার সমগ্র নিয়ামত বসে বসেই তারা আহরণ করে। মনে হচ্ছে যেন তাদের সম্পদ অধিক সম্পদ উপার্জনের একটি ফন্দিজাল বিশেষ। এ জাল এমন গুণ বিশিষ্ট জাল যে, তার দ্বারা শিকার ধরতে কোন প্রকার খাদ্য-দ্রব্য ছড়িয়ে দেয়ার প্রয়োজন করে না। দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা নিজ ইচ্ছায় ঝাকে ঝাকে পঙ্গপালের ন্যায় উড়ে এসে এ জালে জড়িয়ে পড়ে। প্রয়োজনই তাদেরকে গলা ধাক্কা দিয়ে সামনের দিকে নিয়ে আসে এবং তারা নিজ পায়ে এসেই এ ফন্দি জালে আট্‌কে পড়ে।

আসলে সুদ প্রথা ইসলামী দর্শন ও ধ্যান-ধারণার মৌলিক নীতির সাথে সম্পূর্ণরূপে একটি সংঘর্ষশীল প্রথা। ইসলামী নীতিতে সম্পদের সার্বভৌম মালিকানা আল্লাহ তায়ালাকে স্বীকার করে মানুষকে সেখানে শুধু একটি শর্তাধীনে প্রতিনিধির মর্যাদা দান করা হয়েছে। আর এ নীতির নির্ধারক হয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। মানুষ তার মন মতো যা ইচ্ছে তাই করবে– এমন নয়।

সুদ ভিত্তিক অর্থনীতির মূল দর্শন ও ধ্যান-ধারণা হচ্ছে যে, মানব জীবন আর আল্লাহ তালার ইচ্ছা ও মর্জির মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। এ পৃথিবীর সার্বভৌম মালিক হচ্ছে মানুষ। আল্লাহ তালার সাথে কৃত কোন অঙ্গীকার পালনে তাঁরা বাধ্য নয়। আর তাদের জন্য আল্লাহর আদেশ নিষেধ ও বিধানাবলীর অনুগত থাকাও জরূরী নয়। ব্যক্তি সর্বদিক দিয়ে সম্পূর্ণরূপে আযাদ। সে যে রকম ইচ্ছে সেই রকম ধন-সম্পদ আয় করতে এবং তা বৃদ্ধি করতে পারবে। এ ব্যাপারে

তার নিকট কোন ন্যায় নীতির বালাই নেই। নেই কোন আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষার বাধ্যবাধকতা। আর নেই কোন তার উপর আরোপিত শর্তসীমার আনুগত্যতা। অপরের স্বার্থের পানে লক্ষ্য রাখার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই; সে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও স্বাধীন। তার নিজস্ব ধন-ভাণ্ডার বৃদ্ধি করেন যদি লাখো কোটি মানুষের ক্ষতি সাধন হয়, বা তাদের দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় তবু তাতে তার কোনই পরওয়া নেই, সে নির্ভীক নির্দয়। এ ব্যাপারে যদিও মানব রচিত আইন-কানুন কখনো কখনো আংশিক রূপে সুদের হার সীমায়িত করে দিয়ে, ধোকাবাজী প্রতারণা, জোড়-জবরদস্তী ও কষ্টদায়ক ইত্যাদির বিভিন্ন কতিপয় অবস্থাকে নিষিদ্ধ করে বটে; কিন্তু এহেন হস্তক্ষেপের সীমানা মানুষের ইচ্ছা অধিকার ও লোভ লালসার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। আল্লাহর সনদ প্রাপ্ত কোন নির্দিষ্টতম নিয়ম নীতির অধীনে তা সম্পন্ন হয় না। মোটকথা এখানে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের কোন প্রকারই দখল থাকে না। যা কিছু করা হয়, তা মানুষের ইচ্ছা ও মর্জি মাফিকই হয়।

উপরন্তু তার অভ্যান্তরে একটি ক্রটিপূর্ণ ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ধ্যান ধারণাও কার্যরত রয়েছে। আর তা হলো কোন না কোন উপায়ে ধন-সম্পদ অর্জন করে কুবৃত্তি নিচয়ের ইচ্ছা মাফিক তার থেকে লাভবান হওয়া। আর এ কারণেই ব্যক্তিকে ধন-সম্পদ অর্জন করার এবং তা থেকে লাভবান হবার কাজে সর্বদাই ব্যাপৃত থাকতে দেখা যায় এবং এ পথে তারা প্রত্যেকটি নিয়ম-কানুন ও অপরের প্রত্যেকটি স্বার্থ পদদলিত করেতে আদৌ কোন কুণ্ঠাবোধ করে না। পরিশেষে তার দ্বারা এমন একটি রীতি-নীতি ও ব্যবস্থাপনার সৃষ্টি হয়, যা মানবতাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে এবং ব্যক্তিগত সমাজগত, জাতিগত ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের প্রত্যেকটি স্তরে গুটিকয়েক সুদখোরদের স্বার্থের খাতিরে মানবকুলের জীবনকে নিরানন্দ ও নিরাশ করে ফেলে। এ ব্যবস্থা মানব জীবনকে নৈতিক আধ্যাত্মিক ও সম্প্রদায়িক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের বিবর্তনশীলতা এবং মানব জীবিকার যথার্থ উন্নতিকে অসম্ভব রূপে ব্যাহত করে। পরিশেষে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বর্তমান যুগের পরিণতির ন্যায় এ হয় যে, সমগ্র মানবতার উপর আসল প্রভুত্ব ও ক্ষমতা এবং বাস্তব স্বাধীনতা কতিপয় খারাপ হীন প্রকৃতি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের হাতের মুঠায় কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। আল্লাহর সৃষ্টি জগতের এহেন হীন প্রকৃত সম্পন্ন লোকেরা মানুষের প্রতি বিন্দু বিসর্গ পরিমাণও খেয়াল রাখে না। তাদের বেলায় কোন দায়িত্ব আছে বলেও তারা মনে করে না। তারা না

রাখে কোন ওয়াদার মর্যাদা, আর না আছে তাদের মধ্যে মানবিক মূল্যমানের প্রতি কোন মর্যাদাবোধ। তরা এমনি ব্যক্তি, যারা ব্যক্তিকে যেমন ঋণ দেয় তেমনি নিজ দেশকে অপর দেশকে বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্র সমূহকেও ঋণ দেয়। সমগ্র মানবতার পরিশ্রমের আসল উৎপন্ন এবং মানুষের ঘর্ম ও রক্ত মিশ্রিত শ্রমের পরিণাম ফল চতুর্দিক থেকে সঙ্কুচিত হয়ে সুদের আকারে তাদের পদতলে এসে জমাহয়, যা উৎপন্ন করতে তারা বিন্দুমাত্র শ্রম ব্যয় করেনি। তারা শুধু কেবল ধন-দৌলত ও সহয় সম্পদের মালিক হয় না। বরং প্রভাব প্রতিপত্তি ও ক্ষমতাও লাভ করে। যেহেতু এ লোকেরা কোন নিয়ম-নীতি ও নৈতিকতার ধারক বাহক নয় এবং তাদের নিকট কোন নৈতিক ও ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা বলতে কিছুই নেই। উপরন্তু তারা ধর্মীয় ও নৈতিক এবং ন্যায় নীতির কথা সম্পূর্ণরূপে ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করে। অতএব তারা যাতে করে অধিক মুনাফা ও অত্যাধিক ধন-সম্পদ উপার্জন করতে সুযোগ পায়, সেই ধরণের অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য এবং তার অনুকুলে মানুষের মন-মগজের গঠন ও চিন্তাধারার প্রসারতা কল্পে এবং নিজেদের সুযোগ মাফিক রীতি-নীতি প্রচলিত করার মানসে নিজেদের সমুদয় প্রভাব প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা ব্যবহার করে। নিজেদের অবাঞ্ছিত লোভ-লালসা এবং অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার পথে তারা কোথাও দমে যায় না। সব চেয়ে বড়কথা হচ্ছে যে, মানুষের চরিত্র যদি খারাপ হয়, আর তারা আরাম আয়েশ ও বিলাসিতা এবং কুবৃত্তি নিচয়ের আনুগত্যের এমনরূপ মোহিত হয়ে পড়ে যে, তার জন্য বহু লোকই নিজের শেষ সম্বলটুকু ব্যয় করার জন্য প্রস্তুত হয়।

আর তাদের টাকা পয়সাগুলো তাদের পকেটে এসে যায় যারা তাদের জন্য এই সমস্ত চক্রান্ত জাল বিস্তার করে রেখেছে। সাথে সাথে তারা পৃথিবীর অর্থনৈতিক কার্যাবলী ও সমস্যাসমূহ নিজেদের সীমিত স্বার্থ মুতাবিক যে রূপ ইচ্ছে, সেই রূপে পরিচালিত করে। ফলে তা পরিণতিতে গিয়ে বাজার দর মন্দা হওয়া এবং অর্থনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি হলেও তাতে তাদের কিছুই আসে যায় না। তাদের প্রভাব প্রতিপত্তির শেষ পরিণতি হিসেবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শিল্পসহ অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রী মানুষের স্বার্থ মুতাবিক ব্যবহার হবার পরিবর্তে সেই সকল ধন কুন্তর সুদ খোরদের স্বার্থের খাতিরেই ব্যবহার হয় যাদের হাতের মুঠোয় পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের মূল চাবিকাঠি থাকে।

বর্তমান যুগে পৃথিবীর সর্বত্র এমন একটি ট্রাজেডির সৃষ্টি হয়েছে, যা বর্বর জাহেলী যুগেও এত বড় বিকট আকার ধারণ করেছিল না। পুরানো কালেও কিছু

কিছু লোক এবং ধন-সম্পদশালী প্রতিষ্ঠানের আকারে সুদ খোর পাওয়া যেত। কিন্তু আজ বড় বড় ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টরগণই তাদের সুদ খাবার সেই ভূমিকা নিয়েছেন। তারা জগতের সাধারণ গরীব জনসাধারণকে এ ভুল পথে পরিচালিত করতে কৃতকার্য হয়েছে যে, সুদ ভিত্তিক অর্থনীতিই হচ্ছে স্বাভাবিক ও নির্ভূল অর্থনীতি। এটা তাদের জন্য কেবল আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সংস্থাসমূহের ভিতরে তাদের বিরাট প্রভাব প্রতিপত্তি থাকার কারণেই সম্ভবপর হয়েছে। দুনিয়ার সমগ্র যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এবং ট্রেনিং কেন্দ্র সমুহের উপর তাদেরই প্রত্যক্ষ পরোক্ষ দখল ও প্রভাব বর্তমান। পত্র পত্রিকা, পুস্তক-পুস্তিকা, স্কুল-কলেজ, ইউনিভার্সিটি, রেডিও সেন্টার, টেলিভিশন কেন্দ্র এবং সিনেমা ঘর সমূহের সর্বত্রই তাদের প্রভাব বিরাজ মান। ফলে এ অবস্থা দেখা দিয়েছে যে, এ সব সুদখোররা দুনিয়ার যে সকল গরীব জনসাধারণের রক্ত চুষে চুষে পান করছে এবং তাদের হাড়মাংস চাবিয়ে গুড়াগুড়া কর ফেলছে, তাদের মন-মগজে ও চিন্তাধারায় এ ধারণা সৃষ্টি করে দিয়েছে যে, অথনীতির একমাত্র সঠিক ভিত্তি হচ্ছে সুদ প্রথা। সুদ ছাড়া দেশের অর্থনীতি কিছুতেই চলতে পারে না। আর অন্য কোন ভিত্তির উপর নির্ভর করে অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রভুত পরিমাণে উন্নতি লাভ করলেও তাও এ সুদ ভিত্তিক অর্থনীতির বরকতেই বাস্তবে সম্ভবপর হয়েছে। তারা গণতান্ত্রিক জগতের মনের কোঠায় এ বিশ্বাস জন্মাতে সক্ষম হয়েছে যে, যারা সুদ প্রথাকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে চায়, তাঁরা খেয়ালী জগতে বিচারণ করছে। বাস্তব জগতের সাথে তাদের আদৌ কোন পরিচয় নেই। আর এ মতবাদের বুনিয়াদ শুধু নৈতিক দর্শন এবং এমন আদর্শের দাবিদার, যা বাস্তব জগতের সাথে আদৌ কোন সম্পর্কই রাখে না। তাদের মতবাদকে যদি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ দেয়া হয়, তবে সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামো চুর্ণ-বিচুর্ণ ও ধূলিস্যাত হয়ে যাবে।

অবস্থা এত দুরে গিয়ে গড়িয়ে পড়েছে যে, যারা বর্তমানে সুদ ভিত্তিক অর্থনীতির সমালোচনা করে তাদেরকে সেই সকল লোকেই ঠাট্টা বিদ্রূপের পাত্রে পরিণত করে চলছে, যারা সুদের বোঝার যন্ত্রণায় আজ জর্জরিত। এ বেচারাদের অবস্থা হচ্ছে তাই, যা সমগ্র জাঁহানের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাজমান, যাকে দুনিয়ার সুদ খোরেরা একটি অস্বাভাবিক অনুপযোগী এবং ভুল পথে পরিচালিত হতে বাধ্য করছে। এ ব্যবস্থার ফলে আজ তারা উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য ঘাটতি হয়ে থাকার সঙ্কটে নিপত্তি। এখন আর এ অর্থনীতি থেকে সমগ্র মানবতার জন্য

লাভবান বা উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়। বরং তা বর্তমানে নরখাদক নেকড়ে বাঘদের শিকারে পরিণত হয়েছে।

সুদ ভিত্তিক অর্থনীতিকে যদি নিছক অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ দিয়েও বিচার করা হয়, তবে তা সমাজের জন্য একটি সম্পূর্ণ মারাত্মক ক্ষতিকারক নীতি বলে অবশ্যই প্রমাণ হয়। এ অর্থনীতির অনিষ্টকারিতা এতদুর বেড়ে গেছে যে, তার ছায়াতলে লালিত-পালিত পাশ্চাত্যের সেই সকল প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদরাও আজ তার প্রাদুর্ভাবের সমালোচনায় সোচ্চার হয়ে উঠছে, যাদের শিক্ষা দীক্ষা সেই বিষাক্ত পরিবেশের মধ্যেই হয়েছে, যা ধনাঢ্যদের শহরগুলো সভ্যতা সংস্কৃতি চিন্তাধারা ও নৈতিকতার প্রত্যেকটি শাখায় সৃষ্টি করে রেখেছিল। সুদ ভিত্তিক এহেন অর্থনীতির উপর যারা শুধু অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে সমালোচনা করেছেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অগ্রগামী হয়েছে, জার্মানীর প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডক্টর সাখত। তিনি জার্মানীর রীচ ব্যাংক-এর গর্ভণরও ছিলেন। ১৯৫৩ সনে দামেস্কে এক বক্তৃতায় বলেছেন– "সে এল্‌জাবরার একটি হিসাব দ্বারা এ কথা প্রমাণ করতে পারেন যে, দুনিয়ার সমগ্র ধন-দৌলত নির্দিষ্ট কয়েক সুদ খোরদের হাতে চলে আসতে বাধ্য। এর কারণ হচ্ছে যে, সুদের ভিত্তিতে ঋণদাতা সর্বদাই লাভবান হয়। আর গৃহীতা হয়ে থাকে কখনো লাভবান, আবার কখনো ক্ষতির সম্মুখীন। আর এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, যারা সর্বদা লাভবান হয়, পরিশেষে যে সমগ্র সম্পদ তাদের হাতের মুঠায় চলে আসতে বাধ্য, তা এল্‌জাবরার হিসাব দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

তিনি বলেছিলেন, বাস্তব জগতে আজ এটাই ঘটতেছে। কেননা বর্তমানে দুনিয়ার অধিকাংশ সম্পদের আসল মালিক হচ্ছে কয়েক হাজার ব্যক্তি। অবশিষ্ট মালিকগণ এবং শিল্পপতিরা ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করেই কারবার চালায়। আর তাদের শ্রমিক মজুরসহ অন্যান্য লোক সেই সকল বিত্তবানদের বেতনভুগী কর্মচারী হিসাবেই থাকে যাদের পরিশ্রম লব্ধ ফল একয়েক হাজার ব্যক্তিরাই পায়।

সুদের অনিষ্টকারীতার বর্ণনা শুধু এখানেই শেষ নয়; সুদের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠার কারণে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মালিকদের মধ্যে সর্বদাই এক প্রকার টানা-হেঁচরা ও সংর্সষের সম্পর্ক এবং হার-জিতের লড়াই চলতে থাকে। সুদ খোররা যাতে করে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের তরফ থেকে সুদ নেয়ার প্রকট চাহিদা দেখা দেয় এবং সুদের হার

অধিক পরিমাণ বেড়ে যায়; সেজন্য তারা অধিক সুদ লাভের আশায় পুঁজি আটকিয়ে রাখে। তারা সুদের হার যখন অধিক মাত্রায় বাড়িয়ে দেয় তখন ব্যবসায়ী ও শিল্প কারখানার মালিকরা মনে করতে থাকে যে, এত অধিক হারে সুদ দিয়ে টাকা এনে কারবার করায় মুনাফা লাভ করার আশা করা যায় না। কারণ পুঁজির দ্বারা যা কিছু উৎপাদন করা হয়, তা সুদ আদায় করার পর নিজেদের জন্য কোনই মুনাফা অর্জন হয় না। যখন বাজারে এ অবস্থা দেখা দেয়, তখন উৎপাদন ক্ষেত্রে সেখানে শতকোটি শ্রমিক কার্যরত থাকলেও একটা মন্দাভাব দেখা দেয়; আর এ ক্ষেত্রে যা কিছু পুঁজি খাটানো হচ্ছে, তাতেও ভাটা পড়ে। মালিকরা উৎপাদনের হার কমিয়ে দেয়; আর মজুর শ্রেণী হয়ে পড়ে বেকার সমস্যার সম্মুখীন এবং জনসাধারণের ক্রয় শক্তিও ঘাটতে থাকে। অবস্থা যখন এ দাঁড়ায় এবং সুদখোররা যখন দেখতে থাকে যে, পুঁজির চাহিদা কমে গেছে অথবা শেষ হয়েছে, তখন তারা অপারগ হয়ে সুদের হার কমিয়ে দেয়। তারপর ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা নতুন-ভাবে সুদের ভিত্তিতে পুঁজি ঋণ নিজেদের শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কাজ কারবার পুনরায় জোরেসোরে আরম্ভ করে। এমনি ভাবে জগতের বুকে দ্রব্য মূল্যের বাজার মন্দা হওয়া এবং পুনরায় তা চরম আকার ধারণ করার অবস্থা একের পর এক আসতে থাকে। আর জনতা মুক বধীরদের মত ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে তার পানে তাকিয়ে নীরবে সহ্য করে যায়।

জগতে সমস্ত লোক তারা সুদ গ্রহণ করুক কিম্বা না করুক তাদের সকলকেই সুদ খোরদেরকে এ ধরণের পরোক্ষভাবে সুদ দিতে হয়। কেননা শিল্প কারখানা ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মালিকরা যে মূলধন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যবহার করে। তার সুদ ক্রেতাদের নিকট থেকেই সুদ যোগ করে মূল্য অধিক পরিমাণে বাড়িয়ে দেয়। এমনিরূপে সুদের বোঝা আল্লাহর সমগ্র বান্দাদের মধ্যেই বন্টন হয়ে যেন সুদখোরদের সুদয় টাকাই আদায় করে নেয়া যায়। রাষ্ট্র তার বিভিন্ন প্রকার উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের নিমিত্ত এবং সমাজের অন্যান্য কাজ করার জন্য বিভিন্ন ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠান থেকে যে ঋণ গ্রহণ করে, সে সুদও রাষ্ট্রের নাগরিকদেরই আদায় করতে হয়। এ সুদ আদায় করে নেয়ার জন্য বিভিন্ন প্রকার কর ও ট্যাক্সের হার বৃদ্ধি করে ঋণসহ সমুদয় অর্থ আদায় করার ব্যবস্থা বাধ্য হয়েই তাদের গ্রহণ করতে হয়। এমনিরূপ রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিকই সুদ খোরদেরকে এহেন জিজিয়া আদায় করার বেলায় সম অংশীদার। সমস্যা এখানেই শেষ হয় না; বরং এ ঋণের পরিণাম ফল সাম্রাজ্যবাদী রূপে দেখা দেয় এবং সামনে অগ্রসর হয়ে তা লড়াই ও যুদ্ধের রূপ নেয়।

ইসলামের মতে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মিটানোর জন্য ঋণ নেয়া হোক কিম্বা উৎপন্ন দ্রব্যের কাজে ব্যবহার করার জন্য নেয়া হোক, সকল প্রকার ঋণই সমান। কেননা সব ঋণই ব্যয় করার জন্য নেয়া হয়। ঋণ নেয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঋণ গ্রহীতা নিজ প্রয়োজন মতো সে তা ব্যয় করবে। সুতরাং তাকে মূলধন ছাড়া কিছু বেশী পরিমাণের দেয়ার জন্য বাধ্য করা কোনক্রমেই ইন্‌সাফের কথা হতে পারে না। সুযোগ ও সামর্থ্য হলে সে যে ঋণের মূলধন ফিরত দেয়, তা বলাই বাহুল্য। আর যদি উৎপাদন কাজের জন্য ঋণ নেয়া হয়, তবে তার দ্বারা যা কিছু মুনাফা হয়, তা আসলে উক্ত ব্যক্তির পরিশ্রমেরই ফল। সে যে ধন ঋণ এনেছিল তার নয়। কেননা শ্রম ছাড়া পুঁজি অচল হয়ে পড়ে। সুতরাং শ্রমই হচ্ছে মুনাফার আসল মালিক। এ জন্যই ইসলামে শ্রমের প্রতিই অধিক গুরুত্ব দান করা হয়েছে। পুঁজির দ্বারা মুনাফা অর্জন শুধু অংশীদারী ভিত্তিতে হয়ে থাকে; যেখানে লাভ লোকসান উভয়েরই সমভাগী হয়। এ কারণেই সুদকে কোন অবস্থাই বৈধ বলা যায় না। তাই ইসলাম যারা নিজেদের প্রয়োজন পুরানোর নিমিত্ত ঋণ চায়, তাদেরকে সর্বাবস্থায়ই ঋণ দেয়াকে অবশ্য কর্তব্য করে দিয়েছে। এখন যদি ঋণ গ্রহীতা ঋণ নেয়ার পর দরিদ্রতার মধ্যে নিপতিত হয়ে পড়ে, তবে তাকে সামর্থ্যবান হওয়া পর্যন্ত ইসলাম ঋণ দাতাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছে।

فَنَظِرَةٌ اِلٰي الْمَيْسَرَةِ

আমার মতে এ আয়াতে নির্দেশ মূলক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা– এ শব্দটি শর্ত উল্লেখ করার পর তার জবাবে বর্ণিত হয়েছে। পূর্ণ আয়াতটি এই–

وَاِنْ كَانَ ذُوْعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى الْمَيْسَرَةِ

“যদি ঋণ গ্রহীতা দরিদ্রতার মধ্যে নিপতিত হয় তবে তাকে সামর্থবান হওয়া পর্যন্ত সুযোগ দেয়া উচিত।” (সূরা বাকারা–২৮০)

এ আয়াতে এ শব্দটি ব্যবহার করে শুধু তা দ্বারা এ কাজের প্রতি উৎসাহ দানই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়; বরং এ নির্দেশের সাথে সাথে ইসলাম ঋণ গ্রহীতার সাথে কোমল ব্যবহার করা এবং ভাল রূপে তার সাথে চলা ফেরারও হেদায়ত দান করেছে। রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ

رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً سَمَحًا اِذَابَاعَ وَاِذَا اقْتَضٰى -

"যারা ক্রয় বিক্রয়ের ভিতর মন খোলা ও সততার আচরণ প্রদর্শন করে, আর ঋণের টাকা চাওয়ার বেলায় কোমল ব্যবহার প্রদর্শন করে এহেন ব্যক্তিদের প্রতি আল্লাহ্ তায়ালা স্বীয় রহমত ধারা বর্ষণ করেন।" (বুখারী, তিরমিযী)

ঋণ চাওয়ার বেলায় ভদ্রতা ও নম্রতা প্রদর্শনের দ্বারা ঋণ গ্রহীতার অন্তরে ঋণ দাতার প্রতি ভালবাসা মহব্বত অধিক পরিমাণে বেড়ে যায়। শুধু এটাই নয়; বরং তার মধ্যে যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি তা আদায় করার নিমিত্ত একটি প্রেরণাও সঞ্চার হয়। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ

مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُّنَجِّيَهُ اللّٰهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ اَوْ يَضَعْ عَنْهُ

"যদি কোন ব্যক্তি কিয়ামতের দিনের বিভীষিকা ও ভয়াবহতা এবং চাঞ্চল্যতা থেকে রেহাই পেতে চায়, তবে তার উচিত দরিদ্রতার মধ্যে নিপতিত ঋণ গ্রহীতার সঙ্কট দুরীভূত করা অথবা তার নিকট যা কিছু পাওনা রয়েছে, তার থেকে কিছু হার কমিয়ে দেয়া।" (মুসলিম)

مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِرًا اَوْ وَضَعَ لَهُ اَظَلَّهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّاظِلُّهُ =

"যে ব্যক্তি দরিদ্রতার মধ্যে নিপতিত ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে কিছু দিনের অবকাশ দান করেছে, অথবা নেয়া ঋণের মূলধন থেকে কিছু কম করে তাকে আল্লাহ্ তায়ালা কিয়ামতের দিন আরশের ছায়াতলে স্থান দিবেন :- যে দিন আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না।" (তিরমিযী)

এর বিপরীত আবার ইসলাম ঋণ গ্রহীতাকে তার ঋণ আদায় কল্পে সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা চরিত্র করাকে ফরজ করে দিয়েছে; যেন এর দ্বারা তার উপর যে ঋণের বোঝা চেপে রয়েছে, তা থেকে সে রেহাই পায় এবং ঋণ দাতার উপকারের প্রতিদানে ঋণ ফিরত দেবার বেলায় নিজে কৃত ওয়াদাকে যথার্থ মর্যাদার সাথে পুরণ করে সততার প্রমাণ দিয়ে তা আদায় করতে পারে। এ কর্ম পদ্ধতির মধ্যে আর একটি উপকার নিহিত রয়েছে যে, এর দ্বারা সমাজের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা স্থাপন ক্রমাগত রূপে বৃদ্ধি পেতে থাকে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

مَنْ اَخَذَ اَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ اَدَاءَ هَا اَدَّى اللّٰهُ عَنْهُ وَمَنْ اَخَذَهَا يُرِيْدُ اِتْلَافَهَا اَتْلَفَهُ اللّٰهُ۔

"যে ব্যক্তি মানুষের থেকে ফিরত দিবার নিয়তে ঋণ গ্রহণ করে আল্লাহ তায়ালা তা তার তরফ থেকে আদায় করবার বন্দোবস্ত করে দেয়। আর যে ব্যক্তি তা না দেবার নিয়তে স্ফুর্তি করার জন্য নেয়, আল্লাহ তায়ালা তা ধ্বংসের মুখে ফেলে দেয়। (বুখারী)

অতএব, যারা আদায় করার নিয়তে ঋণ নেয় সে নিশ্চয়ই তা দ্বারা কিছু রুজী-রোজগার ব্যবস্থা করার নিমিত্ত চেষ্টা চরিত্র করে। আর সাধারণতঃ দেখা যায় যে, এ ব্যাপারে তারা প্রায়ই নিজ নিজ মান সম্মানের সাথে সফলতা লাভ করে। কিন্তু যারা আনন্দ স্ফুর্তির নিয়তে নেয় তারা অপরের মাল বিলাসিতার কাজে ব্যবহার করে তা দ্বারা কেবল ডাট্ই দেয়। শ্রম সাধনার পরিবর্তে হাত-পা গুঠাইয়ে বসে থাকে। ফলে যথা সময় তারা কৃত ওয়াদা রক্ষা করতে সক্ষম হয় না; এবং তারা দুর্বলতা ও অলসতার শিকারে পরিণত হয়ে পরিশেষে নিজেদেরকেই ধ্বংসের মুখে ফেলে দেয়। রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

"সামর্থ্যবান লোকের ঋণের টাকা আদায় করতে বিলম্ব করা, ঋণ দাতার প্রতি জুলুম করা বৈকি? (রাওয়াতুল খামছা)

এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন– হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি আল্লাহর পথে নিহত হই, তবে আল্লাহ তায়ালা কি আমার সমগ্র গুনারাশি মার্জনা করবেন? এ ব্যাপারে আপনার মত কি? নবী করীম (সাঃ) উত্তর করলেন– হাঁ তুমি যদি একমাত্র আল্লাহর জন্য জেহাদ কর; আর সে পথে পূর্ণ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা রক্ষা করে পিছ-পা না হয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে মৃত্যু বরণ করো, তবে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে মার্জনা করবেন। তিনি উক্ত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে আবার বললেন– তুমি কি জিজ্ঞেস করছিলে, আবার বলতো? তখন উক্ত ব্যক্তি তার জিজ্ঞাস্য দ্বিতীয় বার বললে, নবী করীম (সাঃ) উত্তর করলেন ঃ

আমার উত্তর ঠিকই আছে, কিন্তু ঋণ আল্লাহ তায়ালা মার্জনা করবেন না। জিবরীল (আঃ) এসে এই মাত্র আমার নিকট এ কথা বলে গেলেন। (মুসলিম, তিরমিযী)

আল্লাহর পথে এক মাত্র আল্লাহ-তায়ালার সান্নিধ্য অর্জনের নিমিত্ত ধৈর্য সহিষ্ণুতার সাথে পিছ পা না হয়ে বীর বাহাদুরের ন্যায় জিহাদ করে মৃত্যু বরণ করলেই যে সমস্ত গুনাহ সহ ঋণের বোঝা থেকেও রেহাই পাবে, তেমন নয়। ঋণ হচ্ছে মানুষের সাথে সম্পর্কীয় বিষয়, আল্লাহর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

সুতরাং ঋণ দাতা মার্জনা না করলে আল্লাহ্ তায়ালাও তা মার্জনা করবেন না। এটা সেই অবস্থাতেই প্রযোজ্য হয়, যখন ঋণ শোধ করার সামর্থ তার থাকবে। কিন্তু ঋণ গ্রহীতা যদি এমন দরিদ্র হয়ে পড়ে যে, ঋণ শোধ করার মত ক্ষমতা তার নেই, এমতাবস্থায় ইসলাম তার ঋণ শোধ করার নিমিত্ত যাকাত থেকে একটি অংশ তাকে দান করার সিদ্ধান্ত করে দিয়েছে। এমন কি ঋণ পরিশোধ করার নিমিত্ত দান হিসেবেও কিছু দিয়ে তাকে ঋণ মুক্ত করার ব্যবস্থা ইসলামে রয়েছে। হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন– রাসুলে করীম (সাঃ)-এর যুগে এক ব্যক্তি ব্যবসার উদ্দেশ্যে একটি ফলের বাগিচা ক্রয় করেছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাগানটি নষ্ট হওয়ার দরুন বেচারা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লো, তখন নবী করীম (সাঃ) উক্ত ব্যক্তিকে দান খয়রাত দিয়ে সাহায্য করার নিমিত্ত সকলের প্রতি আহ্বান জানালেন। নবী করীম (সাঃ)-এর আহ্বানে উপস্থিত লোকেরা সম্ভাব্য পরিমাণ টাকা-পয়সা দিয়ে লোকটিকে সাহায্য করলো। কিন্তু উক্ত ব্যক্তির ঋণ শোধ করা যায় এমন পরিমাণ টাকা সেখানে পাওয়া গেল না। তখন নবী করীম (সাঃ) ঋণ দাতাগণকে বললেন– এখন তোমরা যা পাও, তা নিয়ে নাও। এখন এর অধিক তোমরা পাচ্ছো না। (তিরমিযী)

মুসলমানদের ক্রমাগত বিজয়ের ফলে "বায়তুল মালে" যখন যথেষ্ট পরিমাণে ধন-সম্পদ জমা হলো, তখন নবী করীম (সাঃ) আরও সামনে অগ্রসর হয়ে এ নীতি ঘোষণা করলেন যে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর যদি তার এমন কোন সহায় সম্পদ না থাকে, যার এক তৃতীয়াংশের দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা যায়; এমন ব্যক্তির ঋণ রাষ্ট্রের কোষাগারের (বায়াতুমাল) পক্ষ থেকে পরিশোধ করা হবে। হযরত আবু হোরায়ারা (রাঃ) বলেন– নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির মৃত লাশ উপস্থিত করা হলে নবী করীম (সাঃ তার ওয়ারীসদের নিকট জিজ্ঞেস করতেন যে, এ ব্যক্তি কি তার ঋণ পরিশোধ করা যায় এমন পরিমাণ সম্পদ রেখে গিয়েছে? "ঋণ পরিশোধ করা পরিমাণ মাল সে রেখেছে" যদি এ জবাব পেতেন, তবে তিনি তার জানাযার নামায পড়াতেন। নতুবা তিনি মুসলমানদেরকে বলতেন যে, তোমাদের বন্ধুর জানাযার নামায পড়াও। যখন আল্লাহ তায়ালা নবী করীম (সাঃ)-কে বিভিন্ন দেশ বিজয় দ্বারা তা হস্তগত করে দিয়েছিলেন। তখন তিনি এ ঘোষণা করলেন যে, আমার সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক আত্মীয়ের সম্পর্কের চেয়ে অনেক নিকটতম সম্পর্ক এবং আমি তাদের

মুরুব্বী। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে আর তার ঋণ পরিশোধ করার মত যদি কোন সহায় সম্পদ না থাকে, তবে তার ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব আমাদের উপর। আর যে সম্পদ সে রেখে যাবে, তা হচ্ছে তাদের ওয়ারীসদের।" (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)

উপরিবর্ণিত আলোচনা দ্বারা এ কথা ভালরূপে আমরা বুঝতে পারি যে, ইসলাম একদিকে যেমন দরিদ্র ও গরীব মিসকীনদেরকে সাহায্য করার জন্য এবং ঋণ শোধ করার বেলায় তাদেরকে অবকাস দেবার নিমিত্ত মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছে। অনুরূপ সে প্রত্যেক হকদার যাতে নিজ নিজ স্বত্ব ও অধিকার লাভ করতে পারে, তারও সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ইসলাম সমাজ জীবনে ব্যবহারিক দিকটির প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রতি খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে এবং সমাজের সমুদয় কল্যাণকর কার্য বাস্তবে রূপদান করে দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকারের মধ্যে একটি ভারসাম্য ও সমাঝোতা প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা সে করে।

ব্যায়ের পথ

ইসলাম পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি করণের বিষয় যে নিয়ম-কানুন ও বিধি নিষেধ আরোপ করেছে, সে বিষয় ইতিপূর্বে আমি মোটামুটি আলোচনা করেছি। যেখানে ইসলাম সম্পদ অর্জনের নিমিত্ত এ ধরণের বিধি নিষেধ নির্দিষ্ট করে সেখানে ইসলাম সম্পদ ব্যয় করণের বেলায়ও নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকতে পারে না। বরং সে ক্ষেত্রেও সে বিজ্ঞান সম্মত ও যুক্তিযুক্ত বিধি-নিষেধ আরোপ করে ব্যক্তিকে ব্যয়ের বেলায় পূর্ণরূপে নিজ নিয়ন্ত্রণাধীন করে রাখে। সুতরাং বিত্তবানদের জন্য এ স্বাধীনতা দেয়া হয় নি যে, তারা যে পরিমাণ ইচ্ছে সেই পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করবে এবং যা ইচ্ছে তা নিজ নিয়ন্ত্রণাধীনে জমা করে রাখবে। অথবা যেখানে ইচ্ছে নিজ মর্জি মত সেখানেই তা খরচ করবে। এ ব্যাপারে ইসলাম ব্যক্তির উপর পূর্ণ সেন্সরশীপ বাধ্য-বাধকতা আরোপ করে রেখেছে। যদিও ব্যয় করণ কাজটা একান্ত রূপে ব্যক্তিগত ব্যাপার। তথাপি ইসলামী জীবন বিধানে ব্যক্তিকে কখনো তার নিজস্ব ও ব্যক্তিগত ব্যাপারেও যে নিজ মর্জি মাফিক আচরণ প্রদর্শন করবে, এমন নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা কখনো সে দান করেনি। অবশ্য ব্যক্তির জন্য যে স্বাধীনতা দান করা হয়েছে, তা শুধু ইসলামের আরোপিত কতিপয় সীমারেখার গণ্ডীর ভিতরে অবস্থান করেই উপভোগ করতে হয়। লেগামহীন স্বাধীনতার পক্ষপাতি ইসলাম নয়। এ ছাড়া এটাও একটি সত্য

কথা যে, যদি এমন কোন ব্যক্তিগত কাজ হয়, অন্যের সাথে যার আদৌ কোন সম্পর্ক নেই, তা হচ্ছে স্বতন্ত্র কথা। এ সম্পর্ক সম্পূর্ণ প্রকাশ্য ও নিকটতম হতে পারবে না।

ইসলাম এক দিকে যেমন অপব্যয় ও অপাত্রে খরচ করাকে সমর্থন করে না; অনুরূপ কঠোর রূপে কৃপণতা প্রদর্শন করাকে ও সঠিক পথ মনে করে না। কারণ এ পথ দু'টি শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের বেলায়ই ক্ষতিকারক হয়। কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

وَلَاتَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً الِٰي عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَحْسُوْرًا ـ

"স্বীয় হস্তকে গলায় বেধে রাখিও না। আর তাকে এমনরূপে খুব প্রশস্ত করে না, যাতে করে পরিশেষে তোমরা ভর্ৎসনার লক্ষ বস্তুতে পরিণত হয়ে দরিদ্রতার মধ্যে নিপতিত হয়ে বসে থাকতে বাধ্য হও।" (সূরা আসরা-২৯)

يٰبَنِىْ آدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَاتُسْرِفُوْا ـ اِنَّهُ لَايُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ـ

"হে বনী আদম! প্রত্যেকটি মসজিদের যাবার প্রাক্কালে তোমাদের সাজ-সজ্জার উপকরণবলী নিজেদের সাথেই রাখো। তোমরা পানাহার করতে থাকো, কিন্তু অপব্যয় করো না। আসলে আল্লাহ তায়ালা কখনো অপব্যয়কারীকে পসন্দ করেন না।" (সূরা আল আরাফ-৩১)

ব্যয়ের পথ থেকে হাত গুটিয়ে বসে থাকার পরিণতি হচ্ছে মানব আত্মা বৈধ সীমারেখা পর্যন্ত আরাম-আয়েশ করা থেকেও বঞ্চিত হওয়া। অথচ ইসলাম ব্যক্তির জন্য শরীয়াতের নির্দেশিত সীমারেখার পরিধির মধ্যে অবস্থান করে নিজ সত্তাকে আরাম দেয়া এবং বিভিন্ন প্রকার সুস্বাদু দ্রব্য সামগ্রী ভোগ করার সুযোগকে আবশ্যকীয় কাজ নির্ধারণ করে। সে কখনো আদৌ এটা পাছন্দ করে না যে, যে সকল দ্রব্য সামগ্রী অবৈধ ঘোষণা করা হয়নি, তা থেকেও মানুষ বঞ্চিত থাকুক। কারণ জীবনটি যথার্থ রূপে আনন্দময় হওয়া বাঞ্ছনীয়। এমন হওয়া উচিত যেন জীবনের ভিতর সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়ে খেল তামাসা ও অপব্যয়ের মধ্যে নিপতিত না হয়ে তা আনন্দময় ও প্রফুল্লচিত্ত হয়ে সর্বদা প্রস্ফুটিত থাকে।

ইসলাম সুস্বাদু দ্রব্য সামগ্রী পরিহার করে আত্মার উপর কঠিন হওয়া এবং আল্লাহর দেয়া পবিত্রতম বস্তু থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার নির্দেশ কখনোই দেয় না।

সুতরাং উল্লেখিত আয়াতটির আলোকে এ কথা পরিষ্কার হয় যে, ইসলাম মানুষের নিকট যথাপোযুক্ত সীমারেখা পর্যন্ত সাজ-সজ্জা ও সৌন্দর্য বর্দ্ধক দ্রব্যাবলী গ্রহণ করার দাবি জানায়। এ আয়াতের পর কুরআনে করীমের অন্য একটি আয়াতে ঘোষণা হচ্ছে ঃ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ط قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ - كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ - قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَاتَعْلَمُوْنَ -

“হে নবী! আপনি তাদের নিকট জিজ্ঞেস করুন যে, কে তোমাদের প্রতি সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জার দ্রব্য সামগ্রীকে হারাম করে, যা আল্লাহ তায়ালা তার নিজ বান্দাদের জন্য প্রকাশ করেছেন? আর কে দানকৃত পবিত্র জীবিকা সমূহ তোমাদের প্রতি নিষিদ্ধ করেছে? হে নবী আপনি ঘোষণা করুন যে, এ সকল দ্রব্য সামগ্রী পার্থিব জীবনে ঈমানদারদের জন্য, বিশেষ করে পরকালে তাদের জন্য তো হবেই। যারা জ্ঞান ও বুদ্ধি বিবেচনার অধিকারী, তাদের জন্য আমি এমনি রূপে আমার কথাকে পরিষ্কার রূপে বর্ণনা করি। আপনি তাদের নিকট বলুন যে, আমার প্রতিপালক যা কিছু নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, তা হচ্ছে বে-শরীয়াতী কার্যাবলী; –তা প্রকাশ্যে হোক কিম্বা গোপনে হোক। আর হচ্ছে গুনাহর কাজ এবং সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা। আর তিনি এ কাজ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন যে, তোমরা আল্লাহ তায়ালার সাথে কাহাকেও শরীক করবে না। আর যে বিষয় তোমাদের জ্ঞান নেই, সে বিষয় আল্লাহ তায়ালার বেলায় কোন কথা বলাকেও তিনি নিষেধ করেছেন।” (সূরা আরাফ ৩২–৩৩)

ছোট বড় আমীর গরীব রাজা প্রজা শাসক শাসিত ধনী নির্ধন সমগ্র মানুষ যাতে জীবনকে সুন্দর করার উপকরণ ও সামগ্রী থেকে উপকৃত হতে পারে এটাই তাঁর কাম্য। এ কারণেই উল্লেখিত আয়াতে সমগ্র বনী আদমকে সম্বোধন করা হয়েছে।

সুতরাং এখন যদি ইসলাম ধৈর্য সহিষ্ণুতা আনুগত্য ও সন্তুষ্ট থাকার উপদেশ দান করে; তবে তার অর্থ জগতের আরামপ্রদ ও সৌন্দর্যদাব পরিত্যাগ করে বৈরাগ্যবাদ গ্রহণ করা নয়। বরং তার অর্থ হচ্ছে যখন মানুষের সামনে কঠিনতম বিপদের কাল ঘনঘটা উপস্থিত হবে, তখন তা দুরীভূত হওয়া বা করা সময় পর্যন্ত ভীত না হয়ে অটল অচল মনোবৃত্তি নিয়ে শান্তশিষ্ট রূপে দণ্ডায়মান থাকার জন্যই হচ্ছে এ উপদেশমালা। এহেন অবস্থা ছাড়া ব্যক্তিকে হালাল বস্তু দ্বারা উপকৃত হবার বেলায় সর্বদাই সুযোগ দান করা হয়েছে। আর সমাজের সমগ্র নাগরিকদের জন্য এ সকল বস্তুর সংস্থান করে দেবার জন্য চেষ্টা চরিত্র চালাবার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। আর যে সকল বস্তু থেকে উপকৃত হবার নিমিত্ত আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন, সে সকল বস্তু ও দ্রব্য সামগ্রী থেকে তাদেরকে যেন বঞ্চিত না করা হয়, তারও তাগিদ দিয়েছেন। এ জন্যই ইসলাম গরীবদেরকে– অর্থাৎ যারা যাকাতের নির্ধারিত সীমারেখার থেকে কম পরিমাণ ধন-সম্পদের অধিকারী; তাদেরকে যাকাতের সম্পদের একটি অংশের অধিকারী করে দিয়েছে। যার উদ্দেশ্য শুধু একান্ত প্রয়োজন পরিমাণ ধন-সম্পদ হস্তগত হওয়া নয়। কেননা এতটুকু পরিমাণ সম্পদতো তার নিকটই বর্তমান রয়েছে। বরং যাতে তারা অধিক পরিমাণে খুশী খোশালীতে জীবন-যাপন করতে পারে, এ জন্যই যাকাতের মাল তাদেরকে দান করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইসলাম শুধু কেবল প্রয়োজন মাফিক অর্থাৎ যতটুকু পরিমাণ ধন-সম্পদ থাকলে তার মোটামুটি রূপে প্রয়োজন পুরণ হয়, এটা তার দাবি ও কাম্য নয় বলেই এ ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। ইসলাম সর্বদা জীবন থেকে ভোগ বিলাসের জন্য মানুষকে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দান করে। আর এটা পরিষ্কার কথা যে, ভোগ-বিলাসের প্রশ্ন কেবল মাত্র অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন মিটানোর পরই সৃষ্টি হয়ে এবং তার চেয়ে অধিক পরিমাণ সম্পদ হস্তগত হওয়ার পরই তা সম্ভব হয়। ইসলাম যখন যাকাতের সম্পদ গরীবদেরকে এ জন্য দেয় যে, তারা যেন এই আধিক্য সম্পদ দ্বারা নিজেদের আত্মার আরাম-আয়েশের নিমিত্ত কিছু উপকরণ সংগ্রহ করে নেয়। একান্ত অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন ছাড়া জীবনের আরো কিছু সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করে রাখতে পারে। তখন বিত্তবান ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের জন্য

একদিকে যেমন ব্যক্তি স্বার্থের প্রতি আঘাত হানা হয়, অনুরূপ সামাজিক সাধারণ স্বার্থের বেলায়ও মারাত্মক ক্ষতির পথ উম্মুক্ত করা হয়। মানব জীবনে অপব্যয় এমন একটি কাজ, যা ব্যক্তি বা সমাজ উভয়ের বেলায়ই ধ্বংস ডেকে আনে। এখানে এ কথাটি পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন যে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে গিয়ে যদি সমুদয় ধন-সম্পদও খরচ হয়, তবে তাকে অপব্যয় বলা যায় না। এ বিষয় উপরে যে হাদীসটি উল্লেখ করা হচ্ছে, সেখানে নবী করীম (সাঃ) এ আশা পোষণ করেছেন যে, যদি তার নিকট পাহাড় সম স্বর্ণমুদ্রা এসে পড়ে, তবে তা সমুদয়ই তিনি আল্লাহর পথে ব্যয় করতেন। তা থেকে দু'কিরাৎ পরিমাণ সম্পদও তিনি নিজ হাতে রাখতেন না।

"অপব্যয়" নামটি শুধু কেবল সেই বাহুল্য খরচের বেলায়ই প্রযোজ্য হয় যা মানুষ স্বীয় কুবৃত্তি নিচয়ের বাসনা পুরণার্থে ব্যয় করে। আর ইস্‌লাম এ ধরনের ব্যয়কেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এ অর্থে সেই আরাম প্রিয়তার নামই অপব্যয়, যাকে ইসলাম কঠোর ভাবে দোষণীয় কাজ বলে ঘৃণ্য করে। ধন-সম্পদ ধনাঢ্য ব্যক্তিদের মধ্যে ঘুরাফেরা করতে থাকুক, আর সম্পদের আধিক্যতা মানুষকে বিলাসিতা ও আরাম প্রিয়তার মধ্যে নিপতিত রাখুক; এটা ইসলামের মতে খুবই নিন্দনীয় খারাপ কাজ। ইসলাম আরাম প্রিয়তাকে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্যই সর্বপ্রকার অন্যায় অবিচার ও ঝগড়া ফাসাদ এবং পাপকার্যের মূল উৎস নির্ধারণ করে। সুতরাং তার মতে এটা এমন একটি গর্হিত কাজ যাতে সমুলে বিলীন করে দেয়া সমাজেরই দায়িত্ব; যদি এ কাজ করতে সমাজ এগিয়ে না আসে, তবে এ কারণেই সে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ফেলে দেয়।

পবিত্র কুরআন মজীদে এবং হাদীস শরীফে এ ধরণের বহু আয়াত ও হাদীস বর্তমান রয়েছে যেখানে দু'টি শব্দের দ্বারা আরাম প্রিয়তার প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করে অবৈধ ঘোষণা দিয়েছে। সেখানে পরিষ্কার করে এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, এটা আল্লাহ তায়ালা এবং তার রাসুলের মতে চূড়ান্তভাবে নিন্দনীয় কার্যসমুহের মধ্যে একটি অবৈধ কাজ। সেই ইসলামই মানুষকে জীবনের পবিত্রতম নেয়ামতবলীর স্বাদ গ্রহণ করা এবং তা থেকে উপকার লাভ করার জন্য আহবান জানায়। আর আল্লাহ তায়ালাও তা মানুষের জন্য হালাল করে দিয়েছেন। কিন্তু মানুষ তাকে নিজেদের জন্য হারাম করাকেও অপছন্দ করে। আর সেই ইসলামই জীবনকে শুধু প্রতিষ্ঠিত রাখার নিমিত্ত এবং তাকে জীর্ণ-শীর্ণ করে দরিদ্রতার বেশে না রাখার পরিবর্তে সুন্দরতর রূপে মনমোহন করে গড়ে তোলার-নিমিত্ত উৎসাহ যোগায়।

আরো অধিক পরিমাণে খরচ করা উচিত এবং নিজেদের আত্মাকে পবিত্রতম বস্তু ও দ্রব্য সামগ্রী থেকে বঞ্চিত রাখা উচিত নয়। সুতরাং মানব জীবনকে সুন্দরতম রূপে গড়ে তোলার নিমিত্ত আল্লাহর এ সৃষ্টি জগতে অগণিত দ্রব্য সামগ্রী যে বর্তমান রয়েছে, তা সকলের চক্ষেই দৃপ্তমান। এ সকল দ্রব্যাবলী গ্রহণ করে, মানব জীবন পূর্ণরূপে সাজ-সজ্জা ও ঔজ্জল্যপূর্ণ হয়ে উঠুক এবং উন্নত চিন্তাধারা এবং সৌন্দর্য শোভা ও পরিচ্ছন্নতার অনুভূতি তাদের মনের কোঠার উন্মেষ সাধন হোক। আর এ বিচিত্রময় সৃষ্টি জগতের প্রতি গভীর চিন্তা গবেষণা ও দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তার পূর্ণতাও সৌন্দর্যতার উন্নততম অনুভূতি সৃষ্টি করার প্রচেষ্টায় নিমগ্ন থাকুক; সেই জন্য এ সকল পবিত্রতম বস্তুর অপূর্ব সমাবেশ। রাসুলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

اِذَا اٰتٰكَ اللّٰهُ نِعْمَةً فَلْيُرَ اَثَرَ نِعْمَةِ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتُهُ ـ

"যখন আল্লাহ তায়ালা তোমাকে নিয়ামত দান করে সৌভাগ্যশালী করে তুলেছেন, তখন আল্লাহর এ নিয়ামতের পরিচয়, প্রভাব ও ফলক্রিয়া তোমার বাহ্যিক জগতে প্রদর্শন করা উচিত।" (আবু দাউদ ও নাসাই)

এখানে নবী করীম (সাঃ)-এর মতে শক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় দরিদ্রতার রূপ ধরে থাকা আল্লাহর দেয়া নেয়ামতের অবমাননা করা যেন মনে হচ্ছে। বরং এহেন আচরণ তাকে অস্বীকার করারই নামান্তর, যা আল্লাহ তায়ালা আদৌ পছন্দ করেন না।

এ আলোচনা এক দৃষ্টিকোণ দ্বারা করা হয়েছে। আর ধন-সম্পদকে আবর্তন বিবর্তনের মধ্যে রাখা এবং ব্যয় করা থেকে বিরত থাকা বিষয়কে ইসলাম অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে। অর্থাৎ তাকে এমন রূপে আটকিয়ে রাখার কারণে তার মূল প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণরূপে অকেজো করে দেয়। সমাজ জীবন যাতে করে ফুলে ফলে সুশোভিত হতে পারে এবং উৎপাদন যাতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং শ্রমিক সমাজের জন্য বেকার সমস্যা দুরীভূত হয়ে কর্মসংস্থান হয়, সাধারণ মানুষের উন্নয়নশীল কর্মতৎপরতা পূর্ণরূপে প্রদর্শন করার সুযোগ ঘটে, এ জন্যই সম্পদ সর্বদা আবর্তন বিবর্তন ও ঘুরাফেরার মধ্যে থাকাটাই হচ্ছে সামাজিক জীবনে সমৃদ্ধি উন্নতি ও কল্যাণকারীতার মূল দাবি। অপর দিকে সম্পদ আটকে পড়ে থাকলে সমাজ জীবনের এ সকল কার্যাবলী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে অচল অবস্থায় সৃষ্টি হয়। অতএব এ কারণেই ইসলাম পুঁজি আটকিয়ে কোটারী করে রাখা কিম্বা তা ব্যবসা বা কল্যাণমূলক কাজে না খাটানকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। এর দ্বারা

অপর দিকে সে অপব্যয় বাহুল্য খরচ ও আরাম প্রিয়তার প্রতি কঠোর ভাবে নিন্দা জ্ঞাপন করে।

আরাম প্রিয় লোকেরা যে ভীরু দুর্বল ও কাপুরুষ হয় তা কুরআন মজীদের আয়াতেই তালরূপে প্রকাশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَا اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَأْذَنَكَ اُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِيْنَ -

"আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য স্থাপন এবং তাঁর নবীর সাথে একাত্ব হয়ে জিহাদ করার আহ্বান জানিয়ে যখন কোন সূরা নাযিল করা হয়, তখন তোমরা দেখবে যে তাদের মধ্যে যারা সামর্থবান, তারাই তোমাদের নিকট জিহাদে অংশ গ্রহণ থেকে ক্ষমা চায়। তারা বলে যে, আমাদেরকে ছেড়ে দাও। আমরা জিহাদ থেকে যাদেরকে বিরত রাখা হয় তাদের সাথে থাকবো।" (সূরা তাওবা−৮৬)

ইসলাম এ ধরণের সামর্থ্যবান লোকদেরকে, যারা মুজাহিদদের কাতার থেকে দূরে সরে বসে থাকে, কতখানি ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে তা আমরা ভালরূপে তখনই অনুধাবন করতে পারবো, যখন জেহাদের প্রতি ইসলাম কতটুকু গুরুত্ব দান করে সে বিষয় সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল হবো। যারা এ ব্যাপারে নিজ ইচ্ছায় আগ্রহের সাথে এগিয়ে আসে, ইসলাম তাদেরকে উচ্চ মর্যাদার আসনে সমাহীন করে নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

"যে ব্যাক্তি মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর পথে জেহাদের কাজে অংশ গ্রহণ না করেছে এবং যার অন্তরে জিহাদের জন্য কোন ইচ্ছা ও বাসনারও উদ্রেক হয়নি, তার মৃত্যু এক ধরনের মুনাফেকী অবস্থায়ই হয়।" (মুসলিম দাউদ, নাসাই)

আরাম প্রিয় দুর্বল লোকেরা যে, কঠোর পথ এড়িয়ে সহজ পথ পছন্দ করে তা কোন আশ্চার্যের কথা নয়। যেমন থাকে না তাদের ভিতর পৌরুষত্ব বলতে কিছু, তেমন না থাকে দৃঢ় মনোবল। তাদের মধ্যে কঠোর পরিশ্রমের অভ্যাস আদৌ পরিলক্ষিত হয় না। যার ফলে তাদের হৃৎপিণ্ডের অনুভূতি ও চেতন সম্পূর্ণরূপে স্তিমিত হয়ে যায়। ফলে তারা ভীরু ও সাহসহীন হয়ে পড়ে। তাদের নিকট প্রিয় বস্তু হলো কামুক রিপুর ইন্ধন ও উৎসাহ দানকারী উপকরণাবলী। জিহাদ করতে গিয়ে যে কঠোরতম পরিশ্রম করতে হয়, তা তাদেরকে কিছূ

দিনের জন্য পাশবিক স্বাদ উপকরণ থেকে বঞ্চিত রাখে। এ ধরণের লোকেরা জীবনে লজ্জাহীনতা অশ্লীলতা অকর্মন্যতার মুল্যবোধ ছাড়া আর কোন মূল্যবোধের সাথেই পরিচয় রাখতে পারে না।

কুরআন আমাদেরকে এ কথা ভালরূপেই জানিয়ে দিয়েছে যে মানব ইতিহাসে ধনাঢ্যদের কি ভূমিকা ছিল? তারা সর্বদাই সেই হেদায়াতের পথে প্রতিবন্ধক রূপে দণ্ডায়মান হয়েছে যা তাদের অধীনস্থ দুর্বল লোকদের জন্য এসেছিল। যে সমাজে কিছু সংখ্যক আরাম-প্রিয় লোক থাকে, সে সমাজে তাদের খোশামোদ করার নিমিত্ত এবং তাদের অহংকারী মনোবৃত্তির তৃষ্ণা মিটানোর জন্য একদল নিম্ন শ্রেণীর চাটুকার অবশ্যই বর্তমান থাকে। তারা দিন রাত পরিশ্রম করে তাদের মনস্কাম ও চাহিদা মিটায়। আর তাদের অধীনে চাকুরী নিয়ে তাদের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত পোকা মাকরের ন্যায় নিজেদেরকে বিলীন করে দেয়। এ ধরণের লোকদের কথা কুরআন পাকে এরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوْهَا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كَافِرُوْنَ -

"আমি যখন কোন বস্তী এলাকায় কোন নবী রাসুলকে ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছি, তখন সেখানের ধনাঢ্য খোশহাল ব্যক্তিরা বলতো যে, তুমি যা কিছু নিয়ে প্রেরিত হয়েছো, আমরা তা অস্বীকার করি।" (সূরা সাবা–৩৪)

وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ وَاَتْرَفْنَاهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مَا هٰذَا اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ -

"যে সকল সম্প্রদায় কুফরী করেছিল এবং পরকালকে মিথ্যা জেনেছিল, আর যাদেরকে আমি পার্থিব জগতে খুশী খোশালী অবস্থায় রেখেছিলাম, তাদের সর্দার ও নেতৃবর্গ বললো– এরা (নবীগণ) তোমাদের মতই মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়। তোমরা যা কিছু খাও তারাও তাই ভক্ষণ করে, তোমরা যা পান করো, তারাও তাই পান করে। সুতরাং তোমরা নিজেদের মত একজন ব্যক্তির আনুগত্য যদি মেনে চলো, তবে বাস্তবিকই তোমরা বিরাট ক্ষতির মধ্যে নিপতিত হবে।" (সূরা মুমিন–৩৩)

وَقَالُوْا رَبَّنَآ اِنَّآ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا- رَبَّنَآ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا -

"আর (কিয়ামতের দিন) তারা এ বলে প্রার্থনা জানাবে– হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের বড় বড় লোক ও নেতৃবর্গের আনুগত্য করেছিলোম। তারা আমাদেরকে হেদায়াতের পথ থেকে বিপথে পরিচালিত করেছে। হে আমাদের প্রভু! তাদেরকে আপনি ডবল ডবল করে শাস্তি দিন। আর তাদের প্রতি আপনার কঠোরমত অভিশাপ (লানৎ) বর্ষণ করুন।"

(সূরা আহযাব ৬৭–৬৮)

এটা কোন আশ্চার্য্যের কথা নয় যে, আরাম-প্রিয় লোকেরা যে জিনিসের জন্য সবচেয়ে অধিক চিন্তিত থাকে, তা হচ্ছে তাদের মানবিক সহজাত বৃত্তির সহজ পথ পছন্দ করা এবং ব্যাধিপূর্ণ জীবন। তাদের জন্য নিজেদের উদ্দেশ্য সাধণের নিমিত্ত এক দল খেদমতগার ও নিমকখোর থাকা বাঞ্ছনীয়। দ্বীন ও ইসলাম তাদেরকে এ ধরণের আনন্দ দায়ক দ্রব্য-সামগ্রীর একটি বিরাট অংশ থেকে বঞ্চিত করে এবং পার্থিব নেয়ামত সমূহ উপভোগ করার নিমিত্ত কতিপয় পথও নির্দিষ্ট করে দেয়। আর এটা সত্য কথা যে, এ বৈধ সীমারেখা তাদের জন্য খুবই কম তুষ্টদায়ক প্রমাণিত হয় যার উপর তাদের ব্যাধিপূর্ণ মানসিকতা এবং লাগামহীন কামনা সন্তুষ্ট হতে পারে না। শুধু এতটুকুই যথেষ্ট নয়, ইসলাম সমগ্র মানুষের মান ইজ্জৎ উন্নত করে এবং এ সকল আরাম-প্রিয় লোকদের জন্য গরীব ও দুর্বল শ্রেণীর উপর সেই ধরণের শাসন শোষণ চালাবার সুযোগ অবশিষ্ট রাখে না, যার দ্বারা তারা তদেরকে গোলাম ও চাকর বানিয়ে হাতিয়ার স্বরূপ ব্যবহার করতে পারে। ইসলাম এ ধরণের ধারণা কল্পনা এবং এ রূপ কথা এবং ভিত্তিহীন কেচ্ছা কাহিনীকেও সমূলে ধ্বংস করে দেয়, যার দ্বারা তারা নিজেদের চর্তুপার্শ্বে একটি পরিমণ্ডল ও পরিবেশ গড়ে নেয় এবং জাহেল গোমরাহ ও দাসত্ব মনোবৃত্তি সম্পন্ন সমাজে তাদের দখল ও প্রভাব অর্জনের নিমিত্ত তাকে একটি কার্যকরী হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করে। এ কারণেই তারা সর্ব প্রকার দ্বীনী কথা ও হেদায়াতের দুশমন হয়ে দাঁড়ায়। আরাম-প্রিয়তা জীবন ও মানুষের উন্নত চেতনাবোধ ও অনুভূতিকে যে নিষ্ক্রিয়তার শিকারে পরিণত করে তা এ সকল দুষ্টতা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কুরআন পাকে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ أَأَنْتُمْ اَخْلَلْتُمْ عِبَادَهُمْ هٰؤُلَاءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ - قَالُوْا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِيْ لَنَا اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَاءَ وَلَئِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَائَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوْا قَوْمًا بُوْرًا -

এমন একদিন আসবে যেদিন (আপনার প্রভু) তাদেরকে এক জায়গায় একত্র করবেন। আর তাদের সেই সকল মাবুদদেরকেও উপস্থিত করবেন, আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে যাদেরকে তারা পূজা করতো। তারপর তাদের নিকট জিজ্ঞেস করা হবে– তোমরা কি আমার বন্দাদেরকে গোমরাহ করেছো না। তারা নিজেরাই পথ ভ্রষ্ট হয়েছে? তখন তারা উত্তর করবে– হে প্রতিপালক আপনি মহান আপনি পবিত্র। আমাদের এমন শক্তি ছিল না যে, আপনি ছাড়া অপর কাহাকেও নিজেদের প্রভু করে নিব। কিন্তু আপনি তাদের বাপ-দাদাদেরকে এমন অধিক পরিমাণ জীবন সামগ্রী দান করেছেন, (যার দরুন তারা আরাম প্রিয়তার শিকারে পরিণত হয়েছে) এমন কি এ সব তারা ভুলে গিয়েছে এবং একটি অভিশপ্ত জাতিতে পরিণত হয়ে মহা বিপদের মধ্যে হাবুডুব খাচ্ছে।"

(সূরা ফুরকান ১৭–১৮)

অর্থাৎ আরাম-আয়েশ ও ভোগ বিলাসের উপকরণ যদি দীর্ঘ দিন ধরে উপভোগ করার সুযোগ মিলে এবং পিতা-মাতা ও বংশীয় সূত্রে যদি এ ধরণের সরঞ্জামের উত্তরাধীকারী হয় তবে তা মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে অকর্মন্য করে ছেড়ে দেয়। তাদের আসল চিত্রটি এখানে তুলে ধরেছে বলে মনে হচ্ছে। আরবী ভাষার বুর শব্দের অর্থ হচ্ছে, এমন তৃষ্ণাতুর বুভুক্ষ শুষ্ক জমি যেখানে কিছুই জন্মে না। এ সকল লোকদের অন্তঃকরণ স্বভাব প্রকৃতি এবং তাদের পূর্ণ জীবনটি এমন রূপই কঠিন ও অনুর্বর হয়ে পড়ে, মনে হয় তার ভিতর কোনরূপ স্পন্দনই অনুভূত হয় না।

আল্লাহর রসূল (সাঃ) স্বেচ্ছাচারী ধনাঢ্য আরাম-প্রিয় লোকদের বাসস্থানকে শয়তানের বাসস্থান আখ্যা দিয়ে তাকে সর্ব প্রকার ঝগড়া-ফাসাদ ও অনিষ্টতার উদয়ভুমি নিরূপণ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

"শয়তানের জন্য যেমন উট থাকে, তেমনি তার বাসস্থানও রয়েছে। আমি তার ঘর অবলোকন করেছি। তোমাদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি এমন উষ্ট্র নিয়ে বাহির হয়, যাকে সে ভালরূপে খাদ্য-দ্রব্য আহার করাইয়ে খুব চতুর ও সাবলীল

করেছে অথচ সে নিজে কোন উষ্ট্রের পিঠে সওয়ার হয় না। অনুরূপ সহয়হীন কোন পথিককেও সে তার উপর সওয়ার করায় না। এ উট্‌টিই হচ্ছে শয়তানের উট। আর শয়তানের ঘরটি হচ্ছে আমার নিকট সেই পিঞ্জিরাটি, যা মানুষকে রসম রেওয়াজ দ্বারা আবৃত করা হয়। (আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ)

নবী করীম (সাঃ) উট্‌টির মালিকের তার পৃষ্ঠে সওয়ার হবার কোনরূপ প্রয়োজন থাকে না, আর একা পথিক ব্যক্তিও তা থেকে বঞ্চিত থাকে, এমন উট্‌টিকেই তিনি শয়তানের উট্ আখ্যা দিয়েছেন। আজ বর্তমান জগতে আমরা লক্ষ্য করতেছি যে, বিরাট বিরাট দামী দামী মোটর গাড়ী ও ট্যাক্সী ছোট ছোট কাজের জন্য এদিক সেদিক দৌঁড়াদৌঁড়ি করতে থাকে। অথচ হাজার হাজার লোক এমনো রয়েছে যাদের জন্য গাড়ির টিকিট খরিদ করার মত কয়েকটি পয়সার সংস্থা হচ্ছে না। শত শত লোক এমনো রয়েছে, যাদের পথ চলার জন্য পা দুটিও নেই। কারণ তাদের পা বিভিন্ন দুর্ঘটনার মধ্যে নিপতিত হয়ে ধ্বংস হয়েছে। আর নবী করীম (সাঃ) যে ঘরটিকে পিঞ্জিরা আখ্যা দিয়েছেন, সে ঘরের লোকদেরকে রুসুম দ্বারা আবৃত করণের কথা বলেছেন, সে ধরণের বহু ঘর আমাদের সামনে দৃশ্যমান। বর্তমানে এ সব বাসভবনে আরাম-আয়েশ ও বিলাস বসনের নিমিত্ত এমন এমন সাজ সরঞ্জাম ও উপকরণ পাওয়া যাচ্ছে যে, সম্পর্কে সেকালের লোকদের মনে কোনরূপ ধারণাও ছিল না।

আরাম প্রিয়তা ও ভোগ-বিলাসের দ্বারা যে মানব জীবনে ধ্বংস ডেকে আনে, তা একটি ঐতিহাসিক সত্য কথা। কারণ পার্থিব ধন সম্পদের বৃদ্ধি করণ এবং তার ভিতর নিজেকে নিমজ্জিত রাখা দ্বারা মানুষের মধ্যে গর্ব অহংকার ইত্যাদি রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। কুরআন মজীদে পূর্বেকার লোকদের কথা বর্ণনায় আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِيْنَ -

"আমি এমন কতগুলো বস্তী এলাকা ধ্বংস করে দিয়েছি; যেখানের অধিবাসীরা নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর গর্ব অহংকার করতো। সুতরাং এ হলো তাদের ঘর-বাড়ী, যেখানে তাদের পর খুব কম সংখ্যক লোকই বস্তী স্থাপন করেছে। (সূরা কাসাস-৫৮)

অপর দিকে ভোগ-বিলাস ও আরাম-প্রিয়তার পরিণামে পরকালে পেতে হয় কঠোরতম আযাব। কারণ এর দ্বারা মানুষের থেকে বিভিন্ন প্রকার গুনাহর কার্য প্রকাশ পায়। কুরআন মজীদ আল্লাহ বলেন ঃ

وَاَصْحَابُ الشِّمَالِ مَآ اَصْحَابُ الشِّمَالِ فِىْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ لَّابَارِدٍ وَّلَاكَرِيْمٍ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ - وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ -

"আর বামপন্থীগণ কিরূপে বামপন্থী হয়। তারা এমন সাইমুম হাওয়া এবং চামড়া খসে পড়ে এমন গরম পানি এবং ধুয়ার কুণ্ডলীর ছায়ায় থাকবে, যা না হবে ঠাণ্ডা এবং না হবে আরামদায়ক। এ লোকেরা এর পূর্বে পার্থিব জগতে খুব আনন্দদায়ক প্রফুল্ল অবস্থায় জীবন যাপন করতো। তরা বিরাট বিরাট গুনাহের কার্যের অর্থাৎ কুফর ও শিরকের মধ্যে অনাবরত লিপ্ত থাকতো। তারা জনসাধাণের মধ্য এ কথা বলে বেড়াতো যে, মৃত্যুর পর আমাদের মাংসপেশী যখন মাটির সাথে মিশে শুধু আমাদের হাড়গুলো অবশিষ্ট থাকবে, তারপরও কি আমাদেরকে এবং আমাদের বাপ-দাদাদেরকে দ্বিতীয়বার জীবিত করে উত্থিত করা হবে।" (সূরা ওয়াকেয়া ৪১–৪৮)

কিন্তু এ পাথির্ব ধ্বংসলীলা এবং পরকালীন আযাব শুধু ভোগ-বিলাস ও আরাম প্রিয় লোকদের বেলায়ই আসবে না, বরং যে সমাজ স্বেচ্ছারী আরাম-প্রিয় লোকদের অস্তিত্বকে ইচ্ছা ও আগ্রহের সাথে বরণ করে নেয় তাদের পূর্ণ সমাজটিকে এ ধরণের আযাব ও ধ্বংসলীরা আবেষ্টন করে নিবে বলে কুরআন মজীদে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِذَآ اَرَدْنَآ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا -

"আমি যখন কোন বস্তী এলাকাকে ধ্বংস করার ইচ্ছা পোষণ করি, তখন সেখানের স্বেচ্ছাচারী ধনাঢ্য ব্যক্তিদেরকে নির্দেশ দেই তারা সেখানে বসে আমার নাফরমানী গুনাহর কাজ করতে থাকে। তখন এ বস্তীর উপর আযাব নাযিল

করার সিদ্ধান্ত হয়ে যায় এবং আমি তাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসে পর্যবসিত করি।"
(সূরা বনী ইসাইল–১৬)

সমাজের মধ্যে আরাম-প্রিয় লোক থাকা এবং সমাজ তাকে খুশীতে বরণ করে নেয়া এবং স্বীয় মৌনতা অবলম্বনের দ্বারা তার প্রতি প্রকারান্তরে সমর্থন দেয়া। আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতার উপকরণাবলী দুরীভূত করণের দিকে লক্ষ্য না দেয়া, আরাম-প্রিয় লোকদেরকে ঝগড়া কলহ ও দুষ্কৃতিমূলক কার্য ছড়ানোর নিমিত্ত স্বাধীনরূপে ছেড়ে দেয়া, ইত্যাদি কার্যাবলী তার মূল স্বভাব প্রকৃতির দিক দিয়ে এমন উপকরণ যা পরিশেষে নিশ্চিত রূপে ধ্বংসের গহীন কুয়ার ভিতর নিক্ষেপ করে। এ আয়াতে ইচ্ছা ও এরাদার অর্থ এটাই। অর্থাৎ কাজের অগ্রবর্তি ভূমিকা প্রমাণিত হবার পর তার পরিণতি স্থির করা; আর উপকরণাদী সংস্থান হবার পর তার মূল বস্তুটিকে কার্যকরি করে তোলা জীবন ও জগতের আদিকাল থেকেই আল্লাহ তায়ালার চিরন্তণ নিয়ম-নীতি রূপে পরিচালিত হয়ে আসছে।

নিজের অভ্যান্তরে এ ধরনের গর্হিত কাজের জন্য সমাজকে জবাবদিহি সাব্যস্ত করা হয়েছে। কোন সমাজে আরাম-প্রিয় লোক বর্তমান থাকাটাই সেই সমাজে অন্যায় অবিচার ও যাবতীয় দুষ্কৃতিমূলক কার্য সম্প্রসারিত হবার কারণ হয়। উপরে আমরা এ কথা আলোচনা করেছি যে, অধিক শক্তি তার নিজের কোন না কোন প্রয়োগ ও ব্যয়ের স্থান অবশ্যই অনুসন্ধান করে। এ সকল স্বেচ্ছাচারী আরাম-প্রিয় লোকদের নিকট প্রচুর ধন-সম্পদ ও দৈহিক শক্তি এবং এমন অবসর সময় বর্তমান থাকে, যার ভিতর না থাকে তাদের কোন কাজ এবং না থাকে কোন কাজের চিন্তা। এ শক্তিগুলো হচ্ছে, বিভিন্ন ধরণের ও বিভিন্নমুখী। এ সকল ধন-সম্পদশালী যৌবন নর-নারী, যাদের মধ্যে যৌবনের উন্মাদনা, সম্পদের প্রাচুর্যতা এবং সময়ের সুবর্ণ অবকাশ ইত্যাদি সব কিছু বর্তমান তারা অশ্লীল ও দুশ্চরিত্রহীন কার্য করবে না তবে করবেই বা কি? তাদেরকে ধন-দৌলতের শক্তি দৈহিক শক্তি ও অবসর সময়সমূহ ব্যয় করার জন্য পাত্রের অনুসন্ধান করতে হয়। আর এহেন ব্যয়ের পাত্র ও স্থানসমূহ অধিকাংশ সময় হীন ও এমন নীচু মানের হয় যা যুগ ও পারিপার্শ্বিকতার দিক দিয়ে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। কিন্তু নীচুতা হীনতা ও প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য মান হানিকর অশ্লীলতা মিশ্রভাবে তার ভিতর সর্বদাই বর্তমান থাকে।

অপর দিকে মুনাফা অর্জনকারী এবং প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারকারী, আর দরিদ্র শ্রেণীর এমন লোক, যাদের মধ্যে দাস দাসী বিক্রয়কারী, ঠাট্টা বিদ্রূপকারী এবং সেই আরাম প্রিয়দের চর্তুপার্শ্বে খেদমতগার কাঁতারের লোক থাকে, যারা

নিজেদের কথা কাজের দ্বারা লজ্জাহীনতা অশ্লীলতা আরাম-প্রিয়তা এবং সহজ পথ অবলম্বনের নীতির প্রসার কল্পে সর্বদাই নিমগ্ন থাকে। তারা জীবনের সেই সকল মহান মূল্যবোধ সমূহের অবমাননা করতে থাকে, যা স্বেচ্ছাচারী ধনাঢ্য সম্প্রদায়ের স্বার্থের সাথে সংঘর্ষশীল হয়।

এ ব্যাধিটি ক্রমান্বয় আস্তে আস্তে জীবনের সকল শাখা-প্রশাখায় সংক্রমিত হয়ে পড়ে। এ অনিষ্টতা পরিশেষে সমাজ জীবনে এমন অবস্থার সৃষ্টি করে যে, অশ্লীলতা নগ্নতা নির্লজ্জতা সাধারণ রূপে সমস্ত জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, একটি লেগামহীন পাশবিকতা ছোট বড় আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলের চাল-চলন ও রীতি-নীতিতে পরিণত হয়। মানুষের শুধু কেবল দেহ যন্ত্রটিই নয়; বরং মন-মজ ও দুর্বলতা ও অলসতার শিকারে পরিণত হয়ে অকেজ হয়ে আধ্যাত্মিক ও মানসিক মূল্যবোধের প্রদীপ নিবু নিবু করতে থাকে। যখন সমাজ এ ধরণের নীচু মনোবৃত্তি সম্পন্ন হয়ে অশ্লীলতা নির্লজ্জতা ও নগ্নতার মধ্যে নিপতিত হয়, তখন তা আল্লাহ তায়ালার সাধারণ নীতি মোতাবিক ধ্বংস ও নির্মূল হয়ে যাবার যোগ্য পাত্রে পরিণত হয় এবং আল্লাহ তায়ালা ইটের দ্বারা, ইট্ পিটিয়ে সম্পূর্ণরূপে পামাল করে দেন।

এই হচ্ছে আরাম-প্রিয়তার অপরাধের ইতিহাস ও পরিণতি। এ অশ্লীলতা প্রথমতঃ কতিপয় ব্যক্তির কার্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ হয়। অতঃপর সমাজ যখন তার বেলায় মৌনতা প্রদর্শন করে, তখন এ অনিষ্টতা তার পরিণতি প্রকাশ করে দেয় এবং স্বীয় দুষ্প্রভাব দ্বারা ঘষে ঘষে সমাজ দেহটিকে একটি পুরানো ক্ষত স্থানে রূপান্তরিত করে এবং তার অগ্রণী ভূমিকার উপর পরিণতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আর সংস্থান কৃত উপকরণ সমূহের কারণে মূল বস্তু বাস্তবে রূপ নেয়ার নিয়ম-নীতির অধীনে এ অনিষ্টতা পরিশেষে সমাজকেই ধ্বংসের গহীন কুয়ায় নিক্ষেপ করে।

আল্লাহতালার শ্বাশত চিরন্তন বিধান হচ্ছে– কুরআনের ভাষায় নিম্নরূপ।

سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا -

“তোমরা কখনোই আল্লাহ তায়ালার শ্বাশত বিধানের ভিতর রদ-বদল দেখতে পাবে না।” (সূরা আহযাব–৬২)

এখানে একটি প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে, আরাম প্রিয়তা এবং দরিদ্রতার সীমারেখা কতটুকু। আর এ দুটির মধ্যে মধ্যম পথ কোন্‌টি?

ইসলামের প্রথম যুগের ইতিহাস আলোচনা করলে সেখানে শুধু দুঃখ দৈন্য ও দারিদ্রতারই করুণ ছায়াচিত্র আমাদের চক্ষুর সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। তখনকার যুগে মুসলিম সমাজে সাধারণ রূপে দরিদ্রতার কালো ছায়া ব্যাপৃত ছিল। অথচ আমরা সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে, রাসুলে করীম (সাঃ) মানুষকে রেশমী পোষাক পরিধান করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

"যে ব্যক্তি এ পার্থিব জগতে রেশমের পোষাক পরিধান করবে পরকালে এ ধরণের পোষাক তার ভাগ্যে জুটবে না।" (বুখারী)

হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলে করীম (সঃ) তাকে সুতী বস্ত্রের উপর রেশম দ্বারা চিত্র অঙ্কনকৃত কাপড় এবং হলুদ রংয়ের কাপড় এবং স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। এ নিষেধাজ্ঞা শুধু পুরুষের বেলায়ই প্রযোজ্য। নারীদের জন্য রেশমের পোষাক এবং স্বর্ণের অলঙ্কার ব্যবহারকে বৈধ করে দেয়া হয়েছে বটে। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) তাঁর আদরের দুলালী হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর জন্য স্বর্ণের অলঙ্কার ব্যবহার করাকে পছন্দ করতেন না। অবশ্য এ নিষেধাজ্ঞা ছিল বিশেষ রূপে তাঁর পরিবার বর্গের জন্য। সাধারণ মানুষের বেলায় এ নিষেধাজ্ঞা মেনে চলা জরুরী ছিল না।

আমাদের মতে এ কথা বলা হারামকে হালাল করে দেয়ার নামান্তর হবে না যে, জাতির অর্থনৈতিক অবস্থা ও পাত্র সমূহের যদি কাম্য না হতো, তবে ইসলাম নিজেই দারিদ্রতার বেশ অবলম্বনের নিমিত্ত কখনো আহ্বান দিত না। আর এটা ও সত্য কথা যে, বিচিত্র রংয়ের রঙ্গিন কাপড় এবং রেশমী ও চিত্র অঙ্কনকৃত পোষাক পরিধান করা হলে পুরুষের যে স্বতন্ত্র মান-মর্যাদায় ভাটা পড়ে এবং তাদের মহত্ব ও গাম্ভীর্য্যতায় আঘাত হানে, তাতে আদৌ কোন সন্দেহ নেই। এমন পোষাক পরিধান দ্বারা আরাম-প্রিয়তা ও সহজ পছন্দী তাদের মধ্যে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করে নেয়ার পথ পেয়ে যায়।

বিশেষ করে দেশে যখন যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান থাকে এবং সমাজে অর্থনৈতিক অবস্থা যখন এ ধরণের সাজ সজ্জার অনুমতি দেয় না, তখনকার জন্য ব্যক্তিগত জীবন ছাড়াও জাতীয় জীবনের জন্য খুবই অশুভ কাজে পরিণত হয়। কিন্তু মানুষ ভাঙ্গাচুরো অবস্থায় জীবন-যাপন করে অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতার আবর্জনার কুয়ায় নিমজ্জিত হোক এবং স্বীয় পোষাক পরিচ্ছদের বেলায় এমনরূপে বেপরওয়া হোক যে দেখলে মানুষের মনে বর্বরতা ও অসভ্যতার ধারণা জন্মে, এটা কখনোই নবী করীম (সাঃ) পছন্দ করতেন না।

হযরত জাবির (রাঃ) বলেন– একবার নবী করীম (সাঃ) আমাদের নিকট সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আগমন করেছিলেন। তিনি এক ব্যক্তিকে চিন্তান্বিত অবস্থায়

এবং তার মাথার চুল এলোমেলো দেখে তাকে বললেন– তুমি কি স্বীয় মাথার কেশ পরিপাট্য করার জন্য কিছুই পাও না?

আর একবার নবী করীম (সাঃ) অপরিষ্কার কাপড় পরিধান অবস্থায় দেখে বললেন– স্বীয় কাপড় খণ্ড পরিষ্কার করার জন্য তোমার কি কিছুই নেই? হযরত আবুল হাওজ হাশামী (রাঃ) স্বীয় পিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, তিনি বলছেন, আমাকে একবার একখানা ছিড়া ও অপরিষ্কার কাপড় পরিধান অবস্থায় দেখে নবী করীম (সাঃ) আমার নিকট জিজ্ঞেস করলেন– তোমার নিকট কি ধন সম্পদ আছে? আমি উত্ত করিলাম, হাঁ আছে। তিনি আবার বললেন কি ধরণের সম্পদ। আমি বললাম– আল্লাহ তায়ালা আমাকে সর্বপ্রকার ধন-সম্পদ দান করেছেন। এমন কি উট বকরীও আমার আছে। তখন নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ

"যখন আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ধন-সম্পদ দান করে সৌভাগ্যশীল করে তুলেছেন, তখন তোমার বহ্যিক জগতে যাতে তার নিয়ামত ও বদান্যতার প্রভাব বিরাজমান অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়, সে বিষয় সচেষ্ট থাকা একান্ত কর্তব্য।" (আবু দাউদ, নাসাঈ)

আপর এক হাদীসে নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

"আল্লাহ তায়ালা পবিত্র তিনি পবিত্রতাকে পছন্দ করেন। তিনি পরিষ্কার পরিচ্ছন। অতএব পরিষ্কার পরিছন্নতাই তার নিকট প্রিয়। তিনি দাতা ও দয়ালু, সুতরাং দানশীলতা ও দয়াদ্রই তার নিকট খুব প্রিয় কাজ। হে মানুষ তোমরাও সর্বদা পরিষ্কার পরিছন্ন অবস্থায় থাকো। ইয়াহুদীদের ন্যায় অশালীন ও বর্বর হয়ো না। (তিরমিষী)

আল্লাহ তায়ালা বনী আদমকে যে পোষাক পরিচ্ছদ সাজ সজ্জা ও অলঙ্কারাদী ব্যবহার করার নিমিত্ত এবং হালাল বস্তুকে হারাম না করার নিমিত্ত এবং হারাম বস্তুকে হালাল না করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, সে বিষয় ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। সে আলোচনার আলোকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, সমাজের সাধারণ অর্থনৈতিক মানদণ্ডই আরাম-প্রিয়তা এবং খারাপ অবস্থার সীমারেখা নির্দিষ্ট করতে পারে। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা যখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও বড় বড় শহরগুলো মুসলমানদেরকে বিজয় দান করে তাদের দখলে এনে দিয়েছিলেন। আর সাধারণ রূপে মুসলমানগণ বিরাট ধন-সম্পদের মালিক হয়ে তাদের অর্থনৈতিক মান উন্নত হলো। তখন তাদের পোষাক পরিচ্ছদও পরিবর্তন হলো। আর তাঁরা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত সেই সকল নেয়ামতবলীও ভক্ষণ করতে আরম্ভ করলো, যা ইতিপূর্বের তাদের হস্তগত ছিল না। এ কাজে কেউই তাদেরকে তখন বাঁধা দান করেনি। হাঁ, যখন তারা যুক্তি ও ন্যায় পরায়ণতার সীমারেখা অতিক্রম করেছে, তখনই তাদর উপর সমালোচনার অনির্বাণ নিক্ষেপ করা হয়েছে। রাসুলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

"যা ইচ্ছে তাই পানাহার করো, কিন্তু সাবধান অপব্যয় এবং বিলাসিতা এ দু'টি কাজ থেকে সর্বদা বিরত থাকবে।" (বুখারী)

কিন্তু সাথে সাথে আমরা এ সত্যটির উপর বিশেষ জোড় দিতে ইচ্ছুক যে ইসলাম মানব জীবনের জন্য যে চলন, ফ্যাসান ও গতি প্রকৃতির পক্ষপাতি, আর যা সে সাধারণ রূপে সমাজে প্রচলিত দেখতে চায়, তা হচ্ছে সরলতা ও অনাড়ম্বরপূর্ণ জীবন। ইসলাম তার অনুগামীদেরকে এ স্বতন্ত্র মর্যাদা দেয় যে, তারা জাগতিক সাজ-সরঞ্জাম ও উপজীবিকার এমন মুখাপেখী হবে না, যাতে তারা তার গোলামে পরিণত হয়। বরং তার দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়েই জীবন-যাপন করার আহ্বান জানায়। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"দিরহামের পুজারীগণ ধ্বংস হোক এবং দীনারের গোলামরাও হালাক হোক, আর মখমলের মর্যাদার গোলামেরাও ধ্বংস হয়ে যাক। তারা ধ্বংস হয়ে ধুলিস্যাৎ হবে এবং যখন তাদের দেহে কাঁটা বিদ্ধ হবে, তখন আর তা বাহির করা যাবে না।"

ইসলামের আসল স্বরূপ হচ্ছে বস্তুগত জাগতিক সাজ-সরঞ্জামের দাসত্বের শৃংখল থেকে মুক্ত হবার সাথে সাথে তা ব্যবহারের বেলায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা। সুতরাং মধ্যম পথ যে, কোন্‌টি তা মুসলমানদের অন্তরের চেতনা অনুভূতিই ভালরূপে ওয়াকিফহাল আছে, বলার প্রয়োজন করে না।

যাকাত দান

এখন আমরা যাকাত সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করতে চাই। যাকাত ইসলামের প্রধানতম রোকন সমূহের এমন একটি রোকন, যা প্রকাশ্য রূপে সমাজ জীবনের রক্ষাকবচ রূপে স্থির করা হয়েছে। ইসলামের অর্থনৈতিক আলোচনায় যাকাতকেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শীর্ষস্থান দান করা হয়েছে। যাকাত ধন সম্পদের উপর আরোপিত একটি অধিকার। এক দিক দিয়ে তা যেমন ইবাদাত, অপর দিকে তা একটি সামাজিক কর্তব্য। ইবাদাত এবং সামাজিক সমস্যাসমূহের ব্যাপারে ইসলামের চিন্তাধারা সামনে রেখে আমরা যাকাতকে একটি সামাজিক ইবাদাত রূপে বর্তব্য স্থির করবো। এ কারণেই তার "যাকাত" নামকরণ করা হয়েছে। যাকাতের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পবিত্রতা ও বর্দ্ধনশীলতা। এর দ্বারা মনের কুলুষ দুরীভূত করে পবিত্রতা অর্জনের কর্তব্য সম্পাদনের পর যা অর্জন হয় তা বুঝান হয়েছে। এটা অন্তরের এমন পবিত্রতার নাম যা সত্তার প্রতি ভালবাসা এবং লোভ লালসা ও কৃপণতার স্বভাবগত চরিত্র বৈশিষ্ট্যের উর্দ্ধে উঠে তা থেকে মুক্ত হবার পরই অর্জন হয়। সাধারণতঃ ধন সম্পদ সকলের নিকটই একটি প্রিয় বস্তু এবং তার মালিক হওয়াকে সবাই মনে-প্রাণে পছন্দ করে। তাই মন দিয়ে তাকে অপর লোকদের জন্য ব্যয় করতে

চায়, তবে তা দ্বারা আত্মার পরিচর্য্যা ও পবিত্রতা সাধন না হয়ে পারে না। এর ভিতর তার নূরানী আলোক বলাকা নিহিত। যাকাত ধন-সম্পদকে এমন রূপে পবিত্র করে দেয়, যা ধন-সম্পদে অধিকার দান করার পর এবং এমনি রূপে বৈধ নিরূপিত হবার পরই অর্জন হওয়া সম্ভব। যাকাতের এহেন ইবাদাতী দিকটির কারণে ইসলাম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদের থেকে তা আদায় করার দাবিকে কখনো পছন্দ করে না। বরং তার পরিবর্তে সে অমুসলিম নাগরিকদের উপর যাতে তারা রাষ্ট্রের সাধারণ উৎপাদন ও উন্নয়নের কাজে সমভাবে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পায়, সে জন্য "জিজিয়া" নামে তাদের উপর কর, ধার্য করে। হাঁ, যদি কোন অমুসলিম নাগরিক তা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে নেয়, তবে স্বতন্ত্র কথা। নতুবা জোর-জবরদস্তী মূলক তাদের উপর ইসলামের কোন ইবাদাতী দায়িত্ব কর্তব্য চাপিয়ে দেয়া যায় না।

যাকাত হচ্ছে সমাজের দরিদ্র লোক ও অভাবী শ্রেণীদের প্রয়োজন পুরণের নিমিত্ত এমন একটি সামাজিক অধিকার, যা ব্যক্তির উপর ওয়াজিব করা হয়েছে। মাঝে মাঝে তা দ্বারা একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদী সংস্থান করা ছাড়াও জীবনের অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামও সংগ্রহ করা যায়। এমনিভাবে ইস্‌লাম

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ আয়াতের দ্বারা যে পুঁজির কন্ট্রোল প্রথা নিরসন কামনা করেছেন, এর দ্বারা কোন একটি সীমারেখা পর্যন্ত এ নীতিকে বাস্তব রূপ দান করা হয়। মানুষ দরিদ্রতার নির্যাতনে জর্জরিত হয়ে অন্তঃসার শূন্য হয়ে পড়ুক ইসলাম তা কখনোই পসন্দ করে না। সে এ নীতি নির্ধারণ করেছে যে, ব্যক্তির যদি ক্ষমতা থাকে, তবে সে নিজ বাহু বলে স্বীয় প্রয়োজন পুরণ করার ব্যবস্থা করবে। আর যদি সে তা করতে অপারগ হয়, তবে সমাজের ধন-সম্পদ থেকে তার প্রয়োজন পুরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

মানুষ গরীব ও দরিদ্রতার মধ্যে নিপতিত হয়ে থাকুক, তা ইসলাম কেন পছন্দ করে না? এ জন্য করে না যে, সে চায় মানুষকে তার বস্তুগত ও জাগতিক প্রয়োজন থেকে অবসর সময় তাকে এমন একটি মহৎ ও গৌরবময় পদমর্যাদার পানে আকৃষ্ট হবার সুযোগ করে দিতে, যা আল্লাহ কর্তৃক দানকৃত মানবতার মহান ও গৌরবময় ঐতিহ্যের বিশেষত্ব স্বরূপ। কুরআন মজীদে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ـ

"আমি বনী আদমকে মহত্ত ও শ্রেষ্টত্বের অধিকারী বানিয়েছি এবং তাদেরকে জলে স্থলে চলাচলের নিমিত্ত যানবাহন দান করেছি। আর তাদেরকে পবিত্রতম বস্তু থেকে রিযিক দান করে আমার সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন প্রকার অনেক বস্তুর উপর প্রাধ্যান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ও দান করেছি। (সূরা বনী ইসরাইল-৭০)

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এ মহত্ত্ব ও সম্মান তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি, অনুভুতি চেতনাবোধ এবং দৈহিক প্রয়োজন হতে মহান উচ্চতম উদ্দেশ্যের পানে আধ্যাত্মিক প্রবণতা দান করে বাস্তব রূপে দান করেছেন। অতএব এখন যদি মানুষের জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী ও সাজ-সরঞ্জাম এতটুকু পরিমাণে না পায়, যাতে তারা এর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক অভীপ্সা ও প্রবণতা চরিতার্থ করণ এবং উন্নত ধরণের চিন্তা জগতে বিচরণ করার জন্য কিছুটা অবসর সময় যাপন করতে পারে, তবে তার অর্থ হবে তাদের থেকে এ মহত্ত্ব ও গৌরবত্ব বস্তুটি ছিনিয়ে নেয়া। আর তখন তারা শুধু জীব-জন্তুর পদমর্যাদায়ই প্রত্যাবর্তন করেনা, বরং তার চেয়েও অনেক নিম্নে চলে যায়। কারণ সাধারণঃ জীব-জন্তুদের পানাহারের বস্তু সংস্থান হয় এবং অনেক জীব-জন্তুই আনন্দে নর্তন কুর্দন করে বহু পাখী শিকার করে আহারের পর জীবনের সৌন্দর্য ও কর্মনীয়তার প্রাচুর্যে আনন্দ উৎসব করে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে থাকে।

যে ব্যক্তি খাদ্য-দ্রব্য অন্বেষণের চিন্তায় এমন গভীর ভাবে নিমগ্ন থাকে যে, মানুষের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের উপযোগী চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণার পানে মনোনিবেশ করাতো দুরের কথা, এতটুকু অবসর এবং এতটুকু মানসিক অবকাশ যাপনের তার সুযোগ হয় না, যতটুকু বনের পাখীরা পায়। এ সকল লোকদেরকে মানুষ নামে যেমন অবিহিত করা যায় না অনুরূপ আল্লাহর নিকট তাদের এবং অন্যান্য জীব-জন্তুর মধ্যে কোনই পার্থক্য রেখা এবং এ শ্রেষ্ঠত্ব মহত্ত্ব কিছুই থাকে না। এহেন অবস্থায় মানুষ নিজের সমুদয় সময় এবং যথাসাধ্য চেষ্টা চরিত্র চালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও যদি তাদের প্রয়োজন পরিমাণ খাদ্য দ্রব্যের সংস্থান করতে না পারে, তবে তা তার জন্য মৃত্যুরই শামিল। আল্লাহ তায়ালা তাকে যে গৌরব ও মহত্ত্ব দান করেছে, তা তাদেরকে তার চেয়েও অনেক নিম্নে ফেলে দেয়। যে সমাজের লোক এ অবস্থার মধ্যে নিপতিত, সে সমাজের জন্য এ অবস্থা খুবই মারাত্মক কথা। এ সমাজটি এমন একটি হীন ও নীচু সমাজ, যা আল্লাহ প্রদত্ত্ব মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের মোটেই উপযুক্ত নয়। কারণ এ সমাজ আল্লাহর ইচ্ছা আকাংখার বিপরীত পথে পরিচালিত হয়। আল্লাহর এ যমীনের বুকে মানুষ হচ্ছে তার নিজস্ব প্রতিনিধি স্বরূপ। তাকে আল্লাহ তায়ালা প্রতিনিধির এ পদমর্যাদা এ

জন্য দান করেছেন যে, তারা এ যমীনে বসে নিজনিজ জীবনকে লালন-পালন করে তাকে ক্রমবর্দ্ধমান রূপে ধাপে ধাপে উন্নত করে তুলবে। আর তাকে উন্নত সাবলীল ও আনন্দময় করে আল্লাহ প্রদত্ত সমুদয় নেয়ামতের জন্য শুক্‌রিয়া জ্ঞাপন করবে। এ কথা দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, মানব জীবনটি যদি রুজি রোজগারের লক্ষ্যে পরিণত হয়; তবে সে যথেষ্ট পরিমাণেই তা অর্জন করতে পারুক, কি না পারুক, সে কখনোই জীবনের মহৎ উদ্দেশ্যে অর্জন করতে পারবে না। অতঃপর এ জীবনটি এমনই দুর্বিসহ জীবন হয় যে, মানুষ তার ভিতর অনাবরত জীবনভর চেষ্টা চালিয়েও স্বীয় প্রয়োজন পুরণ করতে ব্যর্থ হয়।

মুসলিম সমাজের লোকদের মধ্যে এত বিরাট পরিমাণে পার্থক্য থাকুক যে, একদল লোক সদা সর্বদা ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশের শীর্ষ চূড়ায় উঠে আড়ম্বরপূর্ণ অবস্থায় জাঁক-জমক ভাবে জীবন যাপন করবে, আর একদল দরিদ্রতার যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে বুভুক্ষ ও বস্ত্রহীন অবস্থায় ধুকে ধুকে জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থায় জীবনের শেষ দিনটির জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে, এটা ইসলাম কখনই পছন্দ করে না এটা সে চায়ও না। বরং এ অবস্থা নিরসন করাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য। এ সমাজকে কখনোই মুসলিম সমাজ বলা যায় না। আল্লাহর রাসুল (সাঃ) ঘোষণা দেন ঃ

"যে বস্তী এলাকায় কোন ব্যক্তি বুভুক্ষ অবস্থায় রাত্রটি প্রভাত করে সে বস্তীর উপর থেকে আল্লাহ তায়ালার হেফাজত ও রক্ষণশীলতার চুক্তি শেষ হয়।

(মসনদে আহ্‌মদ)

তিনি আরো বলেছেন– "তোমাদের মধ্যে কাহারো ঈমান তখন পর্যন্ত বিশ্বাস যোগ্য নয়, যতক্ষণ না তোমরা নিজেদের জন্য যা কিছু চাও ও পছন্দ করো, তা নিজের ভাইয়ের জন্য পছন্দ না করবে এবং না চাবে।"

(বুখারী, মুসলিম)

ইসলাম সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে এত বিরাট ব্যবধানকে সমর্থন না করার কারণ কি? এর জবাব হিংসা-বিদ্বেষের সেই ভয়াবহ চেতনার মধ্যেই নিহিত, যা সমাজের ভিত্তিমূলকে কাঁপিয়ে তুলে। এর জবাব পাওয়া যায় সেই অবৈধ অর্থনৈতিক ব্যবধান, অধিকার হরণ এবং কঠিন অন্তকরণের মধ্যে, যা মানুষের মন-মেজাজ ও অন্তঃকরণ মলিন করে দেয়। সমাজে এতখানি অর্থনৈতিক পার্থক্য থাকার অর্থ হচ্ছে, দরিদ্র শ্রেণী লোকদেরকে চুরি-ডাকাতি লুটতরাজ করনে এবং আত্মমর্যাদা ও স্বকীয়তা থেকে হাত ধুয়ে মুছে অপমান ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মধ্যে নিপতিত হতে বাধ্য করা। এটা মানুষকে গর্হিত কার্জের

পানে নিয়ে যাওয়ার এমন একটি কারণ, যা থেকে ইসলাম সমাজকে রক্ষা করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

দেশের সম্পদ জাতির ধনাঢ্য ব্যক্তিদের হাতের মুঠায় রয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকুক, ইসলাম তা কখনো কামনা করে না। আর জনসাধারণের অধিকাংশ লোক তাদের ব্যয়কার্য নির্বাহের নিমিত্ত মাল-দৌলতের মালিক না হউক, এটাও সে চায় না। কারণ এর পরিণতি গিয়ে এ হয় যে, জাতীয় জীবন এর দ্বারা প্রায় নির্বাণোম্মুখ হয়ে পড়ে। আর দৈনন্দিন আয় উপার্জনের কর্ম সংস্থান ও আমদানী এবং উৎপাদনের হার নিম্নগামী হয়ে পড়ে। অধিকাংশ লোকের হাতে সম্পদ থাকলে তারা তা নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করার কাজে ব্যয় করে। যার কারণে দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা বেড়ে যায়, উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পায় এবং কর্মক্ষম লোকদের জন্য কর্মের সংস্থান হয়। এমনি রূপে শ্রম ও সম্পদ উৎপাদন এবং সম্পদ ব্যয়ের কাজ স্বীয় স্বাভাবিক গতিধারায় প্রচলিত হয়ে তার উপকারিতা আপনা হতেই প্রকাশ হয়ে পড়ে।

যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তনে উদ্দেশ্য এটাই। শরীয়াত তাকে এমন একটি ধন-সম্পদগত দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারিত করে, যা তার প্রাপকদের জন্য একটি আইনগত অধিকার। এটা যাকাত দাতাদের দান বা এহসান নয়। এর সীমারেখা ও নেসাব ইসলাম এমনভাবে ঠিক করে দিয়েছে, যাতে সমগ্র ধনী ব্যক্তিরাই তা আদায় কল্পে সমভাবে শরিক হতে পারে। কেননা যে সীমারেখার কম পরিমাণের সম্পদের উপর যাকাত ধার্য্য করা হয় না, তা হচ্ছে বিশ মিশকাল পরিমাণ স্বর্ণ, যা আমাদের দেশীয় মূদ্রায় ত্রিশ পাউণ্ডের সমপরিমাণ। অবশ্য এখানে এ শর্ত রাখা হয়েছে যে, মালিক ঋণগ্রস্থ হতে পারবে না; আর এ টাকা স্বীয় প্রয়োজনাদি পুরণ করার পর বেশীরূপে হতে হবে এবং এ সম্পদ পুর্ণ একটি বছর ঘুরতে হবে। এ কথা পরিষ্কার যে, যে সকল লোক নিজেরাই যাকাত গ্রহণের যোগ্য, তাদের থেকে যাকাত আদায় করার দাবি করা যায় না। উৎপন্ন ফসল এবং ফল মুলের যাকাত মৌসুমে মৌসুমে আদায় করতে হয়। আর মৌসুম হয়ে গেলেই তা আদায় করা ওয়াজিব। ব্যবসায়ী দ্রব্য সামগ্রীর যাকাত স্বর্ণ অথবা রৌপ্যের হিসেবে তার যে মূল্য নির্ধারণ হবে, তার হিসাব অনুযায়ী যাকাতের হিসাব হয়। গৃহ পালিত পশুর বেলায় তার যাকাতের নেসাব তাই নির্ধারণ করা হয়েছে যা নগদ পুঁজির বেলায় প্রযোজ্য। অর্থাৎ চল্লিশ অংশের একাংশ। ভু-সম্পদের বেলায় নিয়ম হচ্ছে এক পঞ্চমাংশ যাকাত হিসেবে ধার্য হবে। অবশ্য ভুসম্পদের বিভিন্ন

প্রকার হওয়ার কারণে আইন বেত্তাদের মধ্যে মত বিরোধ রয়েছে। কেউ বলেছে, তার মালিক হবেন সমগ্র জাতি, অর্থাৎ বায়তুল মাল। পবিত্র কুরআন মজীদের ঘোষণা অনুযায়ী নিম্নলিখিত গুণবিশিষ্ট লোকেরাই হলো যাকাত পাবার উপযুক্ত ব্যক্তি।

১। ফকীর

শরীয়াতের পরিভাষায় নেসাবের চেয়ে কম পরিমাণ ধন-সম্পদ যাদের নিকট রয়েছে, তাদেরকেই ফকীর নামে অভিহিত করা হয়। অথবা তদের নিকট নেসাব পরিমাণ মাল আছে বটে, কিন্তু তারা ঋণগ্রস্ত। যদি তারা ঋণের টাকা পরিশোধ করতে যায়, তখন আর তাদের নিকট নেসাব পরিমাণ মাল থাকে না। এ ধরণের লোকদেরকেই ইসলাম ফকীর নামে অভিহিত করেছে এবং যাকাত পাবার অধিকারী বানিয়েছে। এ কথা পরিষ্কার যে তাদের নিকট কিছু না কিছু পরিমাণ ধন-মাল অবশ্যই বর্তমান থাকে। কিন্তু তা তাদের প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। প্রয়োজন পরিমাণ ধন মালের অধিকারী যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিই হতে পারে, ইসলাম তাই কামনা করে। তারা যাতে জাগতিক সাজ-সরঞ্জাম দ্বারা উপকৃত হবার নিমিত্ত যথাসম্ভব প্রয়োজনের তুলনায় অধিক আয় করতে পারে, এটাই তার ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং এ জন্যই যাকাতের ব্যবস্থা প্রবর্তন।

২। মিস্‌কীন

মিস্‌কীন ঐ সকল লোকদেরকে বলা হয় যাদের নিকট কিছু না কিছু ধন সম্পদ মওজুদ থাকে। তারা স্বাভাবিক রূপেই ফকীরদের তুলনায় যাকাত পাবার অধিকতর যোগ্যতম ব্যক্তি। কিন্তু আমার মতে কুরআনে করীমের যে আয়াতে যাকাতের সম্পদ ব্যয়ের স্থানের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, সেখানে মিস্‌কীনদের পূর্বে ফকীরদের কথা উল্লেখ করে এ কথার পানেই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, ফকীরদের নিকট অল্প বিস্তর যা কিছু আছে, তা তাদের জন্য যথেষ্ট নয়। তাদের অবস্থাও মিস্‌কীনদের ন্যায়। ইসলাম শুধুমাত্র প্রয়োজন পরিমাণ ধন-সম্পদ থাকাটাকেই বাঞ্ছনীয় মনে করে না, বরং তার চেয়ে কিছু অধিক সংস্থান হওয়াটাই তার কাম্য।

৩। যাকাত আদায়কারী

যারা তহশীলদার রূপে যাকাত আদায় করার কাজে নিয়োজিত থাকেন, তাদেরকে পারিশ্রমিক হিসেবে যাকাতের তহবীল থেকে ধন-সম্পদ দান করার ব্যবস্থাও শরীয়াত গ্রহণ করেছে। এটা এক ধরণের ভাতা বিশেষ। উক্ত ব্যক্তি যদি

নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকও হয়, তবে দোষের কিছু নেই। তাদের এ ভাতাটা হচ্ছে শ্রম ও পারিশ্রমিকের সাথে জড়িত, প্রয়োজন পুরণের সাথে এর কোনই সম্পর্ক নেই।

৪। মোয়াল্লেফাতুল কুলুব

অর্থাৎ যারা সবেমাত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে, তাদের মন জয় করার নিমিত্ত সাহস বৃদ্ধির জন্য যাকাতের সম্পদ দান করা যায়। এর দ্বারা তাদের ন্যায় অন্যান্য অমুসলিমদেরকেও আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে ইসলাম থেকে যারা ফিরে গিয়ে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের পর এ খাতে ব্যয় বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কারণ এর পর ইসলাম এত দুর্জয় শক্তি অর্জন করেছিল যে, ধন-সম্পদ দান করে অমুসলিমদের মন জয় করার আর প্রয়োজন ছিল না। এতদ্‌সত্ত্বেও ইসলাম কুরআনে করীমের একটি আয়াতের দ্বারা ঘোষণার মাধ্যমে এ ধরণের লোকদেরকে যাকাত পাবার অধিকারী হবার হুকুম বহাল রয়েছে। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) এ ব্যাপারে নও মুসলিমদের সাহায্যের জন্য যাকাতের সম্পদ ব্যয় করাতে কোনরূপ অসুবিধা মনে করেন নি।

৫। দাসত্ব থেকে মুক্তি করার নিমিত্ত

অর্থাৎ যে সকল দাস-দাসী স্বীয় প্রভুর সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ ধন-সম্পদের বিনিময় দাসত্ব শৃংখল থেকে মুক্ত হবার নিমিত্ত চুক্তি স্বাক্ষর করেছে তাদেরকে দাসত্ব শৃংখল থেকে মুক্ত করার নিমিত্ত যাকাতের সম্পদ থেকে আর্থিক সাহায্য দানের জন্য ইসলাম এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে।

৬। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য

যারা স্বীয় পুঁজির চেয়ে অধিক পরিমাণে ঋণ হয়ে পড়েছে, তাদেরকে যাকাতের সম্পদ থেকে আর্থিক সাহায্য দান করা যায়। অবশ্য শর্ত হচ্ছে যে এ ঋণ কোন গুনাহর কাজের জন্য নেয়া হলে যাকাতের সম্পদ থেকে সাহায্য দেয়া যাবে না। যেমন আরাম প্রিয় কোন কাজের জন্য ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়া। তাদেরকে যাকাতের সম্পদ হতে আর্থিক সাহায্য দান করা হলে একদিকে যেমন তা ঋণশোধ করার একটি মাধ্যমে পরিণত হয়, অনুরূপ শালীনতাসহ মান-সম্মানের সাথে জীবন-যাপন করারও সুবর্ণ সুযোগ হয়।

৭। ফী-সাবীলিল্লাহর খাতে

এ-খাতটি এমন একটি খাত, যার বাস্তব রূপায়ণ অবস্থাই নির্দিষ্ট করে দেয়। যেমন মোজাহিদদের প্রস্তুতি, রোগীর সেবা শুশ্রূষা, যারা অর্থাভাবে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হবার সুযোগ পাচ্ছে না; এ অর্থ দ্বারা তাদের শিক্ষার সুযোগ করে

দেয়া। মোটকথা যে সকল কাজ মুসলমানদের কল্যাণ ও উপকারার্থে হয়, তা সমুদয়ই এ খাতের আওতায় পড়ে। এর ভিতর বিরাটাকার প্রশস্ততা রয়েছে যে, বিভিন্ন অবস্থায় সমুদয় সামাজিক কাজই এর অধীনে পড়ে।

৮। মুসাফির

যারা বিদেশে থাকা কালে খালি হাত হয়ে পড়ে এবং নিজেদের ধন-সম্পদ থেকে উপকৃত হতে পারে না, এ ধরণের অভাবী মুসাফিরদেরকে যাকাত দান করে সাহায্য করতে বলা হয়েছে। মুসাফিরের এ সংজ্ঞার অধীনে যারা যুদ্ধের কারণে অথবা জুলুম অত্যাচার ও লুটতরাজের দরুন দেশ থেকে বিতাড়িত ও নির্বাসিত হয়, তারাও পড়ে। কারণ তাদের নিকট যা কিছু ধন-সম্পদ ছিল, তা তারা জীবনের মায়ায় ফেলে আসতে বাধ্য হয়েছে, যার দরুন তারা এখন আর নিজেদের ধন-সম্পদ থেকে উপকৃত হতে পারছে না।

প্রকাশ থাকে যে ইসলাম এ সকল প্রাপক ব্যক্তিদেরকে যাকাত থেকে অংশ পাবার অধিকার তখনই দান করে যখন তারা ধন-সম্পদ অর্জন করার বেলায় কোন চেষ্টা চরিত্র চালাবার ত্রুটি করে না, আপ্রাণ চেষ্টা করেও সফল হতে পারে না। এ নীতি গ্রহণ করার দরুণ ইসলাম সবচেয়ে আত্ম মর্যাদাবোধ ও সম্মানকে গুরুত্বপূর্ণ বস্তু মনে করে। এ জন্যই সে প্রত্যেক ব্যক্তির আয় উপার্জনের এমন একটি স্বাধীন পথের সংস্থান করে দেয়, যেখানে সে কোন ব্যক্তির এমন কি সমাজের অধীনস্থ ও মুখাপেক্ষী হতে বাধ্য না হয়। এ কারণেই সে মানুষকে পরিশ্রম করতে এবং এ ধরণের সাহায্য না নেয়ার জন্য উৎসাহ দেয়। আর এ কারণেই সে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্মসংস্থানের প্রথম দায়িত্ব অপর্ণ করে সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর। এক ব্যক্তি রাসুলে করীম (সাঃ)-এর নিকট কিছু প্রার্থনা করেছিল। তখন তিনি তাকে একটি দীরহাম দান করে বললেন এ দীরহামটি দ্বারা বাজার থেকে একটি রশি ক্রয় করে তা নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে কাঠ বেঁধে এনে বাজারে বিক্রয় করবে। আর স্বীয় বাহুবলের আয় উপার্জন দ্বারা জীবন নির্বাহ করার উপদেশ দান করে তিনি এরশাদ করেছেন ঃ

"মানুষের কাছে খয়রাত প্রার্থনা করবে এবং তাদের যদি মনে চায় তবে কিছু দিবে, অন্যথায় ফিরে যেতে বলবে। এর চেয়ে তোমাদের কেউ রশি নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে কাঠ বেঁধে তা নিজের পিঠে বহন করে বাজারে বিক্রিয় করে জীবন নির্বাহ করা কতই না সুন্দর এবং কতই না ভাল। (বুখারী, মুসলিম)

যাকাত তহবীল থেকে দেয়া সাহায্য হচ্ছে শেষতম সামাজিক রক্ষাকবচ। আসলে যারা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেও বিশেষ কিছু আয় রোজগার করতে পারে না অথবা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত কম কিম্বা নিম্নতম প্রয়োজন মাফিক আয়

করতে পারে, কেবল মাত্র এ ধরণের লোকদের জন্যই হচ্ছে এহেন সামাজিক রক্ষা ব্যবস্থা। যাকাত ব্যবস্থা দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্য সামাগ্রী, শ্রম ও আয়-ব্যয়ের মধ্যে নিয়মিত পন্থায় যাতে করে পুঁজি খাটান যায়, সে জন্য সমাজের সকল ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পদ বির্বতন করানোর উদ্দেশ্যটিও কার্যকরি হয়। এখানে ইসলাম একই সাথে সমস্যার উভয় দিকই রক্ষা করে চলছে। একদিকে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করে কাজ করার এবং সমাজের সাহায্য পেয়ে কর্মহীন অবস্থায় সময় কাটিয়ে না দেয়ার ইচ্ছা। আর অপর দিকে প্রত্যেক প্রয়োজনশীল ব্যক্তিদেরকে প্রয়োজন মফিক সাহায্য দান করে তাদের মাথা থেকে জীবনের প্রয়োজনের বোঝা হালকা করে দেয়া এবং তাদের জন্য একটি পবিত্রতম ও শান্তিময় জীবন-যাপনের সুযোগ সংস্থান করে দেয়ার পানেও লক্ষ্য রেখেছে। সাথে সাথে সে এ ব্যবস্থা দ্বারা পুঁজি সমাজের সর্বস্তরের লোকদের মধ্যে নিয়মিত পন্থায় বিবর্তনশীল থাকার সুযোগও দেয়। এ সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি।

যাকাত পারস্পরিক সাহায্য সহানুভুতি ও দায়িত্বশীলতার উপর নির্ভরশীল সেই সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি, যে সমাজ স্বীয় জীবনের কোন স্তরেই সুদ ব্যবস্থাপনার সহনুভূতি আদৌ প্রয়োজন মনে করে না।

বর্তমান যুগে সামাজিক জীবনে যাকাতের উপকারিতা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে আমাদের ধ্যান-ধারণা সম্পূর্ণরূপে বিবর্তন হয়ে গিয়েছে। সেই সকল হতভাগারা যাকাতের আসল হাকিকত ও সঠিক বোধজ্ঞান থেকে বঞ্চিত, যারা ইসলামী জীবন বিধানকে বাস্তব জগতে প্রতিষ্ঠিত দেখেনি। আর সরাসরি পর্যবেক্ষণ ও জ্ঞান গবেষণা দ্বারাও এটা উপলব্ধি করতে পারেনি যে, এ জীবন বিধান ঈমানী দর্শন ও ধ্যান-ধারণা, ঈমান ভিত্তিক শিক্ষা সংগঠন ও নৈতিক চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আর মানবিক আত্মাকে একটি বিশেষ ছাচে ঢালাই করে নবরূপ দান করে। অতঃপর এ জীবন বিধানের সর্বস্তরে সঠিক ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারা পবিত্রতম স্বভাব চরিত্র এবং উন্নত ধরণের নিয়ম-নীতি প্রচলিত হয়। সুদ ভিত্তিক জাহেলী জীবন বিধানের মোকাবিলায় ইসলাম তার স্বীয় জীবন বিধানে যাকাতকে একটি মৌলিক মর্যাদা দান করে।

এ জীবন বিধানে ব্যক্তিগত চেষ্টা চরিত্র এবং সুদ থেকে মুক্ত পারস্পরিক সাহায্য সহানুভুতি দ্বারা মানব জীবন বহু গুণে উন্নতি লাভ করে। আর অর্থনৈতিক উন্নতিও বাস্তবায়িত হয়। যে সকল ভাগ্য বিড়ম্বনা মানুষের মানবতার এহেন উন্নত ধ্যান-ধারণার বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই, যাকাতের সঠিক রূপরেখা সম্পর্কে তারা কোনই জ্ঞান অর্জন করতে পারে না। এ সকল লোক সুদ ভিত্তিক বস্তুতান্ত্রিক

জীবন বিধানের ছত্র ছায়ায়ই জন্মলাভ করে লালিত-পালিত হয়েছে। তাদের শুধু লোভ লালসা, কৃপণতা, নিকৃষ্ট মানসিকতা এবং পশুর ন্যায় পারস্পরিক প্রতিযোগীতা এবং ব্যক্তিগত স্বার্থপরতারই সেই অভিজ্ঞতা আছে, যা সাধারণ মানুষের অন্তঃকরণের উপর শাসক রূপে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের মতে দরিদ্র ও প্রয়োজনশীল লোকদের সম্পদ সঞ্চয় করতে হলে সুদের হীনতম উপায় অবলম্বন করা ব্যতীত আর কোন উপায়ই সম্পদ জমা করা সম্ভব নয়। যে সকল মানুষের নিকট সঞ্চয়কৃত ধন-সম্পদ না থাকবে, এ জীবন বিধানে সহায়হীন অবস্থায় জীবন যাপন করতে তারা বাধ্য হবে। তাদের জন্য সহযোগিতা লাভের একমাত্র পথ আবিষ্কার করা হইয়াছে যে, নিজেদের সঞ্চিত অর্থ সম্পদের একটি অংশ ইন্সুরেন্স ও সুদী ব্যবসায় খাটিয়ে অংশীদার হতে হবে। অন্যথায় বিনাসুদে কাহারো থেকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা লাভের কোনই আশা নেই। এমন কি ব্যবসা বাণিজ্যহ ও শিল্পক্ষেত্রে কারবার করার জন্য সেই সময় পর্যন্ত পুঁজি পাওয়া যাবে না, যত সময় পর্যন্ত তারা সুদ দানের চুক্তিতে রাজী না হবে। কেবল মাত্র সুদ দেয়ার ওয়াদায়ই পুঁজি পাওয়া যেতে পারে। পরিণামে অবস্থা এ হয় যে, এ হতভাগাদের মন-মগজে এ কথা এমন রূপ বসে যায় যে, সমাজ জীবনে উন্নতি লাভের জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন ব্যবস্থা দ্বারা তা সম্ভবই নয়। জীবনের গাড়ী শুধু সুদের চাকার উপর নির্ভর করেই চলতে পারে, অন্য কোন চাকার উপর নয়।

যাকাত সম্পর্কে মানুষের ধারণা এত বিকৃত হয়েছে তারা একে এমন একটি সাধারণ ব্যক্তিগত দান খয়রাত মনে করে যার ভিত্তির উপর বর্তমান যুগে একটি সামগ্রিক ও সামাজিক জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভব নয়। কিন্তু চিন্তা করার বিষয় যে, যখন জাতির সমগ্র মুলধন এবং তার মুনাফার সমুদয় অর্থের উপর যাকাতের হার শতকরা আড়াই ভাগ ধার্য করা হয়েছে, তখন যাকাত বাবদ প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ কত হবে?১

১. ফসল ফলফলাদি আর খনিজ দ্রব্যের বেলায় যথাক্রমে যাকাতের হার শতকরা পাঁচ, দশ ও বিশ পর্যন্ত পৌঁছে থাকে।

উপরন্তু তা আদায়কারী লোক এমন ধরণের হবে যাদেরকে ইসলাম একটি বিশেষ ছাচে ঢালাই করে তার নিজস্ব আইন-কানুন নীতিমালা ও উপদেশাবলী দ্বারা অনুপ্রাণিত করে সংগঠিত করেছে। তাদেরকে একটি সামাজিক জীবন বিধানের ছত্র ছায়ায় লালন-পালন করা হয়েছে। যারা এর ছত্র ছায়ায় জীবন-যাপন করেনি, তাদের মন-মগজে তার উন্নত ধারণা উপলব্ধি করা খুবই কঠিন ব্যাপার।

অতঃপর তাকে একটি মুসলিম রাষ্ট্রে দান-খয়রাত রূপে না করে অবশ্য পালনীয় ও অনিবার্য রূপে দেয় সামাজিক অধিকার রূপে আদায় করে। এর দ্বারা সে মুসলিম সমাজের সেই সকল লোকদের অভাব অনটন দূরীকরণের ব্যবস্থা করবে, যাদের ব্যক্তিগত আয় উপার্জন তাদের প্রয়োজন পূরণ করে অভাব বিদূরিত করতে যথেষ্ট নয়। এমনিভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের সন্তান-সন্ততির জীবন যাপনের দ্রব্য-সামগ্রী এর মাধ্যমে পুরণ হবার নিশ্চিত রূপে একটি আশ্বাস বাণী পেয়ে চিন্তামুক্ত হতে পারবে। সাথে সাথে যে সকল লোক তাদের ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম, তারা ব্যবসার জন্য ঋণ নিয়ে থাকুক কিম্বা অন্য কোন কাজের জন্য নিয়ে থাকুক, রাষ্ট্র যাকাতের অর্থ দ্বারা তাদের ঋণ পরিশোধ করবে।

এ জীবন বিধানের বাহ্যিক রূপরেখা ও গঠন প্রাণালীটির কোন গুরুত্ব নেই। আসল গুরুত্ব হচ্ছে তার অর্ন্তনিহিত প্রাণ বস্তুটির। ইসলাম স্বীয় শিক্ষা ও উপদেশ মালা এবং তার নিজস্ব আইন-কানুন ও সামগ্রিক রীতি-নীতি দ্বারা যে সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তা এ জীবন বিধানের গঠন প্রণালী এবং বাহ্যিক রূপ রেখা এবং তার প্রয়োগ পদ্ধতির সাথে স্বভাবগত রূপে সংগতিপূর্ণ। তা আইন-কানুন ও উপদেশাবলীর সাথে মিশে পূর্ণতা লাভ করে। এর মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতি শুরু থেকেই জন্ম লাভ করে আইন-কানুন দ্বারা বাস্তবে রূপ নেয়। উভয় পথই একে অপরের পরিপুরক হিসেবে কাজ করে এবং একে অপরের সাথে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত। যারা অন্যান্য জীবন বিধানের ছত্র ছায়ায় লালিত-পালিত হয়েছে, তাদের জন্য এ অর্ন্তনিহিত গূঢ় রসহ্য বুঝে উঠা খুবই মুস্কিলের কথা। কিন্তু আমরা মুসলিম এ রহস্য ভেদ সম্পর্কে বেশ ওয়াকিফহাল। আমরা ঈমানী প্রেরণা দ্বারা এর সন্ধান পেয়ে থাকি। যদিও ঐ সকল লোকেরা নিজেদের অশুভ দুর্ভাগ্যতার কারণে এ অনুপ্রেরণা ও অনুভূতি থেকে বঞ্চিত। বিশেষ করে তদের হাতে যে সকল মানুষের নেতৃত্ব রয়েছে, তারাই আসল দুর্ভাগা এবং এমনটা হওয়াও স্বাভাবিক। তাদেরকে সেই কল্যাণকারিতা থেকে বঞ্চিত থাকতে দাও, যার সুসংবাদ আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে সকল ঈমানদারকে দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে ঃ

"যারা আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতঃ ঈমান গ্রহণ করে সৎকাজ করছে আর নামায আদায় করে এবং যাকাতও দেয় (তাদেরকে আপনি সুসংবাদ দিন।"

এ লোকেরা সওয়াব ও পূণ্য ছাড়াও এ জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত থাকবে। তাদের বঞ্চিত থাকার একমাত্র কারণ হলো তাদের জাহেলীপনা গোমরাহী আর সত্যের প্রতি শক্রতা পোষণ।

যাকাত ব্যতীত অন্যান্য খাজনা ট্যাক্স

অর্থ সম্পদের উপর আরোপিত কর হিসেবে একমাত্র যাকাতই নয় বরং এ ছাড়া তার আরো বিভিন্ন প্রকার কর প্রয়োজন বোধে ধার্য করতে পারে। যারা বর্তমান যুগে যাকাত ব্যবস্থার উপর মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলে যে, অর্থ সম্পদের উপর ইসলাম যে ট্যাক্স ধার্য করে সর্ব সময়ের জন্য তার শেষতম সীমারেখা হচ্ছে যাকাত। এ সব পেশাদার আলেমদের দুরভিসন্ধিমূলক মতবাদের মূল রহস্য ফাঁস করে দেয়া একান্ত প্রয়োজন। যারা বর্তমান উন্নতির যুগে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কার্যকরি করা সম্ভব নয় বলে প্রমাণ করতে চায়, তারাও এ সকল পেশাদার আলেমদেরই মতাবাদের সাহায্য নিয়ে এ কথা প্রচার করে।

আসলে যাকাত ব্যবস্থা হচ্ছে অর্থ-সম্পদের উপর আরোপিত ইসলামের ট্যাক্স ব্যবস্থার সর্বনিম্ন হার। আর এটা হচ্ছে তখনকার অবস্থার জন্য, যখন সমাজের যাকাত আদায় করার পর অন্য কোন তহবীলের প্রয়োজন অনুভব না হয়। যাকাত আদায়কৃত তহবীল যখন সমাজ জীবনের চাহিদার জন্য যথেষ্ট নয়; এমতাবস্থায়ও ইসলামের হাত বন্ধ হয়ে থাকে না। সে ইসলামী শরীয়াত প্রয়োগকারী নেতৃবর্গ ও শাসকবর্গকে অর্থ-সম্পদের উপর ট্যাক্স ধার্য করার অবাধ অধিকার দান করেছে। অর্থ সম্পদের উপর অবস্থার চাহিদা মুতাবিক ট্যাক্স কার্য করার অবকাশও সে তাদের জন্য রেখে দিয়েছে। রাসুলে করীম (সাঃ) পরিষ্কার রূপে ঘোষণা দিয়েছেন ঃ

"যাকাত ছাড়াও অর্থ-সম্পদের ভিতর আরো অন্যান্য অধিকার রয়েছে।" (তিরমিযী)

ইসলামী আইন প্রণয়ণের মধ্যে সাধারণ কল্যাণমূলক কাজ এবং গর্হিত কার্যের উপকরণকে দূরীভূত করার নীতি এত বেশী পরিমাণে বর্তমান রয়েছে যে, তার অধীনে সর্ব-প্রকার সামাজিক কল্যাণমূলক কাজ করার এবং সর্ব প্রকার অনিষ্টকারিতা ও পাপাচার বিদুরিত করা সম্ভব। এ সকল নীতিমালাগুলোর প্রশস্ততা পাঠকবর্গের সামনে উপস্থিত করার নিমিত্ত আমরা কায়রো ইউনিভারসিটির "ল" কলেজে ইসলামী আইনের অধ্যাপক উস্তাদ আবু জোহরা কর্তৃক লিখিত "আল ইমাম মালেক" শীর্ষক পুস্তকের কতিপয় উদ্ধৃতি পেশ করছি।

জনকল্যাণমূলক কাজ

যে সকল জনকল্যানমূলক কাজের বেলায় কুরআন ও সুন্নাতের থেকে সরাসরি কোন দলিল প্রমাণ পাওয়া যায় না, তাকেই মুসালেহে মুরসালাহ্ বলা

হয়। এ সকল কল্যাণমূলক কাজগুলো ইসলামের মৌলিক নীতিমালার দ্বারা কি বিচার করা হবে, না অন্যদিক দিয়ে, সে বিষয় ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদ্‌দের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আল্লামা করণীর দাবি হলো যে, ব্যতিক্রম ছাড়াই সমগ্র আইনবিদগণ ফিকাহ শাস্ত্রের শাখা-প্রশাখার ক্ষেত্রে এ সকল কল্যাণমূলক কার্যগুলোর প্রতি মনযোগ দিয়েছেন। যদিও তাদের অধিকাংশ একে একটি মৌলিক নীতি রূপে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, তথাপি তাকে তারা দলিলরূপে ব্যবহার করেছেন। করণী লিখেছেন–"

"অন্যান্য চিন্তাবিদ লেখকরা যে সকল জনকল্যাণ মূলক কাজ সম্পর্কে কুরআন হাদীসে কোন দলিল প্রমাণ বর্ণিত নেই, তা তারা অস্বীকার করেন। কিন্তু যদি আপনারা চিন্তা করেন, তবে মুল বিষয়ের শাখা-প্রশাখায় গিয়ে তাদেরকে অধিকাংশ সময় সাধারণ জনকল্যাণ মূলক কাজকে গ্রহণ করে নিতে দেখবেন। যখন একই ধরণের দু'টি বিষয়ের বেলায় বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ করতে অথবা ভিন্ন ধরণের দু'টি বিষয় সম্পর্কে একই নীতি গ্রহণ করা হয় তখন এ ধরণের প্রত্যেকটি স্থানেই তারা নিজেদেরকে নীতিগত দলিল প্রমাণ পেশ করতে বাধ্য মনে করেন না। বরং নিত্যান্ত সাধারণ একটু সম্পর্কের উপরই তারা নির্ভর করেন। আমরা এটাকেই মুসলেহাতে মুরসালাহ বা জনকল্যাণ মূলক কাজ বলি।

করণীর এ দাবি ভুল হোক কিম্বা নির্ভূল হোক, এ কথা ফয়সালা হয়ে গিয়েছে যে, যে সকল জনকল্যাণ মূলক কাজ কুরআন হাদীসের বা শরীয়াতের সনদ দ্বারা সমর্থিত হয়নি, তাকে নির্ভরযোগ্য ও সমর্থন দেয়ার বেলায় ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করেন। যদি সমর্থনের বেলায় তাদের (বাস্তবে) মতভেদ নাও থাকে যেমন করণীয় মতবাদ, তথাপি তাকে কোন দিক দিয়ে এবং কোন দলিলের বলে কতটুকু সীমারেখা পর্যন্ত সমর্থন করা যায় সে বিষয় অবশ্যই মতভেদ হয়েছে।

এ ব্যাপারে ওলামায় কেরামদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার চারটি মতবাদ বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

প্রথম প্রকার হচ্ছে, শায়েফী মাযহাব অবলম্বীদের। যে সকল জনকল্যাণ মূলক কাজের ব্যাপারে শরীয়াতে প্রকাশ্য কোন দলিল প্রমাণ মজুদ নেই, তাকে তারা নির্ভরযোগ্য মনে করেন না। কারণ তরা শুধু মাত্র কিয়াস এবং কিয়াসুল মান্‌সুস (যে কিয়াস কুরআন হাদীসের ভিত্তিতে করা হয়)-এর প্রবক্তা। কিয়াসের বেলায় তাদের মতে শর্ত হচ্ছে যে, মূল এবং শাখা-প্রশাখার মধ্যে অর্থাৎ যে, বিষয়টি কিয়াস করা হয়েছে এবং যার উপর কিয়াস করা হচ্ছে, এ দু'টির মধ্যে নিয়মিত ভাবে নীতিগত সম্পর্ক বিদ্যমান থাকতে হবে। কারণ আমাদেরকে

সমর্থন দেয় তো ভাল কথা। কেননা আমরা বলিতেছি যে, শায়েফীদের কাছে নিয়মিত কিয়াস করণ ছাড়া কোন জন-কল্যাণ মূলক কাজ সমর্থন করার উদাহরণ খুব কমই পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় মতবাদটি হচ্ছে হানাফীদের এবং সেই সকল ব্যক্তিদের, যারা কিয়াসের সাথে এস্‌তেহ্‌সানেরও প্রবক্তা। তারা এস্‌তেহ্‌সানের যে সংজ্ঞা দেয় তাতে আপন থেকে সাধারণ কল্যাণ মূলক কাজের প্রতি আস্থা স্থাপন করা হয়। আসল কথা হচ্ছে যে, শায়েফী মতাবলম্বীগণ যে কল্যাণ মূলক কাজকে যেভাবে সমর্থন করে, তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে হানাফীরা সমর্থন দেয়। কেননা কোন ব্যাপারে তাদের সহানুভুতি পূর্ণরূপে শুধু মাত্র উপযোগীতার উপর নির্ভর করতে হবে এটা খুব কমই হয়। এ কারণে এ সকল উপযোগীতামূলক কল্যাণকর কার্যাবলী তাদের নিকট মৌলিক নীতিরূপে গণনা করা হয় না।

তৃতীয় প্রকার মতবাদ হচ্ছে, সেই সকল লোকদের, যারা জনকল্যাণ মূলক কার্যাবলীকে গ্রহণ করনে খুব বাড়াবাড়ির পরিচয় দেয়। এমনকি তারা মানবিক আদান-প্রদান ও লেন-দেনের বেলায় কল্যাণ মূলক বিষয়টিকে কুরআন হাদীসের দলিল প্রমাণের উপর স্থান দেয়। তাদের মতে কল্যাণ মূলক বিষয়টাই নস্‌কে (কুরআন হাদীসকে) খাস করে অর্থাৎ সঙ্কুচিত ও সীমায়িত করে। যদি কোন ব্যাপারে কুরআন হাদীসের দলিল প্রমাণের আলোকে ওলামায়ে কেরাম একমত হন এবং তা কোন্ দিক দিয়ে জনকল্যাণের পরিপন্থী হয়, তবে জনকল্যাণকেই কুরআন হাদীসের দলিলের উপর স্থান দিতে হবে। আর এটাকেই খাস করা হয়েছে মনে করতে হবে। আল্লামা তুফীও এ মতবাদের সমর্থক।

চতুর্থ প্রকার মতবাদটি হচ্ছে, সেই সকল সুধী মণ্ডলীর যারা এ ব্যাপারে মধ্যপথ অবলম্বন করেছেন। তাদের মতবাদটিকেই সঠিক মতবাদের নিকটবর্তী মতবাদ মনে হচ্ছে। তাদের মতে সেই সকল ব্যাপারকেই জনকল্যাণ মূলক কাজকে গণ্য করা হবে, সে সকল ব্যাপারে কুরআন হাদীসে আকট্য দলিল প্রমাণ অবতীর্ণ হয়নি। মালেকী মাযহাব অবলম্বীগণের অধিকাংশই এ মত পোষণ করেন। "জনকল্যাণ মূলক কাজের মূল্য দেয়া একটি স্বতন্ত্র "নীতিগত আইন"। এ মতবাদটি ইমাম মালেকের নিজের মনগড়া নয়। বরং এ ব্যাপারে তিনি যে পূর্ববর্তিগণের অনুসারী ছিলেন, তা নিম্নলিখিত উদাহরণগুলো দ্বারা প্রকাশ পায়।

১। এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, রাসুলে করীম (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম সমাজ জীবনে এমন কিছু কাজের পদক্ষেপ নিয়েছেন, যা নবী করীম (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় করা হয়নি। সুতরাং সর্বপ্রথম তারা কুরআনে করীমকে একটি কিতাব আকারে রূপদান করেছিলেন, অথচ নবী করীম

(সাঃ)-এর যমনায় এমনি করা হয়নি। কিছু সংখ্যক হাফেজের মৃত্যুর পর কুরআন বিস্মৃত হয়ে যাবার সন্দেহের উদ্রেক হলেই বাস্তব অবস্থার তাগিদেই কুরআন সংকলন করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। অতএব মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দরুণ হাফেজে কুরআনদের একের পর এক শহীদ হতে দেখে হযরত ওমর (রাঃ)-এর মনে কুরআন বিনষ্ট ও বিকৃত হবার আশঙ্কা দেখা দিল। তখন তিনি কুরআন সংকলনের প্রস্তাব হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সামনে পেশ করলে সমগ্র সাহারায় কেরাম এক বাক্যে তা সমর্থন করেন।

২। নবী করীম (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম মদপানকারীর শাস্তি বিধানের জন্য আশিটি দোরা সাব্যস্ত করেছিলেন। এ সিদ্ধান্ত বাস্তব অবস্থার উপযোগীতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই নেয়া হয়েছিল। কারণ তারা দেখলেন যে, মদ পানকারীরা প্রলাপ বকনে খুব উত্তেজিত হয়। বরং পরিশেষে সতীসাধ্বী রমণীদের উপর মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে দেয়ার কাজে লেগে যায়।

৩। খোলাফায়ে রাশেদীন স্বর্ণ শিল্পীসহ সমগ্র শিল্পীদের উপর সম্মিলিত মতে জামানত আরোপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অবশ্য যে সকল বস্তু এ সকল শিল্পীদেরকে কাজের জন্য দেয়া হতো, আসলে তা হচ্ছে আমানত রাখা বস্তু। অথচ আমানত রাখা বস্তুর যদি কোন রূপ অনিষ্ট সাধন হয় অথবা তা ধ্বংস হয়ে যায়, তবে সে জন্য কোন জরিমানা দিতে হয় না। কিন্তু বাস্তব অবস্থা ছিল এ যে সমাজে তখনকার দিনে শিল্পীদের খুব অভাব ও চাহিদা ছিল। সকল বস্তু তাদের নিকট থাকা কালে যদি তার কোনরূপ অনিষ্ট সাধন হয় কিম্বা তা ধ্বংস হয় এবং যদি শিল্পীদের উপর তার ক্ষতিপুরণ ধার্য করা না হয়, তবে তারা বেপরওয়া হয়ে যাবে এবং জন সাধারণ বিরাট ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে বাধ্য হবে। এমতাবস্থায় তাদের প্রতি ক্ষতিপুরণ ধার্য করাটাই হচ্ছে সমাজের জন্য কল্যাণকর ও উপযোগী কাজ। এ কারণেই হযরত আলী (রাঃ) এ সকল লোকদেরকে এ বস্তুগুলোর জন্য দায়িত্ববান এবং ঋণগ্রস্ত নিরূপণ করে বলেছেন– এ পথ অবলম্বন ছাড়া জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব নয়।

৪। হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ)-এর নিয়ম ছিল যে তাঁর যে সকল অভিভাবকদের বেলায় গচ্ছিত সম্পদ আত্মসাত করার সন্দেহ হতো, তাদের ধন সম্পদের অর্ধাংশ অধিকার হিসেবে সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতেন। এর

কারণ হলো এসব লোকেরা নিজেদের অভিভাবকত্বের প্রভাব বিস্তার করে যে ধন-সম্পদ অর্জন করতো, তা তাদের নিজস্ব সম্পদের সাথে গড়মিল হয়ে যেত। হযরত ওমর (রাঃ)-এর এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ জনসাধারণের স্বার্থ ও কল্যাণের জন্যই যে করেছিলেন, তা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। তিনি মনে করেছিলেন যে, অভিভাবকদেরকে সংশোধন এবং অভিভাবকত্বের প্রভাব প্রতিপত্তি দ্বারা অবৈধ স্বার্থ অর্জন এবং অন্যান্য অবৈধ পথে ধন-সম্পদ অর্জন করা থেকে বিরত রাখার জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত আবশ্যক।

৫। হযরত ওমর (রাঃ)-এর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি ভেজাল মিশ্রণের দায়ে শাস্তি হিসেবে একবার পানি মিশ্রিত দুগ্ধ মাটিতে ঢেলে দিয়েছিলেন। যাতে করে ব্যবসায়ীগণ জনসাধারণকে প্রতারিত করতে না পারে, সে জন্য সাধারণ মানুষের স্বার্থ ও কল্যাণের খাতিরেই তিনি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

৬। হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে আরো বর্ণিত আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি হত্যার ব্যাপারে পূর্ণ একটি সম্প্রদায় বা একদল লোক সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকতো; তবে তিনি সম্প্রদায়ের সকল লোকদেরকেই হত্যা করার ফরমান জারি করতেন। কেননা এটা ছিল জনকল্যাণের একমাত্র দাবি। আর এ বিষয় কুরআন হাদীসে কোন দলিল প্রমাণও বর্তমান নেই। জন স্বার্থের প্রমাণ হলো যে নিহত ব্যক্তি নিরাপরাধী এবং তাকে ইচ্ছা পূর্বকই হতা করা হয়েছে। এমতাবস্থায় যদি এর প্রতিশোধ গ্রহণ করা না হয়, তবে কিসাসের নীতিকে সমূলে বিনষ্ট করারই নামান্তর হবে। এর ফলে এ পরিণতিই দেখা যাবে যে, হত্যা করার বেলায় একে অপরের সহায্যকারী ছিল। কেননা তাদের এ কথা ভালরূপেই জানা আছে যে, সমবেত হয়ে যদি এ কাজ করা হয়, তবে তাদের থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে না।

অবশ্য এখানে এ প্রশ্ন তুলা যায় যে, এখানে যে ব্যক্তি আসল হত্যাকারী নয় তাকে হত্যা করে ধর্মের মধ্যে একটি নতুন পথ মতের আবিষ্কার করে বিদ্য়াতের গুনায় পতিত হতে হয়? কারণ উপরে বর্ণিত দলটির মধ্যে কোন এক ব্যক্তিকেই ব্যক্তিগত রূপে নিহতকারী সাব্যস্ত করা যায় না। এ প্রশ্নটির জবাব হচ্ছে নিহত করণের আসল অপরাধী দল হিসেবে সমগ্র দলটিই এ কাজের জন্য অপরাধী। সুতরাং একজন হত্যাকারীকে যেভাবে কিসাসের আইনানুসারে হত্যা করা হয়,

অনুরূপ এখানেও পূর্ণ দলটিকেই হত্যা করতে হবে। এ দলটির সাথে হত্যার অপরাধ এমনরূপে জড়িত যেরূপ কোন এক ব্যক্তির বেলায় জড়িত থাকে। অর্থাৎ এখানে হত্যা করার শাস্তির বেলায় সমগ্র দলটিই এক ব্যক্তির শাস্তির সমমর্যাদায় সমাসীন। আর এ ব্যবস্থা নেয়াটাই হচ্ছে সমাজ জীবনে কল্যাণ আনয়নের এক মাত্র পথ। কারণ খুন ও দূষ্টতার পথ চিরতরে রুদ্ধ করে দেয়া এবং সমাজের সংহতি ও নিরাপত্তা নিশ্চয়তা বিধান কেবল এ রূপেই সম্ভব।

সাধারণ মানুষের সমস্যার ব্যাপারে তাদের কল্যাণের পানে লক্ষ্য রাখার আর একটি উদাহরণ হলো যে, যখন 'বায়তুল মাল' শূন্য হয়ে যাবে অথবা সৈন্যবাহিনীর খরচ বেড়ে যাবে, কিন্তু "বায়তুল মালে" প্রয়োজন পরিমাণ তহবীল থাকবে না, তখন রাষ্ট্র-নায়কদের জন্য ধনাঢ্য ব্যক্তিদের উপর প্রয়োজন পরিমাণে ট্যাক্স ধার্য করা উচিত। যখন পর্যন্ত "বায়তুল মালের" তহবীলে অন্য কোন উপায় আমদানী না হবে, অথবা তাতে প্রয়োজন পরিমাণ অর্থ-সম্পদ না আসবে, ততসময় পর্যন্ত এ পথ গ্রহণ করা যেতে পারে। ধনাঢ্য সম্প্রদায়ের মনে যাতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয়, সে জন্য ফসল কাটা এবং ফলমূল তোলা পর্যন্ত এ ট্যাক্স আদায় করবে। বেশী দিন তাদের ঘাড়ে এ বোঝা চাপিয়ে দেয়া ঠিক হবে না। এ ব্যবস্থার কল্যাণকারিতার দিকটি হচ্ছে যে রাষ্ট্রের সৎ নেতৃবর্গ যদি এ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে, তবে জনসাধারণের মধ্যে তার প্রভাব প্রতিপত্তি লোপ পাবে, দেশের আইন শৃংখলা শিথিল হয়ে পড়বে। যার ফলে চতুর্দিক থেকে সর্বপ্রকার অরাজকতা বিশৃংখলা মাথাচাড়া দিয়ে উঠার সুযোগ পাবে। আর যারা এ সকল সুযোগ গ্রহণ করে স্বার্থ উদ্ধার করতে চায় এবং দেশের ক্ষমতায় বসতে চায়, তাদের বিজয় লাভের সম্ভাবনাও শক্তিশালী হয়ে উঠে। বলা হয় যে, ট্যাক্স ধার্য করার পরিবর্তে "বায়তুল মালের" তরফ থেকে নেতৃবর্গের ঋণ গ্রহণ করা উচিত। এ কথার জবাবে আল্লামা সাবেতী বলছেন যে, জুরূরী অবস্থা দেখা দিলে তখনই ঋণ গ্রহণ করা ঠিক হবে, যখন "বায়তুল মালে" অদুর ভবিষ্যতে কিছু সম্পদ আমদানী হবার আশা থাকে। কিন্তু যখন কোন প্রকার আমদানীর আশা থাকবে না এবং আমদানীর উপকরণাবলীও যদি বন্ধ হয়ে যায়, এমতাবস্থায় ট্রেক্স ধার্য করা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন উপায় নেই।

উপকরণ

উপকরণের অর্থ হচ্ছে মাধ্যম বা অসীলা। আর উপকরণ বন্ধ করার অর্থ হচ্ছে অপছন্দনীয় কাজ বা বস্তুর উপকরণ দূরীভূত করা। যে বস্তু কোন অবৈধ কাজের কারণ ও মাধ্যম হয়, সে বস্তুও হারাম হয়ে যায়। আর যে কাজ কোন অবশ্য করণীয় কাজের (ওয়াজিব) অসীলা বা মাধ্যম হয়, সে কাজটিও অবশ্য করণীয় (ওয়াজীব) কাজ হয়। যেমন অবৈধ পন্থায় যৌনক্রিয়া করা হারাম। সুতরাং কোন অপরিচিত গায়ের মোহারেম রমণীর পানে ইচ্ছাকৃত তাকানও হারাম। কারণ এটাই মানুষকে অবৈধ যৌনক্রিয়ার দিক নিয়ে যায়। জুময়ার নামায ফরজ। অতএব তার জন্য মসজিদে গমন করা এবং কাজ কারবার বন্ধ রাখাও ফরজ। হজ্জ করা যেহেতু, ফরজ কাজ, সুতরাং তার জন্য কাবা ঘরের পানে সফর করা এবং হজ্জের সমুদয় নিয়মাবলী পালন করাও ফরজ।

উপকরণ বন্ধ করার মধ্যে কোন্ কাজ শেষ পর্যন্ত কোন্ পরিণতির দিকে ধাবিত হয়, এদিকে লক্ষ্য রাখাই হচ্ছে আসল গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যদি এর গতিধারা সেই কল্যাণমূলক কাজের পানে হয়, যা পারস্পরিক আদান-প্রদান ও লেন-দেনের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তাই যদি সর্বদিক দিয়ে কাম্য ও উদ্দেশ্য হয় তবে এ কাজের এ সকল উদ্দেশ্যের গুরুত্ব আর প্রয়োজনীয় সম্পর্কের কারণে কম অথবা বেশী চাহিদা হবে। অবশ্য যে কাজটি মাধ্যম রূপে রয়েছে, চাহিদার দিক দিয়ে এ উদ্দেশ্য সমূহের সমপর্যায় হবে না। আর যদি এ কাজগুলো এমন হয় যে, তার পরিণতি খারাপের পানে হয়, তবে এ কাজগুলো এ সকল দুষ্টপূর্ণ অবৈধ সম্পর্কের কারণে অবৈধ নিরূপিত হবে। যদিও যতখানি কঠোরতার সাথে খারাপ কাজগুলো হারাম হয় ততখানি কঠোরতার সাথে তা হারাম হয় না।

এ ব্যাপারে কর্তার মনের নিয়ত ও ইচ্ছার উপরই আসল গুরুত্ব নয়, বরং আসল গুরুত্বের বিষয় হচ্ছে কাজের ফলাফল ও পরিণতির উপর। পরকালে শাস্তি পাওয়া না পাওয়াটার ভিত্তি যদিও নিশ্চিতরূপে কর্তার মনের নিয়াত ও ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, তথাপি কোন কাজকে ভাল অথবা খারাপ বলতে হলে অথবা তাকে বাঞ্ছিত কিম্বা নিষিদ্ধ করণের ভিত্তি সমূদয় তার বাস্তব পরিণতির উপর। দুনিয়ার শাসন শৃংখলা ও ব্যবস্থাপনা আল্লাহর বান্দাদের স্বার্থ ও কল্যাণের সংরক্ষণ এবং আদল ইনসাফ ও ভারসাম্যতার উপর নির্ভরশীল। আর এ সকল কাজের অনিবার্য দাবি হচ্ছে, সৎ নিয়ত ও সওয়াবের আশার প্রতি নয় বরং কাজের বাস্তব ফলাফল ও পরিণতির প্রতি দৃষ্টি দেয়া।

যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহকে খুশী করার নিয়াতে মুর্তি ও দেব দেবতাবলীকে ভর্ৎসনা ও গালিগালাজ করে, সে নিজের ব্যাপারে মুসুল্লি ও পাক্কা মুমিন হতে পারে। কিন্তু এ কাজের পরিণতি যদি মুশরিকগণ রাগান্বিত হয়ে আল্লাহ তায়ালাকে গালি দেয়, তখন ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে? এ জন্যই এ ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা নিজেই এ কাজ করতে নিষেধ করনে বলেছেন ঃ

"এরা আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে যার উপাসনা আরাধনা ও পূজা অর্চনা করছে, তাকে গালি দেয়ার কারণে কোথাও যেন এমন না হয় যে, তারা জাহেলিয়াতের বশবর্তি হয়ে অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহকে গালি-গালাজ করে।"

(সূরা আল আনয়াম-১০;৮)

এ নিষেধাজ্ঞার পিছনে যে কারণ নিহিত রয়েছে, তা হচ্ছে এ কাজের বাস্তব পরিণতি। এখানে মনে যে ধর্মীয়ভাব বিরাজমান রয়েছে এবং যার উদ্দেশ্য হচ্ছে নিছক আল্লাহর সন্তুটি বিধান ও সওয়াব অর্জন, তা নিঃসন্দেহে দৃষ্টির আঁড়ালে রাখা হয়েছে। এর দ্বারা আমরা পরিষ্কার রূপে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, যে বস্তু গুনাহ ও দুষ্কর্মের কারণ হয়, তা নিষিদ্ধ করণের ব্যাপারে শুধু নিয়াতের প্রতিই লক্ষ্য রাখা হয় না। বরং তার বাস্তব পরিণতির প্রতিও গুরুত্ব দান করা হয়। আর তাকে তার খারাপ পরিণতির কারণেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়- যদিও আল্লাহ তায়ালা তার মনের ইচ্ছা ও আন্তরিকতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল রয়েছেন।

যদি কোন ব্যক্তি অনুমোদিত বৈধ কোন কাজকে কোন অসৎ উদ্দেশ্য সাধণের উপায় হিসেবে গ্রহণ করে, তবে এমন ব্যক্তি আল্লাহর নিকট গুনাহগার সাব্যস্ত হবেন। কিন্তু অন্য কোন ব্যক্তির এ জন্য প্রতিবাদ করার অধিকার নেই। আর এ কাজ করাকে শরীয়াত মোতাবিক বাতেল ঘোষণা করাও যাবে না। যেমন কোন একজন ব্যবসায়ী তার প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ীর ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে স্বীয় মাল কম মূল্যে বিক্রি করা। এ কাজটি যদিও নিঃসন্দেহে মোবাহ্ কাজ। কিন্তু সাথে সাথে তা একটি গুনাহ্ অর্থাৎ অপরের ইচ্ছাকৃত ক্ষতি সাধনের কারণে পরিণত হতে চলছে। এতদ্সত্ত্বেও এ কাজকে অবাঞ্ছিত বাতিল কাজ বলে ঘোষণা দেয়া যায় না। আর তা প্রকাশ্য এমন কোন নিষিদ্ধ কাজ নয়, যাকে আদালতের সাহায্যে বাঁধা দান করা যায়। নিয়াতের দিক দিয়ে এ কাজটি পাপাচারের উপায় বিশেষ। আর বাহ্যিক দিক দিয়ে তা সাধারণ অসাধারণ (খাছ-আম) উভয় প্রকার কল্যাণের প্রতিভূ হতে পারে। ব্যবসার প্রশ্ন যতদূর পর্যন্ত বিজড়িত, তার নিজের ব্যবসাকে উন্নত করণ এবং ক্রেতাদের সংখ্যা আধিক্য হবার ভিতর নিশ্চিত রূপে তার উপকার হয় বটে এবং সাধারণ মানুষও

দর ঘাটতির দ্বারা উপকার পায়। এর দ্বারা বাজার দর সাধারণ রূপে ঘেটে যাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন ইতিপূর্বের আলোচনায় এটা পরিষ্কার হয়েছে যে, অসৎ কাজের মাধ্যম বা উপকরণকে বন্ধ করার নীতি শুধু ব্যক্তিগত নিয়াত ও উদ্দেশ্যের প্রতিই লক্ষ্য রাখে না। বরং সাধারণ মানুষের স্বার্থ ও কল্যাণ সাধন এবং তাদের সর্বপ্রকার ক্ষতি ও অনিষ্টতা দূরীকরণের প্রতি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। এ নীতি ইচ্ছা ও নিয়াতের সাথে বাস্তব পরিণতি এবং মাঝে মাঝে শুধু মাত্র বাস্তব পরিণতির প্রতিই দৃষ্টি রাখে। অসৎ কাজের উপকরণ ও মাধ্যমকে বন্ধকরণ নীতি আইন অনুমোদিত হওয়ার বিষয়টি কুরআন হাদীস থেকেই প্রমাণিত। কুরআন মজীদে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন ঃ

"তারা আল্লাহকে ছাড়া যাদের ইবাদত বন্দেগী করছে, তাদেরকে তোমরা মন্দ বা গালাগালি করো না, যদি তোমরা তা কর, তবে তারা অজ্ঞতা বশতঃ আল্লাহ্ তায়ালাকে গালি দিবে।" (সূরা আনয়াম)

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে মুশরিকগণ এ দাবি উত্থাপন করেছিল যে, মুসলমানরা তাদের পূজনীয় মাবুদগণকে গালি-গালাজ করা থেকে হয় বিরত থাকবে নতুবা তারা মুসলমানদের আল্লাহকেও গালি দিবে। কুরআনে মজীদে অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে ঃ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা "রায়েনা" বলো না বরং উনজুরনা বলো। আর মনযোগ সহকারে কথা শুনো।"

মুসলমানদের উদ্দেশ্য সৎ ছিল কিন্তু ইয়াহুদীগণ "রায়েনা" শব্দকে নবী করীম (সাঃ) কে গালি-গালাজ করার মাধ্যম রূপে বানিয়ে নিয়েছিল।

হাদীস শরীফে এর অগণিত নজীর বিদ্যমান রয়েছে। নবী করীম (সাঃ) এর অনেক বাণী এবং সাহাবায়ে কেরামদের বহু মতবাদ এর বাস্তব নজীর বিশেষ। যেমন নবী করীম (সাঃ) মোনাফিকদেরকে হত্যা করণ থেকে এ জন্য বিরত ছিলেন যেন কাফেরগণের এ কথা বলার সুযোগ না থাকে যে, মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর অনুচরবর্গকে হত্যা করে।

নবী করীম (সাঃ) ঋণদাতাকে ঋণ গ্রহীতার থেকে হাদীয়া ও উপঢৌকন গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। হাঁ যদি সে তা ঋণের সম্পদের মধ্যে গণ্য করে দেয়, তবে গ্রহণ করা যায়। কেননা হাদীয়া-উপঢৌকন প্রদান দ্বারা ঋণ গ্রহীতা ঋণ শোধ করার বেলায় দীর্ঘ সুত্রিতা ও টাল বাহানা করার সুযোগ নিতে পারে। আর এটা প্রকাশ্য রূপে সুদে পরিণত হয়। কারণ ঋণদাতা তার ঋণ পুরাপুরিই পাবে। তাকে যা কিছু উপঢৌকন স্বরূপ দেয়া হয়, তা হবে আসল মুলধনের থেকে অধিক সম্পদ।

নবী করীম (সাঃ) যুদ্ধের সময় চুরির অপরাধে হাত কর্তন করতেও নিষেধ করেছিলেন। কারণ হয়ত এ কারণে শাস্তি প্রাপ্ত লোকেরা দুশমনদরে দলে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ কারণেই যুদ্ধের মধ্যে শাস্তির ভয়ে অপরাধীরা যাতে পথভ্রষ্ট না হয়, সে জন্য দণ্ডাদেশ (হদুদ) জারি করা যায় না। কেননা এ সময় পথভ্রষ্ট হবার পথ সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত থাকে।

মোহাজেরীন ও আনসারদের মধ্যে বিশিষ্ট নেতাদের মতে যে রমণীকে স্বামী মৃত্যু শয্যায় থাকাকালে তালাক দেয়, তাকে এ ব্যক্তির পরিত্যাক্ত সম্পদের উত্তরাধিকরী নিরূপণ করা হয়েছে। কারণ এ সময় তালাক দানের দ্বারা পুরুষের উপর এ সন্দেহ পোষণ করা হয় যে, হয়ত স্ত্রীকে উত্তরাধিকারী সূত্রে সম্পদ লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ইচ্ছা তার ছিল। বঞ্চিত করার ইচ্ছা যদিও এখানে প্রমাণিত হয় না। কিন্তু তালাক বাস্তব ক্ষেত্রে তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

রাসুলে করীম (সাঃ) সম্পদ জমা করাকে নিষিধ করনে এরশাদ করেছেন ঃ

“যে ব্যক্তি সম্পদ জমা করে রাখে সে অপরাধী।” (মুসলিম, আবুদাউদ) দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী গুদামজাত করণ সমাজের সাধারণ মানুষকে বিপদ ও সংকটের মধ্যে নিপতিত করার মাধ্যম হয়। এ কারণেই যে সকল দ্রব্য-সামগ্রী গুদামজাত করণ সামাজের সাধারণ মানুষকে বিপদ ও সংকটের মধ্যে নিপতিত করার মাধ্যম হয়ে থাকে। এ কারণেই যে সকল দ্রব্য-সামগ্রী গুদামজাত করণের দ্বারা সাধারণ মানুষকে সংকটের মধ্যে নিপতিত করার কারণ হয়ে দাঁড়ায় না, তা গুদামজাত করে রাখা নিষিদ্ধ নয়। যেমন অলঙ্কার দ্রব্য। কারণ তা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর মধ্যে গণ্য করা হয় না।

নবী করীম (সাঃ) সদকাকারীকে তার সদকা কৃত দ্রব্য ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। এমন কি তা যদি সাধারণ বাজারে বিক্রয়ও হয় তবুও নয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে-যে সম্পদ আল্লাহর পথে বিলিয়ে দেয়া হয়েছে, সে সম্পদ কোন উপায় ফেরত নেয়া যেন সম্ভব না হয়। এমন কি ক্রয়ের মাধ্যমেও যেন না হয়। যখন নবী করীম (সাঃ) এমন বস্তুকে বিনিময়ের মাধ্যমেও ফিরত নিতে বারণ করেছেন, তখন বিনিময় ছাড়া হস্তগত করা আরো জোড়ের সাথে নিষিদ্ধ হয়। সদ্‌কা কৃত বস্তু মূল্যের বিনিময় নেয়ার অনুমতি দানের দ্বারা ফকীরের সাথে বাহানা করার সম্ভাবনা থাকে। উক্ত ব্যক্তি একটি বস্তু সদ্‌কা করে তা আবার সঠিক মূল্যের চেয়ে কম মূল্য দিয়ে ফকীর থেকে যদি ক্রয় করে, তবে ফকীর বেচারা মনে করবে সে তো কিছু না কিছু অবশ্যই পেতেছে। সুতরাং সে খুশীতেই তা কম মূল্যে বিক্রয় করবে।

এ ধরণের অগণিত উদাহরণ নবী করীম (সাঃ) এবং সাহাবায় কেরামদের থেকে বর্ণিত আছে। আল্লামা ইবনে কাইয়্যুম তার স্বলিখিত "এলমূল মওকেইন" পুস্তকে এমনি ধরণের নব্বইটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। সেখানে "উদাহরণ বা মাধ্যম সমুদহ বন্ধ' করণের জন্য কোন না কোন কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ইসলামী আইন কানুনের অর্ধাংশই "উকরণ বা মাধ্যম সমূহ বন্ধ" করণের নীতির উপর নির্ভরশীল।

সারকথা হচ্ছে যে, "জনসাধারণের কল্যাণ" (মুসালেহে মুরসালাহ) আর উপকরণ ও মাধ্যম সমূহকে বন্ধ করে দেয়া, এ নীতি দুটি এমনই নীতি;- যদি বিরাট অর্থে বাস্তবায়িত করা যায়, তবে তা রাষ্ট্রের নেতৃবর্গ ও শাসকবর্গকে সমাজের সর্ব প্রকার অন্যায় অবিচার ও দুষ্কৃতিমূলক কার্যাবলী নিরসন করার অবাধ অধিকার দান করে। বিশেষ করে এর ভিতর সম্পদের প্রতি ট্যাক্স ধার্য করার অধিকারও নিহিত রয়েছে। এ অধিকার যদি কোন নিয়ম-কানুনের বাধ্য বাধকতা এবং শর্তের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, তবে তা শুধু কেবল জাতির সাধারণ স্বার্থ ও কল্যাণের দিকে লক্ষ্য দেয়া এবং পূর্ণ সামাজিক ইন্‌সাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই পরিণত হয়। আমাদের এ আলোচনা দ্বারা এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, রাষ্ট্র মুনাফা অর্জন এবং মূলধন ও সম্পদের একটি অংশ অর্জন করার বেলায় ব্যক্তিগত মালিকানার নীতির বেলায় কোনরূপ প্রতিবন্ধক প্রমাণ হয় না।

এ শর্তগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের মৌলিক নীতিমালা সমূহ পূর্ণ সমর্থন করে তার অনুসারী হয়ে চলা। আর সে নীতিগুলো হলো নাগরিকদের জন্য ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার অক্ষুন্ন থাকা এবং শরীয়াত অনুমোদিত সমূদয় বৈধ পথে ও মালিকানাকে বর্ধিত করণ এবং তার ফলভোগ করার পূর্ণ অধিকার থাকা। বৈধ মালিকানার সম্পদ থেকে সেই সীমারেখা পর্যন্ত ট্যাক্স আদায় করা যায় যে সীমারেখা পর্যন্ত উপস্থিত প্রয়োজনের চাহিদা হয়। মানুষ ট্যাক্সের বোঝার কথা শুনে ঘাবড়িয়ে সমুদয় উৎপাদনশীল কাজ বন্ধ করতে এবং সম্পদ বাড়ানোর স্পৃহার গতিবেগ দুর্বল হয়ে পড়ে, এমন পন্থা গ্রহণ করা যাবে না। এর চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে যে, নাগরিকদের নিজেদের খাদ্য বস্ত্রের দিক দিয়ে পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও শান্ত থাকতে হবে। তারা রাষ্ট্রের এমন গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ হবে না, যাদের মনে এ ভীতি সঞ্চার হয় যে, যদি তারা নেতৃবর্গ ও আমলা শ্রেণীর কাজের সমালোচনা করে, অথবা বিরোধীতা করে, তবে তাদের রুজী রোজগারের পথ বন্ধ করবে। কারণ প্রত্যেকটি মুসলিম

নাগরিকদের উপর রাষ্ট্রের নেতৃবর্গ ও আমলাবর্গের প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখার এবং আল্লাহর শরীয়াত থেকে বিপথে পরিচালিত হওয়া থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। যদি তাদের নিজেদের জীবন ধারণের উপায় উকরণগুলো নিজেদের হাতে না থাকে, আর তাদের নিকট রাষ্ট্রের অনুমোদিত দ্রব্যাবলী ছাড়া যদি বাড়তি কোন মালামাল ও বিষয় সম্পত্তি না থাকে, তবে তারা কিরূপে তাদের এ মহান দায়িত্ব পালন করবে?

বর্তমান যুগে একটি আশ্চার্য ধরণের রসম রেওয়াজ চলে আসছে যে কেবল মাত্র সমুদয় শক্তি যাকাতের উপরই ব্যয় করা হয়। মনে হচ্ছে যেন ইসলামী অর্থনীতিতে ধন-সম্পদের অধিকার শুধু যাকাতের পরিমণ্ডলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ সকল ভুল রসম রেওয়াজের লৌহ যবনিকা উন্মোচিত করতে এবং সেই সকল পেশাদার পেটুক আলেমদের রহস্য দ্বার উদঘাটন করতে আমাদের উপরিবর্ণিত আলোচনাই যথেষ্ট; যারা কুরআনে করীমের আয়াত সমূহকে সস্তামূল্যে বিক্রয় করে তারা জাহান্নামের আগুন দ্বারা নিজেদের উদরই পূর্তি করছে।

এ ধরণের লোকদের মনের ভ্রান্তি নিরসন কল্পে আমাদের এ বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজন ছিল। তারা ইসলামী জীবন বিধানে যে সামাজিক নিরাপত্তার পূর্ণ নিশ্চয়তা রয়েছে, তার মর্যাদা ক্ষুন্ন করে। আর তারা এ ব্যবস্থাকে অসম্পূর্ণ আখ্যা দিয়ে বলে যে ইসলামী জীবন বিধান বর্তমান যুগের চাহিদা পুরণ করতে অক্ষম। তদের কথাগুলোকে মিথ্যা প্রচারণা ও ভূয়া প্রোপাগাণ্ডা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এ সকল লোক ইসলামের মুল তত্ত্বজ্ঞান এবং ইসলামী জীবন বিধান ও তার বাস্তব ঐতিহাসিক তথ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ইসলামী জীবন বিধানের আসল রূপরেখা সম্পর্কে তদের মনে কোনই ধারণার নেই। তাদের নিকট ইসলাম হচ্ছে সাত অন্ধর হাতী ধারার ঘটনার ন্যায়।

এ পুস্তকে ইসলামের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের বিস্তারিত আলোকপাত করা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। বরং সামাজিক জীবনে ইন্‌সাফ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক কর্মসূচীর আলোচনা হচ্ছে আমাদের বিষয় বস্তুর মূলকথা। ইসলাম মানব জীবনের জন্য যে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান দান করেছে, তার একটি শাখাকে অন্যান্য শাখা থেকে আলাদা করা যদিও কষ্টকর ব্যাপার; কিন্তু এ পুস্তকের বিষয় বস্তুর ধরণ ইসলামের অর্থনৈতিক কর্মসূচী সম্পর্কে অধিক আলোচনার সুযোগ রাখে না। সুতরাং এখানে আমরা এ বিধানের মৌলিক নীতিমালা গুলো সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা দিয়ে আলোচনার সমপ্তি ঘোষণা করব।

১। এ বিধান শর্তাধীন প্রতিনিধিত্বের উপর নির্ভরশীল। যমীনের সমুদয় উপাদান ও উপকরণাবলী এবং তার মালিকানার মূল সৃষ্টিকর্তা ও মালিক হচ্ছেন

একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। তিনি মানব জাতিকে এ বসুন্ধরায় এ শর্তে তার প্রতিনিধি নিয়োগ করেছেন যে, তারা মালিকানার বেলায় আল্লাহর আইন বিধান ও শরীয়ত অনুযায়ী ধারণা রাখবে ও কাজ করবে। এ শর্তের বিরুদ্ধাচরণ একদিকে যেমন ব্যবহারিক কর্ম তৎপরতাকে অস্তিত্বহীনের মত করে অনুরূপ প্রতিনিধিত্বের চুক্তিনামাকেও নস্যাৎ করে।

২। এ প্রতিনিধিত্ব হবে সাধারণ প্রতিনিধিত্ব। কিন্তু নাগরিকদের তাদের কাজের বিনিময় ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার অক্ষুণ্ন রয়েছে। সুতরাং শরীয়াত অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কতিপয় নির্দিষ্টতম বস্তুর মালিক বানিয়ে থাকেন। আর এ অধিকারকে সে এমন সাধারণ নিরাপত্তার বিধান করে, যার পরিণতিতে খাদ্যবস্ত্র ও রুজী রোজগারের দিক দিয়ে ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয় এবং সে মনের স্ফূর্তিতে অনুরাগের সাথে মর্যাদাপূর্ণ জীবন ধারণ করার সুযোগ পায়। সে যেন ব্যক্তিগত জীবন হতে আরম্ভ করে জীবনের সর্বস্তরে আল্লাহর আইন বিধান প্রতিষ্ঠিত করার বেলায় পর্যবেক্ষক ও দেখা শুনার সেই দায়িত্ব সফলতার সাথে সম্পাদন করতে পারে; যা তার দায়িত্বাধীনে অর্পণ করা হয়েছে।

৩। ব্যক্তিগত মালিকানা যদিও ইসলামের এহেন অর্থনৈতিক কর্মসূচীর মৌলিক বিধান। তথাপি এ মালিকানার অধিকার এবং তাকে বর্দ্ধন করা আর তার ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে এমন কতকগুলো নির্দিষ্টতম সীমারেখা ও শর্তাবলী আরোপ করা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে;- ব্যক্তি এবং সমষ্টি তথা সমাজের স্বার্থ সংরক্ষণ। আর উভয়ে একে অপরের সীমা অতিক্রম করা থেকে বিরত রাখা।

৪। মুসলিম জাতির জীবনের মৌলিক নীতি হচ্ছে- ব্যক্তিগত মালিকানার মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে পারস্পরিক সাহায্য সহানুভুতি করে যাওয়া। ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতি আরোপিত যে সকল দয়িত্বশীলতার কথা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, তা হচ্ছে- পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতিরই মৌলিক দাবি। আর তাকেই শরীয়াত বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করেছে। পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতির নীতিকে কার্যকরি করার নিমিত্ত শরীয়াত কর্তৃক আরোপিত দায়িত্ব কর্তব্য সম্পাদনের বেলায় যথেষ্ট রূপে বিবেচিত।

৫। ইসলামের এহেন অর্থনীতি দ্বারা সামাজিক জীবনে ন্যায় ও ইন্‌সাফ কায়েম করা অন্যান্য মানব রচিত বিধানের তুলনায় অনেক বেশী সম্ভব। কারণ মানব রচিত বিধানগুলো হচ্ছে নির্ভূলতা ও ভ্রান্তি উভয়ের মিশ্রিত শিরিকে ভরপুর। সুতরাং এর দ্বারা সামাজিক জীবনে পুর্ণ ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা ও ইস্‌সাফ কায়েম করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এ কাজ একমাত্র আল্লাহর বিধান দ্বারাই পূর্ণ হতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়

কয়েকটি ঐতিহাসিক উদাহরণ

ইসলামী ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহের অন্তরালে আধ্যাত্মিকতার যে উজ্জ্বল নুরানী আলোক রশ্মি পরিদৃষ্ট হয়, তাকে আমরা ইসলামের প্রাণ-আত্মা বলে অভিহিত করতে পারি।

যে ব্যক্তি এ ধর্মের মুল গতিধারা এবং তার ইতিহাসকে সত্যিকার রূপে পর্যালোচনা করবে সে অবশ্যই তার আধ্যাত্মিকতার মূল রহস্য বিষয় ওয়াকিফহাল হতে পারবে। সে এ প্রাণ-আত্মাকে ইসলামের হেদায়েত ও রীতি-নীতি এবং আইন-কানুনের পিছনে কর্মরত এবং তার ভিতরে প্রবাহমানও দেখতে পাবে। এ প্রাণ-আত্মা এতখানি সুস্পষ্ট প্রভাবশীল যে, কোন মানুষই তার দ্বারা প্রভাবিত এবং তার রূপ সৌন্দর্যে মোহিত না হয়ে পারে না। কিন্তু প্রত্যেকটি মৌলিক ও গভীর অনুভূতি সম্পন্ন বিষয় এবং প্রতিটি পূর্ণাঙ্গ উন্নত চিন্তাধারার ন্যায় তাকে গোটা কয়েক শব্দের পরিসরে আবদ্ধ করে ভাষায় রূপ দেয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। এ প্রাণ-আত্মা একদিকে যেমন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং গতি প্রকৃতির মধ্যে স্বীয় রূপ সৌন্দর্য প্রকাশ করে। অনুরূপ আত্মপ্রকাশ করে দিবাচক্রবালের ঘটনা প্রবাহ, আলৌকিক ঘটনাপঞ্জী এবং রসম রেওয়াজের মধ্য দিয়ে। কিন্তু তাকে ভাষায় রূপদান করা আদৌ সম্ভব নয়।

ইসলাম যে উন্নততর মহান পথের শীর্ষস্থানে আরোহণ করার নিমিত্ত তার অনুসারীদেরকে পা বাড়াতে আহ্বান জানায় এ প্রাণ-আত্মা সেই শীর্ষ স্থানেরই সৌন্দর্য ও রূপ মাধুরী প্রকাশ করে। এ স্থানটি এমনই একটি উন্নততর মহান স্থান, যেখানে উপনীত হবার নিমিত্ত ইসলাম মানুষকে এ বলে অনুপ্রেরণা দেয় যে, শুধু ইসলামের নীতি কর্মগুলো মেনে চলা এবং তার গতানুগতিক রসম রেওয়াজসমূহ নিয়মিত রূপে পালন করাই যষ্টে নয়। বরং স্বীয় স্বভাব প্রকৃতির চাহিদা অনুযায়ী স্বতঃস্ফুর্তভাবে আনন্দ চিত্তে আরো অধিক পরিমাণে আমল করতে হয়। এ মহান স্থানটির পথটি খুবই সর্পিল সন্টকময় ও বিপদ সঙ্কুল পথ। এখানে পৌঁছে দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকা তার চেয়ে আরো মুস্কিলের কথা। এ মহান পথের পানে অগ্রসর হবার বেলায় মানব জীবনের স্বভাবগত ঝোক প্রবণতা এবং জীবন ধারণের উপকরণ সামগ্রীর প্রবল চাপ অধিকাংশ মানুষের পদ যুগলের জিঞ্জিরে পরিণত হয়। যার ফলে মন্যিলে মাকসুদে উপনীত হওয়া আর সম্ভব হয়

না। যদিও কখনো মনের প্রবল আবেগ উচ্ছাসে এবং চেতনা অনুভূতির উগ্রতার আশ্রয় নিয়ে সেখানে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়, তথাপি এ বস্তু বেশী দিন এ স্থানের প্রকট বাঁধার সাথে মোকাবিলা করে সেখানে দৃঢ় ভাবে দণ্ডায়মান থাকার সুযোগ দেয় না। কারণ হচ্ছে যে, এ মহান স্থানের সাথে মন প্রাণ ধন-সম্পদ কাজ-কর্ম ও চিন্তাধারার সাথে সম্পর্কীয় কিছু কঠিনতম দায়িত্বাবলী সংশ্লিষ্ট রয়েছে। এ দায়িত্বসমুহের মধ্যে সবচেয়ে কঠিনতম ও সার্বক্ষণিক বিচক্ষণতা মূলক দায়িত্ব হচ্ছে সেই দায়িত্ব, যা ইসলাম ব্যক্তির আত্মার উপর অর্পণ করেছে। আর তার দেয়া ব্যক্তির জ্ঞান-বুদ্ধির প্রকট চেতনা অনুভূতির সম্পর্ক রয়েছে সেই নীতিমালা ও কর্তব্যের সাথে বিজড়িত, যা ব্যক্তির স্বীয় সত্তা সমাজ ও মানব জাতির উপর এবং সেই মহান সৃষ্টিকর্তার বেলায় অর্পিত হয়;– যিনি তার ছোট বড় সুক্ষ্মতর ও যাবতীয় গোপন কর্মতৎপরতা সর্ম্পকে পূর্ণ ওয়াকিফ হাল থাকেন।

এ মহান পথে অগ্রসর হবার বেলায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়া এবং এ স্থানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকতে সাফল্যের যবনিকা উন্মোচনে কষ্ট হবার অর্থ এ নয় যে, ইসলাম ধর্ম নিছক একটি কবিদের আকাশ কুসুম কল্পনা অথবা এমন একটি অলীক ধ্যান-ধারণা বিশেষ, যা আমাদের চেতনা অনুভূতি তার আঁচল ধরতে পারলেও সে পর্যন্ত পৌঁছানোর নিমিত্ত বাস্তব কর্মতৎপরতা গ্রহণ করা অসম্ভব; –এমন কখনো নয়। বরং এ মহান স্থানে উপনীত হবার নিমিত্ত প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক মানুষের উপর দায়িত্ব অর্পণ করে তাদেরকে সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। এটা এমন একটি লক্ষ্য স্থল যে, মানুষ যাতে সর্বদা সেখানে উপনীত হবার নিমিত্ত চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে, সে জন্য তার পুর্ণ চিত্রটি অঙ্কন করে তাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। অতীতে যেমন মানুষ এর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে কখনো সেখানে আরোহণ করতে পেরেছে, আবার কখনো দুরে সরে পড়েছে। অনুরূপ তার জন্য আজও পেরেছে, আবার কখনো দুরে সরে পড়েছে। অনুরূপ তার জন্য আজও যেমন দুর্দমনীয় প্রচেষ্টা চালাতে হবে, আগামী দিনও তেমনি করতে হবে। এটা এমন একটি আদর্শ, যার ভিতর মানুষ ও তার অন্তর দিল-দেমাগ শক্তি কর্মক্ষমতা ও যোগ্যতাবলীর উপর গভীর আস্থা নিহিত রয়েছে। সুদুর ভবিষ্যতে মানুষের বেলায় যাতে নিরাশ হতে না হয়, তারও প্রমাণ এর ভিতর নিহিত। এ লক্ষ্যস্থানে উপনীত হবার এমন একটি প্রশস্ত কর্মক্ষেত্র রয়েছে, যা চেষ্টা তদবীর ও সাফল্যের এমন একটি মানদণ্ডের জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত, যা অধিকাংশ মানুষের বেলায় হওয়া সম্ভব। আল্লাহ্ তায়ালার একটি বিশেষ নীতি রয়েছে যে সে কোন ব্যক্তিকে তার শক্তির অতীত ও বহির্ভূত কোন কাজ করতে বাধ্য করেন

মানুষ যাতে করে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখার অনুবর্তি হয় এবং তা অতিক্রম করে জীবনের মানকে নিম্নগামী না করে, ইসলামের স্বাভাবিক গতিধারা সাধারণ মানুষের থেকে এতটুকু কাজই খুশীতে কবুল করে নেয়। কেননা, লে কুল্লে দারাজাতেন মেম্মা আমেলু' (কর্মফল অনুযায়ী সকলের জন্য বিশেষ বিশেষ আলাদা মর্যাদা রয়েছে) আয়াত নাযিল করে মানুষের উপর যে কর্তব্য ও দায়িত্ব তাদের ঘাড়ে চালান হয়েছে, তা জীবনের বিশ্বস্ত পরায়ণতা সরলতা ও মুক্তির জন্য যথেষ্ট। তবে সাফল্যের শীর্ষস্থানে উপনীত হবার কথা স্বতন্ত্র। কারণ তার জন্য পথ সর্বদাই উন্মুক্ত। সে ক্ষেত্রে অগ্রসর হবার দওয়াত দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট।

ইতিপূর্বে আমরা ইসলামের যে প্রাণ-আত্মা ও রূহের কথা উল্লেখ করেছি, তা তার স্বীয় প্রভাব প্রতিপত্তি বাস্তব ইতিহাসের রূপ ধারণ করে জনসমাজে তুলে ধরেছে। ইসলাম যে একটি বিশেষ ধ্যান ধারণার নাম যা ঐতিহাসিক ঘটনার আকারে জনসমক্ষে উপস্থিত তা তারই অবদান। এটা একদিকে যেমন নিছক কোন দর্শনের নাম নয়; অনুরূপ এটা ওয়াজ নসীহত এবং বাস্তব জগতে এমন প্রতিষ্ঠান ও ইতিহাসের রূপ ধারণ করেছে, যা লোক চক্ষের নিকট দৃশ্যমান এবং কর্ণের নিকট শ্রবণশীল। এটা জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে এবং মানব ইতিহাসের পাতায় এমন বিরাট প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে, মনে হচ্ছে যেন একটি স্পন্দনশীল নতুন প্রাণ শক্তি; যা মানুষের অন্তর জগতে প্রবেশ করতঃ তাদের মধ্যে একটি বিপ্লব সৃষ্টি করে তাদেরকে নব চেতনায় ও নব রং এ রঙ্গিন করে একটি জীবন দান করেছে।

ইসলামী ইতিহাস শুরু থেকে আরম্ভ করে তার পরবর্তিকালে বিভিন্ন সময় যে সকল মহান ব্যক্তিত্বের রূপরেখা নিজ পাতায় অঙ্কিত করে রেখেছে, তাই হচ্ছে সেই সকল মহান ব্যক্তিত্বের সঠিক রূপরেখা। এ কথাগুলো আপনাকে সেই সকল রূপকথা অলীক কাহিনী ও অবাস্তব কল্পনা বিলাসের মূলতত্ত্ব রহস্য ও তার যথার্থতা উপলব্ধি করতে সাহায্য করে যা কোন কালে সংঘটিত হয়নি এবং তার সততা সম্পর্কে কোন ঘটনাবলীরও প্রমাণ নেই। আর তাকে নিজ পাতায় স্থান দেয়নি কখনো মানুষের ইতিহাস।

ইসলামের এ বস্তুটিই পবিত্র ও নির্ভীক আত্মত্যাগ ও তিতিক্ষা, উদ্দেশ্য সাধনে নিজেকে বিলীন করে দেযার মানসিক অবস্থা, আত্মা ও চিন্তার অসাধারণ শক্তি এবং জীবনের বিভিন্ন দিকগুলোর সেই সকল মহান কর্মময় ইতিহাসের ব্যাখ্যা করে; –যা ইতিহাসে পূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ করা শক্তির অতীত কাজ।

ইতিহাসের পাতায় বিক্ষিপ্ত রূপে যে সকল অসাধারণ ঘটনাবলী ও কর্মময় ইতিহাস পরিদৃষ্ট হয় তার এবং ইসলামের শক্তিশালী ও স্পন্দনশীল প্রাণ আত্মার মধ্যে আমাদেরকে অবশ্যই একটি গভীর ও জোড়ালো সম্পর্ক স্বীকার করতে হয়। ইসলামী ইতিহাসের চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় যে সকল ঘটনাবলীর প্রর্দশনী দৃশ্যমান রয়েছে, এ প্রাণ আত্মাই হচ্ছে এই শক্তির মূল উৎসস্থল।

আমরা যদি এ ইতিহাসকে এ উৎসস্থল থেকে সম্পর্ক বিবর্জিত ও বিচ্ছিন্ন মনে করে তাকে আলাদা আলাদা দৃষ্টিতে অবলোকন করি, তবে আমাদের পর্যালোচনা অসম্পূর্ণ থাকার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে। আর এ পর্যালোচনার সেই সকল শক্তির ব্যাপারে আমাদেরকে কঠোরতম ভুলের মধ্যে নিপতিত করবে যা জড়জগত ও জীব জগতের মধ্যে সত্যিকার রূপে কার্যকরি রয়েছে। ফলে এ হবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির মহত্বের মূলতত্ত্ব তার নেতৃত্বের মধ্যে নিহিত বলে নিরূপণ করা হবে। আর যে প্রাণ-শক্তি প্রথম থেকে সেই সকল ব্যক্তিত্বের অন্তর রাজ্যে প্রভাব বিস্তার করেছে, যারা যুগের গতিশীল চলমান গাড়ীর দিক পরিবর্তন করে দিয়েছিল এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মূল চাবিকাঠি নিজেদের হাতে নিয়ে তা সবকিছু কর্মচঞ্চল ও কোলাহল পুর্ণ জীবনের এমন একটি প্রবল গতিধারাকে উত্তাল তরঙ্গময় স্রোত ধারার নিকট অর্পণ করেছিল, যে তরঙ্গমালার ঢেউয়ের সাহায্যে এ নেতৃত্ব ও কর্মময় ইতিহাস মানব সমাজের সামনে উপস্থিত হয়েছে;–এমন প্রাণ শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টি আড়ালে রেখে দেওয়া হয়।

আমরা যদি নেতৃত্বের অপূর্ব বিকাশ এবং ঐ সকল কর্মময় ইতিহাসের প্রকাশ ইত্যাদি সমূদয় বস্তুকে এহেন শক্তিশালী ও কর্মমুখর প্রাণ শক্তিরই আবদান নিরূপণ করি, তবে তা অনর্থক কিছু করা হবে না। আসলে এ প্রাণ শক্তি এমন একটি জাগতিক স্পন্দন, যা ইতিহাস ও ব্যক্তিত্বের সাথে এসে মিতালী করে, যা প্রকাশ্যে ব্যক্তিগত ও নিজস্ব হলেও স্বীয় মূলগত দিক দিয়ে অনেক বিস্তৃর্ণ ও সার্বজনীন।

সে প্রাণ শক্তির মধ্যে ব্যক্তির নেতৃত্বের মাপকাঠিতে সেই জাগতিক অবদানকে আকর্ষণ করে রাখার এমন যোগ্যতা নিহিত রয়েছে, যা সে কর্মক্ষেত্রে প্রদর্শন করে। সুতরাং এমন যদি সর্বোচ্চ মর্যাদার স্থান কেবল মাত্র মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুয়াতের মসনদকেই নিরূপণ করা হয়, তবে তা কোন আশ্চার্যের কথা হবে না। তিনিই ছিলেন সেই মহান সত্তা, যিনি এ অবদানকে পূর্ণরূপে ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি তাকে এমনভাবে নিজের করে

নিয়েছিলেন যে, এ মহান আসনে দীর্ঘদিন পর্যন্ত সমাসীন ছিলেন। সমগ্র জীবনে দু' একটি আকস্মিক দুর্ঘটনা ছাড়া এ মহান আসন থেকে এক মুহূর্তের জন্যও তিনি সরে যাননি। এ সয়মটি ছিল সেই দুর্ঘটনার সময়, যে বিষয় আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় হাবিবকে কঠোর ভাবে সাবধান করে ছিলেন। এ স্থান দু'টি ব্যতীত স্বীয় জীবনের সমগ্র মুহূর্ত এ মানুষটির আত্মা জাগতিক অবদানকে পূর্ণরূপে ধরে রাখার মহান কর্মময় ইতিহাস জগতের সামনে তুলে ধরেছেন;-ধরবেন না কেন? মানবাত্মা তো তার সহজাত স্বভাব ও মূলতত্ত্বের দিক দিয়ে একটি জাগতিক শক্তি, তা একাকী কোন শক্তি নয়।

নবুয়াতের মহানতম উচ্চ আসনের পর উচ্চ মর্যাদার আরো বিভিন্ন শ্রেণী রয়েছে, যা রাসুলে করীম (সাঃ) এর বিভিন্ন সাহাবা এবং পরবর্তীকালে ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে তার অনুসারীদের ভাগ্যে জুটে ছিল। যে ব্যক্তি এ মহান ধর্মের প্রাণশক্তিকে যে পরিমাণ নিজের ভিতর আঁকড়িয়ে ধরে রাখতে পেরেছে, অনুরূপ মর্যাদার আসন লাভ করাই তার সৌভাগ্য হয়েছে। আমাদের এ পূর্ণাঙ্গ আলোচনা দ্বারা আমরা পরিষ্কার রূপে অনুধাবন করতে পারি যে, এ প্রাণশক্তি কিরূপে মানব আত্মাকে প্রভাবিত করে ছিল, আর কিরূপেই বা ঘুমন্ত নেতৃত্বকে জাগরিত করে তাকে কর্মচঞ্চল করে তুলেছিল এবং বিরাট বিরাট আশ্চার্যজনক ইতিহাস সৃষ্টি করে কেমন করে পরিবর্তন করে দিয়েছিল মানব ইতিহাসের গতি।

ইতিহাসের বড় বড় ঘটনাপঞ্জি এবং দৈনন্দিন জীবনে আগত সমস্যাবলীর মধ্যেই এ প্রাণশক্তির ফলপ্রসু প্রভাবের সন্ধান আমরা পাই। এ কথা বাস্তব সত্য যে আধ্যাত্মিক মহত্বকে কখনো দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বা তুলাদণ্ডে পরিমাপ করা যায় না। বরং তার সম্পর্ক বিজড়িত রয়েছে মানসিক অবস্থার সাথে। আকার ইঙ্গিত, ধারণা ও বাস্তব ফলক্রিয়া দ্বারাই তাকে সঠিকভাবে অনুমান করা যায়। খুব অল্প সময়ের মধ্যে মানুষ "জাজিরাতুল আরবের" বিরাট প্রভাবশালী রোমক ও ইরানী সাম্রাজ্যের উপর যে বিজয় লাভ করেছিল, মানব ইতিহাসে স্বল্প সময়ের এহেন বিজয়ের নজীর দ্বিতীয়টি আর নেই। বরং এ ধরণের বিজয়ের নজীর পেশ করতে সে অক্ষম। যদি আমরা এ দাবি করি যে কুরাইশগণ হযরত বিলাল হাবশী (রাঃ) প্রতি যে নির্মম জুলুম ও অত্যাচার করেছিল এবং তিনি এহেন মুহূর্তে যে নজীর বিহীন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছিলেন, এর মধ্যেও এ গৌরব ও মহত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এ মহান বিজয় ঘটনার মহত্ত আদৌ ক্ষুন্ন হয় না। কুরাইশরা হযরত বিলালকে তার অবলম্বিত ইসলাম ধর্ম থেকে বিচ্যুত করানোর মানসে তার প্রতি যখন অত্যাচারের অসহনীয় ষ্টীম রোলার চালিয়েছিল, তখন

ধৈর্য ধারণ করে থাকা ছিল মানব শক্তির অতীত। অগ্নিবৎ উত্তপ্ত পাথর টুকরাসমূহের উপর শায়িত করে বুকের উপর জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দেয়ার নির্মম জ্বালা এবং ক্ষুধা ও পিপাসার চাতকসম চরম তৃষ্ণা যে কত বেদনা বিধুর ও মর্মস্পর্শী, তা ভূক্তভোগী ব্যতীত কেহই অনুভব করতে পারে না। এমনিভাবে বিভিন্ন প্রকার অসহনীয় অত্যাচার ও জুলুম তার উপর করা হয়েছিল। তথাপি দোযখ সম অগ্নিকুণ্ডের নির্মম জ্বালার মধ্যে কাল যাপন করে তার মুখ থেকে এ এক আওয়াজই শুনা গিয়েছিল।, আল্লাহু আহাদ। তার পথ থেকে তাকে বিন্দু বিসর্গ পরিমাণ সরিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিল না। এ সঙ্কটময় মুহূর্তে যে শক্তির বলে তিনি চরম সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার পিছনে ছিল ইস্‌লামের এহেন প্রাণশক্তি নিহিত। এ প্রাণ-শক্তিই সাধারণ মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হয়ে তাকে স্বাধীন সমসাময়িক বাদশাহর সম্মুখে নির্ভীক সৈনিকরূপে দণ্ডায়মান করিয়ে দেয়। সে তখন আর আল্লাহর পথে কাহারো ভর্ৎসনা ও তিরস্কারের আদৌ পরওয়া করে না। এ প্রাণ শক্তির বিমুর্ত প্রতীক রূপে দেখতে পাচ্ছি আমরা ইসলামের প্রথম দুই খলীফাকে, যাদের শাসন বহু দেশের উপর বিস্তৃত ছিল। শাহান শাহীর মসনদে অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে ছিল পূর্ণরূপে অল্পতুষ্টির মনোভাব-বিনয় ও সৌজন্যতা। আর দণ্ডায়মান ছিল তারা মহত্ত্ব ও আত্মিক ঐশ্বর্য্যের শীর্ষ চুড়ায়। তারা উভয়ই একই প্রস্রবণ ধারার অমীয় সুধা থেকে তৃষ্ণা নিবারণ করেছিল। সেই প্রস্রবণটি হলো এ শক্তিশালী ও কর্ম চঞ্চল প্রভাবশীল ইস্‌লামী প্রাণ-শক্তি।

তৎকালীন যুগে ইরান ও রোমাক সমাজ ছিল বিশ্বের মধ্যে ধন ঐশ্বর্য্য ও নামকামে দুই প্রভাবশালী দেশ। এ দু'টি বিরাট শক্তিশালী দেশের উপর আরবরা কিরূপে বিজয় লাভ করেছিল, তা সত্যই আশ্চার্য্যের কথা। তারা যে বিপুল পরিমাণ রণ সম্ভার নিয়ে মুসলমানদের সামনে যুদ্ধের ময়দানে দণ্ডায়মান হয়েছিল, তার সামনে মুসলমানদের এতটুকু স্বল্প পরিমাণ রণসম্ভার নিয়ে টিকে থাকা কোন ক্রমেই সম্ভব ছিল না। তথাপি তারা কিসের বলে বলীয়ান হয়ে বিজয় লাভ করেছিল তা ভেবে দেখার বিষয়। তাদের এ বিজয়ের মূলে ছিল ইসলামের সেই রূহানী শক্তি। এ শক্তি ছাড়া কোন ক্রমেই তারা এত বড় বিরাট শক্তির সামনে টিকে থাকতে পারতো না। আসলে ইসলামের এ বিজয়টি ছিল এমন একটি দর্শনগত আধ্যাত্মিক বিজয়, যা মানুষের অন্তর রাজ্যকে দখল করে নিয়েছিল। এ ঘটনাটি ইতিহাসের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের বেলায় সহায়তা করে। কারণ এখানে বস্তুগত বিশ্লেষণ দ্বারা আসল কথা পরিস্কার হয় না। আর এহেন অসাধারণ বিজয়ের বিশ্লেষণ এর দ্বারা সম্ভবও নয়।

আরবীয়দের চিন্তা ও কর্ম জগতে, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে এবং সামাজিক জীবন ও অর্থনৈতিক জীবনে যে একটি বিরাট আধ্যাত্মিক বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছিল তার মান-মর্য্যদা সেই সকল বিজয়গাঁথা থেকে কোন অংশে কম নয় বরং বহুলাংশে বেশী। এ প্রাণ শক্তি ঐ সকল বিজয় গাঁথার চেয়ে ইসলামের মহত্ব, গৌরব ও শক্তির জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করে। রাসুলে করীম (সাঃ)-এর নবুয়াতের সুপ্রভাত থেকে আরম্ভ করে তাঁর ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত এতটুকু স্বল্প সময়ে "জাজীরাতুল আরবের" সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এমন কি মৌলিক পরিবর্তন হয়েছিল, যা আরবদের দর্শন ও চিন্তা, কাজ কর্ম এবং সামজিক জীবনের শৃংখলার মধ্যে একটি বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল। এ সকল কর্মময় ইতিহাসের পিছনে ছিল একমাত্র এ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভংঙ্গীই।

এখানে আমাদের জন্য বিপ্লবের বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়। আমরা শুধু তার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করেই বিষয় বস্তুর সমাপ্তি ঘোষণা করবো। তৎকালীন যুগে আরবগণ এ ধর্মের অস্বীকারকারীদের সম্মুখে যে বর্ণনা দিয়েছিল তার মধ্যেই এ বিপ্লবের নূরানী আলোক বিম্ব পরিলক্ষিত হয়; যা তারাও অস্বীকার করেনি। এটা ছিল তখনকার কথা যখন ইসলামের দাওয়াত তারা প্রাথমিক স্তর অতিবাহিত করেছিল। আর মক্কার কুরাইশদের নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য এবং স্বীয় দ্বীনের নিরাপত্তার খাতিরে হাবশায় হিজরত করেছিল। মুসলমানগণ দারুল হিজরতে গিয়েও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারলো না। কুরাইশরা হিংস ও সন্দেহের বশবর্তী হয়ে হাবশাব শাসনকর্তা নাজ্জাশীর নিকট তাদের দেশ থেকে আগত মোহাজিরদেরকে বিতাড়িত করার নিমিত্ত অনুরোধ জ্ঞাপন কল্পে দুজন দুতের সমন্বয়ে একটি মিশন প্রেরণ করেছিল। এ মিশনের ভিতর ছিল ওমর ইবনুল আস এবং আবদুল্লাহ বিন রাবিয়াহ। তারা নাজ্জাশীর নিকট গিয়ে বললো ঃ

"হে বাদশাহ। আমাদের কিছু সংখ্যক অবুঝ ছেলে পালিয়ে আপনার দেশে এসে স্থান নিয়েছে। তারা নিজ সম্প্রদায়ের ধর্মকে যেমন পরিত্যাগ করেছে, তেমনি আপনার ধর্মও তারা স্বীকার করছে না। তারা এমন একটি মনগড়া ধর্ম বানিয়ে নিয়েছে, যা আমাদের নিকট যেমন অভিনব তেমনি আপনার নিকটও। তাদের সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ যার মধ্যে তাদের বাপ চাচাগণও রয়েছে, তাদেরকে তাদের নিকট পাঠিয়ে দেবার নিমিত্ত তারা আপনার নিকট আমাদেরকে প্রেরণ করেছে।

তারা হলো এ ছেলেগুলোর তুলনায় অত্যাধিক বোধশক্তি ও ধীশক্তি সম্পন্ন। তারা দেশের সম্বন্ধে যে বিষয় অভিযোগ উত্থাপন করেছে এবং মন্দ অবস্থা বর্ণনা করছে, তা তারা এদের থেকে ভাল ভাবেই ওয়াকিফহাল।"

দুত দ্বয়ের এ বিবৃতি শ্রবণ করে নাজ্জাশী মুসলমানদের নিকট জিজ্ঞেস করলো–তোমরা যে ধর্মটির খাতিরে স্বীয় সম্প্রদায়ের ধর্মকে পরিত্যাগ করেছ, এবং যার কারণে তোমরা আমার ধর্মেও শামিল হচ্ছ না এবং অপর কোন ধর্মও গ্রহণ করছো না সে ধর্মটি কি ধর্ম? তখন জাফর বিন আবু তালিব (রাঃ) উত্তর দিলেন ঃ

"হে বাদশাহ! আমরা বর্বরতা ও জাহেলীয়াতের অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত ছিলাম। দেব-দেবতার পূজা অর্চনা করতাম, মৃত জীবের মাংস ভক্ষণ করতাম এবং খারাপ কাজে লিপ্ত থাকতাম। খুন খারাবীর বেলায় আত্মীয়-স্বজন বা পাড়া প্রতিবেশীর প্রতি কোন লক্ষ্যই আমাদের থাকতো না, প্রতিবেশীর হক হুকুকের বেলায় আনমনা থাকাটা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। শক্তিশালীরা দুর্বলদের রক্ত চুষে খেত। এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালা আমাদের থেকে একজন লোককে নবী মনোনীত করে আমাদের নিকট প্রেরণ করলেন। আমরা তার বংশাবলী, সত্যবাদীতা, আমানতদারী, শালীনতা ও পবিত্রতা সম্পর্কে বেশ ওয়াকিফহাল। তিনি আমাদের আল্লাহর পথে দাওয়াত দিয়ে একমাত্র তাঁরই ইবাদাত বন্দেগী করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আর আল্লাহ তায়ালাকে পরিত্যাগ করে আমাদের পিতা মাতাগণ যে পাথর ও দেবতার পূজা অর্চনা করতো তা পরিত্যাগ করার জন্যও তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি সত্য কথা বলতে, আমানত রক্ষা করতে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখতে এবং ঝগড়া ফাসাদ ও খুন খারাবী থেকে দূরে থাকারও শিক্ষা দিয়েছেন। আর তিনি আমাদেরকে অশ্লীল ও শালীনতা বিবর্জিত বাক্যালাপ করতে, এতীমদের ধন সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করতে এবং শরীফ ও ভদ্র নারীদের নামে মিথ্যা ও অপমানকর অপবাদ রচনা করতেও বারণ করেছেন। তিনি একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ইবাদাত করতে, তাঁর সাথে কাহাকেও আংশীদার না করতে এবং নামায রোযা ও যাকাত দান করতে আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।"

এ সময় কুরাইশদের মিশনের উভয় সদস্যই বাদশাহর দরবারে উপস্থিত ছিল। তাদের ভিতর ওমর ইবনুল আসের মধ্যে যেমন ছিল না শঠতা কুটনৈতিকতার কোন অভাব, তেমনি বাগ্মিতার ক্ষেত্রেও ছিল যে বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু জাফর (রাঃ) ইসলামের পূর্বেকার আরব সমাজের যে নগ্ন চিত্রটি তুলে ধরেছেন এবং এ নব ধর্মটির হাকিকত সম্পর্কে যা কিছু বর্ণনা দিয়েছেন সে সম্পর্কে উভয়ের কেহই উচ্চবাচ্য তো দুরের কথা টুশব্দটি পর্যন্ত করেনি। এর দ্বারা এটাই প্রমাণ হচ্ছে যে আরবের অতীত ও বর্তমান অবস্থার বর্ণনা সম্পূর্ণরূপে বাস্তব সত্য কথা।

এটা ছিল জাজিরাতুল আরব সম্পর্কে একটি ঐতিহাসিক জ্বলন্ত সাক্ষ্য। আধুনিক যুগের একজন T. H Denision নামীয় অমুসলিম লেখক তার স্বলিখিত "Emotions on the basis of civilization" শীর্ষক পুস্তকে তৎকালীন যুগের সমগ্র দুনিয়াটির চিত্র তুলে ধরে বলেছেন ঃ

"পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে এ সভ্যজগত এমন একটি অনিশ্চিত ও ভয়াবহ পরিস্থিতির চরম সীমায় গিয়ে উপনীত হয়েছিল মনে হচ্ছিল যেন, চার হাজার বছরের মানুষের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় গড়ে উঠা বিরাট আজীমুশ্শান সভ্যতা সংস্কৃতি ও তাহজীব তমদ্দুন খণ্ড-বিখন্ড ও চুর্ণ-বিচুর্ণ হতে যাচ্ছে। আর মানবতা বর্বরতার এমন একটি অন্ধকারময় যুগের মধ্যে দ্বিতীয়বার প্রবেশ করতে যাচ্ছিল, যা ইতিপূর্বে চলে গেছে। বিভিন্ন সম্প্রদায় মারামারি কাটা-কাটি ও আত্মকলহে সর্বদা লেগেই থাকতো। তখনকার দিনে সমাজে এমন বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল যে, আইন শৃঙ্খলা যা কিছু প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা সংহতি, নিরাপত্তা ও শৃংখলার পরিবর্তে বিশৃংখলা ও অনৈক্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখনকার দিনে সভ্যতা ও তাহজীব তমদ্দুনের অবস্থা এমন একটি বিরাটকায় বৃক্ষের আকারে রূপ ধারণ করেছিল যার শাখা-প্রশাখা দুর-দুরন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আর সমগ্র দুনিয়া তারই ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতো। কিন্তু এ বৃক্ষটির ভিতরে এমনরূপে ঘুনে ধরলো যে তার কাণ্ডদেশে তা সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় ছড়িয়ে পড়লো। এহেন সামগ্রিক বিশৃঙ্খলা ও হাঙ্গামাপূর্ণ অবস্থার প্রদর্শনীর মধ্যে এমন একজন বিরাট ধীশক্তি সম্পন্ন ও প্রতিভাবন মহাপুরুষের জন্ম হয়েছিল, যিনি সমগ্র দুনিয়ার বিশৃংখলা দুর করে সকল মানুষকে এক মন্ত্রের বন্ধনে আবদ্ধ করে গিয়েছেন।"

যেহেতু এ কাহিনী খুব দীর্ঘ ও লম্বা চওড়া কাহিনী এবং অত্র পুস্তকের বিষয়বস্তু ইসলামের পূর্ণাংগ আলোচনা নয়, বরং ইসলামের সামাজিক সুবিচার হলো এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সুতরাং এ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর উপর এবং এ বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কিছু ঐতিহাসিক নজীর পেশ করেই আলোচনার সমাপ্তি ঘোষণা করবো।

জাগ্রত আত্মার নমুনা

এ সকল ঐতিহাসিক উদাহরণবলীর পূর্বে আমরা এমন সব প্রাণ-আত্মা নিয়ে আলোচনায় বসাটাকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে করছি, যার উপর ইসলামের সমগ্র সৌধ এমারত প্রতিষ্ঠিত।

ইস্‌লাম যে সর্বদা ব্যক্তির আত্মাকে জাগরিত রাখার শিক্ষা দেয় এবং তাদের চেতনাবোধকে অতিমাত্রায় অনুভূতি পরায়ণ দেখতে ইচ্ছুক সে বিষয় আমরা বিশদ আলোচনা করেছি। এহেন জাগ্রত আত্মা এবং প্রকট চেতনাবোধের ব্যক্তিত্ব ইস্‌লামী ইতিহাসের পাতায় এত বেশী পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়, যা অত্র পুস্তকের পাতায় লিপিবদ্ধ করা হলেও শেষ হবে না। আমরা এখানে মাত্র বিভিন্ন প্রকৃতির নজীর পেশ করছি ঃ

হযরত বরীদাহ্ (রাঃ) বলেন– মাগির বিন মালেক (রাঃ) রাসুলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললো, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাকে পবিত্র করুন। নবীকরীম (সাঃ) উত্তর করলেন-পাপিষ্ট দুর হও, আল্লাহর দরবারে একাগ্রচিত্তে তাওবা এস্তেগফার করো। বর্ণনাকারী বলেন, সে কিছুদুর ফিরে গিয়ে আবার নবী করীম (সাঃ)-এর দরবারে সে বললো, হে আল্লাহর নবী! আমাকে পবিত্র করে দিন। নবী করীম (সাঃ) এবারেও পূর্ব্ববৎ জবাব দিয়ে তাকে বিদায় করলেন। এমনিরূপে তিনবার করা হলে চতুর্থবার নবী করীম (সাঃ) উত্তর করলেন–আমি তোমাকে কি বস্তু থেকে পবিত্র করবো? সে বললো অবৈধ যৌন ক্রিয়াকলাপের পাপ থেকে। নবী করীম (সাঃ) উপস্থিত লোকদের নিকট জিজ্ঞেস করলেন–এ লোকটি পাগল নয় তো? তারা লোকটি পাগল নয় বলে তাঁকে জানালেন। নবী করীম (সাঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন–লোকটি মাদকদ্রব পান করছে নাকি? এক ব্যক্তি মাগিরের মুখের ঘ্রাণ নিয়ে দেখলো যে সে কোন মাদকদ্রব পান করেনি। নবী করীম (সাঃ) আবার উক্ত লোকটির নিকট জিজ্ঞেস করলেন-তুমি কি অবৈধ যৌনক্রিয়া সম্পাদন করেছ? সে উত্তর করলো, জিঁ হা-করেছি। তখন নবী করীম (সাঃ) তার প্রতি শরীয়াতের হুকুম জারী করার নির্দেশ দিলে তাকে সংগেসার করে হত্যা করা হলো।

এ ঘটনার দু'তিন দিন পর নবী করীম (সাঃ) দরবারে সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন–তোমরা মাগির বিন মালেকের মাগফিরাত কামনা করে প্রার্থনা করো। সে এমনিভাবে খালেছ তাওবা করেছে যে, সমগ্র লোকের মধ্যে তার তাওবাকে বন্টন করে দেয়া হলে সকলের জন্য তাই যথেষ্ট হতো।

অতঃপর একদিন ইজ্‌দ গোত্রের একজন গর্ভধারী রমণী নবী করীম (সাঃ) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললো–হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে পবিত্র করুন।

তিনি উত্তর করলেন দুরাচারী দুর হও, আল্লাহর দরবারে বিনয়ের সাথে এস্তেগফার করো। সে বললো আপনি কি আমাকে মাগের বিন মালেকের ন্যায় ফিরিয়ে দিতে চান? আমার এ গর্ভ অবৈধ রূপে সঞ্চার হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন–অবৈধ যৌনক্রিয়ার দ্বারা কি তোমার গর্ভ সঞ্চার হয়েছে? রমণী হাঁ সুচক জবাব দিল। তখন নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করলেন, তুমি গর্ভের সন্তান ভুমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো। বর্ণনাকারী বললেন–নবী করীম (সাঃ) উক্ত রমণীটিকে সন্তান ভুমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বললেন। বর্ণনাকারী বললেন–নবী করীম (সাঃ) উক্ত রমণীটিকে সন্তান ভুমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত এক আনসারী ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে রেখে ছিলেন। কিছু দিন পর আনসারী ব্যক্তি রমণীটির সন্তান ভুমিষ্ট হবার কথা নবী করীম (সাঃ)-এর গোচরীভূত করলে তিনি বললেন–আমি উক্ত রমণীটিকে সঙ্গেসার করে তার কচি দুধের শিশুটি এমনভাবে একাকী ফেলে রাখাতে পারি না যে, তার জন্য আর কোন দুগ্ধপান থাকবে না। তখন একজন আনসারী উঠে বললেন–আমি তাকে দুগ্ধ পান করার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিজ দায়িত্বে নিলাম। বর্ণনাকারী বললেন–অতঃপর নবী করীম (সাঃ) উক্ত রমণীটিকে সঙ্গেসার করার হুকুম দিয়েছেলেন।

অপর একটি বর্ণনায় এমনিরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় যে, নবী করীম (সাঃ) উক্ত রমণীটিকে বললেন–তুমি চলে যাও। শিশুটি ভূমিষ্ট হবার পর এসো। শিশুটি ভুমিষ্ট হবার পর রমণীটি নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি তাকে আবার বললেন–এখন গিয়ে শিশুকে দুধ পান করাতে থাকো। দুগ্ধ পান শেষ হলে আমার কাছে আসবে। শিশুটি দুগ্ধ পান পরিত্যাগ করলে শিশুটিকে কোলে নিয়ে বনী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে এমন অবস্থায় উপস্থিত হলো যে তখন শিশুটির হাতে এক খণ্ড রুটির টুকরা ছিল। রমণীটি বলল–হে আল্লাহর রাসুল। শিশুটি দুগ্ধ পান করা ছেড়ে দিয়েছে। এই দেখুন সে রুটি খাচ্ছে। তখন নবী করীম (সাঃ) শিশুটিকে একজন মুসলমানের নিকট সোপর্দ করে তাকে পাথর মেরে উড়িয়ে দেবার নির্দেশ জারী করলেন। সুতরাং রমনীটিকে বুকসম মাটির ভিতর গেড়ে নবী করীম (সাঃ) এর নির্দশ অনুযায়ী সকলে তার উপর পাথর নিক্ষেপ আরম্ভ করেছিল। হযরত খালিদ বিন অলীদ (রাঃ) রমণীটির নিকট অগ্রসর হয়ে তার মস্তকদেশে প্রস্তর নিক্ষেপ করলে শোনিত ধারা বিচ্ছুরিত হয়ে

তার মুখমণ্ডলে পড়লে তিনি রমণীটিকে খারাপ ভাষায় ভর্ৎসনা করলেন। তখন নবী করীম (সাঃ) খালেদকে বললেন–খালেদ। একটু ধৈর্য্যশীল হও। যার হাতে আমার প্রাণ আমি তার নামে শপথ করে বলছি যে এ রমণী এমন খালেছ ভাবে তাওবা করেছে, যদি এমন তাওবা কোন খাজনা উসুলকারী তশীলদারও করতো, তবে তাকে মার্জনা করা হতো। অতঃপর নবী করীম (সাঃ)-এর নির্দেশ মতে রমণীটির জানাযার নামায পড়ে তাকে সমাহিত করা হলো।

হযরত মাগের (রাঃ) এবং উক্ত রমণীটির কার্যক্রম আমাদের সামনে সুস্পষ্টভাবে দীপ্তমান। তাদেরকে যে শাস্তি দেয়া হয়েছে তাদের পরিণতি কি হবে এ বিষয় তারা ওয়াকিফহাল ছিল না এ কথা কোন ক্রমেই সন্দেহ করা যায় না। এ ছাড়া তাদের কৃত অপরাধ কোন লোক চাক্ষুস রূপে অবলোকনও করেনি যে তারা এ বিষয় সাক্ষ্য দান করবে। এতদ্‌সত্ত্বেও তারা স্বীয় অপরাধের কথা নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট প্রকাশ করে তার সমুচিত শাস্তি দেবার জন্য তাঁকে বার বার অনুরোধ জানালো। কিন্তু নবী করীম (সাঃ)-এর মানব সুলভ দয়া এবং ইসলামের কৃপার প্রকৃতিগত দাবি হচ্ছে যে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তাদেরকে শাস্তি থেকে রেহাই দেয়া। তথাপি তাদের বারংবারের স্বীকৃতি দ্বারা আল্লাহর শাস্তি নিধান থেকে নিষ্কৃতি লাভের পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। এমনকি রমণীটি তো নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে বেয়াদবী মূলক কথা বলে ফেললো যে, আপনি আমাকে মাগরের ন্যায় ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছা করেন নাকি? এ কথার দ্বারা মনে হচ্ছিল যে, রমণীটি দ্বীনের ব্যাপারে নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি কোমলতা ও শিথিলতা প্রদর্শনের অপবাদ চাপিয়ে দিতে চায়। এমনি কেন তারা দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীয় দুষ্কর্মের কথা স্বীকার করতঃ তার প্রতিকারের বিধান চেয়ে পাপ কার্য থেকে পবিত্র হতে চায়? কোন শক্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা নিশ্চিতরূপে মৃত্যুর কথা জেনেও পরকালের পথ পরিষ্কার করার জন্য নিজেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল। এর দ্বারা তাদের ভিতরগত কর্মচঞ্চল একটি অন্তর্নিহিত শক্তির ইঙ্গীতই আমাদের নিকট দিতেছে। এ শক্তিটি হলো জাগ্রত আত্মা, সুপ্তহীন বিবেক এবং চেতনা বোধের প্রকট অনুভুতি। যার বাস্তব প্রকাশ অবলোকন করছি আমরা তাদের কৃত অপরাধের স্বীকারোক্তি থেকে। তারা এমন একটি পাপ থেকে মুক্তি চেয়ে ছিল, যে সম্পর্কে আল্লাহ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন লোক জ্ঞাত ছিল না। কাল কিয়ামতে আল্লাহর দরবারে তাদেরকে এমন একটি গুনাহের কাজ করে উপস্থিত হতে হবে, যা থেকে, তারা এখানো পবিত্র হয়নি। এটাই ছিল তাদের

বিবেকের নিকট বিরাট একটি লজ্জাস্কর ব্যাপার। জীবনের বিনিময়ে হলেও তাদের বিবেক-বুদ্ধি এ লজ্জাকে বরণ করে নিতে পারে না। এটাই কি তাদের স্বীকৃতির মূল কারণ? এটাই তাদের জাগ্রত আত্মা ও সজাগ জ্ঞান-বুদ্ধির পরিচয় বহন করে।

এ হচ্ছে সত্যিকারের ইস্‌লাম। আর অপরাধীর অন্তরে যে প্রকট চেতনাবোধ জন্ম হয়, তারই বাস্তব প্রকাশ। অপরাধীদেরকে ফিরিয়ে দিতে রাসূলে করীম (সাঃ) যে স্নেহ দয়া ও ভালবাসার পরকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন, তা হচ্ছে দয়া ও মার্জনার বাস্তব প্রতিবিম্ব। আর নবী করীম (সাঃ)-এর এহেন বুদ্ধিমত্তা হচ্ছে তারই অবদান যার বাস্তব প্রকাশ দোষ প্রমাণিত হবার পর অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের বেলায় হয়। যে স্বীকারোক্তি দ্বারা পবিত্রতা অথবা তাওবার মহত্ব তাকে আইন প্রয়োগ থেকে বিরত রাখতে পারে নি। এর কারণ হচ্ছে যে অপরাধী এবং আইন প্রয়োগ কর্তা (বিচারক) উভয়েই এ দ্বীনের মৌলিক ভিত্তির উপর দৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান থাকতে আন্তরিকভাবে আগ্রহী।

শরীয়াতের দণ্ড বিধানের বেলায় যে আত্মা ও বিবেক-বুদ্ধির এরূপ অবস্থা হতে পারে, সে সকল আত্মার অবস্থা যে সকল সামাজিক কাজের জন্য জান কুরবান করে দিতে হয়, তার বেলায় কিরূপ হতে পারে, তা এর দ্বারাই সহজে অনুমান করা যায়।

এ বিষয় সিরিয়ার সৈন্য বাহিনীর প্রধান সেনাপতির পদ থেকে হযরত খালেদ বিন অলীদ (রাঃ)-কে অপসারণ করে তদস্থলে আবু ওবায়দাকে সেনাপতির পদে নিয়োগের ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খালেদ ছিল ইসলাম জগতের সেই সেনাপতি, যিনি জীবনে কখনো পরাজয়ের গ্লানি বহন করেননি, যাকে রাসূলে করীম (সাঃ) নিজেই "সাইফুল্লাহ" উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। সৈনিক বিদ্যায় তিনি এমন ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন যে তার শিরা-উপশিরা ও ধমনীর সাথে তা সংমিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল। জাহেলিয়াতের যুগে যেমনি ছিলেন দুর্ধর্ষ যোদ্ধারূপে পরিচিত, তেমনি ছিলেন ইসলামের যুগে। এ খালেদকেই প্রধান সেনাপতির পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছিল। তিনি বিদ্বেষ শত্রুতা কিম্বা ঘৃণা ও ঝগড়া ফাসাদ করে এ মসনদ থেকে নেমে আসেনি এবং তার আত্ম মর্যাদাবোধও তাকে যুদ্ধের ময়দান থেকে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে উদ্বুদ্ধ করেনি। তার মনের কোনায় কোনরূপ বিদ্রোহ করার ধারণা সৃষ্টি হবার প্রশ্নই হতে পারে না। সে যুদ্ধের ময়দানে পূর্ববৎ পূর্ণ উৎসাহ উদ্যম নিয়ে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী রাখার নিমিত্ত এবং আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করে

শহীদের খাতায় চিরন্তন রূপে উজ্জ্বল ভাস্কর হয়ে থাকার আশায় আমরণ জেহাদ করে গিয়েছিলেন। মানবিক রিপু তাকে তার পথ থেকে বিন্দুবিসর্গ পরিমাণ সরিয়ে নিতে পারেনি। এ স্থানে সে তার অন্তরে কোন প্রকার শয়তানী কুমন্ত্রণাকে প্রশ্রয় দেয়নি। কেননা ইসলাম ব্যক্তির অন্তরে সর্বদা যে চেতনাবোধ ও প্রকট অনুভুতি সৃষ্টি করে, তা এ থেকে অনেক বড় উন্নত ও মহান। এ সমস্ত কথা ও কাজ তার সামনে আদৌ টিকে থাকতে পারে না। প্রবল জলোচ্ছ্বাসের সাথে খরকুটো যেমন ভেসে যায়, তেমনি মানব অন্তরের জাগ্রত চেতনাবোধ এবং প্রকট অনুভূতির সামনে তা কিছুই নয়, শুধু খর কুটার মতই প্রায়।

এই ঘটনাটির দ্বিতীয় দিকটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আর তা হচ্ছে হযরত ওমর (রাঃ) এর সম্পর্কে। প্রকৃতপক্ষে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে খালেদ বিন অলীদ (রাঃ)-কে প্রধান সেনাপতির পদ থেকে অপসারণ হযরত ওমর (রাঃ)-এর প্রকট চেতনা অনুভূতিরই বস্তব ফল। তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে খালেদ বিন অলীদের এমন কতকগুলো ভুল-ত্রুটি ধরে ছিলেন, যার কারণে তার অন্তর আল্লাহর ভয়ে থর থর করে কাঁপছিল। একটি বিষয় ছিল যে, সে মালিক বিন নবীরাহকে খুব তাড়াতাড়ি হত্যা করে তার স্ত্রীকে সে নিজে বিবাহ করেছিল। আর দ্বিতীয় বিষয় হলো যে মুসাইলামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় যেদিন বারশত বিশিষ্ট সাহাবা শাহাদত বরণ করে ছিলেন, সেদিন ঠিক ভোর বেলায় খালেদ (রাঃ) কর্তৃক মাজাহর কন্যাকে বিবাহ করণ। এ সকল কথার পরিপ্রেক্ষিতে আমার মতে যে বিষয়টি খারাপ মনে হচ্ছিল, তা হলো যে তিনি একজন খ্যাতনামা পারদর্শি সিপাহ সালার এবং তিনি সকলের চেয়ে অনেক যুদ্ধ পরচালনা করে বিজয়ের তাজ মুকুট লাভ করেছিলেন, তিনি তার আদৌ কোন মূল্য দিলেন না। তখন সমগ্র মুসলিম জাতি ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যে বিরাট একটি চূড়ান্ত ফয়সালা মুলক যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। কিন্তু খালেদের অশ্লীল ত্রুটি হযরত ওমর (রাঃ) মনে যে প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল, তা তাকে কোন বস্তুই দাবিয়ে রাখতে সক্ষম হয়নি। খালেদকে সৈন্যবাহিনী থেকে সম্পূর্ণরূপে বহিষ্কার করার তার সিদ্ধান্তকে কোন বস্তুই পরিবর্তন করতে পারলো না। উপরন্তু কারণ হলো যে, খলিফার পক্ষ থেকে যে কাজের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত করা হতো, সে কাজ তিনি স্বীয় খেয়াল খুশী মত সমাধা করতেন। আর এটা ছিল হযরত ওমর (রাঃ)-এর স্বভাব প্রকৃতির সাথে অসামঞ্জস্য ও বিপরিত কাজ। তাই খুটি-নাটি বিষয়েও হস্তক্ষেপ করা এবং প্রত্যেকটি বিষয় কড়া নজর রাখা হযরত ওমরের (রাঃ) দায়িত্ব বোধ অবশ্য প্রয়োজন মনে করেছিল বলেই তিনি পথের কাঁটা সরিয়ে ফেললেন।

এখানে এ প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক যে যদি খালেদ (রাঃ) এত বড় বিরাট অপরাধই করেছিলেন, তবে হযরত আবু বকর (রাঃ) তাকে ছেড়ে দিলেন কেন?

আসল ব্যাপার হচ্ছে যে, হযরত খালেদ (রাঃ) সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)-এর মনে যতখানি খারাপ ধারণা বদ্ধমূল ছিল, ততখানি খারাপ ধারণা হযরত আবুবকর (রাঃ) মনে ছিল না। তার মতে খালেদ (রাঃ) থেকে যে ভুলত্রুটি প্রকাশ পেয়েছে, তা তার ইচ্ছাকৃত ছিল না; বরং তা তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণগত কারণে হয়েছিল। আর এ কারণেই তার প্রতি গোস্বা থাকার পরিবর্তে হযরত আবু বকর (রাঃ) তাকে মার্জনা করে ছিলেন। আর দ্বিতীয় ঘটনাটি যেহেতু তার নিকট খুব খারাপ মনে হবার কারণে খালেদের নিকট একটি জরুরী পত্রও তিনি লিখেছিলেন। তাই হযরত আবু বকরের নিকট খালেদের (রাঃ) ভুল মার্জনা যোগ্য বিবেচনা হবার কারণে তিনি তাকে ক্ষমা করে ছিলেন।

তৎকালীন যুগে ইসলামী মানস যতখানি উন্নত ছিল তার সাথে এ ঘটনার বিশ্লেষণের সাথে সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। সুতরাং এটা আমার নিকট খুব আশ্চর্য মনে হচ্ছে যে, ডক্টর হায়কল যদিও বর্তমান যুগের দুর্গন্ধময় রাজনীতির সাথে বিজড়িত, তথাপি সে কি কারণে খালেদ (রাঃ) সম্পর্কে হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) সিদ্ধান্তের এমন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে বাধ্য হলেন, যার সাথে ইসলামের রূপ ও আধ্যাত্মিকতার আদৌ কোন সম্পর্ক নেই।

তিনি তার স্বরচিত "আচ্ছাদীকু আবু বকর" পুস্তকের ১৫০ থেকে ১৫২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত নিম্ন লিখিত মন্তব্য রেখেছেন–"মালিক বিন নবীরাহ্ এর ব্যাপারে হযরত ওমর ও আবু বকর (রাঃ)-এর মতভেদ কতদুর সীমা পর্যন্ত গিয়ে পৌছেছে, তা তোমরা পর্যবেক্ষণ করছো। এ কথা ধ্রুব সত্য যে এ মহান নেতাদ্বয় সর্বদাই ইসলাম ও মুসলমানের কল্যাণকামী ছিলেন। সুতরাং তাদের এ মতানৈক্যের মূল কারণ কি এটাই ছিল যে খালেদের ভুলটি একজনের নিকট খুব বিরাট ভুল বলে বিবেচিত হচ্ছিল। আর অপরজন এ ভুলটিকে ভুল বলে কোন মূল্যই দেননি। অথবা আরবের চতুর্দিকে যখন ফেৎনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, তখন ইসলাম ও মুসলমানদের জাতীয় জীবনের নাযুক পরিস্থিতিতে কোন কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা সময় উপযোগী হবে, তা স্থির করণে তাদের মতানৈক্য হওয়াই কি এর কারণ?

আমার মতে ইসলামের এহেন সঙ্কটের সময় কি কর্মপন্থা অবলম্বন করা উচিত সেই ব্যাপারেই ছিল তাদের মতভেদের কারণ। এ দু'ব্যক্তির স্বভাবের

মধ্যে প্রকৃতিগত যে পার্থক্য ছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরণের মতানৈক্য হওয়া অস্বভাবিক কিছুই নয়। যেহেতু হযরত ওমর (রাঃ) ছিলেন একজন ন্যায় ইন্‌সাফের বিমুর্ত প্রতীক স্বরূপ। তার মতে খালেদ (রাঃ) একজন মুসলমানের প্রতি জুলুম করেছিল এবং ইদ্দত পূর্ণ হবার পূর্বেই তার স্ত্রীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল। সুতরাং ভবিষ্যতে যাতে সে এ ধরণের অপকর্মের সুযোগ আর না পায় এবং মুসলমানের মধ্যে যাতে এ নিয়ে গোলযোগের সৃষ্টি না হয়, আর আরববাসীদের দৃষ্টিতে যাতে তার সম্মান সম্ভ্রমের হানি না ঘটে, এ জন্য তাকে সৈন্য বাহিনীতে স্থান দেয়া কোনক্রমেই তার মতে ঠিক নয়। আর সে লায়লার সাথে যে ব্যবহার দেখিয়েছে, সে জন্য তাকে শাস্তি না দেয়াটাও সঠিক কাজ হবে না। এটা যদি স্বীকার করে নেয়াও হয় যে মালেকের বেলায় তার অনিচ্ছা কৃত ভুল হয়েছিল;–যদিও হযরত ওমর (রাঃ) তা স্বীকার করছেন না। তথাপি সে তার স্ত্রী লায়লার সাথে যে ব্যবহার করেছে, তার প্রতি দণ্ডবিধান জারী করার জন্য হযরত ওমরের নিকট তাই যথেষ্ট। তিনি যে সাইফুল্লাহ উপাধি লাভ করেছেন এবং তিনি যে সব যুদ্ধেই যেতেন সেখানেই বিজয় লাভ করতেন, এটা তার জন্য কোন ওজর হবার কথা নয়। যদি এ ধরণের ওজর স্বীকার করে নেয়া হয়, তবে তার অর্থ হবে যে খালেদ এবং তৎসম লোকদের জন্য হারামকে হালাল অবৈধকে বৈধ করে দেয়া।

এটা করার অর্থ হচ্ছে মুসলমানদের সামনে কিতাবুল্লাহকে সম্মান করার একটি অবাঞ্ছিত দৃষ্টান্ত। হযরত ওমর এ বিষয় স্বীয় মতামতের ব্যাখ্যা বার বার বিশ্লেষণ করলে হযরত আবু বকর অগত্যা খালেদ (রাঃ)-কে ডেকে এনে এ সব কার্যের জন্য তাকে কঠোর ভাবে ফাসিয়ে ছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট তখন দেশের অবস্থা এত সংঙ্কটময় ছিল যে এ ধরণের ঘটনার কোন মূল্য দেয়াই সম্ভব নয়। সমগ্র দেশ জুড়ে একটি ভয়াবহ ও আতঙ্কজনক পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল। মরু আরবের বুকে চতুর্দিক থেকে বিদ্রোহ মাথাচড়া দিয়ে উঠেছিল। এমতাবস্থায় অনিচ্ছা পূর্বক কিম্বা ইচ্ছা পূর্বক এক ব্যক্তিকে হত্যা করার বিষয়টির গুরুত্ব থাকে কোথায়? সেনাপতির প্রতি যে কাজের জন্য দোষারোপ করা হয়েছিল, তখন এ সকল অবাঞ্ছিত ঘটনাবলীর তুলনায় প্রতিরক্ষার সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম ছিল সেনাপতির জন্য কাহাকেও বিবাহ করা। এছাড়া আরবের দস্তুর মতে পবিত্র হবার পূর্বে তার সাথে সহবাস করা স্বাভাবিক অভ্যাসের কোন পরিপন্থী কাজ ছিল না;–বিশেষ করে কোন বিজিত সেনাপতির জন্য। কেননা

যুদ্ধের কারণে তার এ অধিকার রয়েছে যে, সে যুদ্ধবন্দী রমণীদেরকে স্বীয় মালিকানায় রাখবে। খালেদের ন্যায় একজন বিরাট প্রতিভাবান সেনাপতি ও অসাধারণ মানুষের বেলায় আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে কাজ করা কোন জরূরী বিষয় নয়। বিশেষ করে যখন কোন কাজ করা রাষ্ট্রীয় স্বার্থের পরিপন্থী কাজ এবং তার কারণে অসুবিধার মধ্যে নিপতিত হতে হয়, তখন সে কাজ করা কোনক্রমেই সমীচীন নয়। এ সময়টা এত গুরুত্বপূর্ণ সময় ছিল যে তখন মুসলমানদের জন্য খালেদের তরবারীর প্রয়োজন প্রকটভাবে অনুভূত হচ্ছিল। আর যখন হযরত আবুবকর (রাঃ) খালেদ (রাঃ)-কে ডেকে এনে তাম্বীহ-তাগিদ করেছিলেন, সেদিনের গুরুত্বের কথা অপরিসীম। সেদিন বাত্তালের অতি নিকটে ইমামার ময়দানে মুসায়লামাহ চল্লিশ হাজার সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে মুসলমানের বিরুদ্ধে লড়াই করার অপেক্ষায় ছিল। মুসলমান এবং ইসলামের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ ছিল খুব বিরাট ভয়াবহপূর্ণ ও বিভীষিকাময় বিদ্রোহ। আর মুসলমানের কমাণ্ডারদের মধ্য থেকে আকরামা (রাঃ) কে শত্রুপক্ষ ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তখন এ ময়দানে বিজয় লাভের আশা একমাত্র খালেদের নেতৃত্ব দানের উপরই নির্ভর করছিল। এহেন সঙ্কটময় মুহূর্তে মালেক বিন নবীরাহকে হত্যা করার অপরাধে অথবা লাইলাকে বিবাহ করার কারণে কি খালেদকে সেনাপতির পদ থেকে অপসারণ করে মুসলমানদেরকে মুসায়লামার নিকট পরাজয়ের গ্লানি বহন করার জন্য ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর দ্বীনকে বিরাট সঙ্কটের মুখে ফেলে দেয়া কোন খলিফার জন্য সম্ভব? খালেদ হলো আল্লাহর তরবারী। সুতরাং তখনকার জন্য আবুবকর (রাঃ) কর্তৃক খালেদকে ডেকে এনে তাম্বীহ তাগিদ করতঃ মুসায়ালায়ামার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ইমামায় প্রেরণ করাই ছিল সময়োপযোগী কাজ। বস্তুতঃ এ ব্যাপারে হযরত আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর মধ্যে যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিলো এটাই হলো আমার নিকট এ মতানৈক্যের সঠিক রূপরেখা। মিথ্যা নবুয়তীর দাবীদার মুসায়লামার সৈন্যেরা যখন আকরামা (রাঃ)-কে ধরে নিয়ে ছিল, তখন খালেদ (রাঃ)-কে খলিফা আবুবকর (রাঃ) এ জন্যই প্রেরণ করেছিলেন যে মদীনাবাসী এবং বিশেষ করে যারা হযরত ওমরের মতের সমর্থক ছিলেন, তারা দেখুক এবং উপলব্ধি করুক যে, খালেদ এমন একজন লৌহমানব যে সে মহাসঙ্কটময় মুহূর্তে কঠিনতম যুদ্ধের ময়দানেও একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী কর্মী ও মুজাহিদ। তিনি খালেদকে মুসায়ালামার বিরুদ্ধে বিরাট একটি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ সম পরীক্ষায় ফেলেছিলেন।

হয়তো সে জ্বলে পুড়ে ছারখার হবে নতুবা যুদ্ধের ময়দানে কাজে আসবে। এটা ছিল, উম্মে তামীম এবং তার স্বামীর প্রতি প্রয়োগকৃত শাস্তির চেয়ে খালেদের জন্য খুবই কঠোরতম শাস্তি। অথবা সে যুদ্ধে বিজয় লাভ করে কৃত পাপ থেকে পবিত্র হয়ে আসবে। কিন্তু আল্লাহর অসীম রহমতে ললাট ভুমে বিজয়ের লাল টিকা নিয়েই বিপুল গণীমতের মালামালসহ খলিফার দরবারে সে উপস্থিত হয়েছিল। খালেদ মুসলমানদেরকে এমন এক বিভীষিকা ও মহাসঙ্কট হতে মুক্তি দিয়েছিল, যার সামনে এ ধরণের ছোট খাটো ভুলক্রটির আদৌ কোন মূল্যই নেই।"

ডক্টর হায়কলের দৃষ্টিতে এ হচ্ছে সঠিক অবস্থা। খুবই পরিতাপের বিষয় যে এক ব্যক্তি তার স্বীয় খেয়াল খুশীমত ইসলামী ইতিহাসের এমন যুগের মধ্যে প্রবেশ করছেন এবং এমন চেতনাবোধ ও সজাগ জ্ঞানবুদ্ধি নিয়ে তা লিখছে যার মন-প্রাণ ঘটনার বিশ্লেষণের সেই মূল্যবান ও মানদণ্ডের থেকে উন্নত হতে পারছে না। আর যে মন-প্রাণ বর্তমান বস্তুতান্ত্রিক যুগের বিষাক্ত আবহাওয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। এর ভিতর যেমন নেই কোন ইসলামের সঠিক ভাবধারা, তেমনি নেই সেই বিশিষ্ট যুগের বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সাথে কোন সম্পর্ক। আর এটাই নাকি হচ্ছে অধুনা যুগের সঠিক রাজনীতির পরিচয়, যাদের দৃষ্টিতে ভাল ও সৎ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত এমন খারাপ পন্থা গ্রহণ করা বৈধ; যার দ্বারা মানব আত্মাকে সমসাময়িক প্রয়োজনের অনুগত করে তারপর তাকে কুটনীতিতে পারদর্শি এবং সমস্যার সমাধানে উন্নতশ্রেণীর যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিরূপে প্রকাশ করে। ঐতিহাসিক ঘটনার এ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দ্বারা যা ডক্টর সাহেব একমাত্র সঠিক ব্যাখ্যা মনে করেন, হযরত আবুবকরের ব্যক্তিত্বের মানকে অনেকখানি নীচু করে দেয়া হয়েছে। অথচ হযরত আবুবকর (রাঃ) এর চেয়ে অনেক উন্নত ও মহান। বর্তমান নৈতিকতা হীনতার যুগের মানুষ যে দূরবীনের সাহায্যে জড়জগতের বস্তু দেখায় অভ্যস্ত, যদি সেই দূরবীন দ্বারা তাকে পর্যবেক্ষণ করা হয়, তবে এ উন্নত স্থানকে পর্য্যবেক্ষণ করা আদৌ সম্ভব নয়। তদুপরি পর্যবেক্ষণকারী যদি ইসলামী শরীয়াতের প্রাথমিক বিষয়গুলি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না থাকে, তবে তো সমস্যা আরো জটিল আকার ধারণ করে। ডক্টর হায়কল আর একবার এ একই বিষয় নিয়ে তার স্বরচিত "আলফারুক ওমর" পুস্তকে অনেক আলোচনা করেছেন। তিনি সেখানে খালেদ বিন অলীদকে (রাঃ) পদচ্যুত করণের মনস্থ করার সময় হযরত ওমর (রাঃ)-এর মানসিক অবস্থার সমীক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। আর তাকে যুগের বিষাক্ত হাওয়া প্রভাবিত করে ফেলেছে, তার মন মগজে সেই পার্টি লিডারের কর্ম্মধারা বসে গেছে, যাদের সামনে কেবল

সমসাময়িক উপকার লাভ এবং স্থানীয় প্রয়োজন মিটান ছাড়া কিছুই থাকে না। এহেন ব্যক্তিদের পক্ষে ইসলামের উন্নত ও মহান প্রাণশক্তি তথা রূহানী কুওয়াতকে অনুধাবন করা মোটেই সম্ভব নয়, তিনি অত্র পুস্তকের নিরানব্বই পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

"সিরিয়ায় যখন মুসলমানদের সমুদয় সৈন্যবাহিনী ও সামরিক শক্তি খালেদ বিন অলীদের অধীনে ছিল, এহেন সংকটময় মুহূর্তে খালেদের পদচ্যুতির সিদ্ধান্ত তিনি কেমন করে গ্রহণ করলেন? এ সময় সৈন্যরা মহা সঙ্কটের মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করছিল। তারা রোমান সৈন্যদের মুকাবিলায় এমনভাবে মুখামুখী দণ্ডায়মান ছিল যে প্রকাশ্যে তারা আক্রমণও করতে পারছিল না, আর পারছিল না রোমানদের উপর কোন কর্তৃত্ব ও শক্তি প্রয়োগ করতে। আর রোমানরাও মুসলমানদের কিছু বলতে পারছিল না। মোটকথা একটি তমথমে বিস্ফোরণোম্মুখ ভাব বিরাজ করছিল। ইরাক থেকে খালেদের আসার পূর্বে ও পরে এ একই অবস্থা বিরাজমান ছিল। এ অচলাবস্থা যাতে বিদুরীত হয়, সেজন্য উভয় পক্ষই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। খালেদ (রাঃ)-কে সেপাহ সালারের পদ থেকে অপসারণ করা হলে যে মুসলমানদের মধ্যে তার সুখ্যাতি বিনষ্ট হবে এবং অবস্থা আরো জটিল আকার ধারণ করবে এ কথা কি খলিফা চিন্তা ও কল্পনা করেছিলেন না? খালেদ (রাঃ) যত সময় পর্যন্ত মুসলমানদেরকে এহেন জটিল পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করে সমস্যার অবসান ঘটাতে না পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত খলিফার জন্য ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা এবং পরে খুশীমত যে কোন নির্দেশ জারি করার কি তার সুযোগ হতো না?

যুদ্ধের উন্নতি ও অবনতির জন্য এ কথাগুলো যে অবশ্যক রূপে বিবেচনার বিষয়, সে বিষয় কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না। আবু ওবায়দা খলিফার অমত ও গোলামীর কোন তোয়াক্কা না করে এ বিষয়গুলোর প্রতি সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টি রেখেছিলেন। কিন্তু ওমর (রাঃ) বিষয়টিকে একটি ভিন্নরূপ দৃষ্টিতে অবলোকন করেছিলেন। যদি তিনি খালেদের পদচ্যুত্যির ব্যাপারটি যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত মুলতবী রাখতেন তবে তার পলিসির যথেষ্ট ক্ষতি সাধন হতো। আর সমস্যাও অধিকতর জটিল আকার ধারণ করতো। এ কথা পরিষ্কার যে যুদ্ধে হয়তো মুসলমানরা বিজয় লাভ করতো অথবা পরাজয় বরণ করতো। যদি পরাজয় হতো খালেদের পদচ্যুতি দ্বারা তাতে কোন পার্থক্য দেখা দিত না। আর যদি খালেদের নেতৃত্বে মুসলমানরা বিজয় লাভ করতো, তখন হযরত ওমরের (রাঃ) জন্য কোন কমাণ্ডারকে বিজয় লাভের মহত্ব ও গৌরব অর্জন করার পর তার এ সম্মানিত আসন থেকে অপসারণ করা কোন ক্রমেই সম্ভব হতো না। এ কাজ করাও তার

জন্য মারাত্মক ভুল হতো। তাই ওমর (রাঃ) খালেদকে সিরিয়া অথবা অন্য কোন স্থানে সেনাবাহিনীর সিপাসালার না রাখার সিদ্ধান্ত করেছিলেন। আর এ কারণেই তিনি তাকে পদচ্যুত করার ফরমান খুব তাড়াতাড়ি জারি করেছিলেন। খালেদ (রাঃ) যে হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর হেদায়েত ও ফরমানকে পূর্ণরূপে আমল করতো না, এটা ছিল খালেদের পদচ্যুতির জন্য হযরত ওমর (রাঃ)-এর প্রধান দলিল। যেহেতু এ ঘটনার পর মুসলমানরা এ যুদ্ধে বিজয় লাভ করেছিল বলেই হযরত ওমর (রাঃ)-এর প্রতি অভিযোগ করার সুযোগ রইলো না। তিনি যা কিছু ঠিক ও সত্য মনে করতেন তাই তিনি করতেন। এর পরে খালেদ (রাঃ) সসম্মানে এমন অবস্থায় ছিলেন যে পদচ্যুতকারীর প্রতি কোনরূপ জুলুম করার অভিযোগ আনয়ন করার সুযোগ রইলো না।"

এ হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর "হায়কল পাশার" চিন্তাধারা যা তিনি হযরত আবু বকরের বেলায়ও এমনটি করেছিলেন। তাদের বেলায় এহেন কটুক্তি কেবল তারাই করতে পারে, যাদের অন্তরে আবুবকর ও ওমর (রাঃ) প্রমুখের অন্তর ও আন্তরিকতা সম্পর্কে সঠিক কোন ধারণা নেই এবং যারা ইসলামের কলুষতা যা মানুষের অন্তর আত্মা দ্বীন ঈমান সততা সবকিছু বিনষ্ট করে তা থেকে ক্ষণকালের জন্য দুরে থাকেনি, শুধু তাদের মুখেই এ-উক্তি শোভা পায়। পরিশেষে জনাব ডক্টর সাহেব হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে কি ধারণা নিলেন? যদি অবস্থা অন্যরূপ হতো এবং সুযোগ না পেতো, তবে কি হযরত ওমর (রাঃ) খালেদ (রাঃ)-কে এ ব্যাপারে ছেড়ে দিতেন। অথচ ডক্টর হায়কলের বর্ণনায় বুঝা যায় যে তার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল এবং এ ব্যাপারে তার মন নিশ্চিত ছিল যে খালেদ মালেক বিন নবীরাহ সম্পর্কে ও আল্লাহ তায়ালা এবং তার দ্বীনের ব্যাপারে নির্ঘাতরূপে অপরাধী ও গুনাহগার।

যে ওমর (রাঃ) বিশ্বের বুকে খোলাফায়ে রাশেদার মহান সম্মানে ভূষিত হয়ে স্থিরচিত্ত দৃঢ়তা ও সংকল্পে অটল অচল থাকার পরিচয় দিয়েছেন, আর যে পাহাড়কে তার স্থান থেকে হটিয়ে দেয় কিন্তু স্বীয় পথকে বাঁকা করতে রাজী হয় না, যার দ্বীন ঈমান প্রবল ঝড় ঝঞ্জার গতি পরিবর্তন করে দেয়, কিন্তু নিজের দিক ও গতিধারা পরিবর্তন করতে রাজী নয়; সেই ওমর কি ইত্যাকার বিষয়গুলোর প্রতি মনযোগ দেয়া এবং সেই মহাসঙ্কটের সামনে হাতিয়ার ছেড়ে দিতে পারে? কখনো নয়।

এ ধরণের কাজ কেবল বনী উমাইয়া এবং বণী আব্বাসের বাদশাহদের দ্বারাই শোভা পেয়েছিল। জনগণের নিকট যারা ধুর্ত চালবাজ ও কুটনীতিবিদ রূপেই পরিচিত ছিল। কিন্তু হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ)-এর আসন তাদের

তুলনায় অনেক উচ্চে। তাদের জীবন মহত্বের মহিমায় উজ্জল ভাস্করের নাম দীপ্তমান ছিল। এতদ্‌সত্বেও যদি কোন ব্যক্তি এদের বিষয় খারাপ ধারণা পোষণ করে, তবে তা বর্তমান যুগের ইসলামিক ভাবধারার দুর্বলতা এবং তার নিরিক্ষা নিদানের নীচুতা হীনতাই মূল কারণ বলে মনে করতে হবে।

আমি এই চিন্তাধারা বিশদরূপে আলোচনা আপনাদের খেদমতে এ জন্য পেশ করলাম যেন মারাত্মক ভূলক্রুটিগুলোর প্রতি লাল দাগ পড়ে চিহ্নিত হয়। কারণ এ ধরণের মারাত্মক ভুলক্রটির মধ্যে বর্তমানে অনেক লোকই নিপতিত রয়েছে। ইসলামী আধ্যাত্মিকতা ও রূহানী ভাবধারার চরম উৎকর্ষ সাধন ও উন্নতির শীর্ষ যুগে যে চিন্তাধারা ও কর্ম পদ্ধতি বিরাজমান ছিল, এ লোকেরা তার রূপরেখা বর্তমান বস্তুতান্ত্রিক যুগের এমন চিন্তাধারার আলোকে অঙ্কন করতে চায়, যা থেকে সেই আধ্যাত্মিক চেতনা ও রূহানী ভাবধারা শত সহস্র মাইল পথের ব্যবধানে অবাস্থিত। আমি এ ভুলের অপনোদন এ জন্য করতে যাচ্ছি যে, এ ভুলের পরিণতিতে স্বয়ং মানবাত্মা তার চেতনাবোধ ও উন্নতি সমৃদ্ধির সেই সকল গোপন যোগ্যতা সমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, যা মানবাত্মার মধ্যেই নিহিত। ইসলামের প্রথম যুগের সেই সকল মানুষকে কোন অন্তঃসারশূন্য চাকচিক্যপূর্ণ কৃত্রিম পোষাক পরিধান করায়ে সমাজের সামনে উপস্থিত করবো অথবা তাদেরকে সর্বপ্রকার মানবিক দুর্বলতা থেকে পবিত্র বলে প্রমাণ করবো এটা আমার আদৌ কাম্য নয়। আমার উদ্দেশ্য হলো আবার একবার লোকদেরকে মানবিক আত্মার উপর নির্ভরশীল হতে শিক্ষা দেয়া। এ জন্যই আমি মুসলিম জীবনের সেই যুগটির সঠিক চিত্র তুলে ধরতে চাই যেন প্রত্যেকটি মানবাত্মা যা এ মহান গৌরবময় পথে অগ্রসর হবার যোগ্যতা রাখে, তাকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

এখন আমি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সজাগ আত্মার দৃষ্টান্ত পেশ করার কাজ আরম্ভ করছি। লক্ষ্য করুন হযরত ওমর (রাঃ) এর প্রতি। তিনি বিরাট একটি সমাজের স্বাধীন সার্বভৌম খলিফা হওয়া সত্বেও পানির মশক নিজ কাঁধে বহন করতে আসতেছিলেন। পথিমধ্যে তার ছেলে বিরক্তি ভাব প্রকাশ করে বললেন–আপনি এ কি করছেন? জবাব আসলো-আমার নফস আত্মাগৌরব ও অভিমানের বেড়াজারে নিপতিত হয়েছে, যে জন্য আমি নফ্‌সকে হেদায়েত করার মানসে এ কাজে হাত দিয়েছি। লক্ষ্য করুণ সজাগ চেতনাবোধ ও প্রখর দৃষ্টি সম্পন্ন আত্মার প্রতি। এ ব্যক্তির মনের কোণায় যদি কখনও খিলাফত, রাজ্য বিজয় এবং ভবিষ্যতের মান সম্মানের জন্য বন্দু বিসর্গ পরিমাণ আত্মম্ভরিতা ও গৌরব অনুভূত হতো, তখন তিনি স্বীয় আত্মম্ভরিতা মনের কোণ থেকে ধুয়ে মুছে

ফেলার নিমিত্ত লোক সমাজে নফসের হেদায়াতের জন্য তক্ষণ তক্ষণ বাস্তব পথ অবলম্বন করতেন। তিনি যে একটি বিরাট বিশাল সাম্রাজ্যের স্বাধীন খলিফা তখন এ চিন্তা তার মনে আদৌ স্থান পেত না।

হযরত আলী মুর্তুজা (রাঃ) এর জীবনের প্রতি লক্ষ্য, করুন, শীতের মওসুম, তার শরীরের আবরণের জন্য শুধু মাত্র একখানা পশমী কাপড়, যার দ্বারা শীত নিবারণ হচ্ছে না। শীতের প্রচণ্ড প্রকোপে তিনি থর থর করে কাপছেন। কিন্তু বায়তুল মালের ধনসম্পদ নিজ করায়ত্তে থাকা সত্ত্বেও তার আত্মার সজাগ অনুভূতি এবং বিবেকের উন্নত মননশীলতা তাকে এর থেকে উপকৃত হতে দেয়নি। নিজে কষ্ট বরণ করতে প্রস্তুত, তথাপি তার মন ও বিবেক জনগণের বায়তুল মাল থেকে একটি কর্পদর্ক ও নিজের জন্য ব্যয় করতে অনুমতি দিচ্ছে না। এটা কত বড় উন্নত মানসিকতার পরিচয় লক্ষ্য করুণ।

আবু আবিদ (রাঃ) আমওয়াস নামক স্থানে স্বীয় সৈন্যবাহিনীর শিবির স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু আমওয়াসে যখন প্রচণ্ড আকারে মহামারী দেখা দিল, তখন আমীরুল উম্মত হযরত উমর (রাঃ) হযরত আবীদ (রাঃ) যাতে করে মহামারীর কোপানল থেকে রেহাই পায় সে জন্য হযরত ওমর (রাঃ) ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। পরিশেষে তিনি আবীদ (রাঃ)-কে তার নিকট উপস্থিত হতে নির্দেশ দিয়ে যে একটি সামরিক পত্র লিখেছিলেন তার মর্ম নিম্নরূপ–

"সালাম বাদ বিশেষ খবর হচ্ছে যে, কোন একটি অতীব জরুরী কাজের জন্য তোমার সাথে আমার সাক্ষাৎ আলোচনার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। সুতরাং তোমাকে বিশেষ তাগিদ দিয়ে বলছি যে, পত্র পাঠ করার পর তা রেখে দেয়ার পূর্বেই আমার নিকট চলে আসবে।' পত্রটি পাঠ করেই আবু আবীদ (রাঃ) খলিফা ওমর (রাঃ)-এর মনের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পারলেন। তিনি মনে করলেন যে খলিফা আমাকে মহামারীর কবল থেকে বাহিরে নিয়ে আসার জন্য একটি বাহানা করছেন। তিনি বললেন আল্লাহ্ আমীরুল মুমেনীনকে ক্ষমা করুণ! অতঃপর তিনি এ বলে হযরত ওমর (রাঃ) এর নিকট একটি পত্র লিখে পাঠিয়ে দিলেন–"আমার নিকট আপনার কি প্রয়োজন, তা আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি। বর্তমানে সৈন্যদের পুরা বাহিনী আমার সাথে রয়েছে। তাদের থেকে পৃথক হওয়া আমার ইচ্ছা নয়। আল্লাহ্ তায়ালা যত সময় পর্যন্ত আমার এবং তাদের তকদীরের লিখনী পূর্ণ না করেন, ততসময় পর্যন্ত আমি তাদেরকে ছেড়ে দিতে পারব না। হে আমীরুল মুমেনীন। এ কারণে আমি আপনার খেদমতে দরখাস্ত করছি যে, মেহেরবানী করে আপনি আমাকে আপনার তাগিদ থেকে নাজাত দিয়ে আমাকে সৈন্য বাহিনীর সাথে অবস্থান করার সুযোগ দিবেন।"

পত্রটি পাঠ করতে করতে হযরত ওমর (রাঃ)-এর আঁখিপাতা অশ্রুজলে ভিজে গেল। উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করলো-আবু আবীদের ইন্‌তেকাল হয়েছে নাকি? হযরত ওমর অশ্রুসজল অবস্থায় ভাংগা স্বরে জবাব দিলেন-ইন্‌তেকাল করেনি, তবে তার পথে। পরিশেষে তাই হয়েছিল।

আবু আবীদের তাকদীরে এলাহীর প্রতি অগাধ বিশ্বাস ছিল বলেই তিনি নিজকে মৃত্যুর করাল গ্রাসে ঠেলে দিতে কুণ্ঠিত হননি। নিজের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাওয়া এবং সমগ্র সৈন্যদেরকে মৃত্যুর গ্রাসের মুখে ছেড়ে দেয়া কোন ক্রমেই তার বিবেক বুদ্ধি মেনে নিতে পারছিল না। কারণ সবাইতো আল্লাহর পথের মুজাহিদ। সিপাহসালার নিজ প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাবে, আর সমগ্র বাহিনীকে মৃত্যুর মুখে ফেলে দিবে, তা তার জাগ্রত চেতনা অনুভূতি সমর্থন করতে পারল না বলেই খলিফার পত্রের উত্তরে তিনি ঐ কথা লিখেছিলেন। দেখুন কত বড় উন্নত মানসিকতার পরিচয়।

ইসলামের প্রহেলা মুয়াজ্জিন হযরত বিলালা (রাঃ) এর ভ্রাতা আবু রবীহাহ খাশয়মী তার বিবাহের ব্যাপারে ইয়ামনের লোকদের সাথে কথাবার্তা বলার জন্য তাকে মধ্যস্থতা সাব্যস্ত করার ইচ্ছা পোষণ করলে তিনি উক্ত লোকদের নিকট বললেন-আবু রাবিহাহ এর এমন একজন ভাই, যিনি ধর্ম ও নৈতিক চরিত্রের বেলায় খুবই খারাপ প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং আপনাদের মনে ইচ্ছা হলে এর সাথে আপনারা আত্মীয়তা করুণ, আর না হলে না করুন।

তিনি এত পরিষ্কার কথা বলে দিলেন যে স্বীয় ভাইয়ের দুর্বলতাকেও তিনি গোপন করেননি। আর তাদেরকে ভ্রম ও প্রতারণার মধ্যে ফেলে দেননি। তিনি যে একটি বিবাহের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কথোপকথন করছেন, সেদিকে তিনি আদৌ কোন লক্ষ্যই দেননি। কারণ পরকালে আল্লাহর সমীপে হাজির হয়ে স্বীয় প্রতিটি কথা ও কাজের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে, এ ব্যাপারে তিনি যেন গাফেল না থাকেন। এটাই ছিল তার লক্ষ্যের বিষয়। তার এ চিন্তা অনুভূতিই তাকে এমনি রূপ পরিষ্কার পরিষ্কার কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ইয়ামনী লোকরা হযরত বিলালের এহেন সত্য কথার উপর নির্ভর করেই আত্মীয়তা করেছিল। মেয়ে বিবাহ দেবার বেলায় এমন সত্য কথাই তাদের মন জয় করেছিল।

ইমাম আজম আবু হানিফা (রাঃ)-এর জীবনের প্রতি লক্ষ্য করুন। তিনি তার ব্যবহারিক জীবনে সাধারণ খুটিনাটি ব্যাপারেও কতখানি জাগ্রত অনুভুতি ও হুসিয়ার থাকতেন, তা নিম্নের ঘটনাটি দ্বারা পরিষ্কার রূপে উপলব্ধি করা যায়। তিনি তার ব্যবসায় অংশীদার হাফস বিন আবদুর রহমানের নিকট কিছু কাপড়

পাঠিয়ে দিয়ে বলেছিলেন যে এর ভিতর একখানা কাপড়ে ছোট একটি টুটা রয়েছে, বিক্রয়ের সময় খরিদ্দারকে তা দেখাইয়ে বিক্রয় দিবে। হাফস সমুদয় কাপড় বিক্রয় দিলেন। কিন্তু টুটার কথা খরিদ্দারকে স্মরণ করিয়ে দিতে ভুলে গেলেন।

আর সেই কাপড়টির মূল্য তিনি পুরাপরাই নিয়েছিলেন। বর্ণিত আছে যে এ কাপড়ের মূল্য ত্রিশ হাজার কিম্বা পয়ত্রিশ হাজার দিরহাম ছিল। ইমাম আবু হানিফা উক্ত খরিদ্দারকে অনুসন্ধান করার জন্য অংশীদারকে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না। এ ঘটনার কারণে স্বীয় অংশীদার থেকে আলাদা হয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। এমনকি এ কাপড়টির মূল্য নিজের পবিত্র ধনের সাথে মিলিত করতেও তিনি রাজি হলেন না। পরিশেষে তিনি ত্রিশ বা পয়ত্রিশ হাজার দিরহাম যাহাই হোক না কেন সমুদয়ই দান করে দিলেন।

বর্ণিত আছে যে, ইউনুস বিন আবীদ (রঃ)-এর দোকানে বিভিন্ন প্রকার উচ্চ মূল্যের কাপড় মওজুত ছিল। এক ধরণের কাপড় ছিল যার প্রতিটি জোড়া দুই শত টাকার বিক্রি হতো। সে দোকানে ভ্রান্তস্পুত্রকে বসিয়ে মসজিদে নামায পড়তে গিয়েছিলেন। এদিকে একজন খরিদ্দার চারশত টাকা মূল্যের এক জোড়া কাপড় চাইলে ছেলেটি দুই শত টাকা মূল্যের কাপড় জোড়া বের করে সামনে দিল। কাপড় দেখে খরিদ্দারের খুব পছন্দ হলে তিনি চারশত টাকা মূল্য দিয়ে কাপড় নিয়ে নিজ পথ ধরলেন। পথিমধ্যে লোকটি ইউনুসের সামনে পড়লে সে কাপড় দেখেই ঠিক পেল যে এ কাপড় তার দোকানের। খরিদ্দারের নিকট তার মূল্য জিজ্ঞেস করলে তিনি চারশত টাকার কথা প্রকাশ করলেন। তখন ইউনুস (রঃ) বললেন, এ কাপড়ের উচিত মূল্য দুই শত টাকা, আপনি গিয়ে দোকানদারকে কাপড় ফিরত দিন। লোকটি উত্তর করলো এ কাপড়েরর মূল্য আমাদের দেশে পাঁচশত টাকা! সুতরাং আমি তা দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে খুশীতে খরিদ করেছি। ফেরত দিবার প্রয়োজন নেই। তখন ইউনুস (রঃ) বললেন, আপনি গিয়ে কাপড় ফিরত দিন। কারণ দ্বীনের পথে অপরের কল্যাণ কামনা করা দুনিয়ার ধন দৌলতের চেয়ে অনেক উত্তম। অতঃপর লোকটিকে নিজের দু'শত টাকা ফিরত দিয়ে বিদায় করেছিলেন। আর ভ্রাতুস্পুত্রকে এভাবে শাসাতে লাগলেন যে তোমার কি একটুও লজ্জা নই, আল্লাহর ভয় কি তোমার মনে একটুও হচ্ছে না যে তুমি শত শত টাকা মুনাফা নিচ্ছ একজোড়া কাপড়ে। ছেলেটি আল্লাহর নামে শপথ করে বললো খরিদ্দার খুশীতেই এ কাপড় খরিদ করে নিয়েছে, আমার দোষ কি? তখন তিনি উত্তর দিলেন–তুমি নিজের জন্য যা ভাল মনে করো তার জন্য তা তুমি করলে না কেন? এটাই তোমার অপরাধ।

ওমর (রাঃ) ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। পরিশেষে তিনি আবীদ (রাঃ)-কে তার নিকট উপস্থিত হয়ে পড়লেন। পরিশেষে তিনি আবীদ (রাঃ)-কে তার নিকট উপস্থিত হতে নির্দেশ দিয়ে যে একটি সামরিক পত্র লিখেছিলেন তার মর্ম নিম্নরূপ–

"সালাম বাদ বিশেষ খবর হচ্ছে যে, কোন একটি অতীব জরুরূ কাজের জন্য তোমার সাথে আমার সাক্ষাৎ আলোচনার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। সুতরাং তোমাকে বিশেষ তাগিত দিয়ে বলছি যে, পত্র পাঠ করার পর তা রেখে দেয়ার পূর্বেই আমার নিকট চলে আসবে।' পত্রটি পাঠ করেই আবু আবীদ (রাঃ) খলিফা ওমর (রাঃ) -এর মনের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পারলেন। তিনি মনে করলেন যে খলিফা আমাকে মহামারীর কবল থেকে বাহিরে নিয়ে আসার জন্য একটি বাহানা করছেন। তিনি বললেন– আল্লাহ আমীরুল মুমেনীনকে ক্ষমা করুন! অতঃপর তিনি এ বলে হযরত ওমর (রাঃ) এর নিকট একটি পত্র লিখে পাঠিয়ে দিলন–" আমার নিকট আপনার কি প্রয়োজন, তা আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি। বর্তমানে সৈন্যদের পুরা বাহিনী আমার সাথে রয়েছে। তাদের থেকে পৃথক হওয়া আমার ইচ্ছা নয়। আল্লাহ তায়ালা যত সময় পর্যন্ত আমার এবং তাদের তকদীরের লিখনী পুর্ণ না করেন, ততসময় পর্যন্ত আমি তাদেরকে ছেড়ে দিতে পারব না। হে আমীরুল মুমিনীন। এ কারণে আমি আপনার খেদমতে দরখাস্ত করছি যে, মেহেরবানী করে আপনি আমাকে আপনার তাগিদ থেকে নাজাত দিয়ে আমাকে সৈন্য বাহিনীর সাথে অবস্থান করার সুযোগ দিবেন।"

পত্রটি পাঠ করতে করতে হযরত ওমর (রাঃ)-এর আঁখিপাতা অশ্রুজলে ভিজে গেল। উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করলো–আবু আবীদের ইন্তেকাল হয়েছে নাকি? হযরত ওমর অশ্রুজল নেত্রে ভাংগা স্বরে জবাব দিলেন–ইন্তেকাল করেনি, তবে তার পথে। পরিশেষে তাই হয়েছিল।

আবু আবীদের তাবদীরে এলাহীর প্রতি অগাদ বিশ্বাস ছিল বলেই তিনি নিজকে মৃত্যুর করাল গ্রাসে ঠেলে দিতে কুণ্ঠিত হননি। নিজের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাওয়া এবং সমগ্র সৈন্যদেরকে মৃত্যুর গ্রাসের মুখে ছেড়ে দেয়া কোন ক্রমেই তার বিবেক বৃদ্ধি মেনে নিতে পারছিল না। কারণ সবাই আল্লাহর পথের মুজাহিদ। সিপাহসালার নিজ প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাবে, আর সমগ্র বাহিনীকে মৃত্যুর মুখে ফেলে দিবে, তা তার জাগ্রত চেতনা অনুভূতি সমর্থন করতে পারল না বলেই খলিফার পত্রের উত্তরে তিনি ঐ কথা লিখেছিলেন। দেখুন কত বড় উন্নত মানসকিতার পরিচয়।

ইসলামের পহেলা মুয়াজ্জীন হযরত বিলাল (রাঃ) ভ্রাতা আবু রবীহাহ খাশয়মী তার বিবাহের ব্যাপারে ইয়ামনের লোকদের সাথে কথাবার্থা বলার জন্য তাকে মধ্যস্থতা সাব্যতা করার ইচ্ছা পোষণ করলে তিনি উক্ত লোকদের নিকট

বললেন–আবু রাহিহাহ আমার এমন একজন ভাই, যিনি ধর্ম ও নৈতিক চরিত্রের বেলায় আপনারা আত্মীয়তা করুণ, আর না হলে না করুন।

তিনি এত পরিষ্কার কথা বলে দিলেন যে স্বীয় ভাইয়ের দুর্বলতাকেও তিনি গোপন করেননি। আর তাদেরকে ভ্রম ও প্রতারণার ভিতর ফেলে দেননি। তিনি যে একটি বিবাহের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কথোপকথন করছেন, সেদিকে তিনি আদৌ কোন লক্ষ্যই দেননি। কারণ পরকালে আল্লাহর সমীপে হাজির হয়ে স্বীয় প্রতিটি কথা ও কাজের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে, এ ব্যাপারে তিনি যেন গাফেল না থাকেন এটাই ছিল তার লক্ষ্যের বিষয়। তার এ চিন্তা অনুভূতিই তাকে এমনি রূপ পরিষ্কার পরিষ্কার কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। উয়ামনী লোকরা হযরত বিলালের এহেন সত্য কথার উপর নির্ভর করেই আত্মীয়তা করেছিল। মেয়ে বিবাহ দেবার বেলায় এমন সত্যকথাই তাদের মন জয় করেছিল।

ইমাম আজম আবু হানিফা (রাঃ) -এর জীবনের প্রতি লক্ষ্য করুন। তিনি তার ব্যবহারিক জীবনে সাধারণ খুটিনাটি ব্যাপারেও কতখানি জাগ্রত অনুভূতি ও হুসিয়ার থাকতেন, তা নিম্নর ঘটনাটি দ্বারা পরিষ্কার রুপে উপলব্ধি করা যায়। তিনি তার ব্যবসার অংশীদার হাফস বিন আবদুর রহমানের নিকট কিছু কাপড় পাঠিয়ে দিয়ে বলেছিলেন যে এর ভিতর একখানা কাপড়ে ছোট ও একটি সমুদয় কাপড় বিক্রয় দিলেন কিন্তু টুটার কথা খরিদ্দারকে স্মরণ করিয়া দিতে ভুলে গেলেন।

আর সেই কাপড়টির মূল্য তিনি পুরাপুরিই নিয়েছিলেন। বর্ণিত আছে যে এ কাপড়ের মূল্য ত্রিশ হাজার কিম্বা পয়ত্রিশ হাজার দিরহাম ছিল। ইমাম আবু হানিফা উক্ত খরিদ্দারকে অনুসন্ধান করার জন্য অংশীদারকে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না। এ ঘটনার কারণে স্বযি অংশীদার থেকে আলাদা হয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। এমনকি এ কাপড়টির মূল্য নিজের পবিত্র ধনের সাথে মিলিত করতেও তিনি রাজি হলেন না। পরিশেষে তিনি ত্রিশ বা পয়ত্রিশ হাজার দিরহাম যাহাই হোক না কেন সমুদয়ই দান করে ছিলেন।

বর্ণিত আছে, যে, ইউনুস বিন আবীদ (রাঃ)-এর দোকানে বিভিন্ন প্রকার উচ্চ মূল্যের কাপড় মওজুত ছিল। এক ধরণের কাপড় ছিল যার প্রতিটি জোড়া দুই শত টাকায় বিক্রি হতো। সে দোকানে ভ্রাতুষ্পুত্রকে বসিয়ে মসজিদে নামায পড়তে গিয়েছিলেন। এদিকে একজন খরিদ্দার চারশত টাকা মূল্যের একজোড়া কাপড় চাইলে ছেলেটি দুই শত টাকা মূল্যের কাপড় জোড়া বের করে সামনে দিল। কাপড় দেখে খরিদ্দারের খুব পছন্দ হলে তিনি চারশত টাকা মূল্য দিয়ে কাপড় নিয়ে নিজ পথ ধরলেন। পথিমধ্যে লোকটি ইউনুসের সামনে পড়লে সে কাপড় দেখেই ঠিক পেল যে এ কাপড় তার দোকানের। খরিদ্দারের নিকট তার

মুল্য জিজ্ঞেস করলে তিনি চারশত টাকার কথা প্রকাশ করলেন। তখন ইউসুফ (রাঃ) বললেন, এ কাপড়ের উচিত মূল্য দুই শত টাকা আপনি গিয়ে দোকানদারকে কাপড়ের ফিরত দিন। লোকটি উত্তর করলো এ কাপড়ের মূল্য আমাদের দেশে পাঁচশত টাকা। সুতরাং আমি তা দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে খূশীতে খরিদ করেছি। ফেরৎ দিবার প্রয়াজন নেই। তখন ইউনুস (রাঃ) বললেন, আপনি গিয়ে কাপড় সফিরত দিন। কারণ দ্বীনের পথে অপরের কল্যাণ কামনা করা দুনিয়ার ধন দৌলতের চেয়ে অনেক উত্তম। অতঃপর লোকটিকে নিজের দু'শত টাকা ফিরত দিয়ে বিদায় করেছিলেন। আর ভ্রাতুষ্পুত্রকে এ বলে শাসাতে লাগলেন যে তোমার কি একটুও লজ্জা নেই, আল্লাহর ভয় কি তোমার মনে একটুও হচ্ছে না যে তুমি শত শত টাকা মুনাফা নিচ্ছ একজোড়া কাপড়ে। ছেলেটি আল্লাহর নামে শপথ করে বললো খরিদ্দার খুশীতেই এ কাপড় খরিদ করে নিয়েছে, আমার দোষ কি? তখন তিনি উত্তর দিলেন– তুমি নিজের জন্য যা ভাল মনে করো তার জন্য তা তুমি করলে না কেন? এটাই তোমার অপরাধ।

মুহম্মদ ইবনুল মুনকাদীর থেকে বর্ণিত আছে যে তার অনুপস্থিতিতে তার একজন কর্মচারী পাঁচ টাকা মূল্যের একখণ্ড কাপড় দশ টাকা মূল্যে বিক্রয় করলে তিনি তা জানতে পেরে সমগ্র দিন উক্ত বেদুঈন খরিদ্দারের অনুসন্ধানে ব্যস্ত রইলেন। অবশেষে তাকে পেয়ে বললেন– কর্মচারী ভূলবশতঃ পাঁচ টাকার মাল আপনাকে দশ টাকায় বিক্রয় করেছে। লোকটি আশ্চর্য্য হয়ে বললো– আমিতো স্বেচ্ছায় ও খুশীতেই তা খরিদ করেছি। সে বলল যদিও তুমি তা নিজ ইচ্ছাই খরিদ করেছো, তথাপি আমি তোমার জন্য তাই পছন্দ করবো, যা আমার নিজের জন্য পছন্দ করি, এ বলে তিনি পাঁচটি টাকা ফিরত দিয়ে বিদায় অভিবাধন জানালেন। "তোমার লজ্জা হচ্ছে না– তোমার অন্তরে কি আল্লাহর ভয় নাই"? ইউনু বিন আবীদের এ উক্তিটি দ্বারাই উপরোক্ত ঘটনা ত্রয়ের মূলতত্ত্ব রহস্য উপলব্ধি করা যায়। এ সকল ঘটনাবলীর পশ্চাতে যে শক্তি কার্যকরি ছিল, তা হচ্ছে স্বীয় বিবেকের নিকট লজ্জিত হওয়া এবং অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগরিত থাকা। যে মানবাত্মা ইসলামের মূল প্রাণ শক্তিকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে যায় এবং এ প্রাণ শক্তি যখন প্রতি শিরা উপশিরার শোনিত ধারার সাথে প্রবাহিত হতে থাকে, তখনই ইসলাম তার ভিতর পুর্ণশক্তি দিয়ে এ মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করে। এ কয়টি উদাহরণ ছাড়া এ ধরণের আরো শত সহস্র উদাহরণ ইসলামের ইতিহাসের পাতায় পাতায় দিবাকরের ন্যায় দীপ্তমান। কিন্তু এ উদাহরণ কয়টিই সেই মহান সম্মানিত স্থানের দিকে পথ প্রদর্শন করতে যথেষ্ট, যা ইসলাম মানবাত্মার উৎকর্ষ সাধন ও উন্নতি সমৃদ্ধির নিমিত্ত সমাজের লোকদের সামনে পেশ করে। আর এর দ্বারাই ইসলাম মানুষের সকল প্রকার প্রয়োজন ও সম্পর্ক হতে এবং জান মাল ইজ্জত আবরুর প্রতি মোহ ও ভালবাসা হতে উন্নত হবার

শিক্ষা দেয়। সে চায় মানবাত্মা সেই সকল দায়িত্ব সমূহ পালন করুক, সদা সজাগ ও বিচক্ষণতা মূলক চেতনাবোধ এবং প্রকট অনুভূতির স্বভাগত চাহিদা।

এখন আমরা নিশ্চিতরূপে সামনের দিকে অগ্রসর হতে চাই। সামাজিক জীবনে সুবিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম জগতে যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, তার থেকে কিছুটা উদাহরণ এখানে পেশ করবো। এ ব্যাপারে ইসলামী ইতিহাসের উপরোক্ত উদাহরণাবলীই আমাদের পথ প্রদর্শক হবে।

সাম্য প্রতিষ্ঠার উদাহরণ

ইসলাম মানব জাতির কাছে একটি পূর্ণাংগ সাম্যবাদী আর্দশের পয়গাম নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। সে মানুষের অন্তরকে সেই সকল মূল্যবোধ ও আদর্শের গোলামী থেকে মুক্ত করার নিমিত্ত এসেছে, যা মানব সমাজে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথে বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করে। ইতিপূর্বে আমরা এহেন সাম্যবাদ ও আযাদী সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভংগী পরিষ্কার ভাবে পেশ করেছি। আর যে সকল দলিল প্রমাণ ইসলামের এ দর্শনের সাথে এবং তার মৌলিক সামাজিক চিন্তাধারার সাথে গভীর সম্পর্ক প্রমাণিত হচ্ছে সেগুলোও আমরা উপস্থিত করেছি। এখন আমরা ইসলামের এ দর্শন ও দৃষ্টিভংগীকে কি রূপে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা হয়েছে সে বিষয় পর্যালোচনা করবো।

তৎকালীন যুগে সমগ্র জগতে ক্রীতদাসরা সাধারণ ও স্বাধীন মানুষ থেকে একটি আলাদা শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল। এ অবস্থা আরবেও তখন বিরাজমান ছিল। এ ব্যাপারে আমরা আরবের হযরত মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবনেতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাবো যে তিনি তাঁর ফুফাতো বোন যয়নব বিন্‌তে জাহসকে, যিনি কুরাইশ বংশের হাসেমী খান্দানের মেয়ে ছিলেন, স্বীয় আযাদকৃত ভৃত্য যায়েদের সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন। বিবাহ এমন একটি জটিল সমস্যা সেখানে সমগোত্র ও সমমর্যাদা সম্পন্ন হওয়ার প্রশ্ন অন্যান্য প্রশ্নের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহর নবী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির জন্য অথবা তার ধর্মীয় শক্তি ছাড়া অন্য কোন শক্তির এমন সামর্থ্য ছিল না যে এ ধরণের একটি অভূতপূর্ব কাজ করে দেখাবে, যা ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া কোথাও তা করা সম্ভব নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যদিও বর্তমানে আইনতঃ ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ, তথাপি কোন নিগ্রো ব্যক্তি সে যত বড়ই ধনবান ও মর্যাদাশালী ব্যক্তি হোক না কেন, সেখানে কোন শ্বেতকায় রমণীকে বিবাহ করতে পারে না। শুধু কেবল তাই নয় বরং পাবলিক মোটর গাড়ী, বাস, ষ্টীমার রেল গাড়ীতে নিগ্রোর শ্বেতাংগদের নিকটে পর্যন্ত বসতে পারে না। তাদের সাথে সিনেমা থিয়েটারে যাওয়া কিম্বা হোটেল রেস্তরা ও সরাইখানা বা ডাক বাংলোতে অবস্থান করাও আজ পর্যন্ত তাদের জন্য নিষিদ্ধ।

হিজরতের প্রথম যুগে মদীনায় বসে নবী করীম (সাঃ) মোহাজেরীন ও আনসারদেরকে সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন। ফলে তাঁর আযাদ কৃত ভৃত্য যায়েদ (রাঃ) এবং তাঁর চাচা হামজা (রাঃ) ভাই ভাইয়ের ন্যায় হয়ে গিয়েছিলেন। এমনিরূপে হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং খারীজাহ বিন যায়েদ (রাঃ)-ও একে অপরের ভাইয়ে পরিণত হয়েছিলেন। আর খালেদ বিন রবীহা খাশয়ামী এবং বিলাল বিন রিবাহ (রাঃ)-এর মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠেছিল। তদের এ ভ্রাতৃত্ব শুধু মৌখিক ভাষাগত ভ্রাতৃত্ব ছিল না। বরং রক্তের সম্বন্ধের ন্যায় জীবনের একটি সুদৃঢ় আত্মীয়তায় পরিণত হয়েছিল। জান মাল ধন দৌলত মান ইজ্জত এক কথায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে ও সর্ব ব্যাপারে তদের ভিতর আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এর পর নবী করীম (সাঃ) মোতায়ার যুদ্ধে যায়েদকে (রাঃ) সৈন্য বাহিনীর কমাণ্ডার নিয়োগ করে প্রেরণ করেছিলেন। তার ছেলে আসামাকে তিনি রোমানদের বিরুদ্ধে ঘোষিত যুদ্ধে এমন একটি সৈন্য বাহিনীর সিপাহ সালার করে পাঠিয়ে ছিলেন, যে সৈন্য বাহনীটির ভিতর মোহাজির ও আনসারদের অধিকাংশ লোক শামিল ছিল। এমন কি সে বাহিনীতে রাসুল করীম (সাঃ)-এর প্রাণের বন্ধু এবং তাঁর জীবদ্দশার সিনিয়ার উপদেষ্টা এবং পরবর্তী কালের মুসলিম জাহানের স্বাধীন সার্বভৌম খলীফা হযরত আবুবকর এবং ওমর (রাঃ)ও শামিল ছিলেন। এ বাহিনীতে রাসুলে করীম (সাঃ)-এর মাতার দিকের আত্মীয় জনাব সায়াদ বিন আবী আক্কাসও শামিল ছিলেন। নবী করীম (সাঃ) তাঁর ইনতেকালের অল্প কিছুদিন পূর্বে আসামা (রাঃ)-এর নেতৃত্বে সেই সৈন্য বাহিনীটি সাজিয়ে যুদ্ধে প্রেরণের জন্য প্রস্তুত রেখেছিলেন। আর নবী করীম (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর সেই বাহিনীটি যুদ্ধে প্রেরণ কল্পে সাহাবাদের মধ্যে নানা মতের উদ্ভব হয়েছিল। কিন্তু খলিফা আবুবকর (রাঃ) বিরুদ্ধমত পোষণকারীদের কথা ভ্রুক্ষেপ না করে তা প্রেরণ করেছিলেন। তিনি সৈন্য বাহিনীকে বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করতে গিয়ে বাহিনীর সাথে সাথে পায়ে হেটে মদীনার বাহিরে চলে গিয়েছিলেন। তখন আসামা (রাঃ) সওয়ারীর পৃষ্ঠেই উপবিষ্ঠ ছিলেন। মুসলিম জাঁহানের খলিফা বৃদ্ধ হয়ে পায়ে হেটে চলছে, আর আমি নওজোয়ান হয়ে সওয়ারীতে পথ অতিক্রম করছি। এ কাজটা আসামার (রাঃ) মনে একটা খট্‌কার সৃষ্টি করে ছিল। তখন তিনি বললেন– খলিফাতুল মুসলেমীন। আমার সওয়ারীতে এসে উপবিষ্ট হোন নুতবা আমি সওয়ারী থেকে নেমে আসতে বাধ্য হবো। তখন খলিফা কছম দিয়ে বললেন– আল্লাহর কছম তুমি অবতরণ করবে না। তোমাকে আল্লাহর কছম দিচ্ছি নীচে নামবে না। আমি যদি কিছু সময় আল্লাহর পথে হেটে পদযুগলে ধুলোবালি মেখে নেই, তাতে তোমার ক্ষতির কিছুই নেই। অতঃপর তার মনে হলো যে এখন যখন খেলাফত তার স্কন্ধে এসে পড়েছে, তখন ওমর (রাঃ)-কে

তাঁর খুবই প্রয়োজন। কিন্তু অসুবিধা এ ছিল যে সে বাহিনীটিতে হযরত ওমর (রাঃ)-ছিলেন একজন সাধারণ সিপাহী। আর আমীর ছিলেন আসামা (রাঃ)। তাই ওমর (রাঃ)-কে রাখতে হলে তার থেকেই অনুমতি নেয়া প্রয়োজন ছিল। সুতরাং খলিফা আবু বকর আসামার অনুমতি চেয়ে প্রার্থনার সুরে তাকে বললেন– "যদি আপনি ভাল মনে করেন, তবে খেলাফতের কাজে আমাকে সহায়তার জন্য ওমর (রাঃ)-কে রেখে যান।

সোবহানাল্লাহ! "যদি ভাল মনে করেন তবে ওমর (রাঃ)-কে আমার সাহায্যের জন্য রেখে যান" এ কথাটি কত বড় উচু দরের কথা এবং কত উন্নত মানসিকতার ও মহানুভবতার পরিচয়? মর্যাদা এত শীর্ষে যে সেখানে মানুষের মুখের বাক্য উপনীত হতে অপরাগ।

ইতিহাসের পাতা উল্টালে এ ধরণের বাস্তব ঘটনাবলী আরো বহু আমাদের চক্ষে পড়বে। যেমন হযরত ওমর (রাঃ) কুফা প্রদেশে যে লোকটিকে গভর্ণর নিযুক্ত করেছিলেন, সে লোকটি ছিলেন স্বাধীনকৃত ক্রীতদাস। এর নাম ছিল আম্মার বিন ইয়াসার। আমরা আরো দেখতে পাবো যে, হযরত ওমর (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য তার ঘরের দরওয়াজার সামনে ওমর বিন হারেস বিন হাস্‌সামের ছেলে সহীল আবু সুফিয়ান ইবনে হরব এবং কুরাইশদের আরো অনেক সম্মানিত লোক অপেক্ষায় দণ্ডায়মান ছিলেন। কিন্তু সর্বপ্রথম তিনি দু'জন দরিদ্র আযাদকৃত ক্রীতদাস সহীল ও বিলাল (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ দানের নিমিত্ত ভিতরে ডেকে নিয়েছিলেন। কারণ এ দু'জন ছিলেন নবী করীম (সাঃ)-এর একান্ত আপনজন সাহাবীর অন্তর্ভূক্ত। আর তারা বদরের যুদ্ধেও মুসলমানদের বাহিনীতে শামিল ছিলেন।

হযরত ওমরের এহেন কার্য্যে আবু সুফিয়ান অগ্নিসম রাগান্বিত হয়ে জাহেলীপনা ভাষা প্রয়োগ করেছিল। সে বলেছিল– "আমাদেরকে দরজায় দণ্ডায়মান রেখে ক্রিতদাসকে ভিতরে প্রথম ডেকে নিল, এমন কাজতো আমি কখনো দেখিনি?

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) একদিন মক্কায় ভ্রমণ করতে করতে দেখতে পেলেন যে, কর্মচারীরা গৃহকর্তার সাথে খানা খেতে বসেনি। বরং তারা নিকটে দাঁড়িয়ে আছে। এ অবস্থা অবলোকন করে রাগান্বিত হয়ে বিরক্তির ভাষায় গৃহস্বামীকে বললেন– "মানুষের কি হলো যে তারা নিজেদের খাদেমদের সাথে নীচু প্রবৃত্তির ব্যবহার দেখাচ্ছে।" অতঃপর খানা খাবার বেলায় যাতে করে তাদের প্রতি বে-ইনসাফী না করা হয়; সেজন্য তিনি তখন তখন কর্মচারীদেরকে গৃহ স্বামীদের সাথেই একত্রে খানা খেতে বসিয়ে দিলেন।

হযরত ওমর (রাঃ) মক্কায় নাফে বিন হারেস (রাঃ)-কে গভর্ণর নিযুক্ত করেছিলেন। আসফান নামক স্থানে বসে তার সাথে তার সাক্ষাত হলে মরুদ্যান

ও উপত্যকাসমূহে কাহাকে তার প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়েছে, এ কথা তিনি জিজ্ঞেস করলে নাফে (রাঃ) উত্তর দিলেন– ইবনে আব্জাকে নিয়োগ করেছি। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ইবনে আব্জাকে? সে উত্তর দিল– ইব্নে আব্জা হচ্ছে একজন মুক্তিকৃত ক্রীতদাস। হযরত ওমর (রাঃ) উত্তর দিলেন– তুমি একজন মুক্তিকৃত ভৃত্যকে মক্কায় স্বীয় প্রতিনিধি কেমন করে নিযুক্ত করলে? নাফে (রাঃ) উত্তর দিলেন, এ লোকটির কুরআনে করীম সম্পর্কে যেমন জ্ঞান রয়েছে তেমনি রয়েছে ইসলামের বণ্টন নীতিমালা (ফরায়েজ) বিষয় সুষ্ঠুজ্ঞান। অপর দিকে তিনি একজন শহরের কাজীও বটে। হযরত ওমর (রাঃ) উত্তর করলেন– হবে না কেন? তোমাদের নবী (সাঃ) ইরশাদ করে গিয়েছেন– "কুরআনে করীম দ্বারা আল্লাহ তায়ালা কতিপয় মানুষকে উচ্চমর্যাদার আসন দান করবেন, আর কতিপয় লোকদের করবেন নিম্নদেশে নিক্ষেপ।"

যেহেতু হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইবনে আব্জা সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। সুতরাং যে ব্যক্তিকে এমন একটি উচ্চ মর্যাদার আসনে বসিয়ে তার মাথায় গুরুত্বপুর্ণ দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, সে ব্যক্তির গুণাগুণ যোগ্যতা সম্পর্কে ওয়াকীফহাল হওয়া খলিফার জন্য একান্ত প্রয়োজন? এ উদ্দেশ্যেই তিনি এরূপ প্রশ্ন করেছিলেন। এ ব্যাপারে নাফে (রাঃ) এর প্রতি কোন অভিযোগ করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। কেননা ওমর (রাঃ) তাঁর পরবর্তীকালে খলিফা হবার জন্য যে ছয়জন ব্যক্তিকে নিয়ে একটি মজলিশে শুরা কায়েম করেছিলেন তাদের উদ্দেশ্যে নসীহত করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন– আজ যদি আবু হোযায়ফার মুক্তিকৃত দাস সালেম (রাঃ) জীবিত থাকতেন, তবে আমি আজ তাকে খলিফার মসনদে বসিয়ে যেতাম। অতএব এ উক্তিটি দ্বারা তাঁর মানসিতার পরিচয় পাওয়া যায়। হযরত ওমর (রাঃ) খলিফার আসনের জন্য যে ছয় ব্যক্তিকে নিয়ে পরামর্শ বোর্ড করেছিলেন, তারা হচ্ছেন হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত আলী, তালহা, জোবায়ের ইবনে আওয়াল সায়াদ বিন আবী আক্কাস, আর আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীবৃন্দ।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে মুক্তি প্রাপ্ত একজন ক্রীতদাস কুরাইশ বংশের কোন এক লোকের নিকট তার ভগ্নীকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ধন দৌলত দান করার কথা জানিয়ে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু কুরাইশী ব্যক্তি তার ভগ্নীকে তার নিকট বিবাহ দিতে অস্বীকৃতি জানালো। এ কথা হযরত ওমর (রাঃ)-এর গোচরীভুত হলে তিনি কুরাইশ ব্যক্তিকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন– আচ্ছা এ লোকটির নিকট তোমার ভগ্নীকে বিবাহ দিতে অস্বীকার করছো কেন? এ লোকটিতো খুব ভাল লোক। এ ছাড়া সে তো তোমার ভগ্নীকে যথেষ্ট পরিমাণ ধন সম্পদ দেয়ার কথাও প্রস্তাবে উল্লেখ করেছে। অতএব তোমার মনের কথাটা খুলে বলোতো? কুরাইশী ব্যক্তি উত্তর করলো– হে আমীরুল

মুমেনীন। আমরা উচ্চবংশ, সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক। বংশ ও আভিজাত্যের দিক দিয়ে আমার ভগ্নীর সমমর্যাদা সম্পন্ন নয় বলেই আমি তার নিকট তাকে বিবাহ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছি। তখন হযরত ওমর (রাঃ) উত্তর করলেন– এ লোকটিতো দ্বীন দুনিয়া উভয় প্রকার আভিজাত্যের অধিকারী। তার পার্থিব আভিজাত্য হচ্ছে তার ধন-সম্পদ। আর পরকালীন আভিজাত্য হচ্ছে তার তাকওয়া পরহেজগারী। সুতরাং তোমার ভগ্নী সম্মত থাকলে তার সাথে তার বিববাহ দিয়ে দাও। অতঃপর কুরায়শী ব্যক্তি তার ভগ্নীকে এ বিবাহে সম্মত থাকার কথা অবগত হয়ে সে তাকে এ লোকটির নিকট বিবাহ দিয়েছিলেন।

এর পূর্বে আমরা দেখেছি যে একজন মুক্তিকৃত ক্রীতদাস হযরত বিলাল (রাঃ) আরবী বংশীয় ছেলে আবু রবীহার বিবাহের ব্যাপারে মধ্যস্থতাকারী রূপে ইয়ামনী লোকদের নিকট দূত হিসেবে গিয়েছিলেন। আর তারা হযরত বিলাল (রাঃ)-এর সম্মানের কারণেই আবু রবীহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তার সাথে আত্মীয়তা করেছিলেন।

তৎকালীন যুগে মুক্তকৃত ক্রীতদাসদের জন্য সমাজ জীবনে যে কোন দিক থেকে হোক না কেন উচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হবার এবং পার্থিব জীবনে সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করার পূর্ণ মাত্রায় সুযোগ ছিল। এ ব্যাপারে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কথা উল্লেখ করা হলে সাথে সাথে তার মুক্তিকৃত ভৃত্য নাভে (রাঃ)-এর কথা আনস বিন মালিক (রাঃ) সাথে তার মুক্তিকৃত দাস ইবনে সিরীনের কথা আবু হোরায়রার সাথে তার মুক্তিকৃত ভৃত্য আবদুর রহমান ইবনে সিরীনের কথা, আবু হোরায়রার সাথে তার মুক্তিকৃত ভৃত্য আবদুর রহমান ইবনে হরমজ-এর কথা একান্তভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

বসরায় হাসান বসরী মক্কায় মুজাহিদ ইবনে জুবাইর আতায়া ইবনে আবী রিবাহ্ এবং তাউস বিন কায়সান নামে বিভিন্ন ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদ (ফকীহ্) ছিলেন, যাদের সকলেরই মুক্তিকৃত দাসের সাথে সম্পর্ক ছিল। এমনিভাবে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের খেলাফত কালে ইয়াজিদ বিন আবুজাইব নামে এমন একজন লোক প্রধান মুফ্তির আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, যিনি ছিলেন "দীনকলাহ" বংশের লোক এবং "আসওয়াদ" এর মুক্তিকৃত দাস।

ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) ছিলেন একজন খুচরা কাপড় বিক্রেতা। তার পরবর্তী যুগে আরো অনেক এমন এমন ইসলামী আইন শাস্ত্রে পারদর্শি পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়েছিল, যারা ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প কারিগরী পেশা অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। যেমন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল মুচী ছিলেন। তার পিতা ছিলেন ইমাম আবু হানিফা (রাঃ)-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু ইমাম মুহম্মদ এবং হাসান (রাঃ)-এর ছাত্র। একদিকে তিনি জুতা তৈয়ার করার কাজ করে জীবিকা উপার্জন করতেন। আর অপরদিকে খলিফা মেহদী বিল্লার রাজস্ব বিভাগ

পরিচালনার নিমিত্ত "কিতাবুল খারাজ" নামে একখানা রাজস্ব সম্বন্ধীয় ইসলামী আইন পুস্তক রচনা করেছিলেন। সে যুগে তিনি ইসলামী আইন শাস্ত্রে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পুস্তক রচনা করেছিলেন। এমনিভাবে কারাবিসী (রাঃ) সাধারণ কাপড়ের ব্যবসা করতেন। কাফ্ফাল (রাঃ) স্বীয় হস্তযুগল বাহিরে প্রকাশ করলে তার হাতের পৃষ্ঠদেশে বহু দাগ দৃশ্যমান হতো। লোকে তার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন– এগুলি হলো কাজ করার দাগ, যা আমি ইতিপূর্বে করেছি। অর্থাৎ তালা নির্মাণ করা ছিল তার পেশা। ইবনে কুত্তুল (রাঃ) বাগা (রাঃ) দর্জির কাজ করে জীবিকা উপার্জন করতেন। ইমাম জুচ্ছাছ যিনি সমসাময়িক কালে একজন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ছিলেন। তার রাজমিস্ত্রির অবলম্বিত পেশা অনুযায়ী লোকেরা "জুচ্ছাছ" বলে তাকে সম্বোধন করতো। এমনিভাবে ইতিহাসের পাতায় পিতলের বাসন নির্মাণকারী "সফ্ফার", আতর বিক্রেতা "সাইদ লানী" হালুয়া বিক্রেতার পুত্রকে হালুয়াই, গম পেসাই করে বিক্রেতাকে দাক্কাক্ক, সাবান বিক্রেতাকে সাবুনি, জুতা তৈয়ারকারীকে "নায়ালী" শাকসব্জী বিক্রেতাকে বাক্কালী, হাড় বিক্রেতাকে কুদুরী ইত্যাদি নামে সম্বোধন করা হয়েছে। ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতি ও তাহজীব তমদ্দুনের নব উষার সুপ্রভাতে মুসলমানরা যে কাজ করে জগতের সামনে দৃষ্টান্ত রেখে গেছে, সে কাজের জন্য পাশ্চাত্য জগত শতাব্দী ধরে কপাল ঠুকেও করতে সক্ষম হচ্ছে না। অর্থাৎ পেশা স্বয়ং নিজে কোনদিন মান মর্যাদা ও অপমানের বস্তু নয়। বরং ব্যক্তিবর্গই উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হয়ে থাকে। আর কতিপয় লোক হয়ে থাকে উন্নত গুণাবলী থেকে বঞ্চিত। তাই পাশ্চাত্য জগতের মন মগজে এ ধরণের পেশা অবলম্বন করাকে একটি অপমানকর কাজ মনে করার কারণে তা করতে তারা সক্ষম হয়নি। আর এ মনোভাব পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত করতে পারবেও না।

আত্মার স্বাধীনতা

মানবিক সাম্যের এহেন উন্নত ধরণের আলোচনা ততক্ষণ পর্যন্ত অসমাপ্তই থাকবে, যত সময় পর্যন্ত আমরা ইসলামী সমাজ তার ভিতরকার মহান শরীফ লোকদের সাথে কি ধরণের আদান-প্রদান ও ব্যবহার দেখিয়েছে সে বিষয় একটা মোটামুটি ধারণা ও পরিসংখ্যান করতে না পারবো। যত সময় পর্যন্ত বয়স্কশ্রেণী ছোটদের সাথে এক কাতারে দণ্ডায়মান হতে না পারবে এবং মহত্ব বুজর্গী ভদ্রতা শিষ্টাচারিতার একমাত্র মূল বুনিয়াদ বংশীয় আভিজাত্য কৌলিন্য এবং ধন সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য নয়, বরং শুধু বাস্তব জীবনের কার্যাবলী না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত শুধু ছোটদের প্রতি স্নেহ ও সম্মান প্রদর্শন সত্যিকারের সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট নয়।

ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) তাঁর স্বলিখিত পুস্তক "আল-খিরাজ"-এ উল্লেখ করেছেন যে, আমার নিকট অস্ততায়া (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে আবদুল মালেক ইবনে আবু সোলায়মান বলেছেন– হযরত ওমর (রাঃ) সমগ্র কর্মচারী ও প্রদেশের

গভর্ণরদের নিকট হজ্জ সমাপনের সময় তাঁর সাথে মক্কায় সাক্ষাত করার জন্য ফরমান পাঠালে যথাসময় তারা খলিফা ওমর (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তখন উপস্থিত জনতার সামনে দণ্ডায়মান হয়ে তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ

"হে আমার ভাইরা! আমি আপনাদের সাহায্যকারী দেখাশুনা এক কথায় সততা ও ন্যায় পরায়নতার সাথে আপনাদের খেদমত করার জন্য এ সকল গভর্ণর কর্মচারীদের নিয়োগ করেছি। আপনাদের জানমাল ধন-সম্পদের উপর হস্তক্ষেপ করার জন্য আমি তাদেরকে নিয়োগ করিনি। অতএব আমার কোন কর্মচারী সম্পর্কে আপনাদের কোন অভিযোগ থাকলে দাঁড়িয়ে আমার নিকট পেশ করুন।"

বর্ণনাকারী বলছেন, এদিন সমগ্র মানুষের মধ্যে শুধুমাত্র এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হয়ে বললো– "হে আমিরুল মুমেনীন। আপনার অমুক কর্মচারী আমাকে অন্যায়ভাবে একশত বেত্রদণ্ড দিয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ) এ অভিযোগ শুনে বললেন– এখন আপনি এর প্রতিশোধ গ্রহণে ইচ্ছুক হলে আমার নিকটে আসুন প্রতিশোধ নিন।

ইত্যবসরে আমর ইবনুল আস (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন– আমিরুল মুমিনীন! আপনি যদি কর্মচারীদের সাথে এমনি ব্যবহার করেন, তবে তা তাদের জন্য খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াবে এবং আপনার এ আচরণ একটি স্বতন্ত্র নীতিতে পরিণত হয়ে পরবর্তিকালে লোকেরা তা আমল করতে থাকবে। অতঃপর ওমর (রাঃ) এ কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে লোকটিকে বললেন, 'তুমি সামনে এসো, প্রতিশোধ নাও। তখন আমর ইবনুল আস (রাঃ) বললেন, আমিরুল মুমেনীন! এ ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমাকে অনুমতি দিন। বর্ণনাকারী বললেন– আমিরুল মুমিনীন এ লোকটিকে সন্তুষ্ট করার জন্য অনুমতি দান করলে তারা তাকে দুইশত দীনার বখশীশ দিয়ে রাজী করে নিয়েছিলেন। প্রতিটি বেত্রদণ্ডের পরিবর্তে দু'টি করে দীনার দেয়া হয়েছিল।

আমর ইবনুল আস (রাঃ) অন্যের উপর থেকে যদিও মুসিবতের পাহাড় সরিয়ে দিলেন। কিন্তু যখন তার ছেলে কর্তৃক একটি মিসরীয় ছেলেকে মারবার বিষয়টি উত্থাপন হলো, তখন তিনি তার প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যবস্থা করেছিলেন। পুত্রের জন্য বিন্দুমাত্র সুপারিশ করলেন না। প্রতিশোধ গ্রহণের সময় হযরত ওমর (রাঃ) বলেছিলেন– "এ খান্দানী ভদ্র সন্তানটিকে প্রহার করো।" আমর ইবনুল আস (রাঃ) এ ব্যাপারে সে নিজেও শাস্তি ভোগ করতো কিন্তু মিসরীয় ছেলেটি ক্ষমা করে দেয়ায় তারা রেহাই পেয়েছিল।

একদিন হযরত ওমর (রাঃ) জনসাধারণের মধ্যে কিছু মালামাল বন্টন করছিলেন, সেখানে অসংখ্য লোকের সমাগম হয়েছিল। তখন সায়াদ বিন আবী

আক্কাস (রাঃ) যার বংশীয় আভিজাত্য এবং ইসলামের জন্য অসংখ্য ত্যাগ ও কুরবানীর কথা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। তিনি মানুষগুলোকে হটিয়ে হটিয়ে সোজা হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন। ওমর (রাঃ) সায়াদকে সপ সপ করে দোর্‌রা দ্বারা প্রহার করতঃ রক্ত আঁখিতে বললেন-তুমি আল্লাহর যমীনে আল্লাহর হুকুমতের কোন প্রভাব স্বীকার করছো না। আল্লাহর হুকুমত যে তোমার দ্বারা আদৌ প্রভাবিত নয়, এ কথা তোমাকে অবগত করাটাকে আমি আবশ্যক মনে করেছি– যার এজন্য এ ব্যবস্থা।

যে কোন প্রশ্নকারী হয়তো এ কথা বলতে পারেন যে, খলিফাদের কথা আর কি বলা যায়– তাঁরা ছিলেন জীবন্ত আদর্শের বিমুর্ত প্রতীক। সুতরাং তাঁদের জীবনে এহেন ঘটনা হওয়া স্বাভাবিক বৈকি?

বস্তুতঃ এখন আমরা খলিফা এবং রাজা বাদশাহদের সাথে দেশের সাধারণ মানুষ নিজেদের মতামত প্রকাশ এবং তাদের সমালোচনার ক্ষেত্রে কিরূপ স্বাধীন দৃঢ়চেতা অটুট মনোবল ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছেন সেই আলোচনা করবো। মতামত প্রকাশের ব্যাপারে এ ধরণের শঙ্কাহীন স্বাধীনতা এবং নির্ভীক সাহসিকতার মূল উৎস হচ্ছে মানুষের আত্মা ও মন প্রাণের স্বাধীনতা, যা ইসলাম মানুষের অন্তরে দান করে। আর সেই সাধারণ সাম্য যাকে কথা ও কাজে প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। হযরত ওমর (রাঃ) সর্বপ্রথম খলিফার আসনে উপবিষ্ট হয়ে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করনে যখন বললেন– "যদি আপনাদের দৃষ্টিতে আমার মধ্যে কোনরূপ বক্রতা পরিলক্ষিত হয় অথবা আমি পথভ্রষ্ট হই, তখন আপনারা আমাকে হেদায়াতের সরল পথ দেখিয়ে সংশোধন করবেন।" তখন সাধারণ মানুষের ভিতর থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে উঠে বললো– আমরা আপনার মধ্যে কোনরূপ অসুবিধাজনক কিছু দেখলে, তা আমরা তলোয়ার দ্বারা সংশোধন করে দিব। লোকটির কথা শ্রবণ করে হযরত ওমর (রাঃ) বললেন– আমি আল্লাহ তায়ালা প্রতি শত সহস্র শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। কারণ তিনি ওমরের প্রজাদের মধ্যে এমন সব ব্যক্তি সৃষ্টি করেছেন, যারা খলিফার বেলায় কোনরূপ ক্ষমা প্রদর্শন করতে রাজী নয়। খলিফার সংশোধনের নিমিত্ত প্রয়োজন বোধে তলোয়ার হাতে নিতে তারা প্রস্তুত।

মুসলমানরা কোন একটি যুদ্ধে কিছু সংখ্যক ইয়ামনী চাদর গণীমত স্বরূপ পেয়েছিলেন। উক্ত চাদর অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে যে হারে বন্টন করা হয়েছে সেই হারে হযরত ওমর (রাঃ)-ও একটি চাদর পেয়েছিলেন। আর তাঁর ছেলেকেও একটি চাদর দেয়া হয়েছিল। যেহেতু খলিফাকে যে চাদরখানা দেয়া হয়েছিল তা তাঁর প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম ছিল। তাই তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ স্বীয় অংশের চাদরখানা খলিফাকে এ জন্য দান করলেন, যাতে তিনি উভয় চাদরটি মিলিয়ে একটি কোর্তা তৈয়ার করতে পারেন। একদিন খলিফা ওমর

(রাঃ) উক্ত কোর্তা পরিধান করে জনসমক্ষে ভাষণে বললেন– "হে লোকেরা! আমার কথার পানে কর্ণপাত করুন আর তা মেনে চলুন।" এমন সময় সালমান নামে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে উঠে বললো, আপনার কথা আমাদের জন্য শ্রবণ করা এবং তা মেনে চলা ওয়াজিব নয়। ওমর (রাঃ) কারণ জিজ্ঞেস করলে সালমান উত্তর দিল– যেহেতু আপনি একজন লম্বা প্রকৃতির মানুষ এবং আপনার অংশে মাত্র একখানা চাদর পেয়েছেন। সুতরাং আপনি যে এত বড় বিরাটাকার কাপড়টি পরিধান করে ভাষণ দিতে দাঁড়িয়েছেন বেশী কাপড় কোথায় পেলেন, তার জবাব আগে দিন? খলিফা উত্তর করলেন– থামুন, একটু ধৈর্য ধরুণ। অতঃপর তিনি আবদুল্লাহর নাম নিয়ে ডাক দিলে কেহই জবাব দিল না। কিন্তু যখন তিনি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বলে ডাক দিলেন, তখন আবদুল্লাহ উত্তর দিয়ে বললো– "আমীরুল মুমিনীন! আমি উপস্থিত। তখন হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি যে, আমি যে কাপড় দ্বারা তোহবন্দ তৈয়ার করেছি সে কাপড় কি তোমার, না তোমার নয় এটা ঠিক করে বলতো? তখন সে উত্তর করলো– এ কাপড় আমার, আমার অংশে যে চাদরখানা পয়েছি, আমি সেইখানাই আপনাকে দান করেছি। অতঃপর সালমান বললেন– হে আমীরুল মুমিনীন! এখন আপনি যা বলার আছে বলুন, আমরা আপনার কথা শুনবো এবং মেনে চলবো। এখানেও হয়তো বা কোন ব্যক্তি বলতে পারেন যে, এটা হচ্ছে হযরত ওমর (রাঃ)-এর ব্যাপার, –তাঁর বেলায় তো কোন কথাই নেই। তবে আর একটি দৃষ্টান্তের প্রতি লক্ষ্য করুন।

আব্বাসীয়া খেলাফতের প্রতিষ্ঠাতা আবু জাফর মানসুর এমন একজন সুদৃঢ় ও তেজস্বী বাদশাহ ছিলেন, যার রাজত্বকালে দেশের আইন কানুন শরীয়াতের উপর ভিত্তি করে না হয়ে আমাদের পরিভাষা মতে দেশের সাধারণ নিয়ম-কানুন রসম রেওয়াজই ছিল তার আইনগত ভিত্তি।

একদিন সুফিয়ান সওরী (রাঃ) বাদশাহর সামনে উপস্থিত হয়ে তাকে সম্বোধন করে বললেন– আমীরুল মুমিনীন। আপনি আল্লাহ এবং উম্মতে মুহম্মদীয়ার ধন-সম্পদকে তাদের ইচ্ছা ও অনুমতি ব্যতিরেকে যে খরচ করছেন এর কি জবাব দিবেন? হযরত ওমর (রাঃ), একবার কিছু সংগীসহ হজ্জ সমাপন করতে গিয়ে বায়তুল মাল থেকে ষোলশ টাকা খরচ হলে তিনি বলে ফেললেন– আমি বায়তুল মালের উপর খুব বেশী বোঝা চাপিয়ে দিয়েছি।" মানসুর ইবনে আম্মার কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে আপনি ভালভাবে অবগত আছেন। কারণ সেই মজলিসে আপনিও উপস্থিত ছিলেন, আর সর্বপ্রগম আপনিই সেই হাদীসটি নোট করে ছিলেন। উক্ত হাদীসটিতে বলা হয়েছে যে, "ইবনে মাসুদ (রাঃ) বলেন– নবী কমীম (সাঃ)-ইরশাদ করেছেন– এমন কিছু সংখ্যক লোক রয়েছে, যারা আল্লাহ এবং রাসুলের ধন-সম্পদ (বায়তুল মাল) নিজেদের

খেয়াল খুশীমত ব্যয় করে। তদের সকলের জন্যই জাহান্নাম নির্ধারিত করে রাখা হয়েছে।" সুফিয়ান সওরীর এ ভাষণ শুনে বাদশাহর দরবারের একজন প্রবীন লেখক যিনি পুরানো কথা ও ঘটনাবলী লিখে রাখতেন, তিনি দাঁড়িয়ে বললেন- আমীরুল মুমিনীনের সামনে এত বড় স্পর্ধাপূর্ণ কথা? সুফিয়ান তখন ধমক দিয়ে তাকে বললেন- সাবধান, থামুন। ফেরাউন হামানকে যেমন ধ্বংস করেছিল, তেমনি হামান ধ্বংস করেছিল ফেরাউনকে। সুফীয়ান এ কথাটি বলে সেখানে থেকে বেড়িয়ে আসলেন।

জালেম শাসকদের প্রভাব প্রতিপত্তি এবং জালেমিয়াতের দৌরাত্ব যতই বেশী হোক না কেন, যাদের অন্তর রাজ্য আল্লাহর প্রেম আলোকের উজ্জ্বল আলোক ছটায় উদ্ভাসিত এবং যারা জাগতিক প্রয়োজন থেকে বিমুখ হয়ে আল্লাহর পানে একনিষ্ঠতা অবলম্বন করেছে, এহেন ব্যক্তিদের প্রতি হস্তক্ষেপ করা ছিল তাদের শক্তির অতীত কাজ।

সুলতান ওয়াসেক একজন জালেম শাসকের মধ্যেই গণ্য হয়। তার নিকট একবার একজন ইসলামী আকায়েদ শাস্ত্রের শিক্ষক উপস্থিত হয়ে তাকে সালাম করেছিল। কিন্তু সে জবাবে সালাম করার পরিবর্তে লা সাল্লামাল্লাহ আলাইকা (আল্লাহ তোমার প্রতি শান্তি বর্ষণ না করুক) বলেছিল। এ জবাব শুনেই উক্ত শিক্ষক ওয়াসেককে ধমকিয়ে বললো- তোমার ওস্তাদ মনে হয় এমনি বে তমিজী ও অভদ্রতা শিক্ষা দিয়েছেন? অথচ আল্লাহ তায়ালার কালামে মজীদে ইরশাদ করেছেন- "যখন তোমাদেরকে সালাম করা হয়, তখন তোমরা তার চেয়ে ভাল সালাম করো অথবা জবাবে ঐ রকম সালাম দাও।" কিন্তু তুমি আমার প্রতি ভাল সালাম করাতো দুরের কথা আমার মত সালামের জবাবও দেওনি।

ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) আদালতের চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন, এক ব্যক্তি আব্বাসী খলিফা হাদীর বিরুদ্ধে তার বাগিচা দখল করে নেয়ার অভিযোগ নিয়ে একটি মামলা আবু ইউসুফের নিকট দাখিল করলো। ইমাম আবু ইউসুফ তখন এ রায় প্রকাশ করলেন যে, স্বত্ব এ ব্যক্তিরই। তবে মুস্কিল হলো যে, খলিফার নিকট সাক্ষ্য রয়েছে। তিনি খলিফাকে বললেন যে, বাদীপক্ষের দাবী হচ্ছে যে, খলিফাকে আল্লাহর নামে কসম করে বলতে হবে যে, তার সাক্ষ্য সত্য। কিন্তু হাদী কসম করাটাকে নিজের সম্মান হানির ব্যাপারে মনে করে তিনি তা অস্বীকার করলেন এবং বাদী পক্ষের হাতে তার বাগিচা প্রত্যর্পণ করলেন। এমনি তার নিকট আর একটি মামলা এসেছিল। সে মামলার আসামী ছিল খলিফা হারুন রশিদ। উক্ত মামলায় খলিফার পক্ষে ফজল ইবনে রবজী সাক্ষী হয়ে আসলে তিনি তার সাক্ষী আগ্রাহ্য করলেন। খলিফা রাগান্বিত হয়ে তার সাক্ষী অগ্রাহ্য করার অভিযোগ করলে তিনি জবাব দিলেন যে, আমি ফজলকে আপনার নিকট বলতে শুনেছি যে, "আমি আপনার গোলাম।" সুতরাং সে যদি সত্যবাদী হয়,

তবুও শরীয়াত মতে তার সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য নয়। আর মিথ্যাবাদী হলে তো গ্রহণযোগ্যের প্রশ্নই উঠে না।

ইসলাম মানুষের অন্তরে যে এহেন প্রদীপ জ্বেলে দিয়েছে তা ইতিহাসের অন্ধকারময় যুগেও কখনো নির্বাপিত হয়নি। ইতিহাসের সমস্ত যুগে মানব চিত্তের এহেন নির্ভীক স্বাধীনতা সর্বদা অন্যান্য শক্তিসমূহ ও সম্পর্ক থেকে আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে উন্নত ও তাদের থেকে বিমুখ থাকার এবং তাদের পানে মাথা নত না করার বহু প্রমাণ আজো উজ্জ্বল ভাস্করের ন্যায় দেদীপ্যমান। মিসরের সম্রাট আহম্মদ ইবনে তওলুন হানাফী মাজহাবের কাজী বক্কার ইবনে কুতায়াবাহ-কে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন। তিনি তার নিকট এমন অবস্থায় আসতেন যে, নিকটে পৌছা না পর্যন্ত তার আগমন সম্পর্কে কাজীর কোন খবরই থাকতো না। সুতরাং তিনি যখন কাজীর নিকট আব্বাসী খলিফা মুয়াফিক এর প্রতি অভিশাপ করার জন্য প্রার্থনা করলেন, তখন তিনি কিছু সময় চিন্তা করে বললেন, ইল্লা লায়ানাতুল্লাহে আলায্ যলেমীন। (কারো প্রতি নয় একমাত্র জ্বালেমদের প্রতিই আল্লাহর অভিশাপ)। এর পর কোন এক ব্যক্তি ইবনে তওলুনকে বললো যে, কাজী এ কথা আপনাকে লক্ষ্য করেই বলেছে। তখন সে কাজীর জন্য যে সকল উপঢৌকন ও হাদীয়া পাঠিয়েছিল, তা ফেরত চেয়ে পাঠালো। এ সকল হাদীয়া সামগ্রী যেভাবে তিনি পাঠিয়েছিলেন ঠিক অনুরূপ অবস্থায়ই তা সে পেয়েছিল। অতঃপর সে কাজী বক্কারকে বন্দী শিবিরে গ্রেফতার করে রেখে দিল। যদি কোন লোক ইবনে তওলুন থেকে অনুমতি নিয়ে তার সাথে সাক্ষাত করতে আসতো, তবে তিনি বাতায়নের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে তার সাথে কথাবার্তা বলতেন।

ইবনে তওলুন মৃত্যু শর্য্যায় অবস্থানকালে অবশ্য তাকে মুক্তিদানের ফরমান দিয়েছিল। তার মুক্তির সংবাদ নিয়ে বাদশাহের ব্যক্তিগত দূত তার নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাকে বললেন– তুমি গিয়ে বাদশাহর নিকটে বলবে যে, আমি এখন বেশ বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি। আর তুমি রোগ শয্যায় শায়িত। অতিশীঘ্র আমাদের মধ্যে সাঁক্ষাত হবে। আমাদের ভিতরে আল্লাহ তায়ালাই শুধু প্রতিবন্ধক হিসেবে রয়েছেন। ইবনে তওলুনের মৃত্যু হলে বক্কার বলতেন– আহ বেচারা মরে গিয়েছে। "বেচারা মরে গেছে" এ কথার দ্বারা এটাই তিনি পরোক্ষভাবে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, ইবনে তওলুন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিল, তথাপি সে তার চেয়ে অনেক নীচু প্রকৃতির ও নিম্ন মর্যাদার লোক ছিল।

আইয়ুবী সাম্রাজ্যের যুগে মিসরের রাষ্ট্রপ্রতি ক্রুশেডের যুদ্ধে ইংরেজদের পক্ষ সমর্থন করে তাদের সাথে সহযোগিতা করেছিল। আর তারা সুলতান নাজমুদ্দিন আইয়ুবীর বিরুদ্ধে তাকে সর্ববিধ সাহায্য সহানুভূতির ওয়াদায় সায়দা নামক দুর্গটিসহ অন্যান্য দুর্গগুলো তাদেরকে ছেড়ে দিল। এজন্য আজ্জীদ ইবনে আবদুস

সালাম বাদশাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেছিল। ফলে বাদশাহ তার প্রতি ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে তাকে তার পদ থেকে অপসারণ করতঃ ভয়ভীতি প্রদর্শন করে তা:ক পুনর্বার তার পদে বহাল করার এবং বিভিন্ন প্রকার সুযোগ-সুবিধা দানের প্রলোভন দেখান হলো। কিন্তু শর্ত ছিল যে বাদশাহর বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ উত্থাপন করবে না। আর সর্বদা বাদশাহর প্রতি আদবের খেয়াল রেখে চলবে। এ কথা শুনে শায়খ বাদশাহর দূতকে জানিয়ে দিল যে, আমি এটা কখনো পছন্দ করি না যে, বাদশাহ এসে আমার হস্ত চুম্বন করুক। আসলে ব্যাপার হচ্ছে যে, তোমরা হচ্ছো এক জগতের লোক, আর আমি হচ্ছি আর এক জগতের লোক।

জাহির বিরবস-এর রাজত্বকালে শায়খ মহীউদ্দিন নববী (রঃ) দামেস্কে অবস্থান করতেন। তিনি প্রায়ই জাহিরকে নসীহত করতেন। জাহির যখন মিসরে অবস্থন করতো, তখন তিনি পত্র মারফত বিভিন্ন বিষয় তার মতামত ও খেয়াল তাকে অবগত করতেন। আর দামেস্কে অবস্থানকালে প্রকাশ্যে তার সামনেই তা উল্লেখ করতেন। আল্লাম সূয়ুতী (রঃ) তার স্বলিখিত "হাসানুল মুহাজিরা" শীর্ষক পুস্তকে এ ধরণের পত্রগুলো তিনি উল্লেখ করেছেন।

ঐ পত্রাবলীর অধিকাংশ পত্রেই জাহির কর্তৃক দেশের জনগণের প্রতি আরোপিত কর বাতিল করার দাবী উত্থাপন করা হয়েছিল। তাঁর কথা ছিল যে, দেশের জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা সচ্ছল নয়। সুতরাং তাদের প্রতি এ ধরণের কর ধার্য করা হলে তার পরিণতি খুব খারাপ হবে এবং সাধারণ মানুষের মাথায় একটি বোঝা চাপিয়ে দেয়ার শামিল হবে। একটি পত্রে তিনি লিখেছেন– এ বছর বর্ষার অভাবের দরুণ বাজার দর ক্রমশঃ উর্দ্ধগতি হওয়ায় এবং ক্ষেতের ফসল ফলাদি ও উৎপাদন হ্রাস পাওয়া এবং জনসাধাণের চাষের গরু মহিষ অধিক হারে মরে যাওয়ার কারণে তারা অর্থনৈতিক অভাব অনাটন ও দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে নিপতিত হয়েছে। আর আপনি এ কথা অবগত আছেন যে, প্রজাদের প্রতি সদয় ও মেহেরবানী করা শাসকদের জন্য একান্তরূপে কর্তব্য কাজ। অপরদিকে শাসকবর্গকে পরামর্শ দেয়া ও নসীহত করা তাদের এবং প্রজাদের উভয়ের জন্যই কল্যাণকর। কারণ কল্যাণকারীতা হচ্ছে দানের অপর একটি নাম।

বাদশাহ শায়খ এবং এ নসীহত ও পরামর্শকে খুবই কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করলো। আর ওলামায়ে কেরামদের মনোভাবের কথা উল্লেখ করে তাদের প্রতি এ অভিযোগ আনলো যে, তাতারীরা যখন সিরিয়ার উপর প্রচণ্ড হামলা করে সিরিয়াকে ধ্বংস করে দিয়েছিল, তখন এ আলেমের দল নিশ্চুপ হয়ে বসেছিল কেন? জনাব শায়খ মহিউদ্দিন নব্বী খুব জোড়ালো ভাষায় এ কথার জবাবে স্বীয় মতামত ও সাবেক নসীহত পুনর্বার উল্লেখ করে বলেছিলেন– আল্লাহ তোমার

প্রতি খুশী থাকুক। তিনি ভীতি প্রদর্শন ও ধমকীর জবাবে বলেছিলেন– "আমার দাবীর জবাবে বলা হয়েছে যে, আমরা তখনকার সময় কাফেরদের আচরণের বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ বা মন্তব্য করিনি– কথাটি সত্য। কিন্তু বাদশাহ মুসলমান ঈমান ও কোরআনের নিশান বরদারদিগকে কিরূপে বিদ্রোহী কাফেরদের উপর কিয়াস করলেন, তাহাই ভাবলে লজ্জায় মাথা নত হয়ে যায়। তারা যখন আমাদের ধর্মের প্রতি বিন্দুমাত্র বিশ্বাস রাখে না, তখন এ বিদ্রোহী কাফেরদের কি কথা স্মরণ করিয়া দিতে পারি। সুতরাং বাদশাহর এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, আমি কখনো কাহারো ভয়ভীতি প্রদর্শন ও ধমকীর পরওয়া করি না। আর এটা আমাকে এ কাজ থেকে বিরতও রাখতে পারবে না। কেননা আমার আন্তরিক বিশ্বাস যে, এ কাজ আমার এবং আমি ছাড়া অন্যান্যদের প্রতি সম্পাদন করা ফরজ। আজ ফরজের কর্তব্য সম্পাদন করনে আমার উপর দিয়ে যাই ঘটুক না কেন, তা আল্লাহর দরবারে কল্যাণ এবং সম্মান বৃদ্ধির অসীলা হবে। আমি আমার সমস্যাকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করলাম, তিনি তার বান্দার অবস্থা সম্পর্কে ভালরূপেই ওয়াকীফহাল।

রসুলে করীম (সাঃ) আমাদেরকে সর্বদা সত্য তুলে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন এবং আল্লাহর পথে ভর্ৎসনা ও দুর্ব্যবহারের কোনরূপ তোয়াক্কা না করার নসীহত করেছেন। আমি সর্বাবস্থায় বাদশাহকে মহব্বত করি। আর দুনিয়া আখেরাতে যা তার জন্য কল্যাণকর আমি তা তার জন্য পছন্দ করি।"

শায়খ এমনি রূপে দরদের সাথে ক্রমাগত চিঠিপত্র লিখতে ছিলেন। কিন্তু জাহির তার নসীহতের কোন তোয়াক্কা না করে প্রজাদের থেকে তার আরোপিত কর আদায় করছিল। কারণ সামনে একটি বিরাট যুদ্ধ ছিল, যেখানে প্রচুর পরিমাণে ধন-সম্পদ ও আসবাব পত্রের আশু প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল। বাদশাহ বিভিন্ন আলেমদের মতামত ও ফতুয়াও সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। তিনি যা লিখে দিতে বলতেন তারা তাই লিখে দিত। কিন্তু এ কারণেই শায়খ মহিউদ্দিনের মনে তার মতামতের ব্যাপারে আরো কঠোরতা ও দৃঢ়তার সৃষ্টি হয়েছিল। সকল আলেম যার উপর দস্তখত করেছিলেন, সেই বিষয় তার সম্মতি আদায় করার নিমিত্ত শায়খকে ডেকে এনে দস্তখত করার জন্য নির্দেশ দিল। যদিও শায়খ এ ব্যাপারে বিভিন্ন পত্র-মারফৎ তার অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। তখন শায়খ খুব কঠোরভাবে দাম্ভীকতার সাথে জাহিরকে বললেন– তুমি কয়েদ খানার দারোয়া আক্দারের গোলাম ছিলে, তোমার নিকট ধন-সম্পদ বলতে কিছুই ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তোমার প্রতি মেহেরবানী করে তোমার উপর দেশের শাসনভার ন্যাস্ত করে বাদশাহ বানিয়েছেন। আমি শুনেছি যে, তোমার এক হাজার গোলাম রয়েছে যাদের প্রত্যেকে একটি করে জরীর কারুকার্য কৃত বিপুল পরিমাণ কাপড় মওজুদ আছে। আর তোমার নিকট একশত দাসীও আছে যাদের কাছে

প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণের অলংকার বর্তমান। সুতরাং যদি তুমি এ সকল ধন-সম্পদ রাষ্ট্রের বায়তুল মালে জমা দাও, আর তোমার দাস দাসীদের নিকট মোটা কাপড় ছাড়া আর কিছুই না থাকে, কেবল তখনই আমি এ ফতুয়া দিতে পারি যে, তোমার জন্য প্রজাদের থেকে কর আদায় করা বৈধ। জাহির শায়খের এহেন নির্ভীক দাম্ভীকতাপূর্ণ প্রকাশ্য জবাব শুনে ক্রোধে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে শায়খকে দেশ থেকে বহিষ্কার করার নির্দেশ জারী করলো। শায়খ নির্দেশ পেয়ে সিরিয়ার নববী নামক বস্তীতে এসে আশ্রয় নিল। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য ফিকাহ শাস্ত্রবিদরা জাহিরকে এ পরামর্শ দিল যে, শায়খ মহিউদ্দিন আমাদের দেশের বড় বড় আলেম ও মহান বজুর্গ ব্যক্তিদের মধ্যে এমন একজন ব্যক্তি, যার পদাঙ্ক জনসাধারণ অনুসরণ করে। সুতরাং এ ঘটনায় জনমনে বিক্ষোভের সঞ্চয় হওয়ার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব তাকে দেশে প্রত্যাবর্তন করার জন্য আপনার আহ্বান জানান উচিত। জাহির তাদের পরামর্শ মতে শায়খকে দেশে প্রত্যাবর্তন করার অনুমতি দিলে শায়খ সে অনুমতি প্রত্যাখ্যান করলেন। আর তিনি বললেন জাহির যতদিন ওখানে আছে, আমি ততদিনে সেখানে যাব না। এ ঘটনার এক মাস পরে জাহিরের মৃত্যু হয়েছিল।

কালের সাম্প্রতিক ইতিহাসের পাতায় এ ধরণের বহু উদাহরণ স্বর্ণাক্ষরে জাজ্বল্যমান অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। আমি এ সকল দৃষ্টান্ত থেকে এমন দু'টি ঘটনার উল্লেখ করতেছি যা আমি লোক মুখে শুনেছি। তা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে কি না তা আমার জানা নেই। প্রথম ঘটনাটি ইসমাঈলিয়া যুগের বিখ্যাত ঐতিহাসিক মরহুম আহম্মদ শফিক পাশা বর্ণনা করেছেন। আর দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো বর্তমানের খদীয়ু তওফীকের সমসাময়িক কালের ঘটনা। এর বর্ণনাকারী অনেক লোকই আছে।

পহেলা ঘটনা হলো সেই সময়কার ঘটনা, যখন ইসমাঈলের রাজত্বকালে সুলতান আবদুল আযীয মিসর সফরে আগমন করেছিলেন। ইসমাঈল তার এ সফর বিষয় খুবই ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। কেননা খদীয়ীদের খেতাব অর্জন করার নিয়ম-কানুনের ভিতর এ সফর খুবই গুরুত্বপূর্ণ সফর ছিল। এ ছাড়া এ সফর দ্বারা মিসরের রাজনৈতিক কার্যক্রমে অনেকখানি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব পাবারও আশা ছিল। বাদশাহ রাজ মহলে বসে আলেমদেরকে বিশেষভাবে সম্মানিত খেতাবে ভূষিত করার একটি প্রোগ্রামও তার সুভাগমনের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। এ খেতাব বিতরণের আয়োজন সভার সাথে এমন কতকগুলি রসম রেওয়াজের ও নিয়ম নীতি পালনের কথা ছিল, যার ভিতর মাটি ছুয়ে তিনবার তুর্কী পদ্ধতিতে কুর্নিশ করার নিয়মটি ছিল অন্যতম। এ ছাড়া আরো কতই না বর্বর প্রাচীন জাহেলী যুগের নিয়ম-পদ্ধতি পালন করার কথা ছিল তার খোঁজ কে রাখে? যা হোক রাজ মহলের পরির্চ্যাদের প্রতি বাদশাহকে অভিবাদন জানাবার এ সকল

নিয়ম-নীতি আলেমদেরকে শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব তাদের স্কন্ধেই ছিল, যাতে কেউ বাদশাহর সম্মুখে গিয়ে ভুল করে না বসে।

সুতরাং যথা সময়ে ওলামায়ে কেরাম রাজ মহলে প্রবেশ করে সকলকেই আল্লাহর দ্বীনের কথা ভুলে দুনিয়া পুঁজার জন্য নিজেদের ন্যায় একজন আল্লাহর সৃষ্টি বান্দাকে মাথা ঠুকে ঠুকে অভিবাদন জানালো।

পরিচর্যাদের টেনিং মতে তারা মাটি থেকে আরম্ভ করে মাথা পর্যন্ত অতঃপর মুখের নিকট এবং সীনা পর্যন্ত হাত উঠিয়ে সালামের নিয়ম পালন করলো। আর বাদশাহর পানে মুখমণ্ডল রেখে দরওয়াজার দিকে পৃষ্ঠদেশ করে উল্টা পায়ে হেটে তারা সেখান থেকে বাহির হয়েছিল। কিন্তু উক্ত আলেমদের মধ্যে শুধু মাত্র একজন আলেমই এ অভিশাপ থেকে নাজাত পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন শায়খ হাসান আদদী। তিনি দুনিয়ার মুখে লাথি মেরে আল্লাহর দ্বীনের কথা স্মরণ করে অন্তরে এ চেতনা অনুভূতি উজ্জীবিত রেখেছিলো যে সমগ্র শক্তি একমাত্র আল্লাহর হাতেই। তিনি স্বাধীন মানুষের ন্যায় শির উচু রেখে রাজ মহলে প্রবেশ করতঃ বাদশাহর সামনে গিয়ে ইসলামী নিয়ম-কানুন মত– "আস্‌সালামু আলায়কুম ইয়া আমীরুল মুমিনীন" বলে বাদশাহকে সালাম জানালেন। অতঃপর তিনি রাজা বাদশাহদের সাথে সাক্ষাতের সময় আলেমদের করণীয় কাজ যথা তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বন করা; আল্লাহর আযাবের ভীতি প্রদর্শন করা এবং স্বীয় প্রজাদের প্রতি দয়া ও মহানুভবতা প্রকাশ করার নসীহত ইত্যাদি করেছিলেন। পরিশেষে আলাপ আলোচনার কাজ শেষ করে তিনি স্বাধীনভাবে শান শওকতের সাথে মাথা নত না করে সালাম দিয়ে বেড়িয়ে এসেছিলেন।

হাসান আদদীর এ আচরণ অবলোকন করে রাজ মহলের পরিচার্যাগণ সকলে অভিভুত হয়ে পড়লো। তারা মনে করলো যে কাজ খুবই খারাপ হয়েছে; বাদশাহর ক্রোধের আজ আর সীমা থাকবে না। তাদের সকল চেষ্টা বিফলে গেল। আর তারা যে আশা আকাঙ্ক্ষার জাল বুনেছিল তা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

কিন্তু ঈমানী শক্তির প্রেরণায় যারা কাজ করে সে কাজ কখনো বিফলে যায় না। তা যে তেজদীপ্ত শক্তি নিয়ে তাদের মুখ ও অন্তর থেকে বের হয় সেই শক্তি ও তেজস্বীতা নিয়েই অপরের অন্তরে প্রবেশ করে। সুতরাং বাস্তবে ঘটনা তাই হয়েছিল। বাদশাহ হঠাৎ বলে ফেললো যে, তোমাদের এখানে সত্যিকারের আলেম বলতে একজনই আছেন। সুলতান একমাত্র তাকেই বখশীশ ও উপঢৌকন এবং খেতাব প্রদান করে ভূষিত করেছিলেন। আর অন্যরা সকলেই হয়েছিল বঞ্চিত। আর দ্বিতীয় ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল দারুল উলুমে বসে তাওফীক পাশা এবং শায়খ হাসান তাবীলের মধ্যে।

শায়খ তাবীল দারুল উলুম-এর একজন প্রখ্যাত শিক্ষক ছিলেন। তিনি সাধারণতঃ এক বুক ফারাহীন কোর্তা পরিধান করতেন। একদিন দারুল উলুম

এর সেক্রেটারী সাহেব জানতে পারলেন যে অমুক দিন তওফীক পাশা তাদের মাদ্রাসা পরিদর্শন করতে আসবেন। অতএব তিনি মাদ্রাসার পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ সমাধা করে তাকে সাজিয়ে তার আসবাব পত্র ঠিকঠাক করার কাজে ব্যস্ত রইলেন। এ ছাড়া বাদশাহর সামনে উপস্থিত হবার জন্য পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে পূর্ব হতে শিক্ষকদেরকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিলেন। আর ঐদিন শায়খ তাবীলকে একটি কিতফাল এবং একটি বুকফারা কোর্তা পরিধান করে বাদশাহর সামনে উপস্থিত থাকার পরামর্শ দিলেন।

শায়খ সাহেব সেক্রেটারী সাহেবের মনের ইচ্ছার কথা অবগত হয়ে তাকে মৌন সম্মতি জানালেন। কিন্তু এদিন তিনি স্বীয় অভ্যাস মত পুরানো পোষাকেই মাদ্রাসায় উপস্থিত হয়েছিলেন। অবশ্য তার হাতে একটি রুমালে উল্লেখিত কোর্ত্তাসহ বিভিন্ন মূল্যবান কাপড় গাঠরী বাঁধা ছিল। গাঠরীটি দেখেই সেক্রেটারী সাহেবের চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি মনের দুঃখ কষ্ট ও ক্রোধ প্রকাশের অবস্থা প্রদর্শন করে শায়খের নিকট জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কিফতান ও কোর্তা কোথায়? শায়খ উত্তর দিলেন এর ভিতর। সেক্রেটারী সাহেব মনে মনে ভাবলেন যে আমাদের মেহমান আগমনের সময় উপস্থিত হলে হয়তো তিনি পোষাক পরিবর্তন করবেন। শায়খ এর এ কাজটি তার নিকট আশ্চর্য মনে হলো কিন্তু তিনি নিশ্চুপ রইলেন।

কিছুক্ষণ পর যার জন্য সমগ্র শিক্ষকমণ্ডলী অপেক্ষায় ছিলেন সেই মেহমান এসে উপস্থিত হলেন। সমগ্র মাদ্রাসায় একটি নবজীবনের হিল্লোলের ঢেউ খেলে গেল। অতঃপর এমন একটি ঘটনা অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘটে গেল, যা সেক্রেটারী সহ সকল শিক্ষকমণ্ডলীর নিকট নতুন ছিল। শায়খ স্বীয় গাঠরীটি হাতে নিয়ে তাওফীক পাশার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বিনয় ও নম্রতার সাথে বললো– আমাকে লোকেরা বলেছে যে অবশ্যই আমাকে কিফতান ও জুব্বা পরিধান করে আপনার সম্মুখে হাজীর হতে হবে। সুতরাং আমি জুব্বা ও কিফ্‌তান নিয়ে আপনার খেদমতে উপস্থিত হয়েছি। আপনি যদি জুব্বা ও কিফ্‌তান চান, তবে তা এই রইলো। আর হাসান তাবীলকে যদি চান তবে সে এখন আপনার সামনে উপস্থিত। তাওফীক পাশা স্বভাবগত রূপে বলে উঠলো– আমি হাসান তাবীলকেই চাই।

এ হলো মরদে মুমিনদের মনের অবস্থা, যারা ইসলামের ইজ্জৎ সম্মান ছাড়া আর কোন মান সম্মানের প্রত্যাশী নয়। তাদের মন অন্তর নীচু এবং ফাকা মান ইজ্জত এবং পরকালের কল্যাণ লাভ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তারা ইসলামের মূল হাকিকতকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং তাকে একান্তরূপে আপন বানিয়ে নিয়েছেন। কখনো তারা ইসলামের সত্যিকার উচ্চ মর্যাদা এবং তার প্রাণ শক্তি পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করার পর কোন মানুষকে খুশী করার চিন্তায় ব্যস্ত থাকা

প্রয়োজন মনে করেন নি। তাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। এটাই হলো ইসলামী জীবন পদ্ধতি অবলম্বনের সত্যিকারের রূপরেখা।

বিজিত দেশের সাথে ব্যবহার

মানবিক সাম্য বিবেক ও আত্মার স্বাধীনতা আর সাধারণ ন্যায় ইনসাফের সাথে নিকটতম সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের সেই কর্ম পদ্ধতি ও কার্যধারা সম্পর্কে আলোচনা করা উচিত যা বিজিত দেশসমূহের এবং ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম সম্প্রদায় সমূহের স্বাধীনতার অধিকার সংরক্ষণের বেলায় গ্রহণ করা হয়েছিল। ন্যায় ও ইনসাফ এবং সাম্যবাদীতার এহেন গতি প্রকৃতির সম্পর্ক বিজড়িত রয়েছে ব্যক্তির পরিসীমা অতিক্রম করে সম্প্রদায়গত সীমারেখা পর্যন্ত। আর ইসলামের সীমারেখা থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে সমগ্র মানব জাতির সীমারেখার সাথে।

বিজিত দেশসমূহের ব্যাপারে আলোচনা করা হলে স্বাভাবতঃই ইসলামের অসংখ্য বিজয়ের সত্যিকারের রূপ ও গতি প্রকৃতি এবং তার উপায় উপকরণ ও উদ্দেশ্যের বিষয়টি আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়। যদিও তা একটি দীর্ঘ আলোচনার বিষয়। তথাপি আমরা শুধু এখানে একান্ত আবশ্যকীয় বিষয়গুলো এবং মানবতার প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ সীমারেখার ভিতর সামাজিক সুবিচার ও ন্যায় ইনসাফের সাথে সম্পর্কীয় বিষয়গুলোর উপর আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো।

ইসলাম মানুষের দিল দিমাগ ও বিবেকের নিকটই তার দাওয়াত পেশ করে। জোর-জবরদস্তীর দিকটা থেকে সে সম্পূর্ণ পবিত্র ও মুক্ত। সে এ ধরণের মূলগত জোর জবরদস্তীকেও নিজ দাওয়াতী কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যম রূপে গ্রহণ করেনা, যা আলৌকিক ঘটনাবলীর রূপ ধারণ করে মানুষকে দুর্বল, হীন ও অপারগ করে দেয়। সাবেক ধর্মগুলোর সাথে এ ধরনের আলৌকিক ঘটনাবলীর সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়।

ইসলামই হলো একমাত্র সেই প্রথম দ্বীন, যে মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি ও চেতনা অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতঃ তাকে অস্বাভাবিক ঘটনাবলীর দ্বারা দুর্বল করে দেখাতে এবং আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে প্রভাবিত করার পরিবর্তে, শুধু তাকে সম্বোধন করাটাকেই সে যথেষ্ট মনে করেছে। বস্তুগত ও জাগতিক সামরিক শক্তির কিম্বা তলোয়ারের সাহায্য নিয়ে নিজ কথা কাজ ও মতবাদকে মানাবার এবং তার সমর্থন আদায় করার পন্থা কখনো সে স্বীকার করে না। পবিত্র কুরআন মজীদে ঘোষণা হচ্ছে- লাইকরাহা ফীদ দ্বীন।

لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ-

-"ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কোন রূপ জোড় জবরদস্তী নেই।"

(সূরা বাকারা-২৫৩)

اُدْعُوْا اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ-

"সুন্দর সুন্দর নসীহত এবং হিকমত অবলম্বন করে মানুষকে স্বীয় প্রভুর পানে দাওয়াত দাও। আর মানুষের সাথে উত্তম পন্থায় তর্ক বিতর্ক করো।"

(সূরা নহল-১২৫)

কিন্তু প্রথম দিন থেকেই এ নতুন দ্বীনটির পথে কুরাইশরা নানাবিধ জাগতিক শক্তির সাহায্যে সশস্ত্র প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যে সকল ব্যক্তিবর্গকে আল্লাহ তায়ালা এ নব ধর্মে দীক্ষা নেয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন, তাদের প্রতি তারা নির্মম দুর্ব্যবহার করেছে, বহু মুসলমানকে তারা তাদের নিজ পৈতৃক ভিটা বাড়ী ও স্ত্রী-পুত্র সন্তান-সন্ততি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা এমন কারসাজি করেছিল যে তাদেরকে বন্ধী শিবিরে আবদ্ধ করে পিপাসা ও অনাহারে মেরে ফেলা হতো। মোটকথা জাগতিক শক্তি ব্যবহারের এমন কোন পথ তাদের অবশিষ্ট ছিল না- যা তারা ইসলাম থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখার নিমিত্ত ব্যবহার করেনি।

সুতরাং ইসলামের জন্য এহেন সময় নিজের প্রতিরক্ষা এবং স্বীয় অনুসারীদেরকে এ পাশবিক বরবরপনা অত্যাচার থেকে রেহাই দানের চেষ্টা করা ব্যতীত দ্বিতীয় অন্য কোন পথ উন্মুক্ত ছিল না। তাই কুরআনে করীম- ইরশাদ হচ্ছেঃ

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ-

"যাদেরকে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করতে দেখা যাচ্ছে তাদেরকে যুদ্ধ করার নির্দেশ ও অনুমতি দেয়া হয়েছে। কারণ তাদের প্রতি জুলুম ও অত্যাচার করা হয়েছে তারা মজলুম। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সর্ব ব্যাপারে সাহায্য দান করতে সক্ষম ও সমর্থবান।" (সূরা হাজ্ব-৩৯)

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَاتَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ-

"যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হয়ে আসে তোমরা তাদের সাথে আল্লাহর পথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও। কিন্তু খবরদার সীমা অতিক্রম করবে না। কারণ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা ভালবাসেন না।

(সূরায়ে বাকারা- ১৯০)

তারপর এমন একটা সময় এসেছিল যে সমগ্র আরব ভূমি ইসলামের ছায়া তলে আশ্রয় নিয়ে ছিল। আর মুসলমানদের বিজয় কেতন তখন আরবের বার্হিগত দেশেও উড্ডীয়মান হতে আরম্ভ হয়েছিল। এখানে একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হচ্ছে যে মুসলমানগণ কর্তৃক দেশের পর দেশ জয় করার পিছনে তাদের কি উদ্দেশ্য ছিল?

ইসলাম যে নিজকে একটা বিশ্ব-জনীন দর্শন এবং সামগ্রিক জীবন বিধান বলে জগতের সামনে পেশ করে সে বিষয় আমরা বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্বে করেছি। ইসলাম নিজকে কখনো কোন ভূখন্ড কিম্বা আঞ্চলিক আবেষ্টনীর বেড়া-জালে সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়াসী নয়। সে সর্বদা স্বীয় অবদান দুনিয়ার প্রতিটি কোনায় এক কথায় সমগ্র মানুষের নিকট পৌঁছাতে ইচ্ছুক। কিন্তু সিরিয়া ও রোম সাম্রাজ্যের ন্যায় দুটি বিরাট শক্তি যখন চলার পথে প্রতিবন্ধক রূপে দৃশ্যমান হচ্ছে, যারা তাকে চিরতরে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য ওৎপেতে বসে আছে। এ শক্তি ইসলামী দাওয়াতের নিশানবাহীদেরকে আল্লাহর যমীনে স্বাধীনভাবে মানুষের নিকট এ দ্বীনের দাওয়াতের পৌঁছাবার সুযোগ দিত না। এমতাবস্থায় হেদায়াতে এলাহী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে যে সব রাষ্ট্রশক্তি প্রতিবন্ধকরূপে দণ্ডায়মান ছিল; তাকে অপসারিত করা ছাড়া তার জন্য দ্বিতীয় কোন বিকল্প পথ ছিল না। কেননা মানুষের নিকট আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত সরাসরিভাবে পৌঁছার নিমিত্ত মানুষকে সৃষ্টির গোলামীর বন্ধীশালা থেকে পরিত্রাণ দিয়ে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার বন্দেগীর জন্য তার স্থানে ইসলামী আইন-কানুন ও বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা কল্পে সর্ব প্রথম পথের বাঁধা দূরীকরণের জন্য এটাই ছিল একমাত্র পথ। অতঃপর যখন রাষ্ট্রীয় ও জড়বাদী শক্তি মধস্থান থেকে অপসারিত হবে আর খোদায়ী শরীয়ত ওইসলামী বিধি-বিধানের প্রভাবে সমগ্র দিক থেকে থেকে মানুষের আনুগত্য একমাত্র আল্লাহর জন্য নিবেদিত হয়ে দুনিয়ার বুক থেকে সৃষ্টির প্রভুত্ব খতম হয়ে যাবে, তখন পুর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকারের সাথে যে চায় আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত শুনুক, আর যে না চায় না শুনুক। কেননা এ স্বাধীনতা তাকে দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তার নিজের চলার পথ বেছে নেয়ার পূর্ণ অধিকার তার রয়েছে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হচ্ছে- وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنُ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنُ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ- " এ সকল

কাফেরদের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হও। যাতে করে ফেৎনা ফাসাদ সমাজ হতে সম্পূর্ণ রূপে শেষ হয় এবং দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়। অর্থাৎ দুনিয়া থেকে সৃষ্টির প্রভুত্ব খতম হয়ে আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েম হয়।" (সূরা আন্‌ফাল- ৩৯)

দ্বীন একমাত্র সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তায়ালার জন্য হয়ে যাবার অর্থ হচ্ছে যে, এখানে দ্বীনের ব্যাখ্যা আনুগত্য বুঝান হয়েছে। মানুষ যাতে করে সৃষ্টির প্রভুত্ব এবং তার আনুগত্য করা থেকে মুক্তি পেয়ে আল্লাহর প্রভুত্বের অধীনস্ত হয়ে যায় এবং তারপর কোন প্রকার জোর-জবরদস্তি ও জুলুম পীড়ন ছাড়া সে নিজের মত পথ নিজেই নির্বাচন করে নিতে পারে, এটাই হচ্ছে তার একমাত্র উদ্দেশ্যে। আমাদের এ আলোচনার আলোকে এ কথা পরিস্কার হয় যে, ইসলাম যুদ্ধ ঘোষণা করে যে সকল দেশের উপর বিজয় লাভ করেছে, সে সকল যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য ও ধরণ অপরাপর যুদ্ধ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও আলাদা ছিল;- যা এক জাতি শক্তির নেশায় মত্ত হয়ে অপর জাতির সাথে করে অথবা যেমন বিগত শতাব্দীতে সাম্রাজ্য দখল করার উদ্দেশ্যে এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে করেছিল। আর ইসলাম যে সকল যুদ্ধ পরিচালনা করে জয়লাভ করেছে তার একমাত্র অর্ন্তনিহিত উদ্দেশ্য হলো ইসলাম যে নবতর মতবাদ ও বিশ্বাসের পতাকাবাহী ছিল তার এবং অন্যান্য জাতির মধ্যে যে সকল রাষ্ট্রীয় জড়বাদী শক্তি প্রতিবন্ধক রূপে দণ্ডায়মান ছিল তাকে হটিয়ে দেয়া। জাতীয় দিক দিয়ে এ যুদ্ধ ছিল নিছক আধ্যাত্মিক যুদ্ধ।

অবশ্য এ সকল জাতির উপর যে সকল রাষ্ট্রশক্তি স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করে বসে ছিল যারা তাদেরকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও জড়শক্তির সাহায্যে এ নবতর দ্বীনের পথ থেকে ফিরিয়ে রেখেছিল এবং তাদেরকে খোদায়ী দাবীদার রাষ্ট্রপতিদের অধীনস্থ করে দিয়েছিল, তাদের জন্য এ যুদ্ধগুলো জড়বাদী যুদ্ধই ছিল।

ইসলাম নিজেকে দুনিয়ার সমগ্র মানুষের ধর্ম মনে করে এবং স্বীয় প্রভাব বিস্তারের জন্য কখনো সে জাগতিক শক্তি ব্যবহার করে না। তার এ নীতির পরিপ্রেক্ষিতে সে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দুনিয়ার সকল জাতির সামনে তিনটি পথ পেশ করে। প্রত্যেক জাতিকে এ পথ তিনটির যে কোন একটি অবশ্যই গ্রহণ করে নিতে হবে।

১। ইসলামকে মনে প্রাণে গ্রহণ করা। ২। জিজিয়া দেওয়ার অঙ্গীকার করা। ৩। যুদ্ধ ঘোষণা করা।

'ইসলাম' সে নিজেকে এ জন্য সর্বপ্রথম উত্থাপন করেছে যে, এটাই হচ্ছে হেদায়েতের একমাত্র শান্তিপূর্ণ পথ। এটা আল্লাহর আল্লাহত্ব সার্বভৌমত্ব, সৃষ্টি জগত, জীবন ও মানুষ সম্পর্কে একটি নবতর পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন। এটা এমন

একটি প্রবেশ পথ যে, এ পথ দিয়ে প্রবেশ করলেই একজন অমুসলিম সমগ্র মুসলমানের ভাইয়ে পরিণত হয়। সে তখন মুসলমানের ন্যায় সমগ্র অধিকার ভোগ করতে থাকে। আর তাদের ন্যায় দায়িত্ব পালনকারী রূপে মুসলিম সমাজের একজন দায়িত্বশীল নাগরিকে পরিণত হয়। জাতিগত সম্প্রদায়গত কোন প্রথার আভিজাত্য ও কৌলিন্য এবং ধন-সম্পদের দিক দিয়েও অন্যান্য মুসলমান ও নব মুসলিমের উপর কোনরূপ উচ্চতা ও আভিজাত্যের দাবীদার হতে পারে না। সে বংশ বর্ণ সম্প্রদায় ও জাতিগত কোন প্রকার কারণেই অন্যান্য মুসলমানদের থেকে ভিন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারে না।

জিজিয়া দেয়ার বেলায়ও ইসলামের সামনে এ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে যে, মুসলমানদেরকে স্বীয় হুকুমের সংহতি ও নিরাপত্তার জন্য নিজেদের দেহের রক্তধারা পর্যন্ত বিলিয়ে দিতে হয়। আর সামাজিক জীবনের নিরাপত্তার জন্য তাদেরকে যাকাত আদায় করতে হয়। একজন অমুসলিমও ইসলামী রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করে পূর্ণ নিরাপত্তা ও শান্তিতে বসবাস করার সুযোগ পায়। ইসলামী রাষ্ট্র তার নাগরিকদের নিরাপত্তার জন্য যে সকল আভ্যন্তরীণ ও বাহিরগত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা গ্রহণ করে, সে সকল সুযোগ থেকেও তারা লাভবান হয়। বৃদ্ধ পনা ও কর্মহীন অবস্থায়ও তারা সামাজিক জীবনের পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতি লাভ করে। যাকাতের ধরণটা যেহেতু ধনগত কর হবার পূর্বে একটি ইসলামী ইবাদত বিশেষ। সেহেতু ইসলাম অমুসলমানদের ধর্মানুভূতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখে এবং তাদেরকে একটি ইসলামী ইবাদতের মধ্যে জোর করে শামিল কারাটাকে আদৌ পছন্দ করে না। সুতরাং সে যাকাতের পরিবর্তে তাদের জন্য জিজিয়ারূপী করা ধার্য করে দিয়েছে। জিজিয়া আরোপ করার বেলায় মূল রহস্য হচ্ছে যে রাস্ট্রের জন্য জীবনগত ত্যাগ তিতিক্ষা কেবলমাত্র মুসলমানরাই বরণ করে। আর জিজিয়া হচ্ছে অমুসলমানদের জন্য এ কাজে একটি সমর্থন সুচক নির্দশন বিশেষ। এর দ্বারা এটাও প্রকাশ পায় যে শক্তির দ্বারা কখনো ইসলামের পথ থেকে বিরত রাখা যায় না। আর ইসলাম এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক থাকবে না; এটাই হচ্ছে জিজিয়া আরোপ করার অন্তর্নিহিত মূল উদ্দেশ্য।

এখন রয়ে গেল তৃতীয় পথটির আলোচনা অর্থাৎ যুদ্ধ। অতএব আসল কথা হচ্ছে যে, ইসলাম গ্রহণ এবং জিজিয়া দেয়ার অংগীকারকে প্রত্যাখ্যান করার অর্থ হচ্ছে, তার (রাষ্ট) এবং ইসলাম ও সাধারণ মানুষের চিন্তা জগতের মধ্যে প্রতিবন্ধক রূপে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান থাকা। এমতাবস্থায় শক্তির দাম্ভীকতাকে শক্তি দ্বারা চুর্ণবিচুর্ণ করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকে না। এ পথেই তাকে চিরতরে খতম করতে হয়। এটাই হচ্ছে এ রোগের আখেরী এলাজ।

ইসলাম বিজয়কৃত দেশসমূহে তার মানবিক উদ্দেশ্যাবলীকে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করেছিল। ইসলাম গ্রহণ করা অবস্থায় তাদের সকল নাগরিকদেরকে আরবীয়দের ন্যায় সর্বক্ষেত্রে সে সম অধিকার প্রদান করেছিল। আর জিজিয়া দেয়ায় অবস্থায় তাদের জন্যও সর্ব প্রকার মানবিক অধিকার সংরক্ষণ করেছিল। এমন কি যুদ্ধাবস্থায়ও তাদের সাথে সে ইনসাফ এবং মানবতা সুলভ ব্যবহার প্রদর্শন করেছে।

কতিপয় বিজিত দেশের শাসনকর্গ স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসলাম তাদেরকে পূর্ববৎ শাসকের পদেই অধিষ্ঠিত রেখেছিল। "বায়রাণ" যিনি পার্শিয়ান ছিলেন, তাকে হযরত আবুবকর (রাঃ) ইয়ামনের শাসক পদে বহাল রেখেছিলেন। এমনিভাবে সময়া প্রদেশের শাসক ফিরোজকে তার পদেই বহাল থাকার সুযোগ দিয়েছিলেন। কয়েস বিন আরদে ইয়াগুস যিনি আরবী ছিলেন, তাকে তার পদ থেকে অপসারণ করে দিলে হযরত আবুবকর (রাঃ) আরবী মুসলমানদের বিরুদ্ধে পার্শিয়ান মুসলিম ব্যক্তিটিরই সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন এবং দ্বিতীয়বার তাকে তার সেই পদেই পূর্ণবহাল করেছিলেন। এমনিরূপ মুসলমানদের বিজিত দেশসমূহের যে সকল নিম্ন পদস্থ কর্মচারী সাধারণ মানুষের খেদমতের জন্য নিজেদের মন-প্রাণ নিবেদিত করে দিতে দেখা যেত, তাদেরকেও নিজনিজ পদে বহাল রাখা হতো। যে সকল অমুসলিম দেশ ইসলাম গ্রহণ কিম্বা জিজিয়া দিতে শুধু অস্বীকৃতি জানায় না বরং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়, সেই সকল যুদ্ধবাজ দেশসমূহ দখল করার জন্যই ইসলাম মুসলিম সৈন্যদেরকে নির্দেশ দেয়। এতদসত্ত্বেও হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে পারশ্য দেশ জয় করার পর তিনি ইসলামের মূল ভাবধারার দাবী উপলব্ধি করে একটি নতুন পলিসি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সেখানে ভূ-সম্পত্তি পর্ববৎ মালিকদের মালিকানায় রেখে তার উপর খিরাজ (কর) ধার্য করেছিলেন। প্রথম বিষয়টি ছিল যে সেখানের অধিবাসীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সত্ত্বেও তাদের জীবিকা অর্জনের পথ যাতে করে অবশিষ্ট থাকে এবং তারা নিজ শ্রম বিনিময় করে দিন কালাতিপাত করতে পারে, সেজন্য তাদের মালিকানায় ভূসম্পত্তি ছেড়ে দেয়া। আর দ্বিতীয় বিষয়টি ছিল মুসলমানদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের সম্পর্কীয়। সমগ্র যমীন সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করে ভবিষ্যৎ বংশধরদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করাকে তিনি সঠিক পথ মনে করলেন না। বরং ভবিষ্যতের খাতিরে সেখানের ভুসম্পত্তির উপর খিরাজ ধার্য করেছিলেন। যাতে করে তা সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যয় করা হয় এবং ভাবীকালে তার স্বত্ত্বাধিকারীরা নিজ নিজ অংশ পেতে থাকে। এটাই ছিল খিরাজ ধার্য করার মূল উদ্দেশ্য।

আর একটি কথা হচ্ছে যে ইসলাম তার বিজিত দেশসমূহের সাথে সর্বদা মানবতা ও ভ্রাতৃত্ব সুলভ ব্যবহার প্রদর্শন করে এসেছে। সে তাদেরকে তার বিশেষত্ব ও সৌন্দর্য থেকে উপকৃত হবার পূর্ণ সুযোগ দিয়েছে। এ বিষয় সে তাদেরকে দাওয়াত জানাতে বিন্দু পরিমাণ কুণ্ঠিত হয়নি। আর এ ব্যাপারে সে কাহারো জন্য বংশ জাত বর্ণ সম্প্রদায় ভাষা ও ধর্মকে কোনরূপ প্রতিবন্ধক হতে দেয়নি। প্রত্যেককে সামাজিক জীবনের উৎকর্ষতা ও সমৃদ্ধি লাভ করার জন্য সম্ভাব্য সব কিছু করার সুযোগ দেয়া হতো। বিজিত দেশসমূহের অধিবাসীবৃন্দ এবং তাদের মুক্তিকৃত দাসবৃন্দ ইসলামের ফিকাহ শাস্ত্র ও আইন প্রণয়ন ক্ষেত্রে কিরূপ সম্মানের আসন অধিকার করে নিয়েছিল, সে বিষয় আমরা আপনাদের খেদমতে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সাধারণ জীবনের এমন কোন উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র ছিল না যেখানে তাদের সাথে সুবিচার মূলক আচরণ না করা হয়েছে। তারা সব বিষয় শুধু আরবীয়দের চিন্তা ও কর্মের নিকট ঋণী ছিল। এমন কি রাষ্ট্র শাসনের সেই সকল বিশিষ্ট পদসমূহ তাদের ভাগে এসেছিল, যে পদের লোকেরা দেশের উদ্বৃত্ত সম্পদ প্রথমতঃ সেই দেশের সাধারণ কল্যাণমূলক কাজের জন্য ব্যয় করতো। কেন্দ্রীয় "বায়তুলমালে" তার সেই অংশই শুধু প্রেরণ করা হতো যা ব্যয় করার পর অবশিষ্ট থাকতো।

এসকল বিজিত দেশসমুহের মর্যাদা ও ধরন নও আবাদীদের ন্যায় ছিল না, যে বিজিতরা তার অধিবাসীদের জানমাল নিয়ে ছিনিমিনি করবে এবং তাদেরকে নিজেদের ভোগ বিলাসের উপকরণ রূপে গ্রহণ করবে- এমন কখনোই ছিল না।

ইসলাম তার বিজিত দেশগুলির অধিবাসীদের পালনের বেলায় জনগণ ও হুকুমতের কোন প্রকারই বাঁধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয় নি। সে তাদের যাজক এবং পুরোহিতদের নিরাপত্তার সর্ববিধ দায়িত্ব নিজ হস্তে নিয়েছে। সে তাদের সাথে চুক্তিকৃত অংগীকার এতখানি সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার সাথে পালন করে, যার নজীর বর্তমান যুগে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া খুবই দুষ্কর! এ ব্যাপারে আজো ইসলামের জারীকৃত রসম রেওয়াজগুলো প্রাণবন্ত অবস্থায় বিরাজমান।

বর্তমান যুগের পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং সেই সকল দেশের সাথে তার অমানুষিক নির্মম ব্যবহার যারা ভাগ্যের পরিহাসের দরুণ সাম্রাজ্যবাদীদের পাশবিক থাবার গ্রাসের পরিণত হয়েছে তাদের সাথে যখন আমরা ইসলামকে তুলনা করি, তখন ইসলামকে তার নিজস্ব ইতিহাসের প্রতিটি যুগে উন্নত উদার ও নিষ্কলুষই দৃশ্যমান হয়। বর্তমানে আমরা দেখতেছি যে, শিক্ষা প্রশিক্ষণ এবং অর্থনৈতিক উৎকর্ষতা ও সমৃদ্ধির বেলায় পাশ্চাত্য সভ্যতার অবদান থেকে এ

সকল দেশকে এ জন্য ইচ্ছাপূর্বকই বঞ্চিত রাখা হয় যেন যথাসম্ভব দীর্ঘদিনের জন্য দেশগুলি পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য একটি দুগ্ধবতী গাভীতে পরিণত হয়। এ ছাড়া ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের উভয় ক্ষেত্রে মানবিক সম্মান ও মর্যাদাবোধকে নষ্ট করে দেয়া, ইচ্ছা পূর্বক নৈতিকতার ক্ষেত্রে অনৈতিকতার বিষ বাষ্প ছড়িয়ে দেয়া, দলগত ও সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও হাঙ্গামা সৃষ্টির বীজ বপন করে তাকে লালন-পালন করা, দল, জাতি ও ব্যক্তি সমূহকে সম্ভাব্য সকল পথে রাহাজানী হয়রানী এবং জুলুম উৎপীড়ন করাটা পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির একটি স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে।

পাশ্চাত্য দেশসমূহ বর্তমান যুগে যতটুকু ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করে, এর পূর্বে তাদের কাছ থেকে এমন একটি যুগ অতিবাহিত হয়েছে যে যুগে স্পেনের সন্ধানী ও গোয়েন্দা আদালতসমূহের পাশবিক দণ্ডবিধান, আর প্রাচ্যের নির্মম নৃশংস হত্যাযজ্ঞের পাশবিক কাণ্ডলীলা জাজ্বল্যমান রূপে বিদ্যমান। আজ যতটুকু ধর্মীয় স্বাধীনতা সেখানের নাগরিকরা ভোগ করে তা কেবল নামে মাত্র স্বাধীনতা। বাস্তব জীবনে তার কোনই খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তাই দক্ষিণ সুদানের পানে একটু অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে লক্ষ্য করুন সেখানে কি ঘটছে? সেখানের খ্রীষ্টান মিশনারীগুলো সরকারের সর্বপ্রকার সাহায্য সহানুভূতি পেয়ে থাকে। কিন্তু সেখানে মুসলমানদের জন্য প্রবেশ করা পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ!

এমন কি ব্যবসার উদ্দেশ্যও সেখানে প্রবেশ করার অনুমতি তাদের নেই। বিগত মহাযুদ্ধের সময় একজন ইংরেজ কমাণ্ডার এলেন বাই (Allen By) বায়তুল মোকাদ্দাস শহরে প্রবেশ করার সময় ইউরোপীয়দের আসল মনোভাবটি ব্যক্ত করে বলেছিলেন– "প্রকৃত প্রস্তাবে ক্রুশেডের যুদ্ধের অবসান আজ হলো। ১৯৪০ সনে সিরিয়ার বিগত বিপ্লবের সময় সেখানে দাঁড়িয়ে সদর্পে ঘোষণা করছিল– "আমরা ক্রুশেডের বীর সেনাদের বংশধর। যারা আমাদের শাসনকে মনে-প্রাণে পছন্দ করে না, তারা এখান থেকে বের হয়ে যাক। কমিউনিষ্ট ব্লকের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিন, সেখানে মুসলমানদেরকে চিরতরে খতম করার কারসাজিতে তারা লিপ্ত। চারটি শতাব্দীর এ সংক্ষিপ্ত সময় মুসলমানদের সংখ্যা চার কোটি দু'লাখ থেকে নেমে দু'কোটি ছয় লাখে এসে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে সেখানে মুসলমানদের রেশন কার্ড ইস্যু করার পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, যে রেশন কার্ড ছাড়া দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী সংস্থান করা সম্ভব নয়। রেশন কার্ড চাওয়া হলে তারা বলে যে, তোমরা নামায পড়ার অনুমতি চাইলে তাই দেয়া হবে, তোমাদের জন্য কেবল নামায পড়ার অধিকার রয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্র তোমাদেরকে খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করবে না, তোমরা আল্লাহর নিকট

খাদ্য চাও। বর্তমানেও যুগোশ্লাভিয়া এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের মুসলমানদের সাথে এহেন ব্যবহারই করা হয়।

ইসলাম সামগ্রিকভাবে সামাজিক জীবনের সুবিচার ও ভারসাম্যের এমন একটি মহান উচ্চ সোপানে আরোহণ করেছে, সেখানে ইউরোপীয় সভ্যতা পৌঁছতে পারেনি, আর কখনো পারবেও না। কেননা তাদের সভ্যতাটি এমন একটি বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা যার ভিত্তি হচ্ছে হত্যা লুটতরাজ, খুন-খারাবী জোর-জবরদস্তি, জুলুম অত্যাচার ও উৎপীড়নের উপর প্রতিষ্ঠিত।

পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতি

সবল-দুর্বল, অনাথ-গরীব, রাজা-বাদশা, ব্যক্তি-সমষ্টি, শাসক-প্রজা এবং এমনি রূপ সমগ্র মানব জাতির মধ্যে দয়া, বদান্যতা, সাহায্য-সহানুভূতি, দান দক্ষিণা এবং পারস্পরিক সহযোগীতার যে গুণাবলী ইসলাম মানব সমাজের নিকট দাবী করে, সে বিষয় আমরা ইতিপূর্বে বিশদ আলোচনা করেছি। এখন আমরা ইতিহাস থেকে তার কয়েকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও জীবন্ত আদর্শ পাঠক সমাজের খেদমতে পেশ করতে যাচ্ছি। ইসলামের বিরাটাকায় দীর্ঘ ইতিহাসে এ ধরণের প্রাণবন্ত উজ্জ্বল ঘটনবলী বহুল পরিমাণে ছড়িয়ে রয়েছে।

ইসলাম গ্রহণের সময় হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট ব্যবসায় লব্ধ মুনাফার চল্লিশ হাজার দীরহাম গচ্ছিত ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর ব্যবসা করে সে যথেষ্ট সম্পদ উপার্জন করেছিল। কিন্তু যেদিন তিনি তার প্রাণের বন্ধু হযরত রাসুলে করীম (সাঃ)-এর সাথে হিজরত করে মদীনায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেদিন তার হাতে সমুদয় পুঁজির মধ্যে মাত্র পাঁচ হাজার দিরহাম অবশিষ্ট ছিল। মুসলিম দাস-দাসীকে অর্থের বিনিময় মুক্তি করনের নিমিত্ত এবং দুর্বল অসাহয় গরীব মিসকিন মুসলমানদের সাহায্যার্থে তিনি তার সমুদয় সম্পদ ব্যয় করেছিলেন।

হযরত ওমর (রাঃ) ছিলেন একজন দরিদ্র সাহাবী। খায়বর দখল হবার পর সেখানে তিনি একখন্ড জমি পেয়ে ছিলেন। এক দিন রাসুলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে

এসে বললেন– "ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি খায়রবে একখণ্ড জমি রেখেছি। তা খুব মূল্যবান সম্পদ এর পূর্বে আমি কখনো এমনটি পাইনি। এ ব্যাপারে আপনি আমাকে কি নির্দেশ দিচ্ছেন?

+ এ বিষয় বিস্তারিত অবগতির জন্য "আস্‌সালামুল-আলমী অল-ইসলাম" পুস্তক আর লেখকের 'দেরাসাতে ইসলামীয়া" পুস্তকের "ইসলামী বিষয়ের গতি প্রকৃতি" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

নবী করীম (সাঃ) উত্তরে বললেন, যদি তোমার মনে চায়, তবে মুল সম্পত্তি স্বীয় মালিকানায় রেখে তার আয়লব্ধ অর্থ সদ্‌কা করে দাও। সুতরাং হযরত ওমর (রাঃ) গরীব মীসকীন, নিকটতম আত্মীয় স্বজনের সাহায্যার্থে দাস-দাসীদেরকে মুক্তি করার নিমিত্ত এবং অসহায় দুর্বলের সাহায্যের জন্য ও ফি সাবীলিল্লাহর সকল কাজের জন্য এ শর্তে ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন যে, তার ওয়ালী অর্থাৎ পরিচালনাবৃন্দের জন্য ন্যায়ানুগ পন্থায় এ সম্পদ ভক্ষণ করা অনর্থক খরচ করা ব্যতীত বন্ধু-বান্ধবদেরকেও ভক্ষণ করাবার অধিকার থাকবে। এমনিভাবে তিনি বিভিন্ন সময় তার প্রিয় ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে অকাতরে দান করে কুরআনে করীমের নিম্নলিখিত আয়াতটির মর্ম নিজ জীবনের বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ-

"তোমার নিকট একান্ত প্রিয় ধন সম্পদ যা রয়েছে তা আল্লাহর রাহে যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যয় না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর মঙ্গলাশীষ তোমরা পাবে না।"

(সূরা আলে ইমরাণ–৯২)

খেলাফত লাভ করার পূর্বে সিরিয়া থেকে হযরত ওসমান (রাঃ)-এর নিকট গম, রওগণ তৈল ও মোনাক্কা ইত্যাদি দ্রব্য-সামগ্রী এক হাজার উষ্ট্রের পিঠে বোঝাই করে একটি তিজারতী কাফেলা এসেছিল। তখন মুসলমানদের জন্য একটি সংকটপূর্ণ সময় ছিল। মহা দুর্ভিক্ষের কারণে তারা খুব দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। বহু ব্যবসায়ী উক্ত মাল খরিদ করার জন্য তার নিকট ভীড় জমায়ে বললো– আপনি লোকদের প্রয়োজনের কথা বেশ ওয়াকীফহাল রয়েছেন। এ মাল আমাদের নিকট বিক্রয় করুন। তিনি উত্তর করলেন– তার চেয়ে অনেক বেশী মূল্য দেয়ার প্রস্তাব তোমাদের পূর্বেই আমার কাছে রয়েছে। লোকেরা তখন জিজ্ঞেস করলো, হে আবু ওমর। মদীনার সমগ্র ব্যবসায়ী এখন আপনার খেদমতে উপস্থিত। দ্বিতীয় কোন লোক আমাদের আগমনের পূর্বে আপনার সাথে সাক্ষাত করেনি। সুতরাং যে লোকটি অধিক মূল্য দিবার প্রস্তাব দিয়েছে সে লোকটি কে? তিনি জবাব দিলেন– আল্লাহ তায়ালা আমাকে এর পরিবর্তে দশগুণ দেয়ার ওয়াদা করেছেন। তোমরা কি তাঁর চেয়ে বেশীমূল্য দিতে পারবে? জবাবে তারা সকলে না সূচক উত্তর দিল। তখন হযরত ওসমান (রাঃ) সেই সমাবেশেই আল্লাহকে সাক্ষ্য রেখে ঘোষণা করলেন– এই কাফেলার সমুদয় মালামাল আল্লাহর রাহে গরীব মীসকীনদের জন্য সদ্‌কা করা হলো।

একদিন হযরত আলী (রাঃ) এবং তার পরিবারে লোকজনের নিকট ছাতু দ্বারা তৈয়ারী তিনটি রুটি ব্যতীত খাবার আর কোন বস্তু ছিল না। এ রুটিগুলি তারা একজন মিসকীন একজন এতীম এবং একজন বন্দী কায়েদীকে সদ্‌কা করে ছিলেন। তারা পেটপুরে খেয়ে নিজেদের ক্ষুধা নিবারণ করলো। আর এরা বুভুক্ষ অবস্থার অবসানে আঁখি পাতা বুঝিয়ে নিদ্রার শীতল কোলে ঢলে পরলো। হযরত হোসাইন (রাঃ) বেশ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। আবী নিযারের পানির কুপটি তার মালিকানার ছিল বটে, কিন্তু তিনি তা এ জন্য বিক্রয় দিলেন না যে তা থেকে গরীব মুসলমানরা নিজেদের জমিতে পানি সেচের কাজ করে। তা তিনি গরীবদের ব্যবহারের জন্য রেখে দিলেন। আর বনী হাসেমের উচ্চ খান্দানের নয়ন-পুতুল হওয়া সত্ত্বেও ঋণের বোঝা নিজ কাঁধে বহন করেই চললেন।

মদীনার আনসারগণ মুহাজেরীনদেরকে নিজেদের ধন-সম্পদ ও ঘর বাড়ীতে অংশীদার করে নিয়েছিল। তাদের পক্ষ থেকে তারা জরিমানা (দিয়াত) আদায় করে দিত। আর কয়েদীদেরকে মুক্ত করাবার নিমিত্ত নিজেরা ফেদিয়া দিয়া দিত। এক কথায় তারা মুহাজেরীনদেরকে মনে-প্রাণে এমন ভাবে আপন ভাইয়ের মত করে নিয়েছিলেন যার নজীর বর্তমান জগতে খুবই বিরল। তাদের সেই ভ্রাতৃ সূলভ আচরণের কথা সাক্ষ্য দিয়ে পবিত্র কুরআন মজীদে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اُتُوْا
وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ-

"তারা মুহাজিরদেরকে যা কিছু দান করে তাতে তাদের মনে বিন্দু মাত্র কষ্টবোধ ও সংকীর্ণতা অনুভব হয় না। নিজেদের উপবাস থাকতে হলেও তারা তাদেরকে সর্বদা নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়।" (সূরা হাসর-৯)

যত দিন পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতার প্রভাব থেকে মুক্ত ও পবিত্র থাকবে ততদিন জীবনের এহেন আত্মীয়তার মধ্যে ইসলামের প্রাণ শক্তি ও কার্যকরি রূপে সঞ্চালিত হতে দেখা যাবে।

ওস্তাদ আবদুর রহমান এজাম তার স্বলিখিত পুস্তক "আর রেসালাতুন খালেদাহ" এ লিখেছেন ঃ

"আমি উত্তর আফ্রিকার তাওরেক নামী সম্প্রদায়কে সামাজিক জীবনের পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতি ও দায়িত্ব পালনের সুখ সমৃদ্ধিময় মোবারক জীন্দেগী যাপন করতে অবলোকন করছি। সেখানে তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি নিজের জন্য নয় বরং সমগ্র সম্প্রদায়টির উন্নতি সমৃদ্ধির জন্য জীবিত থাকে। তাদের মধ্যে যা কিছু তাদেরদের সম্প্রদায়ের জন্য করা হয় তাই তাদের নিকট

গর্বের বস্তুতে পরিণত হয়! তাদের অবস্থা আমি এমনভাবে নিরীক্ষণ করেছি যে ফ্রানসিসোর একজন নাগরিক হিজরত করে তাদের মধ্যে এসে ফাঁমায়া বস্তীতে বসতি স্থাপন করেছিল। লোকটির জীবন সেখানের লোকদের দয়া ও দান দক্ষিণার উপর নির্ভর করে অতিবাহিত হতো। অতঃপর সে নিজের পরিবার পরিজনকে সেই ইসলামী সম্প্রদায়টির নিকট রেখে বহির্দেশে আয় রোজগারের জন্য বাহির হয়ে পড়লো। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। কোন আয় রোজগার করতে না পেরে আমাদের নিকট মিসরাতা শহরে এসে সাহায্য প্রার্থনা করলো। আমরা তাকে তার ঘর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে এমন পরিমাণ সাহায্য করেছিলাম। কিন্তু লোকটি এক বছর পরে আমাদের নিকট আবার উপস্থিত হলে আমরা মনে করলাম যে হয়তো সে নিজ পরিবার পরিজনের নিকট থেকে এসেছে। লোকটি আমাদের মনের কথা অনুধাবন করে বললো যে, আমি বাড়ী থেকে আসিনি। আমি এখন বাড়ীতে যাবার মত উপযুক্ত হয়েছি। আমরা জিজ্ঞেস করলাম কিভাবে? লোকটি উত্তর করলো– আপনি আমাকে বিগত সাক্ষাতের সময় যা কিছু দান করে ছিলেন, তা দ্বারা ব্যবসা শুরু করেছিলাম। বর্তমানে আমার নিকট এতো টাকা পয়সা জমা হয়েছে যে এখন আমি তাওয়ারেকদের নিকট যেতে সক্ষম। আমি বললাম পরিবার পরিজনের নিকট না গিয়ে প্রথমেই তাওয়ারেকদের নিকট যাবে কেন? সে উত্তর করলো প্রথমেই আমি আমার তাওয়ারেক ভাইদের নিকট যাবে। কারণ তারা আমার অনুপস্থিতিতে আমার ছেলে মেয়েদেরকে স্থান দিয়েছে, তাদের খবরদারি করেছে। এখন আমি যে সকল লোক দেশে নাই, তাদের পরিবার পরিজন ও সন্তান-সন্ততিদের ভরণ পোষণের ব্যবসা করবো। আর আমার এবং আমার প্রতিবেশী ভাইদের সন্তানদের মধ্যে এই টাকা বিতরণ করব।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা তুমি তোমার প্রতিবেশীদের সাথে যে রূপ ব্যবহার করে। তোমার সমাজে কি প্রতিবেশীদের পারস্পরিক সম্পর্ক এইরূপ? লোকটি জবাব দিল আমরা সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় একে অপরের ব্যাথায় ব্যথিত সুখে সুখী। আমাদের সমাজে দৈনান্দিন জীবনে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা কিছু পয়সা কড়ি উদ্বৃত্ত থাকে, তা উপার্জনকারীরই মালিকানায় থেকে যায়। আমাদের ভিতর কেউ রিক্ত হস্তে ঘরে ফিরে আসুক এটা বড়ই লজ্জাকর ব্যাপার। আমাদের সমাজের পাড়া প্রতিবেশী লোকেরা সকলের জন্য সকলে এমনি ভাবেই প্রতীক্ষায় থাকে, যেমন পরিবারের লোক থাকে।" লেখক তার বাস্তব অভিজ্ঞতার বর্ণনার পর তার পর্যালোচনায় তিনি ঘটনার আসল স্বরূপটি তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"তাওয়ারীক সম্প্রদায়ের এহেন সামাজিক চেতনাবোধ ও দায়িত্বানভূতির প্রেরণার শুধু এ দলটি বা বেদুঈন কিম্বা বস্তীবাসীদের জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। আর এটা দলগত সাম্প্রদায়িকতারও ফল নয়! এটা ইচ্ছে ইসলামী জীবন বোধের সেই প্রেরণা যা আমরা সেই সকল দলের লোকদের জীবনে অবলোকন করেছি, যারা বর্তমান যুগের বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার পরিবেশ থেকে বহু দুরে অবস্থিত। আমি ইসলামের এহেন প্রাণ শক্তিকে এমন এমন বহু শহরে কার্যকরি অবস্থায় প্রাণবন্ত দেখেছি। সেখানের অধিবাসিরা ইসলামের রং-এ রংগীন হয়ে একটি ভ্রাতৃত্বমূলক সমাজ গড়ে তুলেছে। তাদের ভিতর আরবী আজমী সাদা কালো পূর্ব পশ্চিম ইত্যাদি কোন বর্ণ বৈষম্য ও আঞ্চলিকতার প্রভেদ নেই। সকলে তারা আল্লাহর বান্দা এক নবীর অনুসারী। এ ছাড়া বহু স্থানে মুসলমানদেরকে বর্তমানেও পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতি এবং দায়িত্ব অনুভূতি পালনের বেলায় একে অপরের সহযোগী হয়ে সেই সকল কোটি কোটি মানুষের তুলানায় অধিক খুশী খোশালীতে জীবন যাপন করতে দেখেছি, যারা পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার ঘ্রাণে মাতওয়ারা হয়ে গিয়েছে। ইসলামের সর্বশেষ নবী রাসুলে করীম (সাঃ) যে দ্বীনদার ও ন্যায় ইন্‌সাফ ভিত্তিক সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তারা বর্তমান যুগেও সেই সমাজের অনেক নিকটবর্তী। পাশ্চাত্যের লোকেরা শুধু কেবল নিজ স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। নিজ স্বার্থ উদ্ধার করনে যদি সামাজিক জীবনের কাঠামো ভেঙ্গেও যায়, তাতে তাদের কিছু আসে যায় না। তারা স্বীয় চেতনা অনুভূতির শেষ সীমা পর্যন্ত নিজ পরিবার পরিজনের সাথে উত্তম ব্যবহার প্রদর্শন করাকে প্রাধান্য দেয়। সুতরাং প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার প্রদর্শনের তো কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

ইসলামী মূল্যবোধের প্রেরণা সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতি ও দায়িত্ববোধের যে শিক্ষা দেয় তা কেবল শুধু ব্যক্তিগত ও সামাজিক চেতনাবোধের দয়া দাক্ষিণ্যের উপর ছেড়ে দেয় না। বরং রাষ্ট্রেও তা জারী করণের এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করণের এন্তেজাম করে। বস্তুতঃ এ জন্যই হযরত ওমর (রাঃ) তার খেলাফত কালে কচি শিশু অকর্মণ্য বৃদ্ধ এবং রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য বায়তুল মাল থেকে নিয়মিত ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রকাশ থাকে যে বায়তুল মাল থেকে দেয় এ ভাতা যাকাতের নির্দিষ্ট খাতের বর্হিভূত ছিল। এর গতি প্রকৃতি অনুযায়ী তৎকালীন যুগে এটাকে একটি সামাজিক নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থা (Social Security) বলা যেতে পারে। প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের বছর মানুষ বুভুক্ষের শিকারে পরিণত হওয়ার সময় হযরত ওমর (রাঃ) চুরির শাস্তি বিধান মওকুফ করে ছিলেন। কারণ বুভুক্ষতার সময় মানুষ চুরি

করতে বাধ্য হবার সন্দেহ নিহিত ছিল। আর ইসলামের মতে সন্দেহের কারণে দণ্ডবিধান রহিত হয়।

নিম্নলিখিত ঘটনাটি সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতি ও দায়িত্ববোধের বাস্তব ক্ষেত্রে একটি চূড়ান্ত মর্যাদা ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিশেষ। এর দ্বারা ব্যক্তিগত মালিকানার আসল রূপরেখা কি এবং তা সামাজিক জীবনে কোন সীমারেখার অনুবর্তী তাও প্রকাশ হয়।

বর্ণিত আছে যে ইবনে হাতেব বিন আবু বলতার কয়েক জন ভৃত্য মদীনার বস্তির এক ব্যক্তির একটি উষ্ট্র চুরি করে নিয়েছিল। তাদেরকে ধরে হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত করা হলে তারা চুরির কথা অস্বীকার করলো। হযরত ওমর (রাঃ) কাছির ইবনে দুলাতকে তাদের হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন। সে খলিফার হুকুম পালনার্থে তাদেরকে নিয়ে রওয়ানা হতে হযরত ওমর (রাঃ) তাকে বাঁধা দিয়ে বললো-ওগো আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি যদি একথা না জানতাম যে তুমি তদেরকে কঠিন পরিশ্রম করাও এবং তাদেরকে খেতে দাও না, যার কারণে তাদের অবস্থা এমন চরমে পৌঁছিয়েছে যে তারা ক্ষুধা নিবারণার্থে হারাম বস্তু ভক্ষণ করলেও তাদের জন্য বৈধ হতো। তখন অবশ্যই আমি তাদের হাত কেটে দিতাম। অতঃপর তিনি আবদুর রহমান ইবনে হাতেব ইবনে আবু বলতাকে বললেন– আল্লাহর কছম, আমি তাদের হাত কাটবো না। কিন্তু তোমার উপর এমন কঠোর জরিমানার বোঝা চাপিয়ে দিবো, যার ভার উত্তোলন করতে না পেরে তুমি চীৎকার করে উঠবে। অতঃপর তিনি মযীনা বস্তীর লোকটির মুখে তখন তার উষ্ট্রের মুল্যের কথা জিজ্ঞেস করলে লোকটি তার মূল্য চারশো টাকা বললো। তখন ওমর (রাঃ) ইবনে হাতেবকে উষ্ট্রের মালিককে আট শত টাকা জরিমানা আদায়ের নির্দেশ দিয়ে চুরির অপরাধে অপরাধী ভৃত্যদেরকে মার্জনা করলেন। কেননা তাদের প্রভুই তাদেরকে বুভুক্ষ রেখেছিল। আর তারা চুরি করতে বাধ্য হয়েছিল। তাদের অবস্থা এমন ছিল যে ক্ষুধার তাড়ণায় তারা মৃত গোমাংস, যা না খেলে প্রাণে বাঁচা যায় না, তা খেতে বাধ্য হয়েছিল।

ইসলামী ইতিহাসের সামাজিক জীবনে পারস্পরিক দায়িত্ববোধ ও সাহায্য সহানুভূতির মহত্ব যে বস্তুটি দ্বিগুণ করে বাড়ায় তা হলো ইসলামের গণ্ডী সীমারেখা থেকে বাহির হয়ে সাধারণরূপে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র মানুষের জন্য হওয়া।

হযরত ওমর (রাঃ) একজন বৃদ্ধ অন্ধ ব্যক্তিকে দ্বারে দ্বারে ঘুরে ভিক্ষা করতে দেখে তার অবস্থা অবগত হবার পর বুঝতে পারলেন যে, লোকটি বিধর্মী ইহুদী। অতঃপর তিনি তার নিকট ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করার কারণ জানতে চাইলে লোকটি

উত্তর দিল যে, আমার অন্ধতা, বৃদ্ধপনা এবং আমার প্রতি সরকারের আরোপিত জিজিয়া করই হচ্ছে আমার ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করার আসল কারণ। এরপর তিনি লোকটির হাত ধরে নিজ ঘরে নিয়ে তার সাময়িক প্রয়োজনের নিমিত্ত যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করলেন। আর বায়তুল মালের খাজাঞ্চীকে এ বলে নির্দেশ দিলেন যে এ লোকটিকে এবং এ ধরণের যত লোক রয়েছে সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। কেননা আমরা তার যৌবনের আয় ভক্ষণ করবো। আর বৃদ্ধাবস্থায় তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে হটিয়ে দিব, তা কোন ক্রমেই ইনসাফের কথা হতে পারে না। ফকীর মিসকীনদের জন্যই হচ্ছে যাকাতের ব্যবস্থা। সুতরাং এ লোকটি এবং এ ধরনের অন্যান্য লোকদের থেকে জিজিয়া কর আদায় মওকুফ করলেন।

হযরত ওমর (রাঃ) দামেস্ক সফরের সময় এমন একটি বস্তীর পার্শ্ব দিয়ে পথ অতিক্রম করেছিলেন, যেখানে কিছু সংখ্যক খ্রীস্টান মতাবালম্বী লোক সংক্রামক ব্যাধিতে ভূগতে ছিল। তিনি তাদের যাকাত তহবীলের অর্থ থেকে সাহায্য করার এবং তাদের নামে রেশন জারী করার জন্য সেখানের কর্ম কর্তাদেরকে নির্দেশ দিয়ে ছিলেন। সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বে ইসলামের সোনালী যুগের অন্যতম খলিফা হযরত ওমর (রাঃ)-কে তার আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও চেতনাবোধ মানবতার এমন একটি শীর্ষ চূড়ায় উপনীত করেছিল যে, তিনি সামাজিক নিরাপত্তাকে একটি মানবিক অধিকারে পরিণত করেছিলেন। সেখানে জাতি ধর্ম ও সম্প্রদায়গত কোন প্রশ্ন ছিল না। আর অভাবী লোকেরা কোন্ ধর্ম মতে বিশ্বাসী এবং তাদের আচরণই বা কি ইত্যাদি কোন কিছুই তার মনে রেখাপাত করতে পারতো না। তার অন্তরাত্মা ছিল এ সীমারেখার অনেক উর্দ্ধে।

এটা হচ্ছে মহানুভবতা ও মানবতার সেই চরম শীর্ষস্থান, যার পানে অগ্রসর হতে গেলে মানুষের পদযুগল আজো থ খেয়ে যায়। তা এখনো বহু দুর দুরান্তের অবস্থিত।

রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা

রাষ্ট্রের সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ইসলামী শাসনামলে এমন একটি উল্লেখযোগ্য যুগ অতিবহিত হয়েছে যে সম্পর্কে ইতিহাসই হচ্ছে তার জ্বলন্ত প্রমাণ। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে এ যুগটি বেশী লম্বা ছিল না। লম্বা না হবার পিছনে কি কারণ নিহিত ছিল সে বিষয় আমরা তৎকালীন ইতিহাসকে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করবো, যেন আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, এর কারণসমূহ ইসলামের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মূল স্বভাবের মধ্যে নিহিত যেমন কতিপয় লোক দাবী করে থাকেন। অথবা এগুলো এমন সব

বহির্জগতের বিস্ময়কর ঘটনবলীর মধ্যে পরিগণিত; যার এ ব্যবস্থাপনার স্বভাবের সাথে আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। সর্বপ্রথম এখানে আমরা রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো। কারণ বাস্তব জগতে অর্থনৈতিক কার্যক্রম সর্বদা তার অধীন এবং তার গতি প্রকৃতিও স্বভাবের অনুবর্তি হয়।

রাসুলে করীম (সাঃ)-এর জীবন সায়াহ্নের বিদায় মুহূর্ত যখন উপস্থিত হলো, তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) পিতার পক্ষ থেকে ওজরখাহী করে তাঁর প্রস্তাব পরিবর্তন করার এ বলে দরখাস্ত পেশ করলেন যে, আবু বকর (রাঃ) হচ্ছেন খুব নরম ও কোমল পরায়ন অন্তর বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি নামাযের ইমামতীর জন্য দন্ডায়মান হলে পিছনের লোকেরা তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে না। নবী করীম (সাঃ) আয়শা (রাঃ)-এর এ কথা শুনে খুব রাগান্বিত হলেন। তিনি হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে রমণীগণ কর্তৃক ভূলানোর ঘটনাটি উল্লেখ করে হযরত আবু বকরকে ইমামতী করার জন্য পূণঃ তাগিদ করলেন। এ নির্দেশের অর্থ কি নবী করীম (সাঃ) তাঁর জীবন সঙ্গী হেরা গুহার বন্ধুকে ইসলামী হুকুমতের ভাবী খলিফা নিয়োগ করা? মুসলমানরা এর দ্বারা কি এটাই পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পেরেছে?

আমাদের মতে এ অনুমতি দু'টির ভিতর দু'টি গোপন তথ্য ও নিগূঢ় রহস্য নিহিত রয়েছে। খলিফা নিয়োগ করে যাওয়া যদি ফরজ হতো, তবে নবী করীম (সাঃ) যেমন দ্বীনের অন্যান্য কার্যাবলী প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে লোকদেরকে বলে দিয়েছেন, অনুরূপ খলিফা নিয়োগ করার কাজটিও তিনি প্রকাশ্য ঘোষণার দ্বারা সম্পন্ন করে যেতেন। মুসলমানরা যদি পরিস্কার রূপে একথাই উপলব্ধি করে থাকে যে, তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)-কেই খলীফার পদে মনোনয়ন দিয়েছেন, তবে ছকীফায় বসে পরামর্শ সভায় মোহাজির ও আনসারদের মধ্যে কোন রূপ বিতর্কের সৃষ্টিই হতো না। কেননা আনসারগণ কখনো এমন ছিল না যে তারা নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক সিদ্ধান্ত কৃত বিষয়ের ব্যাঁপারে কোনরূপ উচ্চবাচ্য করবে।

আসলে খলিফা নির্বাচনের সমস্যাটি মুসলমানদের পারস্পরিক মতামতের উপর এ জন্য ছেড়ে দেয়া হয়েছিল যে, খেলাফতের জন্য সবচেয়ে উত্তম ও যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচনের ব্যাপারে তারা নিজেরা যেন সন্তুষ্ট হতে পারে; অনুরূপ অন্যান্যকেও যেন সন্তুষ্ট রাখতে পারে। সকীফা নামক স্থানের পরামর্শ সভার সিদ্ধান্ত যদি এ হতো যে খলিফা মুহাজিরদের মধ্য থেকেই নির্বাচিত হবে, তবে এটা করা ইসলামে ফরজ হতো না। বরং এটা ছিল মুসলিম সমাজের তর্ক-বিতর্ক ও বাক বিতন্ডার পর সম্মিলিত মতে চূড়ান্ত কার্যকরি ফয়সালা।

আনসারগণের এমন নিরঙ্কুশ অধিকার থাকতো, যার উপর কাহারো অভিযোগ করার যো থাকতো না। কিন্তু বাস্তবে যা ঘটেছিল তা হচ্ছে এই ঃ- আনসারগণ হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে খলিফার পদের জন্য মনোনয়ন দানকে মেনে নিয়েছিলেন। কেননা অন্যান্যদের তুলনায় তিনি সমধিক যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাদের সামনে তখন সেই সকল আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন, যারা মদীনার আউস খাজরাস সম্প্রদায়ের মধ্যে নেতৃত্ব করতো। তারা হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে সকলের চেয়ে উত্তম ও যোগ্য ব্যক্তিরূপে স্বীকার করে তাকে খলিফার পদে মনোনয়ন দানকে মেনে নিয়েছিলেন।

এখানের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত "খেলাফতের পদ মুজাহিরদের মধ্যেই থাকবে" এর অর্থ এই নয় যে, সর্বদা সর্বকালে সর্ব যুগে অবশ্য অবশ্যই খেলাফতের সর্ব উচ্চপদ কুরাইশ বংশের মধ্যে অপরিহার্যরূপে ঘূর্ণিয়মান থাকবে। ব্যাপারটির আসল স্বরূপ যদি এ হতো, তবে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) তার পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্য ছ'ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত পরামর্শ বোর্ড গঠনের সময় একথা বলতেন না যে, আজ যদি আবু হোযায়ফার পদে মনোনয়ন দিয়ে যেতাম। অথচ সালেম যে কুরাইশ বংশের লোক নয় সে কথা সর্বজন বিদিত। কুরাইশদেরকে শুধু এ কারণে অন্যান্য মুসলমানদের থেকে আলাদা মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্যতা দান করার হয় যে তারা কুরাইশ বংশের লোক এবং রাসুলে করীম (সাঃ)-এর বংশধর। কুরাইশ বংশ থেকে সর্বদা খলিফা ইসলামের আধ্যাত্মিক ভাবধারা কখনো পছন্দ করে না। বরং মনে-প্রাণে ঘৃণাই করে।

রাসুলে করীম (সাঃ) নিজে ঘোষণা করেছেন ঃ

যাকে তার কর্ম পিছনে ফেলে রেখেছে তাকে কখনো তার বংশীয় আভিজাত্য সামনে এগিয়ে নিতে পারে না।" (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী)

হযরত আবু বকর (রাঃ) যে হযরত ওমর (রাঃ) কে খলিফা নিয়োগ করে গিয়েছিলেন, তার অর্থ এ নয় যে, তিনি সমগ্র জাতির উপর তা মতামত চাপিয়ে দিয়েছিলেন এবং তা মেনে নিতে বাধ্য করে গেছেন। মুসলমানদের জন্য তার এ সিদ্ধান্ত বাতিল করার পূর্ণ অধিকার তাদের ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) এ কারণে খলিফার পদ গ্রহণ করেছিলেন না, যে তিনি তাকে নির্দিষ্ট রূপে খলিফা মনোনীত করে গেলেন। বরং তিনি সাধারণ মানুষের থেকে তার হাতে বায়ত গ্রহণ করার শর্ত সাপেক্ষে খলিফার পদ গ্রহণ করেছিলেন। এমনিরূপে হযরত ওমর (রাঃ) তার পরবর্তিকালে খলিফা পদে নির্বাচনের জন্য ছ'ব্যক্তিকে নিয়ে একটি বোর্ড গঠন করে দিয়েছিলেন যেন তারা পরস্পর পরাশর্ম করে নিজেদের ভিতর থেকে একজনকে খলিফা মনোনীত করেন। শুধুমাত্র এ দায়িত্বটুকুই তাদের উপর

চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য রূপে ছ'ব্যক্তির মধ্য থেকে কোন একজনকে খলিফা নির্বাচন করে নিতে কোনরূপ বাধ্য বাধকতা ছিল না। বরং তারা নিজেরাই তাদের মধ্যে থেকে একজনকে খলিফা নির্বাচন করে নিয়েছিল। কারণ বাস্তব ক্ষেত্রে এ ছ'ব্যক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ ও খলিফা পদের জন্য উত্তম ও যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ)-এর নির্বাচন বাস্তবানুগই ছিল। আর এ লোকেরা এ ছ'ব্যক্তির মধ্য থেকে খলিফা নির্বাচন করাটাকে সঠিক মনে করেছিলেন।

হযরত আলীর (রাঃ)-কে খলিফা নির্বাচনের বায়ত সমস্যা নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে চরম বিভেদ দেখা দিয়েছিল। কিছু লোক তার হাতে বায়ত নিতে সম্মত হলো। আর কিছু লোক তার বিরুদ্ধে চলে গেল। যার পরিণতিতে মুসলমানেরা পরস্পরে লড়াইর ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিল। এরপর এমন একটি জটিলতর মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, যা ইসলামের আধ্যাত্মিকতা এবং তার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কর্ম ধারাসহ সমস্ত বিভাগে তার দার্শনিক ভাবধারা ও ধ্যান-ধারণাকে মারাত্মক রূপে আঘাত হেনে ছিল।

আমাদের এ সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা দ্বারা হুকুমত সম্পর্কে ইসলামের মূল দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের নিকট প্রকাশ হয়ে যায়। অর্থাৎ মুসলমানদের স্বাধীনভাবে নির্বাচনই হচ্ছে সেই একমাত্র বিষয় যা কোন একজন মুসলমানকে খলিফা বা রাষ্ট্র নায়ক পদে সমাসীন করতে পারে। নবী করীম (সাঃ) এর একদিকে চাচাতো ভাই, জামাতা, অপরদিকে একান্ত নিকটতম আত্মীয় হযরত আলী (রাঃ)-কে খিলাফতের ব্যাপারে পিছনে রাখার সময় মুসলমানেরা এ রহস্যটি ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে হযরত আলী (রাঃ)-কে পিছনে ফেলে রাখা বিশেষ করে হযরত ওমর (রাঃ)-এর পর তার অধিকারকে লঙ্ঘন করা হয়েছে। কিন্তু এটা একটি অনস্বীকার্য সত্য কথা যে হযরত আলী (রাঃ)-কে পিছনে ফেলে রাখার ব্যাপারটি ইসলামের রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঠিক ব্যাখ্যার বেলায় খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারীর নাম-গন্ধ যাতে এ পদের ধারে কাছে না আসতে পারে তাই ছিল এ কাজের পিছনে মুল রহস্য নিহিত। কেননা উত্তরাধিকারীর ধারণা ইসলামের আধ্যাত্মিকতা ও তার মৌলিক নীতিমালা থেকে বহু দূরে অবস্থিত। এ ধ্যান-ধারণা ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা। ইসলামের নীতির সাথে এর কোনই সামঞ্জস্য নেই। এখানে হযরত আলী (রাঃ)-এর প্রতি যতটুকু অবিচার করা হয়েছে তার চেয়ে এ দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তব জগতে রূপদান করার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

এর পর আসলো বনী-উমাইয়ার যুগ। তারা ইসলামী খেলাফতকে তাদের নিজ বংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে একটি স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রে পরিবর্তন করেছিল। এটা ইসলামী শিক্ষা ও ধ্যান-ধারণার ফল ছিল না। বরং তা ছিল এমন একটি জাহেলিয়াতের প্রভাবের বাস্তব পরিণতি ফল বিশেষ যা ইসলামের আধ্যাত্মিকতাকে সম্পূর্ণরূপে কর্মহীন ও অচল করে দিয়েছিল। এখানে ইয়াযীদ-বিন মুয়াবীয়া (রাঃ)-কে খলিফা নির্বাচনের বায়ত সমস্যা নিয়ে যে সকল অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেছে, তা উল্লেখ করলেই মূল ব্যাপারটা অনুধাবন করা সহজ হয় যে, কি অবস্থায় তার বায়ত হয়েছিল।

হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) সিরিয়ার জনসাধারণের থেকে ইয়ায়ীদের জন্য বায়ত (স্বীকৃতি) নেয়ার পরে হিজাজবাসীদের থেকে যে কোন প্রকারে ইয়াযীদের খেলাফতের জন্য সায়াদ-বিন আবু আক্কাস (রাঃ) এর উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে বহুবিধ চেষ্টা তদবীর চালাবার পর এ কাজে সফলতা লাভ করতে পারলো না। অতঃপর মুয়াবীয়া (রাঃ) নিজে বহু ধন-সম্পদ ও লোক-লস্কর নিয়ে মক্কায় গিয়ে সেখানের নেতৃবৃন্দকে ডেকে এনে তাদেরকে সম্মোধন করে বললেন ঃ

"আমি তোমাদের সাথে যে ব্যবহার করি এবং যেরূপ আমি তোমাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি রাখি, সে বিষয় তোমরা অবশ্যই অবগত আছো। ইয়াযীদ হচ্ছে তোমাদেরই ভাই এবং তোমাদের চাচার ছেলে। আমার ইচ্ছা যে খলিফার আসনে তাকে নামে মাত্র বসিয়ে দাও। বাস্তব ক্ষেত্রে খেলাফতের সমুদয় কাজ যথা কাহাকেও কোন পদে বসিয়ে দেয়া বা পদচ্যুত করা, ট্যাক্স ও খাজনা উসুল করা এবং ধন সম্পদ বন্টন করার সমুদয় কাজ তোমাদের হাতেই থাকবে। মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর এ কথায় জবাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রাঃ) বললেন– নবী করীম (সাঃ) খেলাফতের ব্যাপারে যে পথ গ্রহণ করেছিলেন, আপনার সেই পথ গ্রহণ করা উচিত। অর্থাৎ তিনি এমন লোকের জন্য অসিয়াত করে গিয়েছিলেন, যে তার খান্দানের লোক নয় অথবা– হযরত ওমর (রাঃ)-এর ন্যায় খেলাফতের জন্য এমন ছ'ব্যক্তিকে নিয়ে একটি পরামর্শ বোর্ড করা উচিত যার ভিতর আপনার কোন আত্মীয়-স্বজন থাকবে না।

আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রাঃ)-এর ভাষণ শুনে মুয়াবিয়া (রাঃ) ক্রোধে জ্বলে উঠলেন এবং বললেন, "তোমাদের সামনে আর কোন পথ আছে কি?" ইবনে জুবাইর (রাঃ) উত্তর করলেন না– দ্বিতীয় আর কোন পথ নেই। মুয়াবিয়া (রাঃ) অন্যান্য লোকদের পানে ফিরে জিজ্ঞেস করলো এ ব্যাপারে তোমরা কি

বলো? তারা উত্তর করলেন– আমরা সকলে জুবাইর (রাঃ)-এর কথার সাথে একমত। অতঃপর মুয়াবিয়া (রাঃ) তাদেরকে ধমক দিয়ে বললেন ঃ

"যে ব্যক্তি তোমাদেরকে এ কথা জানিয়েছে সে নিজের জন্য পথও খুঁজে নিয়েছে। আমি তোমাদের নিকট যে প্রস্তাব উত্থাপন করলাম তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সকলের সামনে তা প্রত্যাখ্যান করলো। সুতরাং এখন আমি তোমাদের সামনে এমন একটি কথা বলার জন্য দণ্ডায়মান হয়েছি যে, যদি কোন ব্যক্তি সে কথার জবাবে একটি বাক্যও ব্যবহার করে, তবে দ্বিতীয়বার তার কোন কথা শুনবার পূর্বে আমি তার দেহ থেকে মস্তক পৃথক করে ফেলবো। এখন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ প্রাণ বাঁচাবার চিন্তা করুক।"

এর পর যা কিছু হয়েছিল তা হচ্ছে এই যে, মুয়াবিয়া (রাঃ) দেহরক্ষী বাহিনীর কমাণ্ডার হিজাজের সে সকল নেতৃবৃন্দের জন্য দু দু'জন ফৌজ মোতায়েন করেছিলেন, যারা এ প্রস্তাবের বিরোধী ছিল। এদিকে মুয়াবিয়া (রাঃ) তার কমাণ্ডারকে এ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, এদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তিও যদি আমার সততা কিম্বা মিথ্যার ব্যাপারে মুখ থেকে একটি বাক্যও বের করে, তবে এ দু'জনে যেন তলায়ারের মুখে তাকে উড়িয়ে দেয়।" অতঃপর মুয়াবিয়া (রাঃ) মসজিদে এসে মিম্বরের উপর দণ্ডায়মান হয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ঘোষণা করলেন যে, এ সকল লোক হচ্ছে মুসলমানদের নেতৃস্থানীয় লোক এবং তাদের মধ্যে বিশিষ্টতম ব্যক্তি। তাদের মতামত ব্যতিরেকে যেমন কোন সমস্যারই সমাধান করা হয় না, তেমনি হয় না তাদের পরামর্শের পরিপন্থী কোন ফয়সালা। এরা ইয়াযীদকে খেলাফতের আসনে সমাসীন

ইবনুল আসীর-ঘটনা ৫৬ হিজরী। আমরা আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে এ বর্ণনাটিকে সত্য বলে নিরূপণ করাটাকে পছন্দ করি না। কিন্তু ইসলামের মূল ধ্যান-ধারণা পালটিয়ে দেবার হাত থেকে রক্ষা করার নিমিত্ত এতটুকু অবশ্যই বলবো যে এ বর্ণনাটি যদি সত্য হয়, তবে এটা করা ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র শাসনের নিয়ম কানুনের মূল স্বভাবের পরিপন্থী। কোন দলিল প্রমাণই এ কর্ম পদ্ধতিকে সঠিক বলে প্রমাণ করেনা। করার ব্যাপারে সম্মত হয়ে বায়ত করে নিয়েছে। তোমরাও আল্লাহর নাম নিয়ে বায়ত করো। সুতরাং সাধারণ মানুষ এ কথা শুনে তক্ষণ তক্ষণ বায়ত করে নিল।"

ইয়াযীদের হুকুমত এমন একটি বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা ইসলাম কোন ক্রমেই সমর্থন করতে পারে না। আর ইয়াযীদ লোকটি কে ছিলেন? এ লোকটি এমন একটি অবাঞ্ছিত লোক ছিল, যার সম্পর্কে আবুদল্লাহ ইবনে হানযালা (রাঃ) বলেন– "আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি যে, আমরা ইয়াযীদের বিরুদ্ধে তখনই দণ্ডায়মান হয়েছি, যখন আমাদের মনে এ ভয়ের

উদ্রেক হয়েছে যে কে জানে আসমান থেকে আমাদের উপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ হয় নাকি? এ লোকটি মা বোন ও মেয়েদেরকে এক সাথে বিবাহ করতো। মদ পান করতো এবং নামায ইচ্ছাপূর্বক ছেড়ে দিত। আল্লাহর কসম, যদি আমার সাথে অন্য কোন লোক নাও হতো, তবুও আমি একা আল্লাহর পথে অবশ্যই কোরবান হয়ে যেতাম।”

হয়তো হতে পারে যে ইয়াযীদের একজন দুশমন তার সম্পর্কে এ অতিরিক্ত বর্ণনা দিয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে ইয়াযীদ যা কিছু করেছে যেমন হযরত হোসাইন (রাঃ)-কে নির্মম ও নৃশংসভাবে হত্যা করা, আল্লাহর ঘরকে আরোদ করে রাখা এবং তার উপর পাথর নিক্ষেপ করে তার ক্ষতি সাধন করা ইত্যাকার কাজই সাক্ষ্য বহন করছে যে, ইয়াযীদের দুশমনরা তার ব্যাপারে কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত করে বলেনি। অবস্থা যাই থাকুক না কেন কোন মুসলমানের এ কথা দাবি করার সাহস হতে পারে না যে, মুসলমানদের মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈনগণ বর্তমান থাকাকালে খেলাফতের দায়িত্ব বহন করার জন্য ইয়াযীদই একমাত্র উত্তম ব্যক্তি। মূল উদ্দেশ্য ছিল হুকুমতকে উমাইয়া বংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা এবং উত্তরাধিকারীর প্রথা চালু করা। এ গতিধারা ও প্রবণতা ইসলাম ও ইসলামী জীবন পদ্ধতির অনুসারী মানুষের অন্তরে একটি হিংস্র পশুর নখ যুগলের হিংস্র থাবারই নামান্তর। আমরা এখানে এ সকল ঘটনাবলী এ জন্য পেশ করছি যেন ইসলামের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে রাজতন্ত্রের যে একটি নতুন সনদবিহীন পথের আবিষ্কার হয়েছে, এর সাথে ইসলামের এবং ইসলামের আধ্যাত্মিক প্রাণ শক্তির ও তার মৌলিক নীতিমালার সাথে আদৌ কোন সম্পর্কই নেই এ কথাটা যেন প্রকাশ হয়। আর ইসলামের রাষ্ট্র শাসন করার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার ধ্যান-ধারণা তার নিজস্ব মূল তত্ত্বানুযায়ী যে হবে তা মানুষের নিকট পরিষ্কার করে দেয়াই হচ্ছে আমার উপরি বর্ণিত আলোচনা পর্যালোচনার মূল উদ্দেশ্য।

রাষ্ট্র শাসন পদ্ধতির নমুনা

ইসলাম যখন তার প্রাথমিক যুগে যে বিরাট একটি আঘাত পেয়েছিল সে আঘাতের কারণ সন্ধানের নিমিত্ত তার গভীর তলদেশে পৌঁছিতে হলে আমাদেরকে বিভিন্ন যুগের যথা হযরত আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতের যুগ হযরত ওসমান ও মারওয়ান (রাঃ)-এর যুগ এমনিভাবে বনী উমাইয়া ও বনী আব্বাসের যুগের শাসন পদ্ধতির কিছু উদাহরণ উপস্থিত করা একান্ত আবশ্যক।

মুসলমানেরা যখন তাদের খেলাফতকে নিয়ন্ত্রণ করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর প্রতি ছেড়ে দিয়েছিলেন, তখন মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহর

দ্বীন কায়েম করা এবং তার শরীয়তকে জারী করা ব্যতীত অন্য কোন দায়িত্ব ও কর্তব্য তার নজরে ছিল না। এমনিভাবে এ পদ তার জন্য এমন সব বস্তু বৈধ করে দেয় যা সাধারণ নাগরিক থাকা কালে তার জন্য বৈধ নয়– এমন খেয়াল ও ধারণা তার মনকে কোন দিনই প্রভাবিত করতে পারে নি। অথবা এ পদে সমাসীন হবার কারণে এমন কোন অধিকার লাভ করেছে যে অধিকার তার ইতিপূর্বে ছিল না। কিম্বা সাধারণ নাগরিক থাকা কালে যে সকল দায়িত্ব তার মাথার উপর ছিল; চাই তা ব্যক্তিগত বংশগত ও পরিবারগত অথবা আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় হোক না কেন, এ পদ লাভ করার কারণে সে দায়িত্বসমূহের পালন করা তার কর্তব্যের বাহিরে, এমনি তিনি কোন দিনই ভাবেন নি। বরং খলিফা নির্বাচিত হবার পর পূর্ববৎ তিনি নিজেকে সর্বক্ষেত্রে একজন সাধারণ নাগরিকের মত মনে করতেন।

সকীফা নামক স্থানে বসে যখন তার হাতে সমস্ত নাগরিক বায়ত নিলেন, তখন সেখানে দণ্ডায়মান হয়ে তিনি তার খেলাফতের প্রথম ভাষণে বলেছিলেন– "আমার দায়িত্বকে যদি আমি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে নিয়মিত ভাবে পালন করি তবে তোমরা আমায় সাহায্য করবে। আর বাঁকা পথ গ্রহণ করলে তোমরা আমাকে সরল পথে নিয়ে আসবে। সত্যবাদীতা একটি আমানত স্বরূপ। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দুর্বল তাকে আমি শক্তিশালী মনে করি যেন আমি তার অধিকার সত্যকে অক্ষুণ্ন রেখে তার নিকট তা পৌঁছে দিতে পারি। আর যে শক্তিশালী সে আমার নিকট দুর্বল। কারণ আমি তার থেকে অধিকার আদয় করবো ইনশা আল্লাহ। যখনই আল্লাহ তায়ালা কোন জাতি আল্লাহর পথে জিহাদ করা থেকে বিমুখ হয়, তখনই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে। আর যখন কোন জাতির মধ্যে নগ্নতা অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা সাধারণভাবে প্রাসার লাভ করে তখন আল্লাহ তায়ালা সেই জাতির উপর গজব নাযিল করেন। সুতরাং আমি যতক্ষণ আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসুলের আনুগত্য মেনে চলবো, ততক্ষণ তোমরা আমার আনুগত্য করবে। আর যখন তার আনুগত্য ছেড়ে দিয়ে নফরমানির ভিতর লিপ্ত হই, তখন আমার আনুগত্য করা তোমাদের দায়িত্ব নয়।"

হযরত আবুবকর (রাঃ) মদীনা থেকে অল্প কিছু দূরে 'সখ' নামক বস্তীতে বাস করতেন। সেখানে নিজ পরিবার সহ থাকার জন্য খুব ছোট একটি সাধারণ ঘর ছিল। তিনি খলিফা হবার পরে নিজ বাড়ীর কোন পরিবর্তন সাধন করলেন না এবং সেখানে থেকে স্থানান্তরিত হলেন না। উক্ত বস্তী থেকে সকাল বিকাল পায়ে হেটে মদীনায় এসে খেলাফতের কাজ পরিচালনা করতেন। মাঝে মাঝে যদিও

তিনি একটি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে মদীনায় আসতেন কিন্তু সে ঘোড়াটি বায়তুল মালের ঘোড়া ছিল না। বরং তার নিজের ছিল। পরিশেষে খেলাফতের কাজ বহুল পরিমাণে বেড়ে যাওয়ায় এবং সর্বক্ষণ তার মদীনায় থাকার তাগিদেই তিনি স্ব বস্তী পরিত্যাগ করে মদীনায় এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন।

তার পারিবারিক জীবনের ভরণ-পোষণ এবং রোজী-রোজগারের একমাত্র মাধ্যম ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। ব্যবসা বাণিজ্যই তার আয় রোজগারের উৎস ছিল। খলিফা নির্বাচনের পর ভোরবেলা নিজ কারবারের জন্য রওয়ানা হবার ইচ্ছা পোষণ করলে মুসলমানরা বাঁধা দিয়ে বললো– আপনি খেলাফতের দায়িত্ব এবং ব্যবসা-বাণিজ্য এক সাথে পূর্ণরূপে পালন করতে পারবেন না। তখন তিনি বললেন, আয় রোজগারের অন্য কোন পথের সাথে আমি পরিচিত নই। সুতরাং আমার সংসার কিরূপে চলবে? অতঃপর লোকেরা চিন্তা ভাবনার পর তাকে তার ব্যবসা-বণিজ্য পরিত্যাগ করে এ দায়িত্ব পালনের জন্য ওয়াকফ হওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন। আর তার ঘর সংসারের ভরণ পোষণ ও ব্যয় বহনের নিমিত্ত বায়তুল মাল থেকে প্রয়োজন পরিমাণ ভাতা দানের ব্যবস্থা করলেন।

কিন্তু তার যখন ইনতেকালের সময় উপস্থিত হলো তখন তিনি জনসাধাণের ধন-সম্পদ থেকে নিজকে মুক্ত রাখার নিমিত্ত তাকওয়ার আতিশর্য্যের উঠে যা কিছু বায়তুল মাল থেকে নিয়েছেন তা হিসাব করার জন্য নির্দেশ দিয়ে তার সম-পরিমাণ মাল তার যমীন এবং অন্যান্য সম্পদ থেকে বায়তুল মালে দিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ইসলাম শাসক ও শাসিতদের অন্তরকে সর্বদা যেরূপ জাগরিত রাখার নির্দেশ দিয়েছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনা অনুভূতি দান করেছে, তার তাগিদেই তার অবস্থা এ ছিল যে, তিনি নিজেকে জন সাধারণের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনের ব্যাপারে দায়িত্ববান ও জবাবদিহি মনে করতেন। এ ব্যাপারে তিনি এতখানি মহত্বের উচ্চসীমায় উপনীত হয়েছিলেন যে, সখ্ স্থানের তার প্রতিবেশীর মধ্যে যারা গরীব দুর্বল ও সহায়হীন ছিল, তাদের বকরীর দুধ দোহন করার দায়িত্ব নিজেই নিয়েছিলেন। খেলাফতের মসনদে সমাসীন হবার পর একটি মেয়ে তাকে বললো– আপনি এখন আর আমাদেরকে বকরীর দুধ দোহন করে দিবেন না। কারণ আপনি এখন খলিফা হয়ে গেছেন। মেয়েটির করুণ কণ্ঠের কথা শুনে তিনি উত্তর করলেন– কেন দিব না? আল্লাহর কসম তোমাদের জন্য আমি তা অবশ্যই দোহন করবো।

তাই তিনি খলিফা হবার পরেও তাদের বকরী দোহন করে দিতেন। মাঝে মাঝে তিনি বকরীর মালিক উক্ত মেয়েটিকে লক্ষ্য করে বলতেন– হে মেয়ে! এ

দুগ্ধ থেকে কি মাখন বেড় করে দিব, না দুধ থেকে যাবে। কখনো সে মাখন বেড় করে দেবার কথা বলতো এবং কখনো শুধু দুগ্ধই রেখে দেবার কথা বলতো। অর্থাৎ মেয়েটি যা করতে বলতো তিনি তাকে তাই করে দিতেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে হযরত ওমর (রাঃ) মদীনার একটি অন্ধ রমণীর খেদমত ও দেখাশুনা করতেন। অতঃপর তিনি যখনই উক্ত রমণীটির নিকট যেতেন, তখনই তিনি দেখতে পেতেন যে তার প্রয়োজন সমাধা করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু কে তার প্রয়োজন পুরণ করে দিয়ে যায়, সে খবর তার জানা ছিল না। একদিন সে লোকটির খবর নেয়ার উদ্দেশ্যে নিশ্চুপে ওৎপেতে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি দেখতে পেলেন যে আবু বকর (রাঃ) এসে তার কাজ করে দিয়ে যাচ্ছে। খেলাফতের দায়িত্ব তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে নি। হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে দেখামাত্র হযরত ওমর চিৎকার করে বলে উঠলেন– আপনি! আমার প্রাণের শপথ আপনি।

এ হচ্ছে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর রাষ্ট্র শাসন করার দার্শনিক চিন্তাধারা এবং তার ধ্যান-ধারণার যৎকিঞ্চিৎ নমুনা। তারপর যখন ওমর (রাঃ)-কে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, তখনো এ একই পটভূমিকা ও দার্শনিক চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা বর্তমান ছিল। হযরত ওমর কখনো এ কথা চিন্তা করতেন না যে, তার খলিফার পদ তার অধিকারকে অধিক পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছে। বরং তিনি নিজেকে একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে চিন্তা করতেন। অবশ্য তিনি স্বীয় দায়িত্ব ও জিম্বাদারীর মধ্যে আল্লাহর শরীয়তকে সমাজ জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার দায়িত্ব অধিক পরিমাণে বাড়িয়ে নিয়েছিলেন।

বায়ত গ্রহণের পর খলিফা হয়ে তিনি জাতির উদ্দেশ্যে প্রথম ভাষণে বলেছিলেন– "আমার প্রিয় জনসাধারণ! আমি আপনাদের ভিতরকার একজন আপনাদের মতই সাধারণ মানুষ। এর চেয়ে বেশী কিছুই নয়। যদি আমি নবী করীম (সাঃ)-এর খলিফার কথা লঙ্ঘন করাটাকে অপছন্দ না করতাম, তবে কখনোই আমি এ গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করতাম না!" তিনি অন্য একটি ভাষণে বলেছেন– "তোমাদের ব্যাপারে আমার উপর এমন কতকগুলো দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, যে গুলো এখন আমি তোমাদের সামনে উল্লেখ করছি। এ সকল বিষয় তোমরা আমার থেকে হিসাব-নিকাশ ও জিজ্ঞাসাবাদ করবে। আমার পহেলা দায়িত্ব হচ্ছে যে, তোমাদের খিরাজ ও ফায়ের মালকে আইন-কানুন মত আদায় করা, আর যে ধন সম্পদ আমার নিকট এসে জমা হয়, তা যথোপযুক্ত পাত্রে ন্যায়ানুগ পন্থায় ব্যয় করা। আর দ্বিতীয় দায়িত্ব হচ্ছে তোমাদেরকে কোনরূপ ধ্বংসের মুখে ফেলে না দেয়া এবং একাধারে অধিক দিন তোমাদেরকে সীমান্তে

মোতায়েন না রাখা। আর যখন তোমরা যুদ্ধের জন্য নিজ দেশ ছেড়ে দেশ হতে দেশান্তরে চলে যাও, তখন আমার তোমাদের পরিবারের অভিভাবক হয়ে থাকা হচ্ছে আর একটি অন্যতম দায়িত্ব।

তিনি প্রায়ই এ কথা বলতেন যে, আমি আল্লাহর ধন-সম্পদকে (বায়তুল মালের সম্পদ) এতীমের সম্পদের মতো মর্যাদা দেই। যদি প্রয়োজন না হয়, তবে আমি তা থেকে অবশ্যই বিমুখ থাকবো। আর যদি প্রয়োজন হয়; তখন ন্যায়ানুগ পন্থায় তা গ্রহণ করবো।

একবার তার নিকট জিজ্ঞেস করা হলো যে, আল্লাহর মাল অর্থাৎ বায়তুল মালের অর্থ সম্পদ থেকে কি পরিমাণ অর্থ সম্পদ গ্রহণ করা বৈধ? উত্তরে তিনি বললেন যে, আমি তার থেকে আমার জন্য কি পরিমাণ অর্থ সম্পদ গ্রহণ করা বৈধ মনে করি সে বিষয় আমি তোমাদের কাছে এখনই বিবরণ দিচ্ছি। আমার জন্য শীত ও গ্রীষ্মের মওসুমে দু'টি ব্যবহারযোগ্য কাপড় গ্রহণ করা বৈধ। আর হজ্জ ও ওমরাহ্ পালনার্থে যানবাহনের সাহায্য নেয়া। আর কুরাইশ বংশের একজন মধ্যমশ্রেণী লোকের উপর তার পরিবার বর্গের ভরণ-পোষণের যে দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবে থাকে, ঠিক অনুরূপ ভোরণ পোষণ দেয়াই হচ্ছে আমার পরিবার বর্গের জন্য আমার দায়িত্ব। সুতরাং এ পরিমাণ মালই আমি বায়তুল মাল থেকে গ্রহণ করা বৈধ মনে করি। এছাড়া আমি সর্বক্ষেত্রে একজন সাধারণ মুসলমানের ন্যায়। একজন সাধারণ মুসলমান যা পাবে আমিও তাই পাবো।"

হযরত ওমর (রাঃ) তার জীবনকে এমনিভাবেই অতিবাহিত করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ সময় তিনি যে সকল বস্তু তার জন্য বৈধ করে দেয়া হয়েছিল, সে সকল বস্তু সম্পর্কেও খুব কঠোরতা অবলম্বন করতেন। তিনি রোগাগ্রস্ত হয়ে পড়লে বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তার জন্য ঔষধ স্বরূপ মধু পান করা সাব্যস্ত করলেন। তখন বায়তুল মালে একটি মাত্র মধুর ছোট ড্রাম (কাপী) ছিল। তিনি মসজিদের মিম্বরের উপর দণ্ডায়মান হয়ে জিজ্ঞেস করলেন-যদি তোমরা বায়তুল মালের এ মধুটুকু ব্যবহার করা জন্য অনুমতি দাও, তবে আমি তা ব্যবহার করতে পারি। নতুবা তা আমার জন্য হারাম। লোকেরা তখনই তা পান করার জন্য তাকে অনুমতি দিয়েছিলেন। লোকেরা হযরত ওমর (রাঃ)-কে নিজের বেলায় এমনি কঠোরতা অবলম্বন করতে দেখে তার মেয়ে উম্মুল মুমীনীন হযরত হাফসাহ (রাঃ) নিকট গিয়ে বললো যে, সে নিজের বেলায় অত্যাধিক কঠোরতা অবলম্বন করে চরম সীমায় উপনীত হয়েছে। এখন তো আল্লাহ তায়ালা জীবিকার ক্ষেত্রে প্রশস্ততা দান করেছেন। সুতরাং এ গণীমতের মাল থেকে (ফায়ে) নিজ ইচ্ছা মতো এখন নিয়ে নেয়া উচিত। মুসলমানদের তরফ থেকে এটা করা তার জন্য

পূর্ণ অনুমতি রয়েছে। এ বিষয় হযরত হাফসাহ (রাঃ) তাঁর সাথে আলোচনা করলে তিনি স্বীয় কওমের জবাবে বললেন– হে ওমরের কন্যা হাফসাহ। তুমি স্বীয় কওমের সহায়তা করলে আর স্বীয় পিতার জন্য করলে। অকল্যাণ কামনা। মনে রেখ! আমার পরিবারের জন্য আমার জান ও মালের উপর অধিকার রয়েছে। কিন্তু দ্বীন এবং আমানতী বস্তুর ব্যাপারে আমার উপর তাদের কোনই অধিকার নেই।

হযরত ওমর (রাঃ) তার নিজের জন্য জনসাধারণের মধ্যে সমতা ও ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে খুব বেশী গুরুত্ব দান করতেন। আম্মুর রিমাদ এর বছর অর্থাৎ যে বছর আরবে ভয়ঙ্কর আকারে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল এবং মানুষ অনাহারের শিকারে পরিণত হয়েছিল, সে বছর তিনি এ বলে আল্লাহর নামে শপথ নিয়েছিলেন যে, যতদিনে মানুষের জীবনে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসবে, ততদিনে তিনি গোশত এবং ঘৃত মুখে নিবেন না। এ শপথ পালনে তৈলের অভাবে তার শরীরের চামড়া শুষ্ক হয়ে কৃষ্ণ বর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কিছু দিন পর বাজারে একটি ঘৃতের ছোট ড্রাম এবং এক মশক দুগ্ধ বিক্রি হবার নিমিত্ত আনিত হলে তার একজন ভৃত্য তা চল্লিশ দীরহাম দ্বারা খরিদ করে দিয়ে হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট বললেন "এখন আল্লাহ তায়ালা আপনার শপথ পূর্ণ করেছেন। কেননা বাজারের ঘৃত এবং দুগ্ধ বিক্রি করবার জন্য আনা হয়েছে। আমি তা আপনার জন্য খরিদ করে নিয়ে এসেছি। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) তার মূল্যের কথা অবগত হয়ে বললেন মূল্য বহুত চড়া হয়ে গিয়েছে। উভয়টাই ছদকা করে দাও। আমি অত্যাধিক মুল্য দিয়ে এস্‌রাফ করে খাদ্য খাবার পক্ষপাতি নই। মাথা নত করে কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনার পর আবার বললেন, বর্তমানে জনসাধারণের উপর দিয়ে যে অবস্থা অতিবাহিত হয়ে চলছে সেই অবস্থা যদি আমার উপর দিয়ে অতিবাহিত না হয়, তবে আমি তাদের সমস্যা সঠিক রূপে কিভাবে অনুভব করবো।

তিনি যাতে করে জনসাধারণের অবস্থা সঠিক রূপে উপলব্ধি করতে পারেন, সে জন্য জনসাধারণ যে বস্তু থেকে বঞ্চিত থাকতেন সেই বস্তু থেকে নিজেকেও তিনি বঞ্চিত রাখতেন। যেমন ইতিপূর্বে তার উল্লেখিত ঘোষণা দ্বারাই পরিষ্কার বুঝা যায়। আসল কথা হচ্ছে যে, তাঁর মনের কোণায় কখনো এ ধরণের খেয়াল ও ধারণা এসে চেপে বসতে পারেনি যে রাষ্ট্রের দায়িত্ব বহন করার কারণে তিনি এমন কিছু স্বাতন্ত্র্যতা ও বাড়তি অধিকার পেয়ে গেছেন, যা থেকে অন্যান্য লোক বঞ্চিত। তিনি সর্বদাই নিজেকে একজন সাধারণ প্রজার ন্যায় মনে করতেন। যদি এ ব্যাপারে তিনি আদল ইন্‌সাফের উপর প্রতিষ্ঠিত না থাকেন, তবে তখন আর

তিনি মানুষের নিকট আনুগত্য পাবার অধিকারী থাকেন না। ইতিপূর্বে পাঠক বর্গের খেতমতে ইয়ামনী চাদরের ঘটনাটির কথা বিবৃত করেছি।

"আর এ কথাও বলেছি যে তিনি কিরূপে এটা ঘোষণা দিয়েছিলেন যে তিনি যদি আদল ইন্সাফের উপর দৃঢ়রূপে কায়েম না থাকেন, তবে তার আনুগত্য করার দায়িত্ব ও কর্তব্য জনসাধারণ থেকে রহিত হয়।" তবে এ ঘোষণাটি দ্বারা ইসলামের রাষ্ট্র শাসন পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান আমাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ে। অর্থাৎ বেইন্সাফ জালেম শাসকরা জনসাধারণের আনুগত্য পাবার অধিকারী নয়। তারা যদি আল্লাহর সার্বভৌম শাসন ক্ষমতায় বিশ্বাসীও হন তারা শরীয়াতকে সমাজের বাস্তব জীবনের প্রয়োগও করেন, তথাপিও নিজেদের বিচারের ক্ষেত্রে সঠিকরূপে ইন্সাফ না করার কারণে তিনি আর রাষ্ট্রের নাগরিকদের আনুগত্যের পাত্র থাকেন না।

তাঁর মন-মগজে ইসলামের জ্ঞান ও চেতনাবোধ এমনি আভাবে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে সর্বক্ষণ প্রতিটি পলে পলে তার অনুভূতি তার মনে বর্তমান থাকতো। একবার তিনি এক ব্যক্তির থেকে একটি ঘোড়া ক্রয় কল্লে তার মূল্য নিরূপণ করছিলেন। ঘোড়াটি পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে তিনি তার পিঠে সওয়ার হয়ে দৌড়িয়ে দেখতে গিয়ে ঘোড়াটি হোচট খেয়ে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিল।

তিনি ঘোড়াটি মালিকের হাতে প্রত্যাপর্ণ করতে চাইলে মালিক তা নিতে অস্বীকৃতি জানালো। এ বিষয়টি নিয়ে তারা উভয়ই কাজী সোরাহ্-এর আদালতে উপস্থিত হলেন। কাজী উভয় গ্রুপের দলিল প্রমাণ ও বক্তব্য শ্রবণ করার পর তিনি বললেন- "আমীরুল মুমিনীন। যে বস্তুটি আপনি ক্রয় করেছিলেন, তা নিয়ে নিন। নতুবা যে অবস্থায় ঘোড়াটি আপনি নিয়েছিলেন, সেই অবস্থায় তা ফিরৎ দিন।" হযরত ওমর বলে উঠলেন- একেই বলে ফয়সালা। অতঃপর তিনি আদল ইন্সাফের সাথে কাজী সোরাহকে বিচার করতে দেখে খুশী হয়ে কুফার প্রধান কাজীর পদে তাকে নিয়োগ পত্র দিলেন।

রাজনীতি ও রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারে হযরত ওমর (রাঃ)-এর দর্শন ও ধ্যান ধারণা যখন এই, তখন রাষ্ট্র শাসকদের নিকটতম আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের রাষ্ট্রের অন্যান্য নাগরিকদের তুলানায় আলাদা কোন মর্য়াদা ও বিশেষত্বের অধিকারী হবার কোন প্রশ্নই সৃষ্টি হতে পারে না। তাই হযরত ওমর (রাঃ)-এর ছেলে আবদুর রহমান মাদক দ্রব্য পান করলে তার প্রতি শরীয়াতের দণ্ড বিধান প্রয়োগ করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়েছিল। এ বিষয় হযরত ওমর (রাঃ)-এর ভূমিকা খুবই প্রসিদ্ধ। এমনিরূপে আমর ইবনুল আস্ (রাঃ)-এর ছেলে একজন মিসরীয় নাগরিক-এর উপর অত্যাচার করলে অবশ্যই তার কিসাস নেয়া হয়েছিল।

রাষ্ট্রের কর্মচারীদের ব্যাপারে তিনি এ নীতি গ্রহণ করেছিলেন যে, তারা নিজ নিজ পদে অধিষ্ঠিত হবার পর থেকে তাদের ধন-সম্পদ যা কিছু বর্ধিত হবে, সে ব্যাপারে তাদেরকে খলিফার নিকট জবাবদিহি ও হিসাব নিকাশ পেশ করতে হবে। কেননা এখানে মুসলমানদের ধন-সম্পদের ক্ষতি সাধন করে কিম্বা নিজের ক্ষমতাকে অপব্যবহার করে হয়তো এ সম্পদ আয় করার সম্ভাবনা রয়েছে। এ জন্য তিনি এ নীতি গ্রহণ করেছিলেন। আর কথা হচ্ছে যে, তারা অবৈধ রূপে সম্পদ অর্জন করবে কোত্থেকে। এ মৌলিক নীতিটির অধীনে যখনই তিনি কাহারো মধ্যে এ ধরণের যুক্তি সংগত কারণ দেখতে পেতেন, তখনই তিনি এক একজন কর্মচারীকে গ্রেফতার করতেন। এ নীতির তাগিদেই তিনি মিসরের গভর্ণর আমর ইবনুল আস্ এর সম্পদের অর্ধাংশ বাজেআপ্ত করে বায়তুল মাল-এ নিয়া নিয়েছিলেন। কুফার গভর্ণর সায়াদ ইবনে আবী আক্কাসের বেলাও তিনি একই ব্যবহার প্রদর্শন করেছিলেন। তখন আবু হোরায়রা (রাঃ) ছিলেন বাহরাইনের গভর্ণর হোরায়রার সম্পদ তিনি সিস করে বায়তুল মালে নিয়ে ছিলেন। এমন হযতর আবু হযরত ওমর (রাঃ) এর রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতির দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং চিন্তাধারার ও ধ্যান-ধারণার মোটামুটি কথা হচ্ছে যে রাষ্ট্রের প্রজাবর্গ ও নাগরিকবৃন্দ ধর্মীয় সীমারেখার ভিতর অবস্থান করে রাষ্ট্র নায়কদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে। তাদের সাথে অংগীকার ওয়াদা রক্ষা করবে এবং সর্বদা তাদের কল্যাণ কামনা করবে। আর রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ এবং পরিচালকগণ সর্বদা জনসাধারণ ও নাগরিক বৃন্দের সাথে করবে ইনসাফ ও সুবিচারমূলক ব্যবহার। করবে তাদের জন্য সর্বদা উন্নতি সমৃদ্ধি এবং কল্যাণ কামনা। সুতরাং হযরত ওমর (রাঃ) একজন সাধারণ নাগরিক-এর এ উক্তিটিকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। উক্তিটি এই– যদি আমরা তোমার মধ্যে কোন রূপ বক্রতা ও শরীয়াত গর্হিত কাজ হতে দেখি তবে তলোয়ার দ্বারা তা সোজা করে দিব। অর্থাৎ এ উক্তিটিকে অভিনন্দন জানায়ে তিনি এ নীতিটি সমর্থন করেছেন যে, রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিক বৃন্দের জন্য রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ ও পরিচালকদেরকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে এবং সঠিক পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত তাদের কার্যের আলোচনা সমালোচনা করার অধিকার তাদের রয়েছে। একদিন তিনি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ভাষণে বলেছিলেন যে, তোমাদের উপর আমি গভর্ণর ও কর্মচারী এ জন্য নিয়োগ করিনি যে, তারা তোমাদের গণ্ডদেশে চড় মারবে, তোমাদের মান সম্মানের উপর হস্তক্ষেপ করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করবে। বরং আমি তাদেরকে তোমাদের প্রভুর কিতাব এবং তোমাদের নবীর সুন্নত শিক্ষাদানের জন্য নিয়োগ করেছি। অতএব এখন যদি কাহারো প্রতি কোন

কর্মচারী জুলুম বা অত্যাচার করে, তবে আমার পক্ষ থেকে তার আদৌ কোন অনুমতি নেই। সুতরাং উক্ত ব্যক্তির উচিত সমস্যাটি আমার নিকট এজন্য পেশ করা যাতে আমি তার থেকে প্রতিশোধ নিতে পারি। এমনিরূপে হযরত ওমর (রাঃ) গর্ভণর ও রাজ কর্মচারীদের জন্য তাদের স্বাধীনতার সীমারেখা চিহ্নিত করে দিয়েছেন যে তা অতিক্রম করা আদৌ ঠিক হবে না। বরং জনগণের আদালত এবং আল্লাহর আদালত উভয় স্থানেই তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।

রাষ্ট্র পরিচালকের দায়িত্ব বোধের এমন প্রকট অনুভূতি হযরত ওমর (রাঃ) এর মধ্যে ছিল, যার কারণে তিনি এটা কখনোই পছন্দ করেন নি যে, তার নিজ বংশ-খাত্তাবী খান্দানের মধ্য থেকে একের অধিক আবার দ্বিতীয় একজন এ বোঝা বহন করুক। তাই তিনি পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের নিমিত্ত ছ'ব্যক্তির সমন্বয়ে যে পরামর্শ বোর্ডটি করে ছিলেন, যদিও তার মধ্যে তার ছেলে আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর নাম ছিল, তথাপি তিনি তাকে খলিফা মনোনিত না করার জন্য পরিষ্কার রূপে নিষেধ করেছেন। এ সময় তিনি যে ভাষণটি দিয়েছিলেন তা খিলাফতের ব্যাপারে তার চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণারই পরিচয় বহন করে। ভাষণটি এই–

"তোমাদের খিলাফতের দায়িত্ব আমাদের নিজেদের মাথায় নেয়ার জন্য আমরা বিন্দুমাত্র ইচ্ছুক নই। আমি নিজে তাকে ভাল মনে করেনি এবং আমার জন্য তা গ্রহণ করা ভালোও হয়নি। সুতরাং এখন আমার বংশের কাহারো জন্য তা পাওয়ার বা দিবার আশা আমি করি না। বাস্তবিক পক্ষে তা যদি কল্যাণময়ী হয়, তবে তা থেকে আমার অংশ আমি পেয়েছি। আর যদি তা খারাপ হয় তবে ওমরের পরিবার বর্গের জন্য তাই যথেষ্ট যে, তাদের মধ্যে মাত্র এক ব্যক্তিকেই তার জন্য হিসাব-নিকাশ ও জবাবদিহি করতে হবে।"

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর রাষ্ট্র শাসন পদ্ধতি

আমরা একথা নিশ্চতরূপে বলতে পারি যে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর যুগে যে কর্ম পদ্ধতি ও নিয়ম নীতি দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হতো তা হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খেলাফতের সময় কিছুটা রদ-বদল হয়েছিল। কিন্তু এ রদ-বদল হলেও ইসলামের সীমারেখার মধ্যে তিনি ছিলেন।

খেলাফতের দায়িত্ব হযরত ওসমান (রাঃ)-এর স্কন্ধে তখনই অর্পিত হয়েছিল, যখন তিনি আশীতিপর বৃদ্ধ হয়েছিলেন। আর তার এ বৃদ্ধপনার সুযোগ নিয়েই মারওয়ান ইবনুল হাকাম অসংখ্য বিষয় ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবার

পথ গ্রহণ করেছিল। হযরত ওসমানের স্বভাবের অত্যাধিক কোমলতা, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি তার অতিশয় স্নেহ ভালবাসা এ দু'টি বস্তুর প্রভাবে ও তাগিদে এমন কতকগুলো পদক্ষেপ তিনি নিয়েছিলেন, যা তার সমসাময়িক কালের বহু সাহাবায় কেরামই খারাপ মনে করতেন। তার এ পদক্ষেপগুলোর প্রভাব সমাজের উপর পতিত হয়ে পরিণামে এমন একটি ঝগড়া ও আত্মকলহের সৃষ্টি করেছিল, যা মুসলমানদের ও রাষ্ট্রীয় জীবনের ঐক্য সংহতিকে মারাত্মক আঘাত হেনে মুসলিম সমাজকে দ্বিধা বিভক্ত করেছিল। আর ইসলামের হয়েছিল অফুরন্ত ক্ষতি যা ইতিহাস কোনদিনই মুসলমানদেরকে ক্ষমা করবে না।

হযরত ওসমান (রাঃ) স্বীয় জামাতা হারেস ইবনুল হাকামকে তার বিবাহের সময় বায়তুল মাল থেকে দুই লক্ষ দীরহাম উপঢৌকন দিয়েছিলেন। ভোর বেলা বিষণ্ন হৃদয় চিন্তিত মনে বায়তুল মালের খাজাঞ্চী যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) হযরত ওসমানের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে খাজাঞ্চীর পদ থেকে রেহাই দানের জন্য দরখাস্ত করলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) তার পদ ত্যাগের কারণ অনুসন্ধানে জানতে পারলেন যে, তার জামাতাকে মুসলমানদের সম্পদ থেকে উপঢৌকন দেয়াই হচ্ছে পদ ত্যাগের মুল কারণ। তাই তিনি বিস্ময়ে বলে উঠলেন– আমি আত্মীয়তার অধিকার রক্ষা করছি বলে তুমি কাঁদছো? ইসলামী আধ্যাত্মিকতার জীবন্ত অনুভূতির অধিকারী এ লোকটি জবাব দিলেন না, আমীরুল মুমিনীন এ কারণে আমি কাঁদছি না। বরং আমি এ জন্য কাঁদছি যে, এ ধন-সম্পদ আপনি সেই খরচের পরিবর্তে নেননি, যা নবী করীম (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় আপনি করে থাকতেন। আল্লাহর কসম আপনি যদি তাকে একশত দীরহাম দান করতেন তবুও হতো। ইবনে আরকাম-এর বক্তব্য শ্রবণ করে হযরত ওসমান (রাঃ) তার প্রতি খুব রাগান্বিত হলেন। ইবনে আরকাম এমন একজন আল্লাহভীরু লোক ছিলেন, যার অন্তরে মুসলমানদের সম্পকে অবৈধভাবে খলিফাতুল মুসলেমীনের আত্মীয়দের জন্য ব্যয় করতে বিন্দুমাত্র স্থান পেলো না। তাই হযরত ওসমান তাকে লক্ষ্য করে বললেন– "আরকাম। তুমি চাবি রেখে যাও। আমি এ কাজের জন্য লোক পাবো।

হযরত ওসমান (রাঃ) এর জীবনে এমনি উদারতার দৃষ্টান্ত যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। একদিন জুবায়ের (রাঃ)-কে ছ'লাখ, তালহা (রাঃ)-কে ছ'লাখ, দীরহাম দান করেছিলেন। আর মারওয়ান ইবনে হাকামকে দান করেছিলেন আফ্রিকার খিরাজ তহবীলের আয়ের এক পঞ্চামাংশ। সাহাবায় কেরামদের একদল লোক যাদের লিডার ছিলেন হযরত আলী (রাঃ); এ কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে হযরত ওসমানের নিকট অভিযোগ উত্থাপন করলে হযরত ওসমান তাদেরকে এ

বলে জবাব দিলেন যে, আমার এমন কিছু সংখ্যক বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন রয়েছে, যাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা আমার কর্তব্য। লোকেরা তখন এ জবাব খণ্ডনে জিজ্ঞেস করলেন– হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ)-এর কি বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজন ছিল না? তারাতো কোন দিন এমন কাজ করেন নি। এর জবাবে তিনি বলেছিলেন যে, আবু বকর (রাঃ) নিজ আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে বঞ্চিত করে আল্লাহর নিকট সওয়ারের আশা রাখতেন। আর আমি তাদেরকে দান করে আল্লাহর নিকট সওয়াবের আশা পোষণ করি। হযরত ওসমানের কণ্ঠে এ জবাব শুনে তারা এই বলে রাগান্বিত হয়ে সেখানে থেকে বিদায় নিলেন যে, "আল্লাহর কসম। যদি আপনার ব্যবহার এ হয়, তবে আমরা আপনার ব্যবহারের তুলনায় তাদের ব্যবহারকেই অত্যাধিক পছন্দ করি।

এতো গেল ধন-সম্পদের কথা। রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য পদসমূহ এবং গভর্ণরীর পদসমূহের অবস্থা ছিল যে, হযরত ওসমানের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের বেলায় তা বর্ষণ হতো। তদের মধ্যে হযরত মুয়াবিয়াও শামিল ছিলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) সিরিয়া ছাড়া ফিলিস্তিন এবং হাম্‌স প্রদেশকেও তার গভর্ণরীর আয়ত্তাভূক্ত করে দিয়েছিলেন। তাকে সৈন্য বাহিনীর কমাণ্ডারীর পদও দান করেছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা হলো যে, ধন-সম্পদ এবং সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করার পর হযরত আলী (রাঃ)-এর খেলাফত কালে যাতে সে খেলাফতের দাবিদার হয়ে দণ্ডায়মান হতে পারে তার জন্য রাস্তা পরিষ্কার করার পূর্ণ সুযোগ তিনি দিয়েছিলেন। আর সেই লোকও স্থান পেয়েছিল, যাকে নবী করীম (সাঃ) নিজে প্রত্যাহার করে ছিলেন। আর তার দুই ভাই আবী সারাহও খেলাফত কালে রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য পদে সমাসীন হয়েছিলেন।

সাহাবায় কেরাম হযরত ওসমান (রাঃ)-এর এ কার্যাবলীর ভয়াবহ পরিণতির কথা চিন্তা করে এবং হযরত ওসমানকে পরীক্ষার হাত থেকে বাঁচাবার নিমিত্ত এবং ভাবীকালে যাতে ইতিহাস কলঙ্কিত না হয়, সেজন্য দৌঁড়িয়ে দৌঁড়িয়ে কেবল মদীনায় এসে উপস্থিত হতেন। কিন্তু খলিফার অবস্থা ছিল যে, অতিশয় বয়োবৃদ্ধ হওয়া এবং বার্দ্ধক্য জনিত দুর্বলতার দরুন মারওয়ানের উপর থেকে তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে নস্যাৎ হওয়া। আসল কথা হচ্ছে যে, যতদূর পর্যন্ত হযরত ওসমান (রাঃ)-এর মধ্যে ইসলামের সঠিক ভাবধারা ও প্রাণশক্তি কার্যকরি পরিদৃষ্ট হয় তাদৃষ্টে তার প্রতি কোন রূপ অভিযোগ উত্থাপন করা বা সন্দেহ পোষণ করা খুবই কষ্টকর ব্যাপার। কিন্তু তাকে যে আমরা ভুলভ্রান্তি থেকে মুক্ত ও পবিত্র মনে করবো, তাও তার চেয়ে কম দুষ্কর কথা নয়। আমাদের মতে এখানে হযরত ওসমানের ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করার একমাত্র কারণ ছিল মারওয়ানকে উজীরে আলার পদ দান করা এবং তার বার্দ্ধক্য জনিত দুর্বলতা।

একবার বহু লোক একত্রে সমবেত হয়ে হযরত ওসমান (রাঃ)-এর এ সব কার্যাবলীর কথা আলোচনা করে খলিফা হযরত ওসমানের নিকট জনসাধারণের মতামত প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে হযরত আলী (রাঃ)-কে তাদের পক্ষ থেকে নির্বাচিত করে তার নিকট পাঠালেন। হযরত আলী (রাঃ) খলিফা ওসমান (রাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন– "আমাকে জনসাধারণ তাদের মুখপাত্র হিসেবে নির্বাচন করে আপনার খেদমতে বিভিন্ন বিষয় আলাপ-আলোচনার জন্য প্রেরণ করেছেন। কিন্তু আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি যে, আমার বুঝে আসে না যে আমি আপনার নিকট কি কথা বলবো। আমার এমন কোন কথা জানা নেই, যে বিষয় আপনি ওয়াকিফহাল নন। আর আপনাকে আমি এমন কোন কথা বুঝাতেও পারি না যার প্রতি আপনার দৃষ্টি নেই আমি যা কিছু জানি আপনিও তা'ই জানেন। আপনার অবগতির পূর্বে আমি এমন কোন বিষয় অবগত নই, যে বিষয় আমি আপনাকে ওয়াকীফহাল করতে পারি। আমিই একমাত্র জ্ঞাত আর আপনি জ্ঞাত নন এমন কোন বিষয় আমার নিকট নেই। আর আপনার নিকট গোপন রেখে আমার গোচরীভূত করা হয়েছে এমন কোন বিষয়ও নেই। আপনি নবী করীম (সাঃ)-কে স্বচক্ষে অবলোকন করেছেন, তার মুখের বাক্য আপনি শুনেছেন। এমন কি তার সাহচর্য্যেও অনেক দিন কাটিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। সততা ও ন্যাপরায়ণতার দিক দিয়ে যেমন আপনার চেয়ে আবু কোহাফা বেশী ছিল না, তেমনি ছিল না আপনার চেয়ে ইবনে খাত্তাব। শ্বশুর হবার আত্মীয়তার দিক দিয়ে আপনি হচ্ছেন তাদের তুলনায় অনেক নিকটতম আত্মীয়। কোন ব্যাপারেই তারা আপনার চেয়ে অগ্রণী নয়। সুতরাং নিজের ব্যাপারে সর্বদা আল্লাহকে ভয় করা উচিত। কারণ আপনাকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে হেদায়াত দেয়ার প্রয়োজন করে না। যেমন করে না অজ্ঞানতার পথ থেকে জ্ঞানের পথের দিশা দিতে। হেদায়াতের পথ উজ্জ্বল ভাস্করের নায় দেদীপ্যমান। দ্বীনের স্তম্ভ এখনো সুপ্রতিষ্ঠিত রূপে দণ্ডায়মান। ওসমান! মনে রেখ! আল্লাহর নিকট সবচেয়ে উত্তম বান্দা হলেন সেই ইন্সাফগার খলিফা, যিনি নিজেকে হেদায়াতের পথে পরিচালনা করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছে। আর অপরকে হেদায়াতের পথ প্রদর্শন করেছেন। কোন্ সুন্নাতটিকে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং কোন্ বিদয়াতটিকে তিনি মিটিয়েছেন, তা দিবাকরের ন্যায় সুস্পষ্ট। আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, প্রত্যেকটি বস্তুই আপনার সামনে জ্বলন্তমান অবস্থায় বিরাজ করছে। সুন্নাত এখনো প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তার ঝাণ্ডা হিমলী হাওয়ার সাথে রহিয়া রহিয়া উড়ছে। যে ব্যক্তি নিজেকে হেদায়াতের পথ থেকে বিপথে নিয়ে গেছে এবং তার কারণে

অন্যান্য লোকও বিপথগামী হয়েছে, সে ব্যক্তিই হচ্ছে আল্লাহর দরবারে নিকৃষ্ট ব্যক্তি। কোন কোন উল্লেখযোগ্য সুন্নাতকে তুমি মিটিয়ে দিয়েছো। আমি নবী করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালা অত্যাচারী রাজা বাদশাহ্ ও শাসকদেরকে এমন অবস্থায় হাজীর করবেন যে, সেদিন তাদের কেউই সাহায্যকারী থাকবে না এবং তাদের ওজর-আপত্তিও শুনবার মত কেউ থাকবে না। সুতরাং তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" 'হযরত ওসমান (রাঃ) জবাবে বললেন ঃ

১. তীবরানী গ্রন্থে এ হাদিসটি চৌত্রিশ হিজরীর ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি– আমি জানি যে লোকেরা আমাকে এমনিরূপে অনেক কিছুই বলবে, যে রকম তুমি বললে। শুনো! আল্লাহর কসম। যদি আমার স্থানে তুমি হতে, তবে আমি তোমার প্রতি এত কঠোরতা প্রদর্শন করতাম এবং তোমার দোষত্রুটিও খুঁজে বেড়াতাম না। আর তোমাকে মানুষের মিথ্যা অপবাদের লক্ষ্য বস্তুতেও একাকী রেখে দিতাম না। আমি তোমার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ নিয়েও দণ্ডায়মান হতাম না যে, তুমি আত্মীয়দের প্রতি সদয় হলে কেন? গরীব ও প্রয়োজনশীল লোকদের অভাব দূর করলে কেন? আর অসহায় ভবঘুরেদেরকেও বা স্থান দিলে কেন? আর এ ধরণের লোকদেরকেও বা গভর্ণরী দিলে কেন, যাদেরকে হযরত ওমর (রাঃ) এ পদে নিয়োগ করেননি। আলী! আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি যে, তুমি কি এ কথা অবগত নও যে মুগীরাহ্ বিন শোবা এ পদে অধিষ্ঠিত আছেন। সে উত্তর করলেন– হাঁ আমি জানি।

ওসমানঃ– হযরত ওমর (রাঃ) যে তাকে গভর্ণর পদে নিয়োগ করেছিলেন সে কথাটি কি তোমার জ্ঞাত নয়?

আলীঃ–হ্যঁ–আমার জ্ঞাত আছে।

ওস্‌মান ঃ–অতঃপর আমি যদি নিকটতম আত্মীয়তার কারণে ইবনে আমের (রাঃ)-কে গভর্ণর নিয়োগ করি তবে এ জন্য আমাকে তোমরা ভৎর্সনা কর কেন?

আলী ঃ– তখনকার মূল অবস্থা কি ছিল তাই আপনাকে জানাচ্ছি। হযরত ওমর (রাঃ) যাকেই গভর্ণর নিয়োগ করতেন, তার মাথায় তার জুতা সর্বদাই থাকতো। যদি তাদের বিরুদ্ধে একটি হরফও ওমর (রাঃ) এর নিকট পৌঁছতো, তবে তৎক্ষণাৎই তিনি তাদেরকে দরবারে হাজীর হবার জন্য নির্দেশ দিতেন এবং বিষয়টির শেষ প্রান্তে উপনীত হবার পরই তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতেন। আর এ কাজটি এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা আপনি করেন না বলেই আপনার নামে এরূপ অভিযোগ উত্থাপিত হয়। বরং এ কাজ না করে আপনি আপনার আত্মীয়দের

সাথে নরম ও কোমল ব্যবহার করেন। আর আপনি অতিশয় বৃদ্ধপনার কারণে দুর্বলও হয়ে গিয়েছেন।

ওসমান ঃ– তোমাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে কি তুমি এটা করো না?

আলী ঃ– আমার সাথে তাদের নিকটতম আত্মীয়তা অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু আপনারাও তাদের চেয়ে উত্তম।

ওসমান ঃ–তুমি কি জান না যে হযরত ওমর (রাঃ) মুয়াবীয়াকে তার খেলাফতের শেষ পর্যন্ত গভর্ণর বানিয়ে রেখেছিলেন? সুতরাং আমিও তাকে গভর্ণর পদে পুনর্বহাল রেখেছি।

আলী (রাঃ) ঃ–আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি– আপনি কি এটা অবগত নন যে, ওমর (রাঃ)-এর ভৃত্য ইরফা যেরূপ হযরত ওমর (রাঃ)-কে ভয় করতো, মুয়াবিয়া হযরত ওমরকে তার চেয়ে কম ভয় করতো না?

ওসমান (রাঃ) ঃ– হাঁ আমি জানি সে হযরত ওমর (রাঃ)-কে খুবই ভয় করে চলতো।

আলী (রাঃ) ঃ–বর্তমানে অবস্থা এ পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে, মুয়াবিয়া আপনার নিকট কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করে অথবা আপনার মতামত না নিয়েই নিজ খেয়াল খুশী মতো কাজ করে। কিন্তু এ দিকে এসব কাণ্ড কারখানার কোন খবর আপনার থাকে না। অথচ সে যে লোক সমাজে এ কথা বলে বেড়াচ্ছে যে, এটা হযরত ওসমানের নির্দেশ। আর এটা আপনার গোচরীভূত করা সত্ত্বেও আপনি মুয়াবিয়ার কথার কোন প্রতিবাদ করেন না।

পরিশেষে দেশের অবস্থা এত বড় মারাত্মক ও জটিল আকার ধারণ করে ছিল, যার ফলে হযরত ওসমানের বিরুদ্ধে– বিরাট বিদ্রোহীতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। কিন্তু বিদ্রোহী দলটির মধ্যে হক্ক বাতিল ভাল মন্দ উভয়েরই সংমিশ্রণ ছিল। ইসলামী দৃষ্টিকোণ দিয়ে যদি ঘটনবলীকে বিশ্লেষণ করা হয়, তবে ইসলামী ভাবধারার আলোকে বাস্তব সমস্যাসমূহ অনুধাবনকারীর জন্য এটা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, এ বিদ্রোহ সাধারণতঃ ইসলামী ভাবধারা ও স্প্রিটের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ ছিল বৈকি? এ কথার পর আমরা এটাও অনবহিত নই যে এ বিদ্রোহের পিছনে "ইবন সাবা" ইয়াহুদীর গোপন কারসাজী কর্মরত ছিল। তার প্রতি আল্লাহর গজব নাযিল হোক।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর দিক দিয়ে আমরা এ ওজর পেশ করি যে খেলাফতের দায়িত্ব শেষ বয়সে এমন অবস্থায় তার উপর ন্যাস্ত হয়েছিল, যখন উমাইয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে ফেলেছিল। আর তখন বয়সও হয়েছিল প্রায় আশি বছরের কাছাকাছি। যার কারণে তিনি

খেলাফতের ভারসাম্য রক্ষা করতে সমর্থ হননি। তখন তার অবস্থা ঠিক এ-ই ছিল যা তার অন্তরঙ্গ বন্ধু হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন– যদি আমি আমার ঘরে বসে থাকি, তবে সে বলবে যে তুমি আমাকে আমার আত্মীয়-স্বজন এবং আমার দাবি ও অধিকারকে ভুলিয়ে রেখেছো। আর যদি আমি তার সাথে কথাবার্তা বলি, তবে তিনি তার মনে যা চাইতো তাই বলতেন। মারওয়ান নিজ খেয়াল-খুশীমত যা ইচ্ছা তার থেকে তাই করিয়ে নিত। নবী করীম (সাঃ) এর সোহবতে বহু দিন অতিবাহিত করে বৃদ্ধ হবার পর সে পূর্ণরূপেই তার নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে গিয়েছিল। সে যেদিক ইচ্ছে সে দিকই তাকে নিয়ে যেত।

ইসলামের তৃতীয় খলিফার আশীতিপর বৃদ্ধপনার যুগে এ প্রগতিশীল উন্নয়নকারী জাগমান দ্বীনটির পরিচালনার হালটি উমাইয়া সম্প্রদায়ের হাতে চলে যাওয়ার পরিণতি এ হয়েছিল যে, তার বাস্তব-কর্মধারা তার দার্শনিক শিক্ষাসমূহের মৌলিক বুনিয়াদের উপর দীর্ঘ সময় দৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান থাকারও সুযোগ লাভ করা সম্ভব হয়েছিল না।

হযরত ওসমান (রাঃ) দীর্ঘ দিন যাবৎ খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত থাকার ফলে উমাইয়া সম্প্রদায়ের শক্তি সাহস বহুগুণে বেড়ে গিয়েছিল। তারা সিরিয়া সহ অন্যান্য দেশে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও প্রভুত্ব দৃঢ়ভাবে কায়েম করার সুযোগ পেয়েছিল। উপরন্তু হযরত ওসমান (রাঃ)-এর রাজনৈতিক পলিসির ফলে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা সমৃদ্ধির শীর্ষ চুড়ায় উপনীত হয়ে সম্পদ অধিকগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিল। আর তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার ফলে মুসলিম জাতির মূল ভিত্তিকে সম্পূর্ণরূপে প্রাথমিক যুগের ন্যায় অতিশয় দুর্বল ও টলটলায়মান অবস্থার রেখেছিল।

তৎকালীন যুগের ইতিহাস এবং বাস্তব অবস্থা এ দ্বীনের যে সৌন্দর্য ও মহত্ত্বের প্রমাণ বহন করে তার সাথে সাথে মানুষের জীবন রাষ্ট্র আর শাসকবর্গ এবং রাষ্ট্রের নাগরিকদের অধিকারের বেলায় মানুষের ধ্যান-ধারণায় একটি বিরাট বিবর্তনেরও সন্ধান দেয়। অবশ্য যে ফেৎনা ফাসাদ ও বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তার ভয়াবহতা এবং তার সুদুর প্রসারী মারাত্মক প্রভাবের গুরুত্ব কোন অংশে কম ছিল না।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর পরিবর্তি যুগ

হযরত ওসমান (রাঃ) পরপারের যাত্রি হবার পর পরই কার্যতঃ উমাইয়াদের বংশীয় হুকুমত কায়েম হয়েছিল। হবে না কেন? তাদের রাষ্ট্র কায়েম হবার উপকরণ ও মাল মাশল্লা তিনিই তো সংগ্রহ করে দিয়েছেন। সমগ্র দেশে বিশেষ করে সিরিয়ায় তাদেরকে শিকর গেড়ে বসবার সুযোগ তিনি দিয়ে ছিলেন। তিনি বনী উমাইয়াদেরকে তাদের নীতি ও কর্ম পদ্ধতিসমূহ যা সম্পূর্ণরূপে

ইসলামের পরিপন্থী ছিল যেমন গণীমতের মাল মুনাফা এবং অন্যান্য ধন-সম্পদকে নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা এবং ভ্রাতৃত্ব পরোপকার এবং সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতির ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন করা ইত্যাদি অকর্ম করার সুযোগ দিয়েছিলেন।

আর এ বিষয়টাই মুসলিম জাতির ভিতর ধর্মীয় ভাবধারা ও আধ্যাত্মিক প্রাণ শক্তিকে খুব দুর্বল করে দিয়েছিল। খলিফা তার আত্মীয়-স্বজনকে সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্য দান, তাদেরকে লাখ লাখ টাকা বখশীশ করা নবী করীম (সাঃ)-এর দুশমনদেরকে গভর্ণর নিয়োগ করার জন্য তার সাহাবাদেরকে অপসারণ করা; ইত্যাদি কার্যাবলীর প্রতিবাদে জনসাধারণের মনে কখনো ঠিক কখনো অঠিক রূপে তার প্রতি যে উত্তেজনা ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়েছিল তার গুরুত্বও কম নয়। হযরত আবুজার (রাঃ)-এর মত একজন মহান সাহাবীর প্রতি শুধু এ কারণেই কঠোরতা প্রদর্শন করেছিল যে, তিনি ধনাগারে সম্পদ পূঞ্জীভূত করে রাখার এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিদের আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতার মধ্যে ডুবে থাকার বিরোধীতা করতেন। অথচ হযরত আবুজার (রাঃ) সেই দাওয়াত নিয়েই দণ্ডায়মান হয়েছিলেন, যে দাওয়াত নবী করীম (সাঃ) মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে থাকতেন। এ ধরণের বিদ্বেষ ও উত্তেজনা দেশময় সাধারণভাবে ব্যাপৃত হয়ে পড়লে তার স্বাভাবিক পরিণতি ঠিক হোক বা ভুল হোক এটাই হয় যে কিছু লোকের মধ্যে বিদ্রোহের দাবানল রহিয়া রহিয়া ধুমায়িত হতে থাকে। আর কিছু সংখ্যক লোকের মধ্যে এমন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় যাদের অন্তর ইসলামী ভাবধারার আলোক ছটায় উৎভ্রাসিত। তারা এহেন ব্যাপারে নীরবতার ভূমিকাকে গুনাহ মনে করে এবং তার বিরুদ্ধে মানবিক চেতনাবোধ তাদেরকে বিদ্রোহ করার জন্য প্রেরণা যোগাইয়ে উদ্বেলিত করে। আর যারা ইসলামই শুধু একটি বহির্গত আবরণী পোশাকের ন্যায় ঝুলিয়ে রেখেছে এবং দুনিয়ার চিন্তা যাদেরকে নিজের পিছনে পিছনে টানিয়ে চলছে, আর যারা বাতাসের গতি পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজেদের গতি পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত থাকে-এমন লোকদের স্বভাবও পাল্টিয়ে যায় এবং খারাপ কাজের দিকে তারা ঝুঁকে পড়ে। এ ধরণের সব কিছুই হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খেলাফতের শেষভাগে দেখা গিয়েছিল।

হযরত আলী (রাঃ) খেলাফতের আসনে আমীন হলেন বটে, কিন্তু তার জন্য খুব তাড়াতাড়ি দেশের অবস্থায় একটি বিবর্তন আনা সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খেলাফত কালে যারা স্বার্থ কুড়াবার কাজে ব্যস্ত ছিল, বিশেষ করে উমাইয়ারা, তারা এ কথা ভালরূপেই অনুধাবন করতে পেরেছিল যে, আলী (রাঃ) তাদের বেলায় একেবারে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকবে না। সুতরাং তারা

নিজেদের স্বার্থের খাতিরে স্বাভাবিকভাবেই মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর দলে গিয়ে ভীড় জমালো।

রাষ্ট্রের শাসকবর্গ এবং জনসাধারণ দ্বিতীয়বার যাতে ইসলামের রাষ্ট্র শাসনের মূল ধ্যানধারণা ও চিত্রটি সবার সামনে সমভাবে তুলে ধরতে পারে। সেই মিশন নিয়েই আলী (রাঃ) দণ্ডায়মান হয়েছিলেন।

তাঁর অবস্থা ছিল এই যে, তার স্ত্রী নিজ হস্ত দ্বারা তৈয়ারী খাদ্যই হতো তার খানা। একবার একটি যবের বস্তার মুখ বন্ধ দেখে তিনি বলেছিলেন- আমি সেই খাদ্য দ্বারা আমার উদর পুর্তি করাকে পছন্দ করি যা পবিত্র ও হালাল হওয়া সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। কখনো এমনো হতো যে, নিজের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত স্বীয় তলোয়ার বিক্রয় দিতে হতো। তিনি কুফার শাহী বালাখানা "কছরুল আবইয়াজকে" নিজের থাকার অবস্থান নির্বাচন করার পরিবর্তে সেই জীর্ণ শীর্ণ পর্ণ কুটিরকেই থাকার স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন, যেখানে গরীব লোকেরা বসবাস করতো। তিনি কি ধরণের জীবনযাপন করতেন সে বিষয় ওক্‌বা বিন আল কামারের উদ্ধৃতি দিয়ে নজর ইবনে মানছুর (রাঃ) যে বর্ণনাটি দিয়েছেন তার প্রতি লক্ষ্য করলেই অনেকটা অনুমান করা যায়। তিনি বলেন- আমি একবার হযরত আলী (রাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলাম যে, দুর্গন্ধযুক্ত দুধ যা টক হয়ে গিয়েছে এবং শুকনো রুটির টুকরা তার সামনে খাবার জন্য রাখা হয়েছে। আমি বললাম আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি এ ধরণের খাদ্য খেয়ে থাকেন? তিনি জবাব দিলেন- রাসুলে করীম (সাঃ) এর চেয়েও রুক্ষ শুকনো খাদ্য খেতেন এবং মোটা কাপড় পরিধান করতেন। তিনি নিজ পোশাকের পানে ইশারা করে বললেন- আমি যদি তার মত না চলি, তবে সন্দেহ হচ্ছে যে, তার সঙ্গী হবার সৌভাগ্য আমার হবে না। হারুন বিন আনতারা তার পিতার উদ্ধৃতি দিয়ে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাতেও এ একই ধরণের কথা বলা হয়েছে। তিনি বলেছেন- আমি খওরনায় হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য গিয়েছিলাম, তখন ছিল শীতের মওসুম। তার শরীরে মাত্র একখানা ছিরা কতীফা বস্ত্র ছিল, যার দ্বারা শীত নিবারণ হতো না। শীতের প্রচণ্ড প্রকোপে তিনি থর থর করে কাঁপতে ছিলেন। আমি বললাম আমীরুল মুমেনীন! আল্লাহ্ তায়ালাতো আপনার এবং আপনার পরিবারের লোকদের জন্য এ মালের উপর কিছুটা অধিকার দন করেছেন। আপনি নিজের বেলায় এ রকম করেছেন কেন? তিনি উত্তর করলেন- আল্লাহর কসম আমি তোমাদের ক্ষতি করতে চাই না। এই যে কতিফা দেখছো, এটা আমি মদীনা থেকে নিয়ে এসেছি।

ধর্ম যে তাকে এর চেয়ে অনেক কিছু বেশী গ্রহণ করার অনুমতি দেয় হযরত

আলী নিজের বেলায় এবং তার পরিবার পরিজনের বেলায় এ ধরণের আচরণ করার সময় সে সত্য থেকে একেবারে অনবহিত ছিলেন তেমন নয়। আর তিনি নিজেকে সর্বপ্রকার আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাস থেকে বঞ্চিত করে রুক্ষ শুকনো রুটি খেয়ে মোটা কাপড় পরিধান করতঃ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করে একজন সাধকরূপে জীবন-যাপন করাটাকেও জরুরী মনে করতেন।

তিনি এটাও ভালরূপে অবগত ছিলেন যে সেই সময়ও মুসলমানদের একজন সাধারণ ব্যক্তি হিসেবে বায়তুল মাল থেকে তার অংশ যা তিনি নিয়ে থাকতেন তাদের থেকে কতগুণ বেশী ছিল? আর একজন শাসক হিসেবে যিনি সাধারণ মানুষের খেদমতের জন্য নিজেকে ওয়াক্‌ফ করেন তার অংশ তার তুলনায় কত বেশী ছিল সে বিষয়ও তিনি বেশ ওয়াকিফহাল ছিলেন। তিনি যদি ইচ্ছে করতেন তবে হযরত ওমর (রাঃ) বিভিন্ন দেশের গভর্ণরদের জন্য যে পরিমাণ ভাতা নির্দিষ্ট করেছিলেন, তৎপরিমাণ ভাতা তিনি বায়তুল মাল থেকে নিতে পারতেন। হযরত ওমর (রাঃ) আম্মার-বিন-ইয়াসার (রাঃ)-কে কুফার গভর্ণর নিয়োগের সময় তার এবং তার সহকর্মীদের জন্য মাসিক ছয় শত দীরহাম ভাতা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। আর সাধারণ মানুষের ন্যায় যে বখশীশ তার নিকট আসতো, তা ছিল স্বতন্ত্র। এ ছাড়া দৈনিক একটা বকরীর অর্ধাংশ এবং এক বস্তা আটার অর্ধাংশ দেয়া হতো। এমনিভাবে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে কুফার জনসাধারণকে তালিম দেয়ার উদ্দেশ্য "বায়তুল মাল"- এর এক চতুর্থাংশ ভাতা নির্দিষ্ট করে দিয়ে সেখানে প্রেরণ করেছিলেন। আর ওসমান বিন হানিফের জন্য বাৎসরিক বখশীশ ছাড়া যার পরিমাণ ছিল আনুমানিক পাঁচ হাজার দীরহাম, মাসিক দেড়শত দীরহাম এবং দৈনিক এক চতুর্থাংশ বক্‌রী নির্দষ্টি করে দিয়েছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) নিজের বেলায় যা কিছু করেছেন, তা তিনি এ সকল বিষয় থেকে অজ্ঞাতসারে করেন নি। আসলে তিনি এ কথা ভালরূপেই জানতেন যে, শাসকবর্গ জনসাধারণের জন্য আদর্শের একটি বিমূর্ত প্রতীক হয়। জনসাধারণ তার কার্যকলাপই অনুসরণ করে। আর তার প্রতি সন্দেহ পোষণ করারও যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। কারণ "বায়তুল মাল" তার নিয়েন্ত্রণেই থাকে। সুতরাং সেখানে সম্পদ আত্মসাৎ করার সম্ভাবনা থাকাটা স্বাভাবিক ব্যাপার এবং এ ব্যাপারে মানুষের সন্দেহ পোষণ করাটাও বিচিত্রের কিছু নয়। এ ছাড়া খলিফাতো দেশের জনসাধারণ এবং তার নিয়োগ কৃত গভর্ণরের জন্য তাক্‌ওয়া পরহেজগারীর বেলায় অনুসরণীয় হন। ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তিনি নিজের বেলায় এতখানি সহনশীলতার পরিচয় দিতেন। রাসুলে করীম (সাঃ) এবং তাঁর পরিবর্তে খরিফাদ্বয় রাষ্ট্রের আইন-কানুন নিয়ম শৃঙ্খলাকে যে ছাঁচে

ঢালাই করে রাষ্ট্রকে পূর্নবিন্যাস করতঃ সুসংহত ও সুসংগঠিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি তার নিজস্ব যুদ্ধের ঢালটি একজন খ্রীস্টানের নিকট দেখতে পেয়ে তাকে ধরে কাজী সোরায়েহ এর নিকট উপস্থিত করলেন। আর একজন সাধারণ নাগরিকের ন্যায় উক্ত লোকটির বিরুদ্ধে একটি মোকাদ্দমা দায়ের করে এ বলে তার প্রতি অভিযোগ আনয়ন করলেন যে এ ঢালটি নিশ্চিতরূপে আমার ঢাল। আমি এ ঢাল তার নিকট যেমন বিক্রয় করিনি অনুরূপ করিনি তাকে দান। কাজী সোরায়েহ খ্রীস্টান ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞেস করলেন যে, আমিরুল মুমিনীন যা কিছু বলছেন সে বিষয় তোমার কি বক্তব্য আছে? খ্রীস্টান ব্যক্তি বললো– ঢালটি তো অবশ্যই আমার ঢাল। তবে আমীরুল মুমিনীনও আমার নিকট মিথ্যাবাদী লোক নন। সোরায়েহ হযরত আলী (রাঃ) কে বললেন– এ ঢালটি যে আপনার তার কোন দলিল প্রমাণ আছে কি? যদি থেকে থাকে তবে পেশ করুন। হযরত আলী (রাঃ) স্মিত হেসে বললেন– সোরায়েহ ঠিক বলেছে, আমার নিকট দলিল প্রমাণ থেকেও নেই। সুতরাং হযরত আলী (রাঃ) কোন দলিল প্রমাণ পেশ করতে পারলো না। তখন তিনি ঢালটি খ্রীস্টান লোকটিকে দিয়ে দিবার নির্দেশ দিলেন। সে তা নিয়ে পথ অতিক্রম করেছিল। আর আলী (রাঃ) তার পানে তাকিয়ে নিরিক্ষে দেখছিলেন। কিছু দুর অগ্রসর হবার পর খ্রীস্ট্রান ব্যক্তি কাজীর নিকট প্রত্যাবর্তন করে বললো– আমীরুল মুমিনীন আমাকে কাজীর সামনে পেশ করলো। আর কাজী সাহেব তার বিরুদ্ধে রায় দিলেন আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি এটাই হচ্ছে নবীদের বিধান। এ বলে লোকটি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবার উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করলো– আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু। আর বললো আমীরুল মুমিনীন। এ ঢালটি আপনার; যখন আপনি সিফ্ফিনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন আমি আপনার সৈন্য বাহিনীর পিছু পিছু চলছিলাম। এ ঢালটি আপনার বাদামী রং-এর উষ্ট্রটির পৃষ্টের উপর থেকে পড়ে গিয়েছিল। আর আমি তখন তা নিয়েছিলাম। হযরত আলী (রাঃ) বললেন– যখন তুমি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছো, তখন এ ঢাল তোমারই। আমার নেয়ার প্রয়োজন নেই।

হযরত আলী (রাঃ) তার বায়ত গ্রহণের পর যে সারগর্ভ ভাষণটি তিনি উপস্থিত জনতার সামনে দিয়েছিলেন, সেই ভাষণটি ছিল তাঁর দেশ শাসনের মূলনীতি। ভাষণটি হচ্ছে এই ঃ

"হে উপস্থিত লোকেরা! আমি তোমাদের মধ্যেরই একজন মানুষ। তোমাদের জন্য যে অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে, আমার জন্যও রয়েছে সেই একই

অধিকার। আর তোমাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয় সেই দায়িত্বই আমার উপরও অর্পিত হয়। আমি তোমাদেরকে তোমাদের নবীর প্রদর্শিত পথে পরিচালনা করবো। আর যে আইন-কানুন প্রয়োগ করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা আমি তোমাদের প্রতি অবশ্যই জারী করবো। মনে রেখ! হযরত ওসমান (রাঃ) যত লোককে জায়গীরদারী দিয়াছেন এবং যত ধন-সম্পদ আল্লাহর মাল থেকে (বায়তুল মাল থেকে) মানুষকে বখশীশ ও হাদীয়া স্বরূপ দিয়েছেন তা আবার বায়তুল মালে নিয়ে আসা হবে। কেননা কোন বস্তুই আসল জিনিসকে পরিবর্তন করতে পারে না। যদি আমি দেখতে পাই যে সেই ধন-সম্পদ দ্বারা রমণীদেরকে বিবাহ করা হয়েছে অথবা তা দ্বারা দাসী ক্রয় করা হয়েছ কিম্বা বিভিন্ন দেশে তা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় গচ্ছিত রাখা হয়েছে, তথাপিও আমি তা ফিরত আনবো। কারণ আদল ইন্‌সাফের বিরাট প্রশস্ত পথ রয়েছে। যার জন্য অধিকার পাওয়ার বেলায় খুব সংকীর্ণতা ও অসুবিধা দেখা দিয়েছে, তার বেলায় জুলুম অত্যাচার করাটাও খুবই কঠিন ব্যাপার হয়।

ভাইরা আমার! স্মরণ রাখুন, তোমাদের মধ্যে যাদেরকে দুনিয়া নিজ প্রভাব দ্বারা আবেষ্টন করে ফেলেছে, বিরাট বিরাট অট্টালিকার মালিক হয়ে আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের জন্য নহর কেটেছে, ঘোড়ার পৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে মনের আনন্দে ভ্রমণ করছে। আর দাস-দাসী রেখে তাদের দ্বারা খেদমত নিচ্ছে, তাদেরকে আমি যখন তাদের আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাস থেকে বঞ্চিত করবো এবং তাদেরকে তাদের মৌলিক অধিকারের সীমারেখার আবেষ্টনীর মধ্যে নিয়ে আসবো, তখন তারা বলবে যে, ইবনে আবু তালেব আমাদেরকে আমাদের অধিকার ও ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত রেখেছে। এমনটি যেন না হয়; অর্থাৎ তাদেরকে এ কথা বলার যেন সুযোগ না দেয়া হয়। মনে রেখ! নবী করীম (সাঃ)-এর সাহাবী মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি মনে করে যে নবী করীম (সাঃ)-এর সাহচার্য লাভের সৌভাগ্য হওয়ায় অন্যান্যদের উপর তাদের সম্মান মহত্ব ও মর্যাদা অধিক তাদের জেনে রাখা উচিত যে, এ মান-সম্মান মহত্ব ও গৌরব কাল আল্লাহর দরবারে কাজে আসবে, তিনি তাদেরকে সওয়াব দান করবেন (আমার নিকট তার কোনই মূল্য নেই) আমার কাছে সকলে সমান।

মনে রেখ! যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসুলের দাওয়াতে লাব্বায়েক বলে সাড়া দিয়েছে। আমাদের ধর্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে আমাদের ধর্মের মধ্যে দাখিল হয়েছে। আর আমাদের কিব্‌লার পানে মনোনিবেশ

কররেছে। সে ইসলাম প্রদত্ত অধিকারসমূহ ভোগ করার যোগ্য পাত্র হয়ে তার নির্দিষ্ট কৃত সীমারেখার বাধ্য-বাধকতার অনুগামী হয়ে গিয়েছে। তোমরা সকলেই আল্লাহর অনুগত দাস। আর সম্পদও আল্লাহর সুতরাং এ ধন-সম্পদ তোমাদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করা হবে। এ ব্যাপারে কাহারো উপর কারো কোন স্বাতন্ত্র্য মর্যাদা ও প্রাধান্য নেই। মুত্তাকী লোকদের জন্য আল্লাহর দরবারে বেশ মূল্যবান প্রতিদান মওজুদ রয়েছে।"

নিজে হীন স্বার্থের বশবর্তি লোকেরা হযরত আলী (রাঃ)-এর ব্যবহারে সন্তুষ্ট হতে না পারাটা একটা স্বাভাবিক কথা। যারা স্বতন্ত্র্য ব্যবহার প্রদর্শনের অভ্যাসে অভ্যস্ত এবং সর্বদা অন্যের উপর নিজেদেরকে প্রাধান্য দানের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত থাকতো, হযরত আলী (রাঃ)-এর সমতার বিধানের ঘোষণা তাদের তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে নি। পরিশেষে তারা অন্য শিবিরে গিয়ে অর্থাৎ হযরত আলীর শুক্র শিবিরে গিয়ে যোগদান করেছিল। আর শিবিরটি ছিল উমাইয়া সম্প্রদায়ের শিবির। সেখানে তারা হক্ক ইন্‌সাফকে চিরতরে বিদায় দিয়ে নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার পূর্ণ সুযোগ পেত। আর আলী (রাঃ)-এর বক্তব্যের বিষয়ও ছিল সেটাই। যারা মুয়াবীয়া (রাঃ)-এর ভিতর কুটনৈতিকতা, বাক চাতুরতা, বিচক্ষণতা এবং দক্ষতা দেখছে, আর তা হযরত আলী (রাঃ)-এর মধ্যে না পেয়ে তাকেই শেষ পর্যন্ত মুয়াবিয়া (রাঃ)-কে সাফল্যের দ্বার তোরণে পৌঁছে দেবার মূল বস্তু বলে মনে করছে। তারা বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করনে ভুল করে থাকে। তারা হযরত আলী (রাঃ)-এর আসল মান মর্যাদার মূল্যায়ন করত পারে নি এবং পারেনি তারা মূল কর্তব্যকে সঠিকরূপে নিরূপণ করতে। হযরত আলী (রাঃ)-এর সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ কর্তব্য ছিল ইসলামের ইতিহাসকে তার আসল শক্তি ফিরিয়ে দেয়া এবং দ্বীনের ভিতর তার মূল প্রাণ শক্তিকে দ্বিতীয়বার উজ্জীবিত করে তাকে সেই কুৎসিত আবর্জনা থেকে পবিত্র করা, যা হযরত ওসমান (রাঃ) এর বৃদ্ধপনা ও দুর্বলতার যুগে উমাইয়াদের দ্বারা হয়েছিল।

এ যুদ্ধে তিনি যদি মুয়াবিয়া (রাঃ) এর মত পথ গ্রহণ করে চলতেন, তবে তার আসল উদ্দেশ্য ও মিশনই ব্যর্থ হত। আর খেলাফতের সমস্যা নিয়ে যুদ্ধে যে তিনি বিজয়ী হয়েছেন, প্রকৃত পক্ষে ধর্মীয় ক্ষেত্রে তার কোন মূল্যই থাকতো না। আলী (রাঃ) যদি আলী (রাঃ)-ই থেকে যায়। অথবা খেলাফত চলে যাবার সাথে সাথে যদি তার প্রাণও চলে যায়, তবে পরওয়া কিসের? এটা ছিল তার এমনই একটি সঠিক বুঝ ও চিন্তাধারা যা ক্ষণিক কালের জন্য তার অন্তর থেকে বিদুরীত হয়নি।

হযরত আলী (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর বনী উমাইয়াদের শাসনকাল চলছিল। যদি উমাইয়াদের সামনে হযরত ওসমান (রাঃ)-এর ঈমান তাকওয়া, পরহেজগারী এবং তার উদার আন্তরিকতা একটি বাঁধার প্রাচীর স্বরূপ দণ্ডায়মান ছিল। কিন্তু সে প্রাচীরটি এখন ধ্বসে গিয়েছে। ধর্ম বিমুখতার পথ এখন তাদের জন্য পরিষ্কার হয়েছে।

এর পর যদিও ইসলামের প্রসারতা ও উন্নতির গতিধারা ক্রমবর্দ্ধমান ভাবে প্রবাহমান ছিল। কিন্তু তার প্রাণ-শক্তি নিহিত না থাকতো এবং তার আধ্যাত্মিক শক্তির মধ্যে অপরকে প্রভাবিত করার যাদুকরী দক্ষতা না থাকতো, তবে উমাইয়াদের শাসন কালটিই তার আসল পথ থেকে বিপথে নিয়ে যাবার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তার প্রাণশক্তি সর্বদা মোকাবিলা ও প্রতিরক্ষার কাজে ব্যস্ত থেকেই শক্তি সঞ্চয় করতে লিপ্ত রয়েছে। আর বর্তমানেও টানা-হেঁচড়া এবং বিজয় লাভ করার শক্তি তার ভিতর নিহিত।

উমাইয়াদের যমানায় মুসলমানদের বায়তুল মালের সীমারেখা বেশ পরিমাণেই প্রশস্ত হয়েছিল। আর তা রাজা বাদ্‌শাহ্ আমীর উমারাহ্ দরবারের উজীর-নাজীর ও চাটুকারদের একটি গণীমতের মালে পরিণত হয়েছিল। ইসলামী ইন্‌সাফের মূল বুনিয়াদ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। শাসকবর্গ বিশেষ একটি শ্রেণীতে পরিণত হয়ে স্বতন্ত্র মর্যাদা ও আভিজাত্যের অধিকারী হয়ে বসেছিল। তাদের খাদেম খুদ্দাম এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবরা নিয়মিত হাদীয়া তোহফা পেত, স্বার্থ আদায়ের বেলায় তারা দু'হাতে লুঠতো। মোটকথা তখন খেলাফত একটি জুলুম অত্যাচার লুণ্ঠন ও স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করেছিল, যা থেকে নবী করীম (সাঃ) সুদুর ভবিষ্যতে পবিত্র থাকার জন্য তার ভবিষ্যদ্বাণীতে সাবধান করেছিলেন।

আজ আমরাও তাই দেখছি যে, চাটুকার গায়ক ও খেলোয়াড়দেরকে বিভিন্ন প্রকার বখশীশ দান করা হচ্ছে। যেমন একজন উমাইয়া বাদশাহ্ একজন দক্ষ ও পারদর্শি খেলোয়ারকে বারো হাজার দীনার দান করেছিল। একজন আব্বাসী বাদশাহ্ হারুন রশীদ ইসমাঈল বিন জামে নামক একজন গায়ককে শুধু একটি কণ্ঠস্বরের ললিত সুরের মুর্চ্ছনায় বিমোহিত হয়ে চার হাজার দীনার দান করেছিল। আর সাথে সাথে দিয়েছিল তাকে সাজ সরঞ্জামে ভরপুর একটি কারুকার্য্য খচিত সুন্দর আবাসিক অট্টালিকা। তখন অবস্থার গতিধারা এ দিকেই ধাবমান ছিল, যদিও মাঝে মাঝে এ গতিধারা থেমে যেত কিন্তু আবার তা দুর্বার বেগে প্রবাহমান হয়ে পড়তো।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ)-এর শাসনকাল

এখন আমাদের হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রাঃ)-এর খেলাফত সম্পর্কে আলোচনা করা উচিত। তার শাসনাকাল ছিল খিলাফতে ইসলামীয়ার সর্বশেষ যুগ। তিনি এমন একটি তেজস্বী উজ্জ্বল আলোক বার্তিকা ছিলেন, যিনি সমগ্র রাস্তাটি উজ্জ্বল ও আলোকময় করে তুলছিলেন। তিনি অবৈধ উপায় ও জোর-জবরদস্তী মুলক শাসন ক্ষমতাকে যার সর্বপ্রথম অধিকারী হলো সমগ্র মুসলিম জাতি, তাদের হাতে তা অর্পণ করে নিজ খেলাফত কালের উদ্বোধন করেছিলেন। কেননা সমগ্র মুসলিম জাতি স্বাধীনভাবে স্বেচ্ছায় মনের খুশীতে নিজেদের রাষ্ট্র নায়ক বা ইমামকে নির্বাচন করা তাদের জন্য একান্ত আবশ্যকীয় কাজ। সামরিক শক্তি বা উত্তরাধীকারি সুত্রে ক্ষমতায় যাওয়া এটা জনগণের ব্যক্তি স্বাধীনতা তথা মৌলিক অধিকারকে হরণ করা হয়, জোর-জবরদস্তী মূলক তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটি জিনিস চাপিয়ে দেয়া এটা জুলুম অত্যাচারের চেয়ে কোন দিক দিয়েই কম নয়। তাই হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (রাঃ) বিগত খলিফা নিজ মনোনয়ন মতে নিজের নাম ভাবী খলিফার জন্য মনোনিত হতে দেখে মসজিদের মিম্বরের উপর দণ্ডায়মান হয়ে উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন, "দেশবাসী! আমার মতামত না নিয়ে আমার প্রার্থী হওয়া ছাড়াই এবং মুসলমানদের সাথে পরামর্শ বাতিরেকেই আমার উপর খেলাফতের দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে আমাকে একটি পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছে। আমার হাতে বায়ত গ্রহণের তোমাদের গলায় জোর-জবরদস্তী করে যে তাওক ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে, আমি স্বয়ং তা উঠিয়ে নিয়ে তোমাদেরকে মুক্ত করে দিচ্ছি। এখন তোমরা তোমাদের ইচ্ছা মত স্বাধীন মতামত পোষণ করে যে কেউকে তোমরা খলিফা নির্বাচন করে নিতে পারো।"

লোকেরা হযরত ওমর (রাঃ)-এর ভাষণ শুনে সমস্বরে বলে উঠলো-আমীরুল মুমিনীন! আমরা আপনাকেই খলিফা নির্বাচন করছি। আপনার নেতৃত্বের প্রতি আমরা সকলেই খুশী। আল্লাহ তায়ালা আপনার নেতৃত্বকে কবুল করুন এটাই আমরা চাই। আপনি আমাদের হুকুম দাতা থাকবেন। এমনিরূপে তিনি রাষ্ট্রের নেতৃত্ব ও অধিনায়কত্ব সমস্যার বেলায় এ মূল নীতিটি আবার নতুন করে চালু করলেন। কেননা মুসলমানদের পারস্পরিক পরামর্শ এবং তাদের ইচ্ছা ব্যতিরেকে নেতৃত্ব ও অধিনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। এটাই হচ্ছে ইসলাম ও গণতন্ত্রের মুল কথা।

অতঃপর তিনি দেশবাসীকে সম্বোধন করে বললেন– প্রিয় দেশবাসী! আমার শাসনকাল আরম্ভ হবার পূর্বে এমন কিছু সংখ্যক শাসকবর্গ চলে গেছেন, যাদেরকে

তোমরা শুধু তোমাদের প্রতি যে জুলুম অত্যাচার চালাতো তা থেকে নিষ্কৃতি পাবার উদ্দেশ্যে তাদেরকে ভালবাসতে। মনে রেখ! যখন সৃষ্টিকর্তার নাফরমানী হতে দেখা যায়; তখন কোন সৃষ্টি জীবের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা উচিত নয়। অর্থাৎ স্রষ্টার নাফরমানী কাজে সৃষ্টির আনুগত্য করতে নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে তার আনুগত্য করা প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য ওয়াজিব। কিন্তু যিনি আল্লাহ তালার নাফরমানীতে লিপ্ত, তার আনুগত্য করা উচিত নয়। আমি যত সময় তোমাদের বেলায় আল্লাহর পথ অনুসরণ করে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবো, তখন তোমরাও আমার আনুগত্য করবে। কিন্তু যখন আমি আল্লাহ তায়ালার নাফরমানীতে লিপ্ত হয়ে আনুগত্য ছেড়ে দিব, তখন তোমাদের জন্য আমার আনুগত্য করা ওয়াজিব নয়।

শাসন ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে নিজ নিয়ন্ত্রণে আসার পর তিনি যে সব লোকেরা জমাজমি ও সহায়-সম্পদ অবৈধ উপায়ে জুলুম করে দখল করে নিয়েছিল, তাদের থেকে সেই সকল সম্পদ এনে মূল মালিকদের হাতে প্রত্যর্পণ করার কাজে মনোনিবেশ করলেন। এ কাজ তিনি নিজ থেকেই শুরু করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন– নিজের পূর্বে অন্য লোকের মাধ্যমে প্রথম আরম্ভ না করাই উচিত। সুতরাং স্বীয় দখলে যে সব সহায় সম্পত্তি ও মালামাল ছিল তা হিসাব করার পর মূল মালিক অথবা বায়তুল মালে ফেরত দিলেন। এমন কি তার নিজ হস্তে একটি আংটি ছিল। আংটিটি ওয়ালীদ পাশ্চাত্য দেশ থেকে আমদানীকৃত মাল থেকে বিনামূল্যে তাকে অর্পণ করেছিল। তাও তিনি বায়তুল মালে দিয়েছিলেন। তার নিয়ন্ত্রণাধীনে যতটি জায়গীরদারী ছিল, তাও তিনি প্রত্যপর্ণ করেছিলেন। ইমামা প্রদেশের কয়েকটি জায়গীর এবং ইয়ামন প্রদেশের মকীদস্ জাবালুল, ওয়ারস আর ফকদ ইত্যাদি জায়গীরসমূহও তার দখল ও নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল, তাও তিনি ছেড়ে দিয়ে মুসলমানদেরকে দিয়েছিলেন। শুধু মাত্র সওদায় একটি কুপ তার মালিকানায় ছিল তা তিনি নিজের উপঢৌকন লাভের সম্পদ দ্বারা খরিদ করেছিলেন। প্রতি বছর গড়ে দেড়শত দীনার তার আয় তিনি লাভ করতেন।

অতএব তিনি নিজের নিকট সঞ্চিত ধন-সম্পদ এবং জায়গীর ও জমাজমিসমূহ প্রত্যপর্ণ করার সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা ঘোষণা করার জন্য জনসাধারণকে মসজিদে জমায়েত হবার জন্য নির্দেশ দিলেন। আর নামাযের শামিল হবার ঘোষণা হবার পর মিম্বরের উপর দণ্ডায়মান হয়ে তিনি খুৎবায় ঘোষণা করলেন– "লোকেরা আমাদিগকে এমন সব বস্তু দান করেছে, যা আমাদের জন্য গ্রহণ করা ঠিক ছিল না। এ সকল সম্পদ আমার হাতে এসেছিল। আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন ব্যক্তি আমার থেকে হিসাব-নিকাশ নিতে পারতো

না। তোমরা স্মরণ রাখো। এ ধরণের দানের সকল সম্পদসমূহ আমি ফিরত দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। আর এ কাজের শুরু আমি আমার এবং আমার পরিবার বর্গের থেকেই আরম্ভ করেছি। মোজাহেম তুমি পড়া শূরু করো। এর পূর্বে সেখানে একটি থলিয়া উপস্থিত করা হয়েছিল, যার ভিতর তার নিজের ব্যক্তিগত অনেক কাগজপত্র ছিল। মোজাহেম (নাপিত) এক এক করে কাগজগুলো পড়তে আরম্ভ করলো। আর তিনি তা নিতে ছিলেন, তার ভিতর তার নিজের চুল কাটার একটি কেঁচিও পেয়েছিল। মোটকথা তিনি তার প্রতিটি কাগজ তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে রেখে দিয়েছিলেন। এরপর আসলো তার স্ত্রীর পালা। তার স্ত্রীর নিকট স্ত্রীর পিতার দেয়া একটি হিরক ছিল। তিনি তাকে বললেন– হিরকটি বায়তুল মালে ফিরত দিয়ে দাও। নতুবা তোমার থেকে আমাকে পৃথক হবার অনুমতি দাও। দু'টি পথের যে কোন একটি পথ তুমি গ্রহণ করতে পারো। এ অবস্থায় আমি আর তুমি এক ঘরে থাকবো, এটা আমি কিছুতেই পছন্দ করতে পারি না। তখন তার স্ত্রী বলে উঠলো– আমীরুল মুমেনীন। আমি আপনাকেই পেতে চাই। এ হিরকটির আর কি মূল্য আছে, আর এর দ্বারা কতটিইও বা অলংকার তৈরী হতে পারে। আমি আপনাকেই প্রাধান্য দিতেছি। অতএব হিরকটি বায়তুল মালেই জমা দেয়া হলো। ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পর ইয়াযীদ ইবনে আবদুল মালেক খলিফা হলে তিনি তার ভগ্নী ফাতেমাকে বললেন– যদি তুমি চাও, তবে আমি তোমার হিরক ফেরত দিতে পারি। এ কথার জবাবে ফাতিমা বললো, আমি ওমরের জীবদ্দশায়ই তার আশা করিনি, মনের খুশীতেই তা দিয়ে দিয়েছি। এখন তার মৃত্যুর পর তা গ্রহণ করবো, আল্লাহর কছম, এ কাজ আমার দ্বারা হতে পারে না। এ জবাব শুনার পর তিনি তা স্বীয় পরিবারবর্গ এবং সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিলেন।

হযরত ওমর বিন আবদুল আযীযের নিজের নিকট যে সব অবৈধ মালামাল ও ধন-সম্পদ ছিল, শুধু তাই ফেরত দিয়েছিলে না। বরং ঐতিহাসকিদের মতে বায়তুল মাল থেকে তিনি নিজের জন্য একটি কপর্দকও গ্রহণ করতেন না। অথচ হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এখেকে দৈনিক দুই দীরহাম করে নিজের খরচের জন্য নির্দ্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন। একদিন হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (রঃ)-কে ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) যে পরিমাণ নিতেন সেই পরিমাণ নেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলে তিনি উত্তর দিলেন– হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এর ব্যক্তিগত সম্পদ বলতে কিছুই ছিল না। আর আমার অবস্থা হচ্ছে যে আমার ব্যক্তিগত ধন-সম্পদ আমার খরচের জন্য যথেষ্ট। এরপর আর "বায়তুল মাল" থেকে নেয়ার প্রয়োজন করে না।

মারওয়ানের বংশাবলীর নিকট যে ধন সম্পদ অবৈধ উপায়ে গচ্ছিত অবস্থায় এবং তাদের দখলে ছিল, সেই সকল সম্পদ মূল মালিকের হাতে অপর্ণ করে দেয়ার নিমিত্ত তিনি তাদেরকে উৎসাহিত করেছিলেন। বর্ণিত আছে যে হামস্ দেশের একজন অমুসলিম এ কথা শুনে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের নিকট এসে বললো– আমি আপনার নিকট আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালার জন্য প্রার্থনা করছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বিষয় কি? লোকটি উত্তর করলো– আব্বাস ইবনে ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালেক আমার যমীন জোড় জবরদস্তীমূলক আমার থেকে হরণ করে নিয়েছে। এ বিষয় আল্লাহর আইন মুতাবেক আমি আপনার ফয়সালা চাই। আব্বাস সেখানে উপস্থিত ছিল। তিনি আব্বাসের নিকট বললেন এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কি? আব্বাস উত্তর করলো– এ জমি আমীরুল মুমেনীন ওয়ালিদ বিন আবদুল মালেক আমাকে দান করেছেন। সে এ বিষয় আমাকে একটি লিখিত দলিলও দিয়েছেন। তখন অমুসলিম জিম্মী লোকটির নিকট তিনি জিজ্ঞেস করলেন– এখন তুমি কি বলো? লোকটি উত্তর দিল আমীরুল মুমেনীন। আমি আপনার নিকট আল্লাহর কিতাব মুতাবিক ফয়সালার প্রার্থী। তখন ওমর (রঃ) বললেন– ওয়ালিদ বিন আবদুল মালেকের লিখিত অর্ডারের সামনে আল্লাহ তায়ালার আইনই কার্যকর করা একান্ত কর্তব্য। আব্বাস তুমি এর জমি ফিরত দিয়ে দাও। সুতরাং খলিফার নির্দেশ মুতাবিক তার জমি সে ফিরত দিয়েছিল।

ওয়ালিদ বিন আবদুল মালেকের রওহা নামে একটি ছেলে ছিল। শিশুকালে সে বাদীয়া নামক স্থানে লালিত-পালিত হয়েছিল বলে তাকে দেখতে বেদুঈনদের মতো মনে হতো। হামস শহরে কয়েকটি দোকান সম্পর্কে একটি মামলা নিয়ে কিছু লোক ওমর (রাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হলো। আসলে এ দোকানগুলো এ লোকদেরই ছিল। কিন্তু ওয়ালিদ তার ছেলের নামে এগুলো লিখে দিয়েছিলেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয তাকে দোকানগুলো মূল মালিকদেরকে দিয়ে দিবার হুকুম দিলে রওহা বললো– এ দোকানগুলো প্রাক্তন খলিফা ওয়ালিদের কৃত দলিল-দস্তাবীজ অনুযায়ী আমার মালিকানায় রয়েছে। এ কথা শুনে তিনি বললেন, দলিল দস্তাবীজে কোন কাজ হবে না। এ দোকানগুলো মালিক যে এ লোকেরাই, তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। এখন তুমি তাদের দোকান ফিরত দিয়ে দাও। অতঃপর রওহা এবং হামস-এর লোকটি সেখানে থেকে চলে আসলো। পথিমধ্যে রওহা হামসের লোকটিকে ভীতি প্রদর্শন করে খুব ধমক দিল। লোকটি ওমর (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো– আমীরুল মুমেনীন! রওহা আমাকে পথি মধ্যে খুব ধমক দিয়েছে। তখন ওমর (রাঃ) তার দেহরক্ষী

বাহিনীর সিপাহসালার কায়াব বিন হামেদকে রওহার নিকট পাঠিয়ে দিয়ে বললেন– যাও সে যদি দোকান ফিরত দিয়ে দেয়, তবে তো ভাল কথা নতুবা তার মাথা কেটে আমার নিকট উপস্থিত করো। রওহার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু একথা শুনে দরবার থেকে বাহির হয়ে খলিফার ফরমানের কথা রওহার নিকট বলল। ফরমান শুনে রওহা দিশেহারা হয়ে গেল। কায়াব উলংগ তেলোয়ার নিয়ে রওহার নিকট উপস্থিত হলে রওহা বললো– চলুন এখনই দোকান খালি করে দিই। সে উত্তর করলো, হাঁ এখনই গিয়ে দোকান খালি করে তার মালিকের হাতে ফিরিয়ে দাও। এমনিভাবে একের পর এক করে জনসধারণ তার সামনে জুলুম অত্যাচার জোর জবরদস্তীমূলক বিভিন্ন মামলা পেশ করেছিলো। জুলুম ও জোর জবরদস্তীমূলক কোন সমস্যা এমন ছিল না যে তার নিকট উপস্থাপিত হবার পর তিনি সেই সকল বিত্ত সম্পত্তি মূল মালিকের হাতে অপর্ণ করেন নি। চাই তা নিজের দখলেই থেকে থাকুক কিম্বা অপরের দখলে থেকে থাকুক, সব কিছুই তিনি ফিরত দেওয়ায়ে ছিলেন। মারওয়ানের বংশাবলীরা যে সকল বিত্ত সম্পত্তি জোর জুলুম করে দখল করে নিয়েছিলো তিনি তা সবই মূল মালিকদেরকে ফেরত দিয়েছিলেন। তিনি আকট্য কোন দলির প্রমাণ ছাড়াই এসব অত্যাচারমূলক সমসার সমাধান করে দিতেন।

এ ব্যাপারে অতি সাধারণ দলিল প্রমাণই তার যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতো। কোন মানুষের সাথে জুলুম অত্যাচার করা হয়েছে, এ কথা যখন তিনি অনুমান করতে পারতেন তখনই তিনি তার মালিকানা স্বত্ব তার হাতে পৌঁছিয়ে দিতেন। তিনি তাদের প্রতি অকাট্য দলিল প্রমাণ সংগ্রহ করার জন্য এ কারণে চাপ দিতেন না যে তিনি একথা ভাল রূপেই অবগত ছিলেন যে পূর্বেকার শাসকবর্গ তাদের প্রতি জুলুম করতো। বর্ণিত আছে যে, জোর-জুলুম করে অর্জিত বিত্ত-সম্পত্তি ও ধন-সম্পদ ফিরত দিতে গিয়ে তিনি ইরাকের বায়তুল মাল এমনিরূপে খালি করে ফেলেছিলেন যে, সিরিয়া থেকে মাল আমদানী করে সেখানের প্রয়োজন পুরণ করতে হয়েছিল।

আমবাসাহ্ বিন সায়াদ বিন আয়াস যিনি উমাইয়া বংশের একজন লোক ছিলেন, তাকে খলিফা সোলায়মান বিন আবদুল মালেক (রঃ) বিশ হাজার দীনার দান করার জন্য একটি হুকুমনামা জারি করেছিলেন। হুকুমনামাটি বিভিন্ন দফতরে ঘোরাফিরার পর তা গিয়ে সীল মোহরের দফতরে পৌঁছেছিল। সব কাজ সমাধা হয়ে শুধু দীনারগুলো হস্তান্তর করার কাজ অবশিষ্ট ছিল। ইতিমধ্যে দীনারগুলো উত্তোলন করার পূর্বেই সোলায়মানের মৃত্যু হলো। আমবাসাহ্ ছিল হযরত ওমর বিন আবদুল আযীযের একজন বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ বন্ধু। ভোর বেলা সে

ওমর (রাঃ)-এর সাথে সোলায়মান কর্তৃক দান কৃত উক্ত টাকা গুলোর সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে এসে দেখতে পেল যে, তার দরওয়াজা বন্ধ হয়েছে। উমাইয়া সম্প্রদায়ের বহুলোক নিজ নিজ সমস্যার ব্যাপারে তার সাথে আলোচনা করার জন্য ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতির জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি আমবাসাহকে দেখে মনে মনে স্থির করলেন আমার কথা বলার পূর্বে সে আমার সাথে কি ব্যবহার প্রদর্শন করে তা দেখাই ভাল কাজ হবে। আমবাসাহ্ তার নিকট উপস্থিত হয়ে বললো– আমিরুল মুমেনীন আপনার পূর্বেকার আমীরুল মুমেনীন সোলায়মান আমাকে বিশ হাজার দীনার দান করার হুকুম জারী করেছিলেন। এ হুকুমনামাটি বর্ত্তমানে সীল মোহরের দফতরে মওজুদ রয়েছে। দীনারগুলো উত্তোলন করার পূর্বেই তার ইনতেকাল হয়ে গিয়েছে। আমি মনে করি আপনি আমার প্রতি এ এহসানটি পূর্ণ হবার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করবেন। কেননা সোলায়মানের সাথে আমার যে সম্পর্ক ছিল, তার চেয়ে আপনার সাথে আমার সম্পর্ক অনেক বেশী ঘনিষ্ট। আশা করি আমার প্রতি আপনার মেহেরবানী থাকবে। সোলায়মান জিজ্ঞেস করলেন সে টাকার পরিমাণ কি? সে উত্তর করলো বিশ হাজার দীনার। হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (রাঃ) বললেন– বিশ হাজার দীনার চার হাজার মুসলমান পরিবারকে দেয়া হলে তারা তা দ্বারা যথেষ্টভাবে উপকৃত হতে পারে। আমি তা এক ব্যক্তিকে কিরূপে দিতে পারি? আল্লাহর কসম আমার দ্বারা এহেন কাজ হওয়া সম্ভব নয়।

আমবাসাহ্ বলেন, আমি ওমরের মুখে এ কথা শ্রবণ করে লিখিত হুকুম নামাটি দুরে নিক্ষেপ করে ছিলাম। ওমর (রঃ) বললেন– লেখাটি নিজের নিকট রাখতে কোন অসুবিধা নেই। সম্ভবতঃ এমন কোন শাসক তোমাদের কাছে আসবে, যারা এ সম্পদ সম্পর্কে নির্ভীক থাকবে। আর এ লিখিত হুকুম নামাটি তারা কার্যকরি করবে। সুতরাং লেখাটি আমি উঠিয়ে নিয়ে সেখান হতে বাহির হয়ে বনী উমাইয়াদের নিকট আসলাম। আমি তাদের নিকট বললাম এ ব্যাপারে এখন আমি আর কি করতে পারি? তারা আমাকে বললো যে, এ বিষয় এখন আর কোন আশা করা যায় না। তুমি এখন অন্য কোন এলাকায় বসবাস করার অনুমতি প্রার্থনা করে তার নিকট দরখাস্ত কারো। তখন আমি তার নিকট গিয়ে বললাম–আমীরুল মুমেনীন। আপনার কওমের লোকেরা দরওয়াজায় দন্ডায়মান রয়েছে! তারা পূর্বে যে ভাতা বায়তুল মাল থেকে পেত, সেই ভাতা এখনো যাতে পূর্ববৎ পেতে থাকে, তারা আপনার নিকট সেই কামনা করে। হযরত ওমর (রাঃ) জবাব দিলেন-আল্লাহর কসম, এ ধন-সম্পদের মালিক আমি নই। আর আমার দ্বারা এ ধরণের কিছু হবারও সম্ভাবনা দেখছি না। আমি বললাম, আমীরুল

মুমেনীন। এমতাবস্থায় তারা আপনার নিকট বিভিন্ন দেশে গিয়ে নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা করার অনুমতি পার্থনা করছে। তিনি উত্তরে বললেন, তারা যা ইচ্ছে, তাই করতে পারে। আমার নিকট সাধারণ অনুমতি রয়েছে। আমি বললাম এ পথ আমিও অনুসরণ করতে চাই। তিনি বললেন তোমার জন্য অনুমতি রয়েছে। তবে আমার মত হল যে, তুমি এখন অপেক্ষা করো। তোমার নিকট অনেক নগদ অর্থ সম্পদ রয়েছে। আমি সোলায়মানের পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি বিক্রয় দিতেছি। হতে পারে যে, তুমি তার থেকে কোন বস্তু খরিদ করে নিতে পারবে, তার লভ্যাংশ দ্বারা তোমার এ ক্ষতি পুরণ হতে পারে। আমবাসাহ্ বললেন-আমি সেখানে অবস্থান করলাম। আর সোলায়মানের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে একলাখ দীনার মূল্যের মাল খরিদ করে তা ইরাকে নিয়ে দুলাখ দীনার বিক্রয় করলাম। আর সেই লেখাটিও আমি হেফাজত করে রেখেছিলাম। হযরত ওমর (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর সেই লিখিত হুকুমনামাটি পরবর্তি শাসক ইয়াযীদ বিন আবদুল মালেকের নিকট উপস্থিত করলে তিনি তা আমাকে কার্যকরি করে দিয়েছিলেন।

একদিন হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (রাঃ) মারওয়ানের বংশাবলীকে ডেকে এনে জমায়েত করে তাদেরকে বললেন–ধন-সম্পদ বিষয়-সম্পত্তি এবং ইজ্জত সম্মান সব কিছু তোমাদের পাবার সৌভাগ্য হয়েছে। আমার মনে সমগ্র জাতির সম্পদের অর্দ্ধাংশ কিম্বা দুই-তৃতীয়াংশ তোমাদের হস্তগত রয়েছে। সুতরাং মানুষের ন্যায়গত স্বাত্বাধিকার যা তোমাদের হাতে রয়েছে। তা তাদেরকে তোমরা ফিরত দিয়ে দাও। তোমাদেরকে আমি এমন কাজ করতে বাধ্য করবো যা তোমরা পছন্দ করতে পারবে না, এমন কাজ করতে তোমরা আমাকে বাধ্য করো না। কিন্তু এ কথার জবাব তারা কেহই কিছু দিল না। সকলেই নিশ্চুপ রইলো। তিনি দ্বিতীয় বার জবাবের প্রার্থনা করলে, তাদের থেকে এক ব্যক্তি উঠে বললো–আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের থেকে যা কিছু বিষয়-সম্পদ লাভ করেছি, তা থেকে আমরা হাত গুটিয়ে আমাদের ছেলে সন্তানদেরকে দরিদ্রতার মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারি না এমনকি আমরা মাথা কাটিয়ে দিতে প্রস্তুত, কিন্তু এ কাজে রাজী নই। হযরত ওমর (রাঃ) জবাব দিলেন–যাদের জন্য আমি তোমাদের নিকট এই অধিকার প্রত্যর্পণের দাবী করছি, তাদেরকে সাথে নিয়ে যদি আমার বিরুদ্ধে তোমাদের দন্ডায়মান হবার সন্দেহ না থাকতো, তবে আল্লাহর কসম করে বলছি–আমি তোমাদের সকলকেই প্রহার করে ছেড়ে দিতাম। কিন্তু আমার বিদ্রোহের আশঙ্কা হচ্ছে যদি আল্লাহ তায়ালা আমাকে সুযোগ দেন তবে প্রত্যেক হকদারকে আমি তার হক পাওয়ার ব্যবস্থা করব। কিন্তু সকলের অধিকার তাদের নিজ হাতে ফিরিয়ে দেবার আশা তিনি বাস্তবায়িত করে

যেতে পারেননি। তবে মৃত্যুর পর সেই লোকেরাই মসনদে বসেছিল, যারা তার মত পথ ছেড়ে উমাইয়াদের মত পথ বেছে নিয়েছিল। পরে আব্বাসীয়া সম্পদায় আসলেও তারা বাদশাহ হয়েই খেলাফতের মসনদে বসেছিল। তাদের যুগে দেশময় ঝগড়া-ফাসাদ,কলহ-বিবাদ,মারামারি,কাটাকাটি সাধারণভাবে দেখা দিয়েছিল। মানুষ ধর্মের পথ থেকে বহু দূরে সরে পড়েছিল। কেননা উমাইয়া বাদ্শাহরা তাদেরকে যুগযুগান্তর ধরে দ্বীনের পথ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। আসল কথা হচ্ছে যে, আব্বাসীয়াদের শাসন কোন অংশেই উমাইয়াদের চেয়ে উত্তম ছিল না। তাও অমনি রূপ একটি জালেম শাহীর শাসন কাল ছিল।

রাজতন্ত্র

যেহেতু এখানে আমরা ইস্লামী রাষ্ট্রের নয়, বরং রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ইস্লামী ভাবধারা ও আধ্যাত্মিক রূপরেখার ইতিহাস বর্ণনা করতে ছিলাম। অতএব সেই ভাবধারাও আধ্যাত্মিক রূপরেখার বিকৃতি দেখা দিয়ে যে তা নিষ্ক্রিয় ও নিষ্প্রাণ হয়ে পড়েছিল, তার বাস্তব দৃষ্টান্ত পেশ করার উদ্দেশ্য রাজা বাদ্শাহদের যুগের তিনটি ভাষণ উল্লেখ করেই বিষয়বস্তুর যবনিকা টানতে চাই যা দ্বারা খোলাফায়ে রাশেদার উপরোল্লেখিত তিনটি ভাষণ এবং তার মধ্যে তুলনা করে যুগ দু'টির বিরাট পার্থক্য ও ব্যবধান অতি সহজে আমরা অনুধাবন করতে পারবো।

হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে মুয়াবীয়া সন্ধি স্থাপন করার পর কুফায় বসে জনসাধারণকে সম্বোধন করে বলেছিলেন–"হে কুফাবাসী! তোমরা কি মনে করছো যে, আমি নামায রোজা হজ্জ যাকাত ইত্যাদি কাজ সচারুরূপে সম্পন্ন করার নিমিত্ত তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছি? অথচ আমি ভালরূপেই অবগত আছি যে, তোমরা নিয়মিত নামায রোযা আদায় করো, আর যাকাত এবং হজ্জ ব্রত পালন করে থাকো! কখনও আমি এজন্য যুদ্ধ করিনি। বরং আমি তোমাদের উপর আমার শাসন ক্ষমতার প্রভূত্ব পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছি। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে সাফল্যের দ্বার প্রান্তে নিয়ে উপনীত করেছেন। মনে রাখবে! এ যুদ্ধে জান, মাল সহায়-সম্পত্তি ইত্যাদি যা কিছু ক্ষতি সাধন হয়েছে; তার কোন ক্ষতিপুরণ বা প্রতিদান কিছুই দেয়া হবে না। আর আমি যতটি শর্তের সাথে সন্ধিবন্ধ ছিলাম তা আজ আমার দু'পদতলে দাফন করে দিচ্ছি।" এমনিরূপে তিনি মদীনাবাসীকে সম্বোধন করে বলেছিলেন,– আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আমার জ্ঞাতসারে তোমাদের ভালবাসার প্রতিদান হিসেবে আমি নেতৃত্ব ও অধিনায়কত্ব লাভ করিনি।

আর আমার ক্ষমতা লাভে তোমরা সন্তুষ্টও ছিলে না। বরং তোমাদের থেকে

আমি এ তলোয়ারের বলেই তা লাভ করেছি। তোমাদের জন্য আমার স্বভাবকে আমি ইবনে কাহাফার (হযরত আবুবকর) মত ও পথের পানে চলার জন্য উৎসাহিত করেছি;–করেছি ওমরের কর্মনীতি অনুসরণ করার জন্য। কিন্তু সে তা কঠোররূপে অস্বীকার করেছে। অতঃপর আমি সে যাতে হযরত ওসমানের মহান উদারময় রাজীনীতি পছন্দ করে সে জন্যও চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। সুতরাং আমি তাকে এমন একটি পথে নিয়ে ফেলেছি, যে পথে আমার এবং তোমাদের উভয়ের জন্যই কল্যাণ রয়েছে। উদার মনোভাব নিয়ে একই থালায় মিলে মিশে খানা-পিনা করতে হবে যদিও আমি তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি নই, তথাপিও রাষ্ট্র পরিচালনার দিক দিয়ে তোমাদের জন্য উত্তম হবো।'

মনসুর আব্বাসী নিম্নলিখিত ভাষণটি তখনই দিয়েছিলেন, যখন উমাইয়াগণ শাসন ব্যবস্থার চিত্রটিকে নিজেদের ইচ্ছা মাফিক রূপদান করেছিল। এমন কি ইসলাম রাষ্ট্র ব্যবস্থার তুলানায় যে চিত্র ও রূপরেখার সাথে পরিচিত নয়, আব্বাসীয়দের যুগে উমাইয়াদের তুলনায় শাসন ব্যবস্থার রূপরেখাটি রাজতন্ত্রের একটি পবিত্রতম এবং আল্লাহর তরফ থেকে একটি সঠিক ও সৎ হবার রূপরেখা পরিবর্তন করে নিয়েছিল। সে বলেছিল–"হে আমার দেশের নাগরিকবৃন্দ। আমি আল্লাহর যমীনের উপর তাঁরই মনোনীত বাদশাহ; আমি তাঁর সাহায্য সহানুভূতি ও ক্ষমতা দানের দ্বারাই রাষ্ট্র পরিচালনা করবো। আমি তাঁর ধন সম্পদের উপর তাঁর তরফ থেকে নিয়োজিত পাহারাদার। আমি তাঁর ইচ্ছে ও মর্জি মোতাবেকেই তা ব্যবহার করি। আর তাঁর নির্দেশ অনুযায়ীই তা মানুষকে দান করি আল্লাহ তায়ালা আমাকে এ কোষাগারোর তালা স্বরূপ করে দিয়েছেন। যদি তিনি আমাকে খুলতে ইচ্ছা করেন, তবে তোমাদেরকে দান করি এবং তোমাদের মধ্যে রিযিক বন্টন করার জন্য খুলি। আর বন্ধ করার ইচ্ছা থাকলে বন্ধ করি।"

এর পর থেকেই রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি ও কর্মসূচী ইসলাম এবং তার শিক্ষার গন্ডীর সীমারেখা থেকে সম্পূর্ণরূপে বাহির হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে আরো বিকৃত রূপ নিয়ে বিরাজ করেছে।

অর্থনৈতিক কর্ম পদ্ধতি

অর্থনৈতিক বিধান ও কর্মসূচী সাধারণতঃ শাসনতন্ত্র ও শাসন ব্যবস্থারই অনুবর্ত্তি। রাজনৈতিক আদর্শের আলোকেই রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বিধান রচনা করা হয়। এছাড়া শাসনকর্তারা রাষ্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে এবং শাসকবর্গ এবং রাষ্ট্রের নাগরিকদের অধিকারের বেলায় যে দৃষ্টিভঙ্গী চিন্তাধারা এবং ধারণা পোষণ করে তাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচীও ঠিক তার আলোকেই গৃহীত হয়। নবী করীম

(সাঃ) সহ হযরত আবুবকর, ওমর, আলী (রাঃ) প্রমুখ খোলাফায়ে রাশেদার শাসন আমলে সর্বক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রক্রিয়াশীল ছিল। অর্থাৎ বিশেষ করে অর্থনীতি ক্ষেত্রে এ নীতি ছিল যে, জনসাধারণের সম্পদে মালিক হচ্ছে জনসাধারণ তথা মুসলিম সমাজ। শাসন কর্তাদের জন্য তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে এবং তাদের আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের জন্য তা থেকে কিছু গ্রহণ করা বা নেয়া তখনই বৈধ হতো যখন উক্ত সম্পদে তাদের অধিকার স্বত্ব রয়েছে বলে প্রমাণিত হতো। এমনিরূপে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাদের অধিকার ও স্বত্ব পরিমাণ তা থেকে দেয়ার জন্য শাসনকর্তাদের বাধ্য থাকতে হতো। এ ব্যাপারে কারো উপর কাউকে প্রাধান্য দানের আভাস ছিল না। এমন কি শাসক ও নাগরিকবৃন্দ এ ক্ষেত্রে সম পরিমাণই অধিকার ভোগ করতো। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর শাসনামলে এ চিন্তাধারা ও কর্মনীতিতে কিছুটা বিবর্তন সৃষ্টি হলেও সাধারণ মানুষ নিজেদের অধিকার ও স্বত্বাবলী পূর্ণরূপেই ভোগ করতো। অবশ্য বায়তুল মালের আমদানী অধিক পরিমাণে দেখা দেয়ায় মানুষের জন্য নির্দিষ্টকৃত বেতন ভাতা দেয়ার পরেও যথেষ্ট পরিমাণে সম্পদ উদ্বৃত্ত থাকতো। তাই খলিফা মনে করলেন এ উদ্বৃত্ত সম্পদ দ্বারা নিজ আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধদেরকে সাহায্য সহানুভূতি করা তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। এর পর রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা জালেম শাসকদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেলে আর কোন বাধ্য বাধ্যকতা এবং শর্ত সীমারেখা বলতে কিছুই রইলো না। শাসকেরা নিজেদেরকে কাহাকেও কিছু দান করা অথবা কাহাকে তাথেকে বঞ্চিত রাখার ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন মনে করতো। কখনো কখনো তারা ইন্সাফপূর্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও অধিকাংশ সময়ই বেইন্সাফী মূলক ব্যবহার দেখাতো। মুসলমানদের ধন-সম্পদ দ্বারা শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের সন্তান সন্ততি ও আমলাগোষ্ঠীদের ভোগ বিলাস ও আরাম আয়েশ করার অবাধ সুযোগ হয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত শাসকগোষ্ঠী এমনিভাবে বায়তুল মালের সম্পদ ব্যবহারের বেলায় ইস্লাম কর্তৃক আরোপিত সকল বিধি নিষেধ পদতলে দলিয়ে তারা সামনে অগ্রসর হতো। এ হচ্ছে তখনকার অবস্থার এটি মোটামুটি চিত্র। এখন আমরা কয়েকটি ঐতিহাসিক উদাহরণ দ্বারা তার বিশদ আলোচনা পাঠকবর্গের খেদমতে পেশ করছি।

নবী করীম (সাঃ)-এর যুগে বায়তুল মালের আয় আমদানীর যে উৎস ছিল তা হচ্ছে যাকাত স্বরূপ আদায়কৃত সম্পদ। তা মুসলমানদের বিভিন্ন প্রকার সম্পদের উপর আরোপ করা হতো। যেমন–স্বর্ণ রোপ্য বিভিন্ন প্রকার শস্য ফল ফলাদি, গৃহপালিত পশু যথা গরু, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, মহিষ ইত্যাদি। আর ব্যবসাই মালামাল সাজ-সরঞ্জাম এবং ভুসম্পদ ইত্যাদি। সাধারণতঃ এ সম্পদ

সমগ্র সম্পদের চল্লিশ ভাগের একভাগ আদায় করা হতো। এটাই হচ্ছে তা ধার্য করার মধ্যম-পরিমাণ। আর এ যাকাতের সম্পদ মাত্র নির্দিষ্টকৃত আট শ্রেণী লোকদের মধ্যে বিতরণ করা হতো। আর দ্বিতীয় উৎসটি হচ্ছে জিজিয়া। তা সেই সকল অমুসলমানদের থেকে তাদের জান মাল ও যাকাতের পরিবর্তে আদায় করা হতো, যারা তা নিয়মিত আদায়ের শর্তে মুসলমানদের সাথে সন্ধির চুক্তিতে আবদ্ধ হতে সম্মত থাকতো। তৃতীয় উৎসটি হচ্ছে ফায়ের সম্পদ, অর্থাৎ কাফের মুশরিকদের থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই বিনা পরিশ্রমে যে সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়, তাকে ফায়ের সম্পদ বলে। পবিত্র কুরআন মজীদের প্রকাশ্য ভাষ্য দ্বারা এর সমুদয় সম্পদ আল্লাহ্ তাঁর রাসুল এবং রাসুলের আত্মীয় স্বজন আর এতীম-মীসকীন এবং মুসাফিরদের জন্য নিয়োজিত করে দেয়া হয়েছে। চতুর্থ উৎস হচ্ছে গণীমতের সম্পদ। অমুসলমানদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ করার পর মুসলমানদের যে সম্পদ হস্তগত হয় তাকেই গণীমতের সম্পদ বলে। এ সম্পদের চার-পঞ্চম অংশ হচ্ছে মুজাহিদের জন্য। আর অবশিষ্ট এক অংশ ফায়ের সম্পদের ন্যায় সেই নির্দিষ্ট লোকদের বেলায় খরচ হতো। অথবা গণীমতের স্থলে অমুসলমানদের সেই যমীনের উপর আয়োপিত খেরাজ, ট্যাক্স, যা মুসলমানরা যুদ্ধ করে নিজেদের দখলে নিয়ে এসেছে. অথবা উক্ত যমীন অমুসলমানদের দখলে রেখেই তাদের সাথে খেরাজ আদায় করার চুক্তি করে নেয়া হয়েছে। যেমন হযরত ওমর (রাঃ) পারস্য দেশের জায়গা জমির বেলায় করেছিলেন। নবী করীম (সাঃ) এর যুগেও বায়তুল মালের আয় আমদানী পরিমাণে খুব বেশী ছিল না। মুহাজিররা নিজেদের ঘর-বাড়ী, সহায়-সম্পদ পরিত্যাগ করে মদীনায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আর আনসাররা তাদেরকে স্বাগতম জানিয়ে নিজেদের বাড়ী-ঘরে স্থান দিয়ে বিত্ত সম্পদে অংশীদার বানিয়ে আপন ভাইয়ের ন্যায় করে নিয়েছিলেন। তখন মুসলমানদের সংখ্যার ছিল নিতান্ত কম। খন্ডযুদ্ধসমূহ সংঘটিত হবার পূর্বে স্বেচ্ছায় আল্লাহর পথে দানকৃত অর্থ-সম্পদই ছিল বায়তুল মালের আয় আমদানী একমাত্র উৎস।

খন্ডযুদ্ধসমূহ আরম্ভ হবার পর থেকে হিজরতের দ্বিতীয় বছর হতে যাকাত আদায় ফরজ হলে বায়তুল মালে যাকাত এবং গণীমতের সম্পদ আসা শুরু হয়। গণীমতের চার-পঞ্চমাংশ মুজাহিদের মধ্যে বিতরণ করা হতো। নবী করীম (সাঃ) পরোক্ষভাবে ত্যাগ কুরবানীর শ্রম অনুযায়ী অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এদিক দিয়ে নবী করীম (সাঃ) আর একটি নীতি করেছিলেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রয়োজন মাফিক পাবে। গণীমতের সম্পদের অবশিষ্ট একাংশ যে সকল নির্দিষ্টতম লোকদের বেলায় ব্যয় করা হতো, সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে

আলোচনা করা হয়েছে। এরপর বায়তুল মালের আয়ের আর একটি নতুন পথ খুলে গিয়েছিল। তা হচ্ছে বণী নজীরদের থেকে বিনা যুদ্ধে লাভকৃত কায়ের সম্পদ। এ সম্পদ নবী করীম (সাঃ) মহাজিরদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখে দিয়েছিলেন। শুধু কেবল তিনি আন্‌সারদের মধ্য থেকে মাত্র দু'ব্যক্তিকে তার থেকে অংশ দিয়ে ছিলেন। এর পর পরই পবিত্র কুরআন মজীদে সম্পদ বিত্তবানদের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হওয়ার বিরুদ্ধে বিকেন্দ্রীয় করার নিমিত্ত এ মৌলিক নীতিটি ঘোষণা হয়েছিল।

كَيْ لَاتَكُوْنَ دَوْلَةً بَيْنَ اَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ-

"তোমাদের জন্য এ বন্টন নীতি গ্রহণ করার কারণ হলো যেন ধন সম্পদ তোমাদের ধনী শ্রেণীদের মধ্যে ঘুরাফিরা করতে না পারে। (আল কুরআন)

ইসলামের ক্রমবর্দ্ধমানশীল দেশ বিজয় এবং জমাজমির উপর আরোপিত বিধি নিষেধের ফলে বায়তুল মাল ক্রমশ-প্রশস্ত হয়ে তার আয় বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ হলো। আর পর্যায়ক্রমে মুসলমানদের সকল সম্প্রদায়ের ভিতর সমপরিমাণে সমৃদ্ধি প্রসারতা লাভ করতে লাগলো। কেননা ইসলামের নির্দিষ্টকৃত অংশ অনুযায়ী সকল লোক বায়তুল মালের আয়ের ভিতর সমান ভাগে অংশীদার ছিল।

নবী করীম (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর কিছু সংখ্যক লোক ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করে যাকাত আদায় করতে অস্বীকৃতি জানানোর সময় হযরত আবুবকর (রাঃ) যে নির্ভীক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ইতিহাসই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। তাঁর তখনকার সে নির্ভীক কঠোর ভূমিকার কথা সত্যই বিস্মৃত হবার মত নয়। তিনি তখন উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন ঃ

"আল্লাহর নামে শপথ করে জানাচ্ছি, এরা নবী করীম (সাঃ)-এর দরবারে একটি উঠের রশিও যাকাত স্বরূপ যদি দিয়ে থাকে, আর তা এখন যদি দিতে অস্বীকার করে, তবে আমি তার বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ ঘোষণা করবো।

এ ব্যাপারে তিনি ওমর (রাঃ)-এর মতের খেলাপ কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিলেন। পরে সে হযরত আবুবকরের মতবাদকে মেনে নিয়েছিলেন এবং আবু বরক (রাঃ)-এর কর্মপন্থাই যে সঠিক পথ তা তিনি ভালরূপেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু পহেলা তাঁর মত ছিল যে, এ সকল লোকেরা আন্তরিক বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সাথে কলেমায় বিশ্বাসী। এ কারণেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জায়েয নয়। তিনি তাঁর মতবাদে এত কঠোর ছিলেন যে, তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলেছিলেন আমরা এদের সাথে কিরূপে যুদ্ধ করতে পারি, যখন নবী করীম (সাঃ) এর এ হাদীসটি আমাদের সামনে বর্তমানে রয়েছে। তিনি বলেছেনঃ

"মানুষ যত সময় মনে-প্রাণে কলেমায় বিশ্বাসী হয়ে তা মুখে উচ্চারণ না করবে, তত সময় পর্যন্ত তাদের সাথে আমাকে যুদ্ধ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর যে ব্যক্তি তা স্বীকার করে সে আমার থেকে স্বীয় জানমাল নিরাপদ করে নিয়েছেন; কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গীতে তাদের উপর যে দায়িত্ব কর্তব্য অর্পিত হয় তা এর অন্তর্ভূক্ত নয়।" তাদের মনের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা আল্লাহ তায়ালার দায়িত্বে।" এ হাদীসটি শ্রবণ করার পর হযরত আবুবকর (রাঃ) পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে তাঁকে জবাব দিলেন যে "আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি–যারা নামায এবং যাকাতে মধ্যে পার্থক্য করবে তাদের সাথে আমি অবশ্যই যুদ্ধ করবো; কেননা যাকাত ধন-সম্পদের উপর আরোপিত ইসলামের একটি অধিকার তা অবশ্যই আদায় করতে হবে।"

তখন হযরত উমর (রাঃ) চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন–আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত আবুবকরের অন্তরকে যুদ্ধ করার জন্য পূর্ণরূপে নিশ্চিত করে দিয়েছেন। এখন আমিও অনুভব করতে পেরেছি যে, এ পথই হচ্ছে সঠিক পথ। এহেন কঠোর মনোভাব গ্রহণ করে হযরত আবুবকর (রাঃ) ইতিহাসের পাতায় ইসলামের অর্থনৈতিক কর্মসূচীর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতি কার্যকরি করে দেখিয়েছিলেন। অর্থাৎ সম্পদের উপর আল্লাহ তায়ালা মুসলিম রাষ্ট্রের বায়তুল মালের জন্য যে অধিকার স্বত্ব ও সীমারেখা এবং যে পরিমাণ নির্ধারিত করে দিয়েছে, তা আদায় কল্পে যুদ্ধ করা, বা কঠোরতা অবলম্বন করা ন্যায়ানুগ কাজ।

হযরত আবুবকর (রাঃ) যাকাত বাবদ আমদানীকৃত সম্পদ তার নির্দিষ্টকৃত সময়সূচীর মধ্যে ব্যয় করার বেলায়; আর খোমছ এবং অন্যান্য খাতের সম্পদ ব্যয় করণের ব্যাপারে নবী করীম (সাঃ)-এর অনুসৃত কর্মপন্থাই অনুসরণ করে চলতেন। নিজের জন্য শুধু কেবল তাই তিনি বায়তুল মাল থেকে গ্রহণ করতেন, যতটুকু পরিমাণ সম্পদ মুসলমানরা তার জন্য নির্দিষ্ট করে নির্ধারণ করে দিয়েছিল। এরপর যা কিছু অবশিষ্ট্য থাকতো, তা তিনি জেহাদের জন্য সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন কাজে ব্যয় করতেন।

হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে একটি নতুন সমস্যা নিয়ে তাঁর এবং হযরত ওমর (রাঃ)-এর মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল। হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর মত ছিল যে, সম্পদ বন্টনের বেলায় যারা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন তারা, আর পরবর্তীকালে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা এবং স্বাধীন নাগরিকবৃন্দ এবং ভৃত্য ও দাস-দাসী সকল নর-নারীদেরকে সম অধিকার সম্পন্ন নিরূপণ করে সমভাবে সকলের মধ্যে বন্টন করতে হবে। কিন্তু হরযত ওমর (রাঃ) এবং সাহাবায় কেরামদের একদল লোকের মনোভাব ছিল যে যারা ইসলাম গ্রহণের বেলায় আগ্রগামী ছিল তাদেরকে পর্যাক্রমে অগ্রাধিকার দেয়া

হোক। এ কথার জবাবে হযরত আবুবরক (রাঃ) বললেন–তোমরা যে শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের কথা আমাকে বুঝাতে চেষ্টা করছো, সে বিষয়ে আমি পূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল রয়েছি। কিন্তু এ শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব এমনই একটি বস্তু যার সওয়াব ও প্রতিদান আল্লাহ তায়ালা দান করবেন। আর এটা হচ্ছে অর্থনীতির ব্যাপার, এ বিষয় কাহাকেও প্রাধান্য দানের তুলনায় সমতার বিধান কার্যকরি করাই সবচেয়ে উত্তম পথ। বায়তুল মালে যত বেশী পরিমাণে আয় আমদানী বেড়ে চললো, ততো বেশী পরিমাণে সুখ সমৃদ্ধি মুসলমানের মধ্যে সমান হারে বেড়ে চলছিল। হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে তিনি তাঁর পূর্ব মতবাদে দৃঢ় ছিলেন। অর্থাৎ যারা নবী করীম (সাঃ) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তাদের সেই সকল লোকদের সমমান কোন ক্রমেই করা সমীচীন নয়, যারা নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে যুদ্ধে ময়দানে সহকর্মী হয়ে কাজ করেছেন।

একদিন বাহারাঈনের গভর্ণর হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বহু ধন-সম্প, ও দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে খলিফা ওমর (রা)-এর দরবারে হাজীর হলেন। তিনি নিজে বর্ণনা দিয়েছেন যে, আমি বাহরাঈন থেকে পাঁচ লাখ দীরহাম নিয়ে এসে ছিলাম। সন্ধা বেলা খলিফা ওমর (রাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললাম,–আমীরুল মুমেনীন এ ধন সম্পদ নিয়ে নিন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন–পরিমাণে কত হবে? জবাবে আমি পাঁচলাখ উল্লেখ করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন পাঁচ লাখে কত হয় বলতে পারো কি? আমি উত্তর দিলাম, হাঁ, একশত হাজার একশত হাজার-- এইরূপে পাঁচবার আমি বললাম। কিন্তু তিনি আমাকে বললেন-তোমাকে মনে হচ্ছে যেন তন্দ্রার ভিতর রয়েছো। এখন রাত্রে তুমি চলে যাও, ভোর পর্যন্ত গিয়ে নিজকে বিশ্রাম দাও। তারপর এসো। অতএব ভোরবেলা আমি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে বললেন–এ মাল তুমি এখান থেকে নিয়ে যাও। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন,–কত টাকা? জবাবে আমি পাঁচলাখ দীরহাম জানালাম। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, এ সব ন্যায় ও ইনসাফ মতো উসুল করা হয়ছে তো? আমি জবাব দিলাম–আমি তো তা জানি। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) সমগ্র মানুষের মধ্যে ঘোষণা দিলেন যে, আমার নিকট যথেষ্ট পরিমাণ সহায়-সম্পদ জমা হয়েছে। যদি তোমরা তা পাল্লা দ্বারা পরিমাপ করে নিতে চাও, তবে তাই তোমাদের জন্য করা হবে। আর গণনা করে নিতে ইচ্ছা করলেও নিতে পারো। এছাড়া ওজন করে দেবারও সুযোগ রয়েছে। তোমাদের খুশীমতই দেয়া হবে। এক ব্যক্তি দন্ডায়মান হয়ে বললো, আমীরুল মুমেনীন। সমগ্র লোকের জন্য নিয়মতান্ত্রিক ভাবে একটি রেজিষ্ট্রেশন বুক তৈয়ার করে তাতে সকলের নাম লিপিবদ্ধ করে নিন। সেই অনুযায়ী সকলের মধ্যে তা বিতরণ করুন। এ প্রস্তাবটি হযরত ওমর (রাঃ)-এর খুব মনঃপুত হলো। তিনি মোহাজিরদের জন্য মাথা পিছু পাঁচ হাজার এবং নবী করীম (সাঃ) এর পরিবার

পরিজন ও স্ত্রীগণের জন্য মাথা পিছু বার হাজার দীরহাম করে বন্টন করেছিলেন। পরিবারের প্রধানের নাম রেজিষ্ট্রেশন বইতে লেখা হয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ) যে কতিপয় লোককে কতিপয় লোকের উুপর প্রাধ্যন্য দিয়ে থাকতেন, এ নীতিটি পরিষ্কার রূপে তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই এখানে ঘটনাটির অবতারণা করা হলো। এছাড়া এ ঘটনাটির মাধ্যমে তখনকার দিনের পরিমাপ যন্ত্রের প্রাচুর্য্যের কথাও সন্ধান পাওয়া যায়। তখনকার দিনে এক মিল্লিনের অর্ধাংশকে যে কতখানি মূল্যবান মনে করতো, সে সম্পর্কে স্বর্ণকাররাই ভালরূপে বলতে পারে। তারপর ভবিষ্যতে বিরাট বিরাট বিজয় লাভ করার পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থাও সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। ইমাম আবু ইউসুফ (রাঃ) কিতাবুল খিরাজে লিখেছেন যে, আমার নিকট মদীনার একজন ওস্তাদ ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ সায়েবের তিনি যায়েদের এবং যায়েদ তার পিতার উদ্ধৃতি দিয়ে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন–আমি হযরত ওমর (রাঃ) কে বলতে শুনেছি যে, আমি সেই আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, যিনি ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপাস্য নেই–এমন কোন ব্যক্তি নেই , যার এ সম্পদের প্রতি কোন অধিকার না আছে। চাই সে কার্যতঃ তা থেকে কিছু গ্রহণ করুক বা না করুক। এর মধ্যে ভৃত্য ও দাস ব্যতীত কোন ব্যক্তির অধিকার অপর ব্যক্তির চেয়ে বেশী নয়। কিন্তু আমাদের শ্রেণী ও মর্যাদা আল্লাহ তায়ালার কিতাব এবং নবী করীম (সাঃ–-এর সাথে আমাদের বন্ধুত্বের আলোকে নিরুপণ হবে। মানুষ ইসলামের পথে যে রূপ অত্যাচার, নির্যাতন নিপীড়ন ইত্যাদি সহ্য করেছেন, এবং ইসলামের যত আগে প্রবেশ করেছে, সে দিকেও লক্ষ্য রেখে বিবেচনা করা হবে। আর ইসলাম গ্রহণ অবস্থায় মানুষ সম্পদশালী হওয়া এবং গরীব ও প্রয়োজনশীল থাকার দিকেও লক্ষ্য রাখা হবে। আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি–আমি যদি জীবিত থাকি, তবে সনয়ার পাহাড়ের উপর মেষ চারণকারীদের এ সম্পদের উপর যে অধিকার রয়েছে তা আমি তাদের চেহারা রক্তিমাবরণ হবার পূর্বেই দিয়ে দিব। এজন্য তাদের দৌড়াদৌড়ি করতে হবে না"।

বদরের যুদ্ধে যারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তিনি তাদের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বাৎসরিক পাঁচ হাজার দীরহাম ভাতা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এমনি রূপে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের ন্যায় সমমর্যাদা সম্পন্ন সেই সকল ইসলাম গ্রহণকারীদেরকে যেমন হাবসায় হিজরত কারীগণ, ওহুদের যুদ্ধের অংশ গ্রহণ কারীগণ ইত্যাদি লোকদের জন্য বাৎসরিক চার হাজার দীরহাম ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন। আর বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের ছেলেদের জন্যও করে দিয়েছিলেন প্রত্যেক কিস্তিতে দুই হাজার দীরহাম। অবশ্য হযরত হাসান (রাঃ)-দ্বয়ের জন্য নবী করীম (রাঃ)-এর সাথে একান্ত প্রিয়তম আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকার কাণে তার পিতাকে দেয় ভাতা পরিমাণ প্রত্যেকের জন্য

বাৎসরিক পাঁচ হাজার দীরহাম ঠিক করে দিয়েছিলেন। আর যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে হিজরত করেছিলেন, তাদের জন্য নির্ধারণ করেছিলেন বাৎসরিক তিন হাজার দীরহাম? মক্কা বিজয়ের সাথে সাথে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তাদের জন্য এবং মুহাজির ও আনসারদের যুবক ছেলেদের জন্য প্রত্যেক কিস্তিতে দুই হাজার করে দীরহাম নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। আর সাধারণ লোকদেরকে বখশীশ দানের বেলায় তিনি তাদের শ্রেণী কুরআন শিক্ষা এবং ইসলামের পথে জিহাদে অংশ গ্রহণ করাকে মাপকাঠি রূপে নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। সুতরাং যারা মদীনায় এসে স্থায়ীরূপে বসবাস করতো তাদের জন্য পঁচিশ দীরহাম নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। ইয়ামনবাসীদের জন্য সিরিয়া ও ইরাকীদের ন্যায় যথাক্রমে দুই হাজার, এক হাজার নয়শত, পাঁচ শত এবং তিনশত দীরহাম ভাতা ঠিক করেছিলেন। তিনশতের কম কেহই পেত না। তিনি বলেছিলেন-যদি বায়তুল মালের সম্পদে আরো আধিক্য ও প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়, তবে আমি প্রত্যেকের জন্য চার হাজার করে দীরহাম ভাতা দেবার ব্যবস্থা করবো। তিনি নিজের ব্যয়ের জন্য সফরের খাতে এক হাজার হাতিয়ার সংগ্রহের খাতে এক হাজার পরিবারের লোকজনের ভর-পোষণের জন্য এক হাজার, আর এক হাজার তার ঘোড়া ও খচ্চরদের পালন পোষণের জন্য নির্ধারিত করে বাদবাকী সকলের জন্য উপরোক্ত নিয়মে বন্টন করে দিয়েছিলেন।

সম্পদ বন্টন ও দানের বেলায় হযরত ওমর (রাঃ) যে নীতি নির্ধারণ করেছিলেন, তা কতিপয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে কার্যকরি করাকে তিনি আবশ্যক মনে করতেন না। এ সকল ব্যক্তিদেরকে তিনি তাদের সমপর্য্যায়ভূক্ত ব্যক্তিদের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে দান করতেন।

হযরত উম্মল মুমেনীন উম্মে সালমা (রাঃ)-এর পুত্র হযরত ওমর ইবনে আবু সালমা (রাঃ)-এর জন্য তিনি বাৎসরিক চার হাজার দীরহাম নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। তা দেখে মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাহস (রাঃ) অভিযোগ উত্থাপন করে আমীরুল মুমেনীন হযরত ওমর (রাঃ)-কে বললেন—আপনি কিসের ভিত্তিতে এর জন্য আমাদের চেয়ে অধিক ভাতা নির্ধারণ করে দিলেন? আমার পিতা যেমন হিজরত করেছিলেন, তেমনি বদরের যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। অতএব আমরা বেশী না পেয়ে সে বেশী পাবার কারণ কি? উত্তর হলো নবী করীম (সাঃ)-এর স্ত্রীর ন্যায় একজন ভাগ্যবতী মাতা সংগ্রহ করে নিয়ে আসুক, আমি তখন তার অভিযোগ মেনে নিব।

হযরত ওমর (রাঃ) আস্‌মা ইবনে ওমর (রাঃ)-এর জন্যও চার হাজার দীরহাম নির্ধারণ করলে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বললেন, আপনি আমার জন্য করলেন তিনি হাজার আর আসমার জন্য করলেন চার হাজার, অথচ আমি সেই সকল যুদ্ধের অংশ গ্রহণ করেছি যে যুদ্ধে আসমা ছিল না। হযরত ওমর

(রাঃ) উত্তর দিলেন, আমি তাকে এ জন্য অধিক দান করেছি যে, সে তোমার চেয়ে ও তোমার পিতার চেয়ে নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট অধিক প্রিয়পাত্র ছিলো।

এমনিভাবে খলিফা ওমর (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর স্ত্রী আসমা বিনতে আমীস (রাঃ)-এর জন্য এক হাজার দীরহাম উম্মে কুলসুম বিনতে ওকবাহ (রাঃ)-এর জন্য এক হাজার, আর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর মাতার জন্যও এক হাজার দীরহাম ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন। এ সকল রমণীদেরকে তিনি অন্যান্য রমণীদের তুলনায় এজন্য বেশী দিয়েছিলেন যে তারা সেই সকল খ্যাতনামা ব্যক্তিদের স্ত্রী ও মাতা ছিলেন যারা সমাজ জীবনে অন্যান্য লোকদের তুলনায় যথেষ্ট মানমর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী ছিল।

উপরিবর্ণিত আলোচনা দ্বারা দেখা যায় যে সম্পদ বন্টনের ব্যাপারে দু'টি মত ও পথের সৃষ্টি হয়েছিল। একটি মত ছিল হযরত আবুবকর (রাঃ) আর অপরটি ছিল হযরত উমর (রাঃ) এর। হযরত উমর (রাঃ) এর মতটির ভিত্তি হচ্ছে যে যারা রাসুলে করীম (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাদেরকে আমি সেই সকল লোকদের সমপর্যায় গণ্য করতে পারি না, যারা তার সাথে থেকে মরণপণ যুদ্ধ করেছেন।

যে ব্যক্তিকে ইসলামের পথে আসতে বিভিন্ন প্রকার দুঃখ-কঃষ্ট ও জুলুম অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়েছে তাদের প্রতিও বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখা হয়। এ নীতিটি এবং শ্রম ও মজুরীর বেলায় সমতা বিধানের মতবাদটি এতদু ভয়েরই ইসলামে একটি মজবুত ভিত্তিমূল বর্তমান রয়েছে। আর হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর মত হচ্ছে যে, মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্ত ইসলাম গ্রহণ করেছে। সুতরাং তার প্রতিদান দেয়া তারই দায়িত্ব। তিনি কেয়ামতের দিন পূর্ণরূপেই তার মর্য্যাদা দান করবেন। অতএব এ জগতে প্রয়োজন অতিরিক্ত বেশী দেয়া হয় না। এ নীতিটিরও একটি যুক্তিপূর্ণ ভিত্তি রয়েছে।

কিন্তু আমরা কোনরূপ সন্দেহ ও দ্বিধা না করে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর মতটিকেই প্রাধান্য দিতে আগ্রহী। কারণ এ নীতিটি সর্ব সাধারণ ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্য ভ্রাতৃত্য ও সৌহার্দ্যের ভাব গড়ে তুলতে অধিক ফলপ্রসু। আর সমাজ জীবনে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলা যে এ দ্বীনের নীতিমালা সমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রভেদ ও পার্থক্য সুচক নীতি দ্বারা পরিণামে যে ভয়াবহ মারাত্মক অবস্থা দেখা দেয় তাথেকে মুক্তির জন্য এ নীতিটি খুবই কার্যকরি ও কল্যাণকর নীতি। যেমন সমাজের কোন এক শ্রেণী লোকের ধন দৌলত বিত্ত সম্পদ বেড়ে যাওয়া এবং বছর বছর তার লভ্যাংশের দ্বারা আরো ক্রমান্বয় বর্ধিত হওয়া। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মুনাফার ধনে লাভ মূলধনের তুলনায় যে অনেক বেশী হয়, তা সর্বজন বিদিত একটি সত্য কথা। আর এ

নীতির সেই ভয়াবহ পরিণাম ফল হযরত ওমর (রাঃ) তার শেষ জীবনে অবলোকন করে আল্লাহর নামে শপথ করে বলেছিলেন-যদি সে আগামী বছর জীবিত থাকেন, তবে সকলের ভাতা সম পরিমাণে করে দিবেন। এখানে হযরত ওমর (রাঃ)-এর কথাটি খুবই প্রসিদ্ধ কথা। তিনি বলেছেনঃ

"ইতিপূর্বে আমি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এখন যদি দ্বিতীয়বার তা সুযোগ পেতাম, তবে ধনী বিত্তবানদের অপ্রয়োজনীয় সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে তা গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করতাম।"

কিন্তু আফ্‌সুসের কথা হচ্ছে যে, হযরত ওমর (রাঃ)-এর আয়ুষ্কাল তাকে এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছিল। আর সেই ভয়াবহ পরিণতি ফল এমনরূপে দেখা দিল যে, ইসলামী সমাজের ভারসাম্য সম্পূর্ণরূপে চুর্ণবিচুর্ণ করে দিয়েছিল। এরপর যখন মারওয়ানের স্বেচ্ছাচারীতা আরম্ভ হলো, আর হযরত ওসমান (রাঃ) তা নীরবে অবলোকন করতে ছিলেন, যার পরিণতি পরবর্তীকালে ফেৎনা ফাসাদ ও বিদ্রোহের অবলোকন প্রজ্বলিত করার পথ খোলাসা করে ছিল।

হযরত ওমর (রাঃ) মুসলমানদের মধ্য সম্পদ বন্টন এবং ভাতা নির্ধারণের বেলায় প্রভেধ ও প্রার্থক্য জনিত নীতি গ্রহণের অশুভ পরিণতি অবলোকন করে তা থেকে প্রত্যাবর্তন করে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর মতবাদকে যে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন, উপরোক্ত ভাষণ দ্বারা তাই মনে হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে হযরত আলী (রাঃ) এর মতবাদও খলিফায়ে আউয়াল হযরত আবু বকর (রাঃ)এর মতবাদের ন্যায় ছিল। প্রকাশ থাকে যে, আবু বকর ও ওমর (রাঃ) খোলাফতেই পুনরাবৃত্তি বা তৃতীয় সংস্করণ ছিল হযরত আলী (রাঃ)-এর খেলাফত কাল। কিন্তু হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খেলাফত যেখানে মাওয়ানের হুকুমই কার্যকরি ছিল, তাকে আমরা একটি অন্তঃসার শূন্য খেলাফত কাল মনে করি। মধ্যস্থানে পর্দার বেড়াজালের ন্যায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এ কারণেই এখানে আমরা হযরত আলী (রাঃ)-এর খেলাফত নিয়ে আলোচনা করার পরই হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খেলাফত নিয়ে আলোচনায় বসবো। হযরত আলী (রাঃ) সম্পদ বন্টন ও ভাতা নির্ধারণের ব্যাপারে যে সব নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তা তার খেলাফতের প্রথম দিনের ভাষনের মধ্য দিয়েই পরিস্ফুট হয়ে উঠে। তিনি বলেছিলেনঃ

"রাসুলে করীম (সাঃ) এর সাহাবাদের মধ্যে মুহাজির হোক বা আন্‌সার হোক তোমরা মন রেখ। যদি কোন ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ) এর সাহায্যে থাকার কারণে নিজেকে অন্য লোকদের তুলনায় উত্তম শ্রেষ্টত্ব ও প্রাধান্য রয়েছে বলে মনে করে, তবে তার জেনে রাখা উচিত যে শ্রেষ্ঠতঃ আগামী কাল আল্লাহর নিকটে ফলপ্রসু হবে এবং তার সওয়াবও তিনি তাকে দান করবেন। ভাল করে বুঝে নাও যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার এবং তাঁর রাসুলের আহব্বানে লাব্বায়েক বলে সারা দিয়েছে, আমাদের মিল্লাতকে সত্য মনে করে আমাদের ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে

এবং আমাদের কিবলার পানেই জীবনের গতি পরিবর্তন করে দিয়েছে, সে নিজের উপর ইসলামী দাবী ও অধিকারগুলো এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ সম্পাদনের ভার ন্যাস্ত করেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে তোমরা সকলেই আল্লাহর বান্দা এবং এই ধন-সম্পদ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সম্পদ। এ সম্পদ তোমাদের মধ্যে সমভাবে বন্টন করা হবে। এ ব্যাপারে কাহারো অন্য কাহারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য বলতে কিছু নেই। অবশ্য মোত্তাকী পরহেজগার লোকদের জন্য আল্লাহর নিকট উত্তম প্রতিদান রয়েছে।

এটাই হচ্ছে সঠিক ইসলামী নীতি, যা ইসলামের সাম্যবাদী নীতি ও আধ্যাত্মিক প্রাণ শক্তির সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। এটা ইসলামী সমাজের ভারসাম্য বহাল রাখার রক্ষাকবচ স্বরূপ। আর এর দ্বারা সম্পদ বৃদ্ধি করণের এতটুকু পরিমাণ সুযোগ পাওয়া যায়, যতটুকু পরিমাণ মেহনত মজদুরী ও শ্রম বিনিয়োগ দ্বারা বৃদ্ধি করা সম্ভব। এটা কাহাকেও লাভজনক কাজের জন্য অপরের তুলনায় অধিক পরিমাণে ধন মালের সংস্থান করতে অন্যদের থেকে বেশী সুযোগ দেয় না।

হযরত ওমর (রাঃ) শেষ জীবনে যদিও এ নীতির দিকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। কিন্তু তা কার্যকরি করার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন না। তিনি শাহাদত বরণ করার কারণে তার স্থিরকৃত এ ইচ্ছাটিই নয় বরং এ রকম দু'টি ইচ্ছাই তার অপুরণ রয়ে গিয়েছিল। একটি ইচ্ছা ছিল ধনাঢ্য ব্যক্তিদের থেকে তাদের প্রয়োজনাতিরিক্তি সম্পদ ছিনিয়ে এনে গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা। কেননা সম্পদ বন্টন ক্ষেত্রে বৈষম্য মূলক নীতি অনুসরণের পরিণতিতেই এ অধিক সম্পদ ধনীদের হাতে পুঞ্জীভূত হয়ে পড়েছিল। এর অধিকাংশ সম্পদই ছিল এ নীতি অনুসরণের বাস্তব পরিণতি ফল স্বরূপ। আর দ্বিতীয় ইচ্ছাটি ছিল সম্পদ বন্টন আর ভাতা নির্ধারণের বেলায় সমতার নীতি গ্রহণ করা। কেননা তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, ইসলামী সমাজের মধ্যে বিক্ষিপ্ততা এবং বিচ্ছিন্নতার প্রসার আরম্ভ হয়েছে তা রোধ করার উদ্দেশ্যে এবং ভবিষ্যতে যাতে এ নীতি গ্রহণ করা না হয়, তার জন্যই তিনি সাম্যবাদী নীতি প্রবর্তন করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন।

হযরত ওসমান (রাঃ) খলিফা হলেন বটে, কিন্তু তিনি এ সিদ্ধান্তকৃত বিষয় দু'টিকে কার্যকরি করাতো দুরের কথা তার পানে ভ্রূক্ষেপও করলেন না। ধনাঢ্য ব্যক্তিদের নিকট তাদের অতিরিক্ত সম্পদ রেখে দেয়া হলো। আর সম্পদ বন্টন ও ভাতা নির্ধারণের বেলায় বৈষম্যমূলক নীতিকেই বহাল রাখলেন। শুধু এতটুকুই নয় বরং মানুষকে দান করার বেলায় খুব উদার মনা ও দানশীলতার পরিচয় দিলেন। ফলে ধনী ব্যক্তিরা ক্রমান্বয়ে আরো ধনী হয়ে উঠলো, আর গরীবের ভাগ্যে মাঝে মাঝে কিছু জুটলেও তারা গরীবই রয়ে গেল। যারা অগাধ

ধন-দৌলত ও বিষয়-সম্পত্তির মালিক ছিল, তিনি কেবল সেই সকল লোকদেরকেই বিরাট অংকের সম্পদ দান করতেন। তিনি কুরাইশদেরকে তাদের জমাকৃত মূলধন দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্য করে করে আরো অধিক সম্পদ অর্জন করার জন্য অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। এ ছাড়া তিনি বড় বড় ধনীদের জন্য সওয়াদ এলাকায় অথবা অন্যান্য দেশে বিরাট অট্টালিকা নির্মাণ এবং যমীন খরিদ করারও পূর্ণ সুযোগ দিয়েছিলেন। পরিস্থিতি এতখানি দূরে গড়িয়ে গেল যে, তার খেলাফতের শেষভাগে সমগ্র ইসলামী সমাজের সম্পদ বন্টন ক্ষেত্রে একটি বিরাট বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছিল। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং তার পরবর্তি খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) এর কর্মনীতির ব্যাপারে খুব কঠোর ছিলেন যে কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় একদল বিশিষট নির্ভরযোগ্য লোককে চিরস্থায়ীরূপে মদীনায় বসবাস করার জন্য বাধ্য করা। তারা এ সকল লোকদেরকে বিজিত দেশসমূহে স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও ভ্রমণ করার এ জন্য অনুমতি দিতেন না যে নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে তাদের আত্মীয়তা, ইসলামের পথে তাদের ত্যাগ ও কুরবাণী এবং জিহাদে তাদের অগ্রগামী ভূমিকা থাকার কারণে যখন তাদের চর্তুস্পার্শ্বে এসে সাহায্যকারী ও সুভাকাঙ্ক্ষীদের দল ভীর জমাবে, তখন যেন এ সকল নেতৃবৃন্দের ধন দৌলত ও রাষ্ট্র ক্ষমতার দিকে লোলুপ দৃষ্টি পড়ে না যায়। এটাই ছিল তাদের এ কাজের মূল রহস্য। প্রকাশ থাকে যে, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী ও ধ্যান-ধারণা মুতাবিক স্বাধীনতার যে সংজ্ঞা রয়েছে, তাতে এ কাজ করা হলে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করে দেয়ার সমর্থন কাজ বলে নিরূপিত হয় না। কারণ ইসলাম এ স্বাধীনতা সামাজিক জীবনের শান্তি কল্যাণ ও সমৃদ্ধির শর্তাধীনে অনুবর্তি করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু, হযরত ওসমানের (রাঃ) খেলাফত কাল আরম্ভ হলেই তাদেরকে দেশের যথাস্থানে অবাধে চলাফিরা ও ভ্রমণ করার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল। শুধু এতটুকু করেই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না। বরং তিনি তাদেরকে বিজিত দেশসমূহে ঘরবাড়ী, দালান কোঠা এবং জায়গা-জমি খরিদ করার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। এটা তিনি কখন করেছিলেন? যখন তিনি সমাজের ভিতর কতিপয় লোককে লাখ লাখ টাকার সম্পদ দান করতেন।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর মুসলমানদের সাথে বিশেষ করে তাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের বেলায় তার এ ব্যবহার যে নিছক সৌজন্য ভ্রাতৃত্ব এবং দয়া দাক্ষিণ্যের পর্যায়ভূক্ত ছিল, তাতে আদৌ কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তার এ কর্মনীতি এমন দুর্নীতির জন্ম দিয়েছিল, যা হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ)-এর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে গোপন ছিল না। তিনি ইসলামী সমাজের মধ্যে একটি বিরাট অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং সামাজিক প্রভেদ ও শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন।

এ ছাড়া তিনি এমন একটি শ্রেণী সৃষ্টি করেছিলেন, যারা অকর্মণ্য হয়ে বসে থাকে বিনা মেহনত ও পরিশ্রমে চতুর্দিক থেকে ও প্রচুর পরিমাণে তাদের ভান্ডারে সম্পদ এসে জমা হতো। এমনিরূপে সেই আরাম প্রিয়তা ও ভোগ-বিলাস আবার আত্মপ্রকাশ করেছিল, যায় বিরুদ্ধে ইসলাম তার নিজস্ব উপদেশ মালা এবং আইন-কানুন দ্বারা ক্রমগতভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে আসতেছিল। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর পূর্বেকার খলিফাদ্বয় এ ব্যাপারে যখন আপন মস্তক সর্বদা সংগ্রামের মধ্যে নিয়োজিত রাখতেন, অনুরূপ তা যাতে মাথা উত্তোলন করার সুযোগ না পায় সে জন্যও সর্বদা স্বচেষ্ট থাকতেন।

সমস্যা যখন এতদুর পর্যন্ত গড়িয়ে পড়লো, তখন ইসলামের দরদে কতিপয় লোকের হৃদয় সাগরে জোয়ারের বান ডেকে উঠলো। তারা এহেন গর্হিত কাজের জন্য জোড়ালো প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলেন। তাদের মধ্যে হযরত আবুযার (রাঃ) ছিলেন সর্বাপেক্ষা নির্ভীক বিপ্লবী ও অগ্রগামী। তার ভূমিকায় তখন জনসাধারণের মধ্যে নতুনরূপে একটি জাগরণের সৃষ্টি হয়েছিল। তিনিই হলেন সেই মহান বিপ্লবী, কর্মবীর সাহাবী, যিনি তখন ভূল কর্মপন্থা গ্রহণ করেছেন বলে মিসরের "দারুল এফ্‌তা" থেকে ফতুয়া জারী করা হয়েছে। আর তারা হযরত আবুযার (রাঃ)-এর চেয়ে অধিক প্রজ্ঞাবান ও অর্ন্তদৃষ্টির অধিকারী বলে অহমিকাও প্রকাশ করেছে। অতঃপর পরিস্থিতি পরিবর্তনের সাথে সাথে তারা নিজেদের ফতুয়াও পরিবর্তন করে দিল। তাদের কাজ অবলোকন করে মনে হচ্ছে যেন আল্লাহর দ্বীন একটি পণ্যের শামিল, আর তা নিয়ে এ সংস্থাটি নিজেদের খেয়াল খুশী মতে বাজারে বস্তু বিক্রয় করে চলেছে। আহ! এই কি ওলামায়ে দ্বীনের শাসন।

হযরত আবু যার (রাঃ) ভোগ বিলাসীদের সেই বিলাসিতাকে জোড় গলায় ইসলাম বিরুদ্ধ কাজ বলে চ্যালেঞ্জ প্রদান করলেন। বনী উমাইয়া এবং মুয়াবীয়া (রাঃ) শুধু নিজেরাই বিলাসিতা গ্রহণের পক্ষপতি ছিল না। বরং তাতে নিজেরা যেমন নিমগ্ন থাকতেন, অনুরূপ জনসাধারনের মধ্যে তার প্রসার কল্পে বাস্তব ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিলেন। তাই তিনি তাদের এ কর্মপন্থার সমালোচনা করে তার বিরুদ্ধে ময়দানে অবতীর্ণ হলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) যে লাখ লাখ ও হাজার হাজার টাকা বায়তুল মাল থেকে ব্যক্তি বিশেষকে দান করতেন এবং বিত্তবানদের ধন-সম্পদ ও ভোগ বিলাসিতাকে আরো দ্বিগুণ করে বাড়িয়ে দেয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন, তিনি এ কাজের জন্যও হযরত ওসমান (রাঃ) এর বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ তুলেছিলেন। তিনি যখন অবগত হলেন যে হযরত উসমান মারোয়ানকে আফ্রিকার খেরাজের এক পঞ্চমাংশ, হারেস ইবনে হাকামকে দু'লাখ দীরহাম, যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ)-কে এক লাখ দীরহাম দান করেছে তখন তিনি ধৈর্য ধারণ করতে পারলেন না। তার অন্তরে বিপ্লবের শিখা

জ্বলে উঠলো। তিনি বিরাট জন সমুদ্রের সামনে দন্ডায়মান হয়ে এ কাজের প্রতিবাদে ঘোষণা করলেন।

ভাইরা আমার!

বর্তমানে আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে এমন সব কাজ হতে চলেছে, যার কারণ আমাদের বুঝে আসছে না। আল্লাহ্র কসম করে বলছি, এ সকল কাজের সমর্থন যেমন নেই আল্লাহর কিতাবে, তেমনি পাওয়া যাবে না রাসুলের সুন্নাতে তার কোন সমর্থন।

আল্লাহর নামে শপথ নিয়ে বলছি–আমি দেখতেছি যে, সত্যকে পদ দলিত করে যাওয়া হচ্ছে। আর বাতেলকে করা হচ্ছে নব জীবন দান। সত্যবাদী লোকদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করা হতেছে; আর মিথ্যাবাদী ও প্রতারকদেরকে দেয়া হচ্ছে প্রাধান্য। হে ধনীক শ্রেণী ভাইরা! গরীবদেরকে ভাইয়ের ন্যায় বরণ করে নাও। তাদের সাথে আপন ভ্রাতৃ সুলভ ব্যবহার প্রদর্শন করো। যারা স্বর্ণ-রৌপ্য গোলাজাত করে রাখছে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করছে না (যাকাত দিচ্ছে না) তাদেরকে পরকালে ললাট ভূমে পাজরে এবং পৃষ্ঠদেশে অগ্নিদ্বারা দাগ কেটে দেবার সুসংবাদ দাও। হে সম্পদ পঞ্জীভূতকারী পুঁজিকারী পুঁজিপতির দল। মনে রেখ সম্পদে তিনজন অংশীদার থাকে। প্রথম অংশীদার হচ্ছে তোমার তকদীর, যা তোমার থেকে উচ্চ সম্পদ ধ্বংস করে কিম্বা তোমাকে মৃত্যু দিয়ে তার ভাল অংশ কিম্বা খারাপ অংশ ছিনিয়ে নেবার অনুমতি প্রার্থনা করবে না। আর দ্বিতীয় হচেছ তোমার উত্তরাধিকারীগণ, যারা তোমার আঁখি পাতা কখন বন্ধ হবে, সেই অপেক্ষায় দিন গুনছে। তোমার মৃত্যুর পরই তারা উক্ত সম্পদ দখল করে নিয়ে যাবে। আর তখন তুমি হয়ে যাবে রিক্ত হস্ত গরীব। তৃতীয় নম্বরে হচ্ছে উক্ত-সম্পদের উপর তোমার অধিকার। এই তিন শ্রেনী অংশীদারদের মধ্যে সম্ভব হলে তোমার সবচেয়ে দুর্বল অংশীদার না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সুতরাং তুমি এ কাজের জন্য প্রস্তুত হও। পবিত্র কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, তোমাদের একান্ত প্রিয়বস্তুটি যত সময় আল্লাহর রাহে ব্যয় করতে সমর্থ না হবে, তত সময় পর্যন্ত পূণ্যবানদের স্তরে উপনীত হতে পারবে না। হে ভাইরা। এখন তোমরা রেশমের পরদা এবং বালিশ ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়েছো, আর বর্তমানে আজার বাইজান থেকে আমানীকৃত সুন্দরতম নরম বিছানায় শয়ন করতে কষ্টবোধ করছো। অথচ তোমার নবী খেজুর পাতার বুনানো চাটাইর উপর শয়ন করে জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। বর্তমানে তোমাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সুস্বাদু খাদ্য-সামগ্রী খাঞ্চায় সাঝিয়ে সাঝিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে, আর তা ধুম ধামে খাচ্ছো। অথচ তোমার রাসুলের জীবন এমনরূপে চলে গেছে, পেটপুরা করে খাবার মত রুটি খন্ডেরও সংস্থান তাঁর ছিল না।

মালেক ইবনে আবদুল্লাহ যীয়াদী (রাঃ) হযরত আবুযারের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, একবার তিনি হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট দেশ ত্যাগের জন্য অনুমতির প্রার্থনা করলে তিনি তাকে ডাকলেন। খবর পেয়ে তিনি যখন উপস্থিত হলেন, তখন তার হাতে একখানা ছড়ি ছিল। হযরত ওসমান (রাঃ) কায়াব (রাঃ)-কে সমম্বোধন করে বললেন– হে কায়াব; আবদুর রহমান যথেষ্ট পরিমাণে ধন-সম্পদ রেখে ইনতেকাল করেছে। এখন এ বিষয়ে তোমার অভিমত কি? তিনি উত্তর করলেন এ সম্পদ দ্বারা যদি সে আল্লাহর পাওনা অধিকার আদায় করে, তবে তার উপর কোন প্রকার অভিযোগ উত্থাপন করা যায় না। এ কথা শুনে হযরত আবুযার (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি এরশাদ করেছেন–'যদি আমার নিকট পাহাড় সম স্বর্ণ মওজুদ থাকতো আমি আল্লাহর রাহে ব্যয় করতে থাকতাম। আর তা আল্লাহ তা'লার মনঃপুত হতো, আমি তা থেকে ছয় আওকিয়া পরিমাণ স্বর্ণ রেখে যাওয়াকে ভাল কাজ করছি বলে মনে করতাম না।" এ হাদীসটি শ্রবণ করে সে হযরত ওসমান (রাঃ)-কে কসম দিয়ে বললেন, তুমি কি সত্যই এ হাদীসটি নবী করীম (সাঃ) এর যবানে বলতে শুনেছো? সে উত্তর করল হাঁ আমি শুনেছি।

জনসাধারণকে ইসলামের এমনিরূপে দাওয়াত দেয়া মুযাবীয়া (রাঃ) এবং মারওয়ানের ধৈর্যের পরিপন্থী কাজ ছিল। সুতরাং এ কাজের জন্য তারা সর্বদাই তার বিরুদ্ধে হযরত ওসমানের নিকট কান কথা বলে তাকে উত্তেজিত করতো। এমন কি ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধীকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে দেয়ার বিধান বর্তমান থাকা সত্ত্বেও হযরত আবুযার (রাঃ) কে আল্লাহ রাসুলের রুিদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারী অথবা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীর অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হওয়া ব্যতিরেকেই তাকে দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে 'রবজাহ' নামক স্থানে চলে যেতে হয়েছিল।

ইসলামের প্রতি এদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভালবাসা এবং জনসাধারণের নিকট তার বাণী পৌছিয়ে দেবার দাওয়াত সেই জাগ্রত আত্মারই বহিঃপ্রকাশ ছিল, যে আত্মাকে কখনো ধন-সম্পদের সীমাহীন প্রাচুর্যতা সত্ত্বেও মানবিক কামনা পরাজয় করতে সমর্থ হয়নি। সম্পদ গোলাজাত করণ এমনরূপে বৃদ্ধ প্রাপ্ত হয়েছিল, যার কারণে ইসলামী সমাজটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল এবং সে মৌলিক নীতি ও আদর্শকে মানুষের মধ্যে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে আগমন করেছিল, সেই মৌলিক আদর্শকেই সম্পূর্ণরূপে পয়মাল করে দিল। সম্পদ গোলাজাত করণের দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করলেই তখনকার বাস্তব অবস্থাটা কিরূপ ছিল তা আমার সহজেই অনুমান করতে পারবো। এ সম্পর্কে মাসূদী লিখেছেন ঃ

"হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খেলাফত কালে সাহাবায় কেরাম যথেষ্ট পরিমাণে ধন-সম্পদ ও বিত্ত-সম্পত্তির মালিকে মোখতার হয়ে বসেছিলেন। তারা এক একজন তখনকার দিনে বিরাট পুঁজিপতি ও জমিদার হয়েছিলেন। সেদিন বায়তুল মালের খাজাঞ্চীর নিকট দেরলক্ষ দীনার এবং দশলক্ষ দীরহাম নগদ জমা ছিল। আর ওয়াদীল কুরয়া এবং হুনাইন সহ অন্যান্য স্থানের বিত্ত-সম্পত্তির মূল্য ছিল এক লক্ষ দীনার। এ ছাড়া তিনি পালে পালে ঘোড়া ও উট রেখে গিয়েছিলেন। হযরত জোবায়ের (রাঃ-এর মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত একটি জায়গীদারের মূল্য ছিল আনুমানিক পঞ্চাশ হাজার দীনার। এ ছাড়া সে এক হাজার ঘোড়া এবং এক হাজার দাসীও রেখে গিয়েছিলেন। তালহা (রাঃ)-এর ইরাক থেকে দৈনিক এক হাজার দীনার আমদানী হতো এবং সারাত থেকেও হত যথেষ্ট টাকা পয়সা আমদানী। আবদুর রহমান ইবনে আউফের আস্তাবলে এক হাজার ঘোড়া, এক হাজার উট, এবং দশ হাজার বকরীর বিরাট একটি পাল ছিল। তার ইন্তেকালের পর হিসাব করে দেখা গিয়েছে যে, তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশের মূল্য ছিল প্রায় চুরাশি হাজার পরিমাণ দীরহাম। যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) এত বেশী পরিমাণ স্বর্ণ রৌপ্য গুদামজাত করে রেখে ছিলেন যে তা কুড়াল দ্বারা কাটতে হতো। এগুলো ছিল তার অন্যান্য ধন-সম্পদ এবং বিষয় সম্পত্তির বহির্ভূত সম্পদ। জুবায়ের (রাঃ) বসরায় একটি মহল, মিসরে একটি মহল, আর আলেকজান্দ্রীয়ায় একটি আলীশান মহল নির্মাণ করেছিলেন। এমনিরূপ তালহা (রাঃ) কুফা শহরে একটি বিরাট আলীশান বাড়ী এবং মদীনায় কারুকার্য খচিত পাকা পোক্ত এমন সুন্দর দ্বিতীয় আর একটি বাড়ী নির্মাণ করেছিলেন যাতে বিভিন্ন প্রকার দামীয় কাঠ ব্যবহার করা হয়েছিল। সায়াদ বিন আবী আক্কাস (রাঃ) কুফা শহরে এমন একটি বিরাটকায় আলীশান বাসভবন নির্মাণ করেছিলেন যার ছাদ ছিল খুব উঁচু এবং তার সম্মুখে ভ্রমণের জন্য ছিল বিরাটকায় খোলা মাঠ। উক্ত মাঠের চতুর্দিকে ফুলের বাগান এবং দালানের উপর কয়েকটি বিরাটকায় মিনার তৈয়ার করেছিলেন, যার ভিতর বাহির কারুকার্য্য খচিত এবং সাদা পাথর দ্বারা মজাইক করা হয়েছিল। হযরত ইয়ালা ইবনে মানবা (রাঃ) পঞ্চাশ হাজার দীরহাম এবং তিন লক্ষ দীনার মূল্যের সম্পত্তি ছাড়াও বহু ধন-সম্পদ রেখে গিয়ে ছিলেন।" (ওস্তাদ সাদেক আরজুন লিখিত হযরত ওসমানের জীবনী থেকে)

এ হচ্ছে তৎকালীন যুগের অগাধ ধন-সম্পত্তির প্রাচুর্যতা। হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে খুব অল্প পরিমাণে ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্য মূলক কর্মপন্থা গ্রহণের পরিণতি হিসেবেই এর গোড়া পত্তন হয়েছিল। এটা এমনই

একটি ভুল কর্মপন্থা ছিল, যাকে চিরতরে খতম করার জন্য এবং সমাজের বুক থেকে তার দুষ্ট প্রবাব বিদূরিত করণের নিমিত্ত তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। তিনি যদি তলোয়ারের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত না হতেন, তবে সত্যই শুধু ওমরের অন্তরেই নয়, ইসলামের অন্তরের বদ্ধমূল কৃত এ কামনাকে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করে তিনি দেখাতেন। অতঃপর ধন-সম্পদের উর্ধ্বগতি দিনের পর দিন ক্রমান্বয়েই তীব্র হতে চললো। আর হযরত ওসমান (রাঃ) এ কর্মনীতিকে বহাল রেখে ছিলেন। যার ফলে পুঁজিপতি ও ধনীদের সম্পদের বাড়তি গতি কেবল অব্যাহতই নয়-আরো তীব্র হলো। এ ছাড়া বিশেষ বিশেষ লোককে যে বখশীশ ও জায়গীরদারী দান করতেন, তা ছিল এ কর্মনীতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এরপর এমন কিছু উপলক্ষ প্রকাশ হতে লাগলো যাতে করে সম্পদের প্রাচুর্যতা আরো দ্বিগুণ বেগে উর্ধ্বগামী হয়ে চললো। বিশেষ করে বিভিন্ন মালিকানা ও বিত্ত সম্পদ একত্রিত মুনাফা লব্ধ কারবারের উপকরণসমূহ নিজেদের কারায়াত্ত্ব করা। কেননা হযরত ওসমান (রাঃ) বিজিত দেশসমূহে জায়গা-জমি ক্রয় এবং বিরাট বিরাট মালিকানা অর্জনের অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। হযরত আবুযার (রাঃ)-এর অন্তরেরর অন্তঃস্থল থেকে যে নিঃস্বার্থ আওয়াজ উত্থিত হয়েছিল, তার বিরুদ্ধাচরণ ও তার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যদি তার এ দাওয়াত নিজ উদ্দেশ্য সাধনে সফলতা লাভ করতো। আর খলিফাকে নিজ মতবাদের পানে টেনে আনতে পারতেন; তবে দেশের এই অবস্থাকে সংসোধন করার মত বুদ্ধিমত্তা ও যোগ্যতার তার আদৌ কোন অভাব ছিল না। হযরত ওমর (রাঃ) ধনী ও পুঁজিপতি ব্যক্তিদের সম্পদ গরীব জনসাধারণের মধ্যে বন্টন করে দেয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলেন, তাও তিনি কার্যকরি রূপ দিয়ে দেখায় যেতে পারতেন। জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য ইমাম বা রাষ্ট্রপতির জন্য অধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে এ কাজ করা অন্যায় হতো না। বরং সমাজ সংস্কারের জন্য এবং জনগণের জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি আনয়নের উদ্দেশ্য এ কাজ করা তার প্রতি ফরজ হয়।

এক দিকে যদি সম্পদ প্রচুর পরিমাণে কেন্দ্রীভূত হয় পরে, তদানুপাতে অপর দিকে বভুক্ষতা দরিদ্রতা এবং বেকার সমস্যা অনিবার্য রূপে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। তবে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মনে হিংসা দ্বেষ এবং প্রতিশোধমূলক মনোবৃত্তি সৃষ্টি হতে থাকে। এ সকল কারণসমূহ একত্রিত ও পাকাপোক্ত হয়ে এমন একটি রক্তাক্ত বিপ্লবেরই জন্ম হয়েছিল, যাথেকে ইসলামের শত্রুগণ পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিল। পরিশেষ এ বিপ্লবই হযরত ওসমান (রা)-এর প্রাণ বিনাশের কারণ হয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়ে উদ্বেলিত অনলকুন্ডের ভিতর নিক্ষেপ

করে ছিল। এ বিপ্লবের অনলকুন্ডের বহ্নিশিখা ইসলামের প্রাণ শক্তিকে স্বীয় ভীতিপ্রদ ধুম্র দ্বারা পরিবেষ্টিত করে এবং জাতিকে অত্যাচারী জালেমী রাজতন্ত্রের মরণ ছোবলের মুখে ফেলে দিয়েই নির্বাপিত হয়েছিল।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর পর হযরত আলী (রাঃ) সামাজিক জীবনে ন্যায় ইন্‌সাফ এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠান কল্পে যে কর্ম পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন, তা দ্বারা পুঁজিবাদী ও ধনী শ্রেণী এবং বখশীশ বন্টনের ক্ষেত্রে যারা প্রাধান্য সুলভ নীতি থেকে স্বার্থ উদ্ধার করতা, তারা হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে যে উত্তেজিত হবে না, তা বিশ্বাস করার কোনই হেতু নেই। তারা তাকে এ কর্মনীতি পরিত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছিল। আর তারা তাকে এ কথাও বলেছিল যে, এ পরামর্শ দাতারা আপনার বিরুদ্দে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে। আর তার সম্ভাবনাও ছিল। কিন্তু ইন্‌সাফের এ জাগ্রত আত্মার বীর মুজাহিদ এ কাজে আদৌ রাজী হলেন না। তিনি তাদেরকে নির্ভিক জবাব দিলেন–"আমাকে যাদের প্রতি ন্যায় ও ইন্‌সাফ প্রদর্শনের জন্য খলিফা মনোনীত করা হয়েছে, তাদের প্রতি জুলুম করে কাহারো সাহায্য গ্রহণের জন্য কি তোমরা আমাকে পরামর্শ দিচ্ছো। এমন সম্পদ যদি আমার হতো, তখনো আমি তা সমভাবে তাদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম। সুতরাং তা যখন আল্লাহর সম্পদ তখন আমি তার বিরুদ্ধাচরণ কিরূপে করি? তোমরা মনে রেখ। সম্পদ অবৈধভাবে কাহাকেও দান করাও অপচয়কারীর শামিল। কোন ব্যক্তি এ জগতে নিঃসন্দেহে এমন কিছু করলে হয়তো সে ব্যক্তি মহান ও সম্মানিত হতে পারে, কিন্তু পরকালে সে কাজের দ্বারা যে অসম্মানিত হবে, তাতে আদৌ কোন সন্দেহের কারণ নেই।

হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (রাঃ)-এর খেলাফতের পূর্ব পর্যন্ত বনী উমাইয়ারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলাম থেকে একটি স্বতন্ত্র ও ভিন্নরূপ কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিল। তিনি অবৈধ উপায় অর্জনকৃত জমিজমা ও মালিকানাসমূহ প্রকৃত মালিকের কাছে প্রত্যর্পণ, এবং বাতুল মালের সম্পদকে অনর্থক ব্যয় করণ পরিত্যাগ করার সেই কর্মনীতিই গ্রহণ করেছিলেন, যা আমি ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তখন বনী উমাইয়াগণ বায়তুল মাল থেকে যা কিছু পাবার সাধারণ মুসলমানদের ন্যায় পেতেন, তাদের জন্য আলাদা কিছু পাবার পথ ছিল না। এমন কিছু তোষামোদকারী ও স্তুতি গায়কদেরও এ সম্পর্কে কোন অংশ ছিল না। কারণ খলিফা তোষামোদ ও কবিকারদের থেকে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন। তাদেরকে তিনি বায়তুল মাল থেকে আদৌ কোন বখশীশই দিতেন না।

জরীর সাথে তার ঘটনা খুবই প্রসিদ্ধ। জ্বরীর তার শানে একটি কবিতা রচনা করে তাকে শুনিয়েছিলেন। তখন ওমর বললেন-ইবন খত্ফী তুমি কি মোহাজিরদের সন্তান যে আমি তাদেরকে যা কিছু দান করি, তা তোমাকেও দান করবো? না তুমি আন্সারীদের সন্তান যে, তাদের যতটুকু অধিকার রয়েছে তোমার জন্যও সেই অধিকার বজায় থাকুক? অথবা তুমি বলতো যে তুমি কি গরীব যে আমি তোমার সম্প্রদায়ের সদ্কা দানকারী অফিসারকে এ নির্দেশ দান করবো যে তোমার সম্প্রদায়ের অন্যান্য লোকদেরকে যা কিছু দান করে তোমাকেও তাই দেয়া হোক? সে জবাব দিল–

"আমীরুল মুমেনীন। আমি এ সকল সম্প্রদায়ের কাহারো সমপর্যায়ের নই; আমি তাদের চেয়ে যথেষ্ট ধন-সম্পদের অধিকারী এবং খুব সাচ্ছেন্দেই আছি। কিন্তু আমি আপনার নিকট সেই পুরুস্কারের প্রার্থনা করছি, যা আমাকে সাবেক খলিফাবর্গ দিয়ে থাকতেন। অর্থাৎ চার হাজার দীরহাম আর একটি ঘোড়ায় সওয়ার হবার পূর্ণ সরঞ্জাম। হযরত ওমর জবাব দিলেন–নিজ নিজ কর্মফল সকলেই ভোগ করবে।

আমি যতক্ষণ পর্যন্ত খিলাফতের সাথে সংশ্লিষ্ট আছি, ততক্ষণ আমার মতে আল্লাহর ধন সম্পদ অর্থাৎ বায়তুল মালের ধন-সম্পদে তোমার কোন অধিকার থাকতে পারে না। অবশ্য আমার ব্যক্তিগত দানের জন্য তুমি অপেক্ষা করো। আমার পরিবার পরিজনের এক বছরের ভরণ-পোষণের জন্য রেখে দেয়ার পর যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তাথেকে তোমাকে উপঢৌকন দেয়া হবে। জরীর উত্তর করলো– আল্লাহ তায়ালা আমীরুল মুমেনীনকে অধিক পরিমাণে ধন-সম্পদ দান করুক। আমার প্রয়োজন নেই আমি চলছি। এই বলে জরীর সেখান থেকে প্রস্থান করলো। তখন তিনি বললেন–এটাই আমার মনঃপুত কাজ। অতঃপর জরীর সেখান থেকে প্রস্থান হবার পর ওমর (রাঃ) বলরেন–তার দুস্কৃতিকারীতা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। তাই তিনি আবার তাকে লোক দ্বারা ডেকে এনে বললেন–আমার নিকট চল্লিশটি দীনার এবং দু'টি পরণের কাপড় রয়েছে। যখন একটি কাপড় আমি ধৌত করি। তখন অপরটি পরিধান করি। এটা আমি তোমার এবং আমার ভিতর অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক বন্টন করে নিচ্ছি। যদিও আমার একান্ত প্রয়োজনীয়। এ কথা শুনে জরীর উত্তর করলো। আমীরুল মুমিনীনকে আল্লাহ তায়ালা আরো বেশী পরিমাণে ধন-সম্পদ দান করুক। আল্লাহর নামে শপথ নিয়ে বলছি–আমি আপনার প্রতি সম্পূর্ণ খুশী, আমার কিছুই প্রয়োজন নেই। ওমর বললেন–তুমি যখন আল্লাহর নামে শপথ নিয়ে বলছো, তখন আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি। আল্লাহর নিকট আমার দরিদ্রতা দূরীকরণের জন্য

তোমার এ দোয়া আমার প্রশংসার চেয়ে অধিক পরিমাণে আমাকে প্রভাবিত করে ফেলছে। এখন থেকে তুমি আমার বন্ধু হলে।

রাষ্ট্রের ধন-সম্পদ যখন এমনিরূপ সতর্কতার সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা হতো আর তার আসল প্রাপকদের হাতে পৌছান হতো, তখন ঐতিহাসিকদের এ কথা আদৌ কোন আশ্চর্য্য হবার কথা নয় যে, হযরত ওমর ইবনে আবুদল আযীযের খেলাফত কালে জনসাধারণ, সাধারণভাবে এমন সম্পদশালী ও বিত্তবান হয়ে উঠছিলে যে কোন কোন অঞ্চলে যাকাতের অর্থ দিবার মত লোক খুঁজে পাওয়া যেত না। কেননা সাধারণভাবে মানুষ নিজদের অন্যান্য অধিকার লাভ করার কারণে যাকাতের অর্থ লাভ থেকে বিমুখ হয়েছিল। এ বিষয় ইয়াহইয়া ইবনে সামাদ বর্ণনা করেছেন যে, আমাকে ওমর বিন আবদুল আযীয আফ্রিকা প্রদেশের যাকাত আদায়ের তহশীলদার নিযুক্ত করে প্রেরণ করেছিলেন। আমি তা যথারীতি আদায় করে তা গরীবদের মধ্যে বন্টন করার জন্য লোক অনুসন্ধান করতে ছিলাম। কিন্তু যাকাতের এ অর্থ দিবার মত কোন গরীব লোকই সেখানে পেলাম না। আর আমার নিকট কেহ উক্ত সম্পদ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে উপস্থিতও হলো না। কারণ ওমর ইবনে আবদুল আযীযের প্রবর্তিত অর্থনীতি সাধারণভাবে দেশের মানুষকে ধনী বানিয়ে দিয়েছিল। অবশেষে আমি এ অর্থ দ্বারা গোলাম খরিদ করে তাদেরকে মুক্ত করি।

আসল কথা হচ্ছে যে, ধন-সম্পদ কেন্দ্রীভূত করণেরই বাস্তব ফল হলো দরিদ্রতা। প্রত্যেক যুগেই দরিদ্র ব্যক্তিরা ধনী ও বিত্তবানদের সীমাহীন জুলুম ও অত্যাচারের কবলে নিপতিত হয়। আর সাধারণতঃ ধনীগোষ্ঠীর সীমাতিরিক্ত বিরাট বিরাট জমিদারী জায়গীরদারী রাজা বাদশাহদের উপঢৌকন জুলুম পীড়ন অত্যাচার এবং মাত্রাতিরিক্ত মুনাফা অর্জন দ্বারাই দরিদ্রতা জন্ম লাভ করে।

নবী উমাইয়া এবং তাদের পরবর্তী আব্বাসীয়দের যুগে বায়তুল মালের ধন সম্পদ ব্যয় করণের বেলায় তাদের ব্যক্তিগত ধন-সম্পদের মত ছিল। তারা সেচ্ছাচারী পন্থায় ব্যয় করণের বেলায় তা তাদের ব্যক্তিগত ধন-সম্পদের মত ছিল। তারা সেচ্ছাচারীর মত অবৈধভাবে এ ধন-সম্পদ ব্যবহার করতো। অথচ তৎকালীন যুগে স্বতন্ত্র রূপে দু'টি বায়তুল মালের ব্যবস্থা ছিল। একটি ছিল সাধারণ বায়তুল মাল, আর অপরটি ছিল খাছ বায়তুল মাল। প্রথমটির ব্যাপারে তার আমদানী ও ব্যয় সম্পূর্ণরূপে বাদশাহদের এখতিয়ারধীনে ছিল। কিন্তু দেখা যায় যে, সাধারণ বায়তুল মালের কতিপয় সম্পদ খাচ বায়তুল মালে রাখা হতো। আর কতিপয় বিশেষ ব্যয় সাধারণ বায়তুল মালের অর্থ দিয়ে নির্বাহ করা হতো।

"চতুর্থ শতাব্দীতে ইস্‌লামী তাহরীক" শীর্ষক পুস্তকে ডঃ আদম মীয লিখেছেন (যার আরবী অনুবাদ হয়েছে ডাঃ আবদুল হাদী আবু বিদাহ দ্বারা) যে

রাজধানীর যাবতীয় ব্যয় বহন এবং পুরস্কার ও উপঢৌকন সাধারণ বায়তুল মালের অর্থ দ্বারা পূরণ করা হতো। আমাদের নিকট হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম যুগের যে সকল ঐতিহাসিক দলিল প্রমাণ রয়েছে, তাতে দেখা যায় যে, নিম্নলিখিত ভাবে রাজ্যের খরচাদি বহন করা হতো, যা খাচ বায়তুল মালের মধ্যে শামিল করে নিয়েছিল।

১। যে সকল ধন-সম্পদ পিতা-মাতা নিজ সন্তান সন্ততিদের জন্য এ বাযতুল মালে জমা রাখত তাও খাছ বায়তুল মালে নিয়ে যাওয়া হতো। কথিত আছে যে খলিফা রশিদ এক কোটি আট লাখ দীনার রেখে গিয়েছিলেন। খলিফা মো'তাদাদ বিল্লাহ স্বীয় শাসনামলে প্রতি বছর রাষ্ট্রীয় খরচ বহন করার পর খাছ বায়তুল মালের আমদানী থেকে দশ লাখ দীনার বাঁচিয়ে রাখতেন।

এইরূপ জমা করতে করতে উক্ত দীনারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল নব্বই লাখে গিয়ে। তার মনের ইচ্ছে ছিল যে, এক কোটি হবার পর তা গলিয়ে একটি বারে রূপান্তিরিত করবে। সে তার এই মনবাসনা পূরণ হলে প্রজাদের উপর থেকে আদায় কৃত খাজনার এক তৃতীয়াংশ মওকুফ করে দেবার মান্নাতও করেছিলেন। তার ইচ্ছে ছিল যে, এ বার জনসাধারণের দর্শনের জন্য প্রকাশ্য স্থানে রেখে দিবেন, যেন লোকেরা এই কথা জানতে পারে যে, তার নিকট এক কোটি দনিার জমা রয়েছে। সুতরাং প্রজাদের নিকট অতিরিক্ত খাজনার জন্য সে মুখপেক্ষী নয়। কিন্তু তার মনের আশা পুরণের পূর্বেই মৃত্যু তাকে গ্রেফতার করে নিয়েছিল। মো'তাদের পরে মোকতাফী খলিফা পদে সমাসীন হয়ে কোষাগারের সম্পদ বাড়িয়ে এক কোটি দশ লক্ষ পরিমাণ করেছিল।

২। পারস্য দেশ ও কেরমান প্রদেশ থেকে খেরাজ স্বরূপ এবং সরকারী মালিকানার স্থাবর সম্পত্তি থেকে খরচ বহন করার পর যে টাকা পয়সা উদ্ধৃত থাকতো, তাও খাচ বায়তুল মালে নিয়ে যাওয়া হতো। হিজরী ২৯৯ থেকে ৩২০ পর্যন্ত এ টাকার পরিমাণ ছিল বাৎসরিক দু'কোটি ত্রিশ লাখ। তার থেকে চল্লিশ লাখ সাধারণ বায়তুল মালে এবং অবশিষ্ট এক কোটি নব্বই লাখ খাচ বায়তুল মালে নিয়ে যাওয়া হতো। অবশ্য খলিফা দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা কালে এ থেকেই তার যাবতীয় ব্যয় বহন করতেন। ৩০৩ হিজরীতে খলিফা সেই সকল দেশ সমূহ বিজয়কালে সত্তর লাখের ও অধিক টাকা এ কাজে ব্যয় করেছিলেন।

৩। মিসর এবং সিরিয়া থেকে আদায়কৃত সম্পদও খাচ বায়তুল মারে নিয়ে যাওয়া হতো। যেমন অমুসলিম নাগরিকদের থেকে আদায় কৃত জিজিয়া কর জনসাধারণের কোষাগারে জমা না হয়ে খলিফার বায়তুল মালে জমা হতো। এটা খলিফা হবার কারণেই নীতিগত ভাবে তার অধিকার ছিল।

৪। রাষ্ট্রের যে সকল উজীর-নাজির সেক্রেটারী ও অন্যান্য নেতৃবর্গ এবং আমলাদেরকে পদচ্যুত করে তাদের ধন-সম্পদ রাষ্ট্রীয়করণ করে নিয়ে যাওয়া হতো, তাও খাছ বায়তুল মালে জমা হতো। এমনিরূপে উত্তরাধিকার সূত্রে খলিফা যে সম্পদ পেতেন তাও সেখানে রাখা হতো।

৫। সাওয়াদ এবং আহওয়াজ প্রদেশ এবং পূর্ব ও পশ্চিম এলাকা থেকে রাজ্যের মালিকানা স্বত্ব থেকে খিরাজ বাবদ যে ধন-সম্পদ আদায় হতো তাও খাছ বায়তুল মালে নিয়ে যাওয়া হতো।

৬। আর যে ধন-সম্পদ খলিফাগণ রাজ্যের ব্যয় বহন করার পর বাঁচিয়ে রাখতেন, তাও খাছ বায়তুল মালে রাখা হতো। যেমন, হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর শেষে খলিফা দ্বয় উভয়ই বাৎসরিক দশলাখ পরিমাণ সম্পদ বাঁচিয়ে রাখতেন। এদিক দিয়ে হিসেব করলে দেখা যাচ্ছে যে, পনেরো বছরে তারা এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পদা জমা করেছিলেন। অর্থাৎ এ টাকার অর্দ্ধাশংশই খলিফা রশিদ রেখে গিয়েছিলেন।

আমাদের এ আলোচনা দ্বারা তৎকালীন যুগে খলিফা রূপী রাজা বাদশারা যে কতখানি জনসাধারণের ধন-সম্পদের উপর অবৈধ হস্তক্ষেপ করে তা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতো, তাই প্রতিভাত হয়। তখন দেশের অর্থনীতির রূপরেখাটি যে ইসলামী অর্থনীতি থেকে দূরে সরে গিয়েছিল তাই লক্ষণীয় বিষয়। একদিকে অগাধ ধন-সম্পত্তির প্রাচুর্যতা ও ভোগ বিলাসিতার সীমাহীন বিরাজমান আচরণ এবং অপর দিকে সমাজের বুকে দরিদ্রতা ও বুভক্ষের প্রচন্ডতা উভয়টিই বিরাজমান ছিল। ইসলামী সমাজ ইসলামী নীতি থেকে কত দুরে সরে যাবার কারণে কিরূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে তা ছিন্নবিছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, তা পাঠবর্গের খেদমতে তুলে ধরাই আমার এহেন নাতিদীর্ঘ আলোচনার উদ্দেশ্য।

কয়েকটি মৌলিক নীতি

খলিফাগণ নিজ চাকর-চাকরানী এবং স্বীয় বংশের সেই সকল লোকের ধন-সম্পদ পেয়ে যেতেন, যাদের মৃত্যুর পর কোন ওয়ারীস থাকতো না। যেহেতু এ সকল লোক খেলাফতের বড় বড় পদে সামাসীন হতো, আর তাদের আয় রোযগাও ছিল অত্যাধিক পরিমাণে। অতএব এ দিক দিয়েও বস্তুতঃ এতকিছু হওয়া সত্ত্বেও অর্থনীতির অধীনে যে বহু মৌলিক নীতি নির্ধারণ হয় ইসলাম তা ঐতিহাসিক ভাবে বাস্তব সত্যরূপে প্রমাণিত করে দেখিয়ে দিয়েছে। এহেন বিমুখতা সত্ত্বেও মানবতার ভাগ্য বিড়ম্বনার কারণে সে তার প্রাথমিক যুগে বনী উমাইয়াদের শাসন প্রতিষ্ঠা হবার দরুন নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার পরও ইসলামী ইতিহাস ইসলামের বহু দার্শনিক নীমিমালাকে বাস্তবে রূপ দান্ করে জগতবাসীকে দেখায় দিয়েছে।

১। ইসলাম গ্রহণের বেলায় এবং তার প্রসারতায় বেশী যাদের ভূমিকা অগ্রণী ছিল, তাদের তুলনায় গরীব ও দরিদ্র লোকেরাই বায়তুল মালের সম্পদ পাবার বেশী অধিকারী। ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বল (রহঃ) লিখিত মসনদ কিতাবে সম্পদ কি ভাবে আদী বিন হাকীম (রাঃ) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন–আমি আমার সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক লোকসহ খলিফা ওমর (রাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। আমরা সেখানে গিয়ে দেখলাম যে তিনি "তায়ে" দেশের কতিপয় লোকের জন্য দু'হাজার টাকা ভাতা নির্ধারণ করে দিলেন। আর আমাকে তিনি দৃষ্টির আড়ালে ফেলে রাখলেন।এটা অনুধাবন করতে পেরে আমি খলিফার সামনে গিয়ে দাঁড়ালা। এ বারে তিনি আমার থেকে অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। তারপর আমি বললাম–আমীরুল মুমেনীন! আপনি কি আমার সম্বন্ধে কিছুই অবগত নন। আমার কথা শুনে হযরত ওমর (রাঃ) হেসে দিলেন। হাসতে হাসতে তিনি সেখানে একেবারে শুয়ে পড়লেন। তারপর আমাকে বললেন-হাঁ আমি তোমার সম্বন্ধে ভালরূপেই ওয়াকিফহাল। মানুষ ইসলামের কথা শুনে যখন নাক ছিটকাতো তখন তুমি ইসলামী আন্দোলনে শামিল হয়ে তার একনিষ্ঠ কর্মী হয়েছো। যখন লোকেরা আন্দোলন থেকে পিঠ ফিরিয়ে দুরে চলে যেত, তখন তুমি এ আন্দোলন নিয়ে সামনে অগ্রসর হয়েছো। লোকেরা যখন এ দ্বীনী আন্দোলনের সাথে ধোকাবাজী ও প্রতারণা করেছে, তখন তুমি বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছো। আমার ভালরূপেই স্মরণ আছে সর্বপ্রথম যাকাতের যে সম্পদ দ্বারা আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এবং সাহাবাগণ উপকৃত হয়েছিলেন এবং তাদের মুখে হাসি ফুটেছিল, তা ছিল তায়ে দেশের যাকাতের সম্পদ। তা আমিই নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত করেছিলাম। বর্ণনাকারী বলেন–অতঃপর খলিফা ওমর (রাঃ) আমার নিকট ওজরখাহী পেশ করে বললেন–আমি এ সম্পদ দ্বারা কেবলমাত্র সেই সকল লোকদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করেছি, যাদের প্রতি আরোপিত দায়িত্বাবলী পালনে তাদেরকে দরিদ্রতা ও বুভুক্ষতার দ্বারা দুর্বল করে রেখেছে। কেননা এরা হচ্ছে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ সম্মানিত লোক।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর এ বাণীটি যিনি সম্পদ বন্টন করার বেলায় ইসলামী আন্দোলনে অগ্রণী ভুমিকা গ্রহণকারীদের তুলনায় গরীব ও দরীদ্রদেরকে প্রাধান্য দানের কর্মপন্থা নিয়েছিলেন, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর দ্বারা অনেক কিছুই প্রমাণ হয়। আসল কথা হচ্ছে যে ইসলামী সমাজে "অভাবী জনই" হচ্ছে সর্ব প্রথম মূল অধিকারী। প্রয়োজনশীল লোকরাই হলো প্রথম কাতারের লোক। ইসলাম প্রয়োজনশীলতা এবং দরিদ্রতা ও বভুক্ষতাকে কতদুর দরদের সাথে দেখে, আর

তা দূরীকরণে সমস্ত কার্য্যের উপর যে কতখানি গুরুত্বদেয় এ নীতি দ্বারাই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

২। একদিকে অগাধ ধন-সম্পত্তির পুঁজিপতির দল, আর অপরদিকে দরিদ্র অভাবী ও বঞ্চিতের দল। এটা ইসলাম কোন ক্রমেই বরদাস্ত করতে পারে না। সে ইসলামী সমাজের এহেন ভারসাম্য হীনতা দূরীকরণের জন্য শাসক শ্রেণীকে বর্তমান অবস্থা মাফিক কর্মপন্থা গ্রহণের পূর্ণ আযাদী দান করেছে। এটা এমনই একটি নীতি যা ঐতিহাসিক রূপে নবী করীম (সাঃ) থেকে প্রমাণিত। তিনি বণী নাজীর্ সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত সমস্ত ধন-সম্পদ দ্বারা যাতে ইসলামী সমাজে এই সর্বপ্রথম সুযোগটিতে কিছুটা ভারসাম্য সৃষ্টি হয়, সে জন্য গরীব মোজাহিদের মধ্যে তা বন্টন করে ছিলেন। এ থেকে শুধু মাত্র দু'জন গরীব আনসারী লোককে দিয়েছিলেন। অতঃপর এ ঐতিহাসিক উদারহণটি যথার্থতার সাক্ষ্য দিয়ে ঘোষণা করলেন–"ধন সম্পদ যাতে করে তোমাদের ধনী শ্রেণী লোকদের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে না পড়ে, সে জন্য এ ব্যবস্থা করা হলো"। (আল-কুরআন)

উদাহরণটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ উদাহরণ। এ দিক দিয়ে মুসলমান শাসক শ্রেণী যারা আল্লাহর বিধানকে জারী করার জন্য দায়িত্বশীল, তারা সাধারণ বায়তুল মাল থেকে সমাজের অভাবী লোকদেরকে সেই পরিমাণ আর্থিক সাহায্য করার পূর্ণ অধিকার রাখে যাতে ইসলামী সমাজের ভারসাম্য বজায় থাকে এবং ইসলামের এবং ইসলামের এসেই আশা আকাঙ্খা যে বিভিন্ন শ্রেণী ভিতর বৈষম্য সৃষ্টি হয়ে সমাজের সাধারণ ভারসাম্য চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে না যায় তাও যেন পূর্ণ হয়।

৩। তৃতীয় নীতিটি হচ্ছে সক্ষম এবং অক্ষম ব্যক্তিদের থেকে তুলনা মূলকভাবে শুল্ক বা ট্যাক্স ধার্য করার বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ করণের মৌলনীতি। সুতরাং যখন জিম্মীদের প্রতি ট্যাক্স ধার্য করা হতো, তখন তাদের বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য নিম্নলিখিত নীতি নির্ধারণ করা হয়েছিল।

(ক) প্রথম শ্রেণীর ধনীদের থেকে বাৎসরিক কিস্তিতে আটচল্লিশ দীরহাম ধার্যকরা হয়েছিল।

(খ) মধ্যবিত্ত শ্রেণী লোকদের বেলায় ধার্য করা হয়েছিল বাৎসরিক চল্লিশ দীরহাম।

(গ) আর মজদুর শ্রেণীর গরীবদের থেকে নেয়া হতো বাৎসরিক বার দীরহাম। আর যে সকল লোক ভিক্ষাবৃত্তি করে এবং যারা মজদুরী করতে সক্ষম নয়; অন্ধ, বিকলাঙ্গ,, পাগল বিপদগ্রস্ত লোকদের থেকে জিজিয়া কর আদায় করা যাবে না। জিজিয়া শুধু স্বাধীন পুরুষ নাগরিকদর থেকে আদায় করা হতো। নারী এবং শিশুদের প্রতি জিজিয়া কর আরোপিত হতো না। অনাবৃষ্টি এবং শুষ্কতার

দরুন যে বৎসর আরবে প্রকট রূপে দুর্ভিক্ষ দেখা দিত এবং সাধারণভাবে মানুষ অনাহার ও বুভূক্ষতার সম্মুখীন হতো, সে বছর হযরত ওমর (রাঃ) যাকাত আদায় বন্ধ রাখতেন এবং ক্ষেত-খামারে ভাল করে শস্য জন্ম না হওয়া পর্যন্ত তা থেকে জনসাধারণকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দিতেন। দেশ থেকে দুর্ভীক্ষ দূরীভূত হয়ে সাধারণ মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার পরে হযরত ওমর (রাঃ) যাকাত উসল করার নিমিত্ত তহসীলদার পাঠাতেন এবং দু'কিস্তির যাকাত দাবী করতেন। এক কিস্তির হলো আ'মুর রিমাদ অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের বছর এবং দ্বিতীয় কিস্তি হতো চলতি সালের। যারা তা আদায় করতে অক্ষম, তাদেরকে তিনি মাফ করে দিতেন। অতঃপর তিনি ঐ দু'ভাগ যাকাতের একভাগ অক্ষম ও গরীবদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য দ্বিতীয়ভাগ তার নিকট বায়তুল মালে জমা করার নির্দেশ দিতেন।

৪। চতুর্থ নীতি হলো তহশীলদারদের যাকাত আদায় করার কারণে কোন ব্যক্তি যেন দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী থেকে বঞ্চিত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা এবং তা আদায় করণে কোনরূপ শক্তি প্রয়োগ না করা। হযরত আলী (রাঃ) একজন তহশীলদারকে এ বলে নির্দেশ দিলেন যে, যখন তুমি জনসাধারণের নিকট যাকাত আদায়ের জন্য যাবে, তখন তা আদায় করে তাদের গ্রীষ্ম ও শীতের মওসুমের পোশাক, খাদ্য সামগ্রী এবং যানবাহন বিক্রি করতে বাধ্য করবে না।

খিরাজ যতই বাকী থাকুক না কেন, তা আদায়ের জন্য কাহাকেও বেত্রাঘাত করবে না, এক পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে শাস্তি দিবে না। কেননা জনসাধারণকে তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্ধৃত্ত সম্পদ থেকে তা আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৫। "প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার পরিশ্রম অনুযায়ী" নীতির সাথে সাথে "প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী দিতে হবে" এ নীতিটিও থাকতে হবে। হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) গণীমতের সম্পদ এক ব্যক্তির জন্য একাংশ এবং বিবাহিতদের জন্য দুই অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এর দ্বারা এটাই প্রমাণ হয় যে, ভাতা নির্দিষ্ট করণের বেলায় পরিশ্রমের সাথে সাথে প্রয়োজনের পানেও দৃষ্টি রাখতে হবে। এ যদি না হয় জিহাদের বেলায় বিবাহিত অবিবাহিত সকলেই সমান কষ্টভোগ করতে হবে। অবশ্য বিবাহিতদের প্রয়োজন অবিবাহিতদের তুলনায় দ্বিগুণ। সুতরাং তার অংশও দ্বিগুণ করে দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা এ কথাও প্রমাণ হয় যে, শুধু ""প্রয়োজনই" ইসলামী জীবন বিধানে মালিকানা অর্জনের একটি মূলগত স্বয়ং সম্পূর্ণ উপকরণ।। এ নীতিটি সামাজিক নিরাপত্তার স্থানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৬। ষষ্ঠ নম্বরের নীতি হলো প্রত্যেকটি অক্ষম ও অভাবী লোকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার নীতি। হযরত ওমর (রাঃ) অভিভাবকহীন নবাগত শিশুদের জন্য একশত দীরহাম ভাতা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। যখন শিশু কিছু বড় হতো, তখন দু'শত দীরহাম করে ভাতা নির্ধারণ করতেন। আর বালেগ হলে তার চেয়েও অধিক ভাতা দিতেন। আর যে শিশুদের রাস্তায় ফেলে দেয়া অবস্থায় পাওয়া যেত, তাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণকারীদেরকে তাদেরকে পালনের নিমিত্ত এর তুলনায় অধিক পরিমাণে ভাতা দেয়া হতো। শিশুর দুগ্ধ পান এবং অন্যান্য ব্যয় বহন বায়তুল মাল থেকে করা হত। সে বড় হলে পর অন্যান্য শিশুদের সম পরিমাণ ভাতা পেত।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর এহেন মহত্ত্ব ও উদারমনা ইসলামের উদারতারই দর্পণ স্বরূপ। কেননা রাস্তায় ফেলে দেয়া শিশরা নিষ্পাপ। তারা স্বীয় অপরাধী পিতা-মাতার গুনাহের জন্য আদৌ অপরাধী নয়। এর পূর্বে আমরা এ কথাও উল্লেখ করেছিলাম যে, হযরত ওমর(রাঃ) অন্ধ ইয়াহুদী, এবং কুষ্ঠ রোগে নিপতিত খ্রীষ্টনদের জন্য বায়তুল মাল থেকে ভাতা নির্ধারণ করে ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ)-এর স্বভাবে ইসলামের এহেন মহান উদারতা শুধু কেবল মুসলমানদের জন্যই নয় বরং সমগ্র মানুষের জন্য ছিল। এ প্রয়োজনই হচ্ছে অক্ষমতা এবং বঞ্চনার মোকাবিলায় সামাজিক নিরাপত্তা।

৭। এটা একটি নীতিগত প্রশ্ন যে "এ অধিকার শাসকরা কোথা থেকে অর্জন করলো? কেননা শাসক বর্গ এমন বিশেষ নিরাপত্তা অর্জন করতে পারেনি, যাতে করে সমাজ তার আয়কৃত সম্পদ সম্পর্কে তার নিকট হিসাব নিকাশ তলব করতে পারে না। এর দ্বারা সে বুঝতে পারবে যে, এ সম্পদ তার না সমাজের। এ নীতিটি নির্ধারণ দ্বারা এ নিশ্চয়তা পাওয়া যায় যে, যে কোন শাসকই জনসাধারণের সম্পদের উপর হস্তক্ষেপ করার পূর্বে অন্ততঃ কয়েকবারই সে চিন্তা করবে। হযরত ওমর (রাঃ) তার সমাজের সকল গভর্ণরদের বেলায় এ নীতিই কার্যকরি করেছিলেন। আর হযরত আলী (রাঃ)-এর খেলাফত কালেও কোন কোন গভর্ণরদের সাথে এ ব্যবহার দেখান হয়েছিল।

৮। অষ্টম নীতিটি হচ্ছে যাকাত আদায়ের নীতি, যা সেই অন্ধকারময় যুগেও অচল হয়ে পড়ে ছিল না, যে যমানায় ইসলামের প্রাণশক্তিটি দ্বীন থেকে বহুদুরে সরে গিয়েছিল। কেননা হযরত আবুবকর (রাঃ) এর খেলাফতের প্রথম দিকে আহলে রদ্দাহ্দের সাথে যুদ্ধ করার পর (যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল) কোন লোকই মৌলিক এবং বাস্তবিক কোন দিক দিয়েই যাকাত আদায় করতে

অস্বীকার করেনি। দেখতে দেখতে আমাদের এই যুগে পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের সমাজকে এমনরূপে ঘিরে ফেললে, যার পরিণাম ফলে ইস্‌লামের মৌলিক নীতিমালাসমূহের শেষতম জীবন্ত নীতিটিও ধ্বংস স্তুপে পরিণত হয়ে গেল।

৯। নবম নীতিটি হলো সামাজিক জীবনে সাধারণ পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতি ও দায়িত্বশীলতার নীতি। এ নীতিটি দ্বারা প্রত্যেকটি বস্তী মহল্লার জনসাধারণকে সেই সকল ব্যক্তিদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে বাধ্য করে, যারা ক্ষুধার তাড়নায় অনাহারে মৃত্যুর স্বীকারে পরিণত হয়। আর এ জবাবদিহি করা হয় ফৌজদারী আইনের অধীনে। প্রত্যেক বস্তীর বাসিন্দাদের প্রতি এ ধরনের মৃত্যু বরণকারী ব্যক্তিদের জন্য দিয়াত। (জরিমানা) দেয়া ওয়াজিব হয়। সেই ব্যক্তির হত্যাকারীরূপে পরিগণিত হয়। কারণ সে তাদের মধ্যে বসবাস করে ক্ষুধার তাড়নায় অনাহারে মৃত্যুর শিকারে পরিণত হয়েছে। এ নীতিটির বাস্তবতার প্রমাণ এ কথা দ্বারাই আমরা পাই। যে যদি কোন লোকের ক্ষুধা অথবা তৃষ্ণার কারণে মৃত্যু হবার সম্ভাবনা দেখায় দেয়, তবে যাদের নিকট পানিও খাদ্য রয়েছে, তারা তা দিতে অস্বীকার করলে তাদের সাথে যুদ্ধ করারও অধিকার তার রয়েছে। আর যদি সে তাকে হত্যাও করে, তবে তার প্রতি যেমন দীয়াত (জরিমানা) প্রযোজ্য হয় না, তেমনি পরকালের আযাব থেকেও সে নিষ্কৃতি পায়।

১০। ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনীতির দশতম মূলনীতিটি হচ্ছে অর্থনীতি থেকে সুদ নিষিদ্ধ হওয়া। সুদকে নিষিদ্ধ করণের অর্থ হচ্ছে পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থাকে চিরতরে বিদায় দেয়া। আর রিক্ত হস্ত থাকা অবস্থায় ঋণদার ব্যক্তিকে কিছু দিন অবসর দেয়া। মুসলমানদের হাতে শাসন ব্যবস্থা থাকা অবধি সুদ নিষিদ্ধ করণের নীতি বরাবরই বলবৎ ছিল। কিন্তু আমাদের দেশে নব সভ্যতার আগমন হয়ে তাকে বৈধ করে দিয়েছে। সুদ বৈধ হবার এ বিপদটি ফ্রান্সের আইন দ্বারা আমাদের মাথায় চাপিয়ে বুনিয়াদ বানিয়ে দিয়েছে। অথচ এর আদৌ কোন প্রয়োজনই ছিল না। তা প্রচলন করার সম্পূর্ণরূপে মূল কারণ হলো মানুষের বাস্তব জীবন থেকে নৈতিক মূল্যবোধ সমূহের প্রভাব একমাত্র মিটিয়ে দেয়া। এর কারণ মানুষের অন্তর থেকে নেকী এবং সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতির মজ্জাগত স্পৃহা ও অনুভূতি চিরতরে বিদায় হয়ে গিয়েছে। অথচ ইসলাম এ স্পৃহা ও অনুভূতিকেই সামাজিক জীবনে মূল বুনিয়াদি কাঠামো এবং মানুষের পারস্পরিক লেনদেন ও আদান-প্রদানের আসল মৌলিক ভিত্তি নিরূপণ করে।

এসব কথাগুলো হচ্ছে সৌভ্রাতৃত্ব এবং সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতির সেই মূল্যবোধের বর্হিগত কথা, যা আইনের দ্বারা রূপ দেয়া সম্ভব নয়, যা ইতিপূর্বে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা নয়, আমাদের পিতৃবর্গ প্রত্যেকটি ইসলামী দেশে রূপদান করে দেখিয়ে গিয়েছেন। তা এখানো ইসলাম জগতের উপর বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার সয়লাব হওয়া সত্ত্বেও কিছু না কিছু স্থানে স্থানে দেখা যাচ্ছে। তা এখানো ইসলামী সাম্রাজ্যের উপর ইসলামী ভাবধারার ও প্রভাবের কথা প্রমাণ করে। সেখানে এ ভাবধারার বদৌলতে আইন-কানুন বা শক্তি প্রয়োগের আদৌ কোন প্রয়োজনই অবশিষ্ট রাখেনি। এই যে অগনিত সম্পদ নিজেদের মুল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কাজে ব্যয় করে এবং যা বিভিন্ন নেতারা বিভিন্ন টাল বাহানা করে বিভিন্ন নামে করায়ত্ত করে রেখেছে, তা সবই নিকটতম অতীত ও দূরতম অতীতের সেই সকল মুসলমানের অন্তরে উদ্বেলিত দয়া ও পারস্পরিক সহানুভূতি এবং সামাজিক জীবনে নিরাপত্তার চেতনা বোধেরই প্রামাণিক সাক্ষ্য বিশেষ পাশ্চাত্যের কঠিন মনা মৃত চেতনাবোধ ও বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা তাদের অন্তরকে আদৌ পরিবর্তন করতে পারে নি।

দুর্বল ও অসহায়দেরকে সামাজিক জীবনে নিরাপত্তা দানে এহেন মনোভাব এতদুর পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল যে মানুষ ছাড়া জীব জন্তুও তা দ্বারা উপকার লাভ করতো। সুতরাং দুর্বল জীব জন্তুর আশ্রয় স্থানের জন্য বিরাট বিরাট জমি ওয়াক্‌ফ করে দেয়ো হতো। সেখানে বিচরণ করে তারা ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণ করতো।

প্রাথমিক যুগে রাষ্ট্র শাসন পদ্ধতি এবং অর্থনৈতিক কর্মসূচীর মধ্যে কিছুটা অনৈক্য এবং দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হওয়ায় সমাজের বুকে যে সুদুর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিলো, তা সত্ত্বেও ইস্‌লামের আসল রূপরেখাটি ফুটে উঠেছে তা হচ্ছে এটাই। যতদুর পর্যন্ত তার সধারণ নীতির প্রশ্ন বিজরিত রয়েছে, ইসলামের মধ্যে সর্বদাই এ যোগ্যতা ও দক্ষতা বর্তমান আছে এবং থাকবে যে, যে সমাজ তার মৌলিক কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং যেখানে তার শরীয়তেকেই একমাত্র আইনের মর্যাদা দেয়া হয়, সে সমাজের নিত্য নব উদ্ভাবিত সমস্যা সমূহের সমাধান দিতে এবং তার গতিশীল ও বিবর্তনশীল চাহিদা ও প্রয়োজন পুরণ করতে কোন দিক দিয়েই তাকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। আর কোন মতবাদ থেকে সমাধান ধার করেও আনতে হয় না। ইসলাম এ চাহিদা ও

জিজ্ঞাসাকে ভারসাম্যের সাথে সর্বাঙ্গীন রূপে পুরণ করতে সক্ষম। আর তা চরম ও নরম পথের সীমানার মধ্য দিয়ে হোঁচট খাওয়া থেকে এমনরূপে আত্মরক্ষা করে, যেমন মানব রচিত জীবন বিধান ও মতবাদসমূহ এবং মানসিক অভিজ্ঞতাবলী বর্তমানে হোঁচট খেয়েই চলছে। এ অভিজ্ঞতাবলীর জন্য মানবতাকে অনেক কিছুই কুরবান করতে হয়েছে, এবং তার জন্য সে অনেক কিছুই হারিয়েছে।

মূল গ্রন্থকারের স্বলিখিত "ইসলাম ও বর্তমান বিপদ" (ইস্‌লাম ওয়া মুশকিলাতে হাজেরাহ) শীর্ষক পুস্তকের চাঞ্চল্য ও বিক্ষিপ্ততা (এজতেরাব ওয়া এন্‌তেসার) অধ্যায় বিস্তারিত দ্রষ্টব্য। এখন "ইস্‌লামের বর্তমান ও ভসিষ্যত" এ বিষয়টি আমাদের আলোচনার বর্হিভূত রয়ে গেল। আল্লাহ চাহে আগত অধ্যায় এ বিষয়ের প্রতি আমরা আলোকপাত করার জন্য যত্নবান হবো-আল্লাহ হাফেজ।

অষ্টম অধ্যায়

ইস্‌লামের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

বিশ্বের মানুষের নিকট আমরা নতুনভাবে পুর্ণরূপে ইস্‌লামী জীবন দর্শন গ্রহণ করার দাওয়াত জানাচ্ছি। আর দাওয়াত দিচ্ছি এমন একটি ইস্‌লামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করতে, যেখানে থাকবে ইস্‌লামের মৌলিক আকিদা ও বিশ্বাসগুলো দুঢ়ভাবে বদ্ধমূল এবং প্রচলিত থাকবে ইস্‌লামী জীবন দর্শনের ধ্যান ধারণা। আর সাথে সাথে সেখানে আইনের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে আল্লাহর শরীয়াত, কায়েম হবে ইস্‌লামী বিধান।

আমরা খুব ভালরূপেই এ কথা অবগত হয়েছি যে, এ ধরণের ইস্‌লামী জীবন দর্শন বহুদিন ধরে এ ভূখন্ডের প্রতিটি স্থান থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে আছে। শুধু তাই নয় বরং এ কারণে ইস্‌লামের অস্তিত্ব আজ টলটলয়মান অবস্থায় বিরাজমান। এতদ্বসত্ত্বেও বহুলোকই আজ এ জগতে মুসলমান হয়ে বাঁচতে চায়। মুসলমানী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা তাদের প্রাণের কাম্য। আমাদের এ কথাটির দ্বারা জনন চঞ্চল হয়ে তাদের অন্তরে ভয়ভীতি নিরাশা বিরাজমান করতে থাকবে যে ঘোষণাটি আমাদের দাওয়াতের নিশানবাহী রূপে প্রচার করছি আমাদের সম্পূর্ণ নতুনভাবে পূর্ণরূপে ইস্‌লামী জীবন যাপন আরম্ভ করা প্রয়োজন। এমনিরূপ করতে হবে যেন, সমাজটি পূর্ণরূপে ইস্‌লামী সমাজে রূপান্তরিত হয়। সেখানে

ইস্‌লামের মৌলিক বিশ্বাস চিন্তাধারা এবং ইস্‌লামী জীবন দর্শনের ধ্যান ধারণাটি প্রচলিত থাকবে। আর ইস্‌লামী বিধানাবলীও সর্বক্ষেত্রে কায়েম হবে। আমাদের নিকট এ সত্যটিকে এ দৃষ্টিকোন দিয়ে অবলোকন করার এবং তা ঘোষণা দেয়ায় জনমনে চাঞ্চল্য ও নৈরাশ্য সৃষ্টি হবার আদৌ কোন কারণই থাকতে পারে না। তেমনি পারে না এ দাওয়াত এবং তার বেলায় যাবতীয় ত্যাগ ও কুরবানীর পরিণতিতে নিরাশ হবার কোন হেতু। বরং আমাদের বিরুদ্ধে যারা এ বেদনাদায়ক মর্মান্তিক ঘোষণাটি দিতে পঞ্চমুখ যে, যুগ যুগান্তর ধরে এ ভূখন্ডের চতুর্দিক থেকে ইস্‌লামী জীবন–যাপন ধারা একেবারে মূলতবী হয়ে গিয়েছে। যার কারণে ইস্‌লামের অস্তিত্ব আজ নির্বাণোম্মুখ প্রায়। চিরতরে মিটিয়ে যাবার পথে। এমতাবস্থায় ইস্‌লামের দাওয়াত এবং ইস্‌লামী জীবন দর্শনের পূর্ণ জাগরণের নিমিত্ত আন্দোলনে সর্বপ্রকার ত্যাগ ও কুরবানীর প্রয়োজনীয়তা একটি অনস্বীকার্য কাজ, যা থেকে পলায়ন দুরের কথা পশ্চাদ পদ হওয়া উচিত নয়। এ দ্বীন সম্পর্কে এটা একটি নিশ্চিত সত্য কথা যে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা মানুষের অন্তরে একটি মূল বিশ্বাস রূপে বদ্ধমূল হতে পারে নাএবং পারে না মানুষের বাস্তব জীবনে ধর্মীয় মর্যাদা অর্জন করতে, যতক্ষণে মানুষ "আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য বা শাসক নেই, সার্বভৌম শাসন ক্ষমতার মালিক হচ্ছে একমাত্র তিনিই; এটা মনে-প্রাণে স্বীকার না করবে। আর এ সার্বভৌম শাসন ক্ষমতাই ভাগ্য নিয়তি জাগতিক বিধান ও তথা শরীয়াতের আহকাম, এ দুটি রূপই গ্রহণ করে। এ উভয় দিকটিই সেই মৌলিক বিশ্বাসের মূল বুনিয়াদ হবার দিক দিয়ে এ পর্যায়ভুক্ত হয়, যা মানুষের অন্তঃপুরে তা মৌলিক বুনিয়াদ হবার ব্যতিরেকে বদ্ধমূল হতে পারে না। ইস্‌লাম বাস্তব জীবনে ধর্ম হিসেবে তখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, যত সময় এ মূল বিশ্বাস বাস্তব জীবনে একটি বিধানের রূপে পরিগ্রহ না করবে। আর এ বিধানটিই হচ্ছে আল্লাহর সেই দ্বীন, যার ভিতর মানুষের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি শাখায়-প্রশাখায় এবং সামগ্রিক দিক দিয়ে শুধুমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়াতই হবে কার্যকরি। এর মধ্যে রাজা প্রজা শাসক শাসিত উভয়ের কেহই খোদায়ীত্ব ও সার্বভৌম ক্ষমতার দাবীদার হবে না। আর এর পথ হচ্ছে যে, তারা যেমন শাসনাত্ব ও সার্বভৌমত্বের দাবীদার হবে না। তেমনি অন্যান্য মানুষ যেখানে নিজদের জন্য আইন-কানুন রচনা করে, এবং বিভিন্ন বিধান উদ্ভাবন করে, অনুরূপ তারা এ ধরণের এমন আইন-কানুনও রচনা করবে না, যার অনুমতি আল্লাহ তায়ালা দেয়নি এবং আল্লার শরীয়াত থেকেও তা গৃহীত নয়। আল্লার শরীয়াত থেকে গৃহীত আইন তাই যার মধ্যে শরীয়াতের অকাট্য প্রমাণ্য আইনসমহ যথাযথ অবস্থায় ঠিক অনরূপ ভাবেই

গ্রহণ করা হবে। আর যে সব ব্যাপারে পরিষ্কার ও নির্দিষ্ট কোন নির্দেশ মালা পাওয়া যায় না, সে ব্যাপারে ইস্‌লামের সাধারণ মৌলিক নীতিমালার গন্ডীর মধ্যে অবস্থান করে ইজ্‌তেহাদ করে আইন-প্রণয়ন করতে হবে। এমনিরূপেই আল্লাহ তায়ালার নির্দেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে। তিনি এরশাদ করেছেনঃ

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَيْئٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ-

"যদি তোমাদের কোন ব্যাপারে ঝগড়া ও মত বিরোধ হয়, তবে তোমরা যদি মুমিন হও এবং পরকালের প্রতি ঈমান এনে থাকো, তবে সে ব্যাপারে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের পানে অগ্রসর হও।" (সূরা নিসায়া ৫৯)

দ্বীন এবং ইসলামের এহেন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আমাদের স্বভাবগত কোন ব্যাখ্যা নয়। একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দ্বারা আল্লাহ্ দ্বীনের বিশ্লেষণকে নির্দিষ্ট করে দেয়া এবং বর্তমান জগতে ইসলামের অস্তিত্ব অচল ও মওকুফ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার অনিবার্যতা এবং সাথে সাথে কোটি কোটি মানুষের দাবী যে তারা মুসলমান, তার প্রতি দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজনীতা, এহেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাপারে মানুষের জন্য নিজ তরফ থেকে কোন ফতুয়া দেবার অর্থ হচ্ছে দুনিয়া ও আখেরাতে নিজের ধ্বংস নিজে ডেকে আনার নামান্তর।

দ্বীন ও ইসলামের এ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আল্লাহ্ তায়ালা নিজেই পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন। যিনি এ দ্বীনের মাবুদ এবং ইসলামের প্রতিপালক। তিনি এ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এমন পরিষ্কার ও নিশ্চিতরূপে করে দিয়েছেন, যার মধ্যে অন্য কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অবকাশ রাখা হয়নি। তিনি বলেছেন–

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ذَالِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ-

"হুকুম দেবার সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় আর কারোর নেই। তাঁর হুকুম হচ্ছে যে, তাকে ব্যতীত অন্য কোন সত্ত্বারই বন্দেগী তোমরা করবে না। আর এটাই হচ্ছে জীন যাপনের সরল সহজ পথ।" (সূরা ইউসুফ–৪০)

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ-

"সুতরাং (হে মুহম্মদ) আপনি আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত আইন মোতাবিক ঐ সকল লোকদের সমস্যার সমাধান করে দিন। আপনি তাদের কুবৃত্তি নিচয়ের ইচ্ছার আনুগত্য করবেন না। তাদের ব্যাপারে সাবধান! আল্লাহ তায়ালা আপনার নিকট যে হেদায়াত নাযিল করেছেন, সেই হেদায়েত থেকে তারা আপনাকে যেন ফিৎনার মধ্যে নিপতিত করে বিপথগামী করতে না পারে। খবরদার!" (সূরা মায়েদা-৪৯)

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ-

"যারা আল্লাহর আইনানুযায়ী বিচার আচার ও ফয়সালা করে না, তারা জালেম। (সূরা নিসায়া-৬৫)

فَلَاوَرَبِّكَ لَايُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا-

"তোমার প্রভুর নামে শপথ নিয়ে বলছি যে, তারা কখনোই মুমিন নামে অভিহিত হতে পারে না, যত সময় না তারা পারস্পরিক মতবিরোধের ক্ষেত্রে একমাত্র আপনাকেই মীমাংসাকারী রূপে মেনে নিবে। অতঃপর আপনি যা কিছু মীমাংসা করবেন সে ব্যাপারে তাদের অন্তরে কোন প্রকার সংকীর্ণতা অনুভূত হবো না, বরং তারা অবনত মস্তকে তা মেনে নিবে।" (কেবল এর পরই তারা সত্যিকারের মুমিন হতে পারে)। (সূরা নিসায়া-৬৫)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ......

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসুলের সর্ব বিষয় আনুগত্য মেনে চলো, আর মেনে চলো সেই সকল লোকদের কথা, যারা তোমাদের মধ্যে আদেশ কর্তা অথবা শাসনকর্তা রূপে পরিগণিত হয়েছে। আর কোন বিষয় ঝগড়া করলে তবে সে বিষয়টি তোমরা আল্লাহ এবং রাসুলের নির্দেশের উপর সোর্পদ করে দাও। যদি তোমরা বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহ তায়ালার প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখো, তবে এটা হচ্ছে তোমাদের জন্য সঠিক কর্মপন্থা এবং পরিণতির দিক দিয়েও কল্যাণকর।" (সূরা নিসায়া-৫৯)

এখানে প্রত্যেকটি আয়াতেই সেই সত্যের প্রতি বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে যে, শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার সার্বভৌম শাসন ক্ষমতার স্বীকৃতি ব্যতীত যেমন ইসলাম গ্রহণকে বিশ্বাসযোগ্য বলা যায় না, অনুরূপ হতে পারে না ঈমান গ্রহণ করা। যে বিষয় পরস্পরের মধ্যে মতভেদ রয়েছে এবং যে সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন নির্দেশনামা দেয়া হয়নি, সে বিষয় আলাদা কথা। কিন্তু এখানে আল্লাহ তায়ালার আয়াতে পরিষ্কার নির্দেশ বর্তমান থাকায় যেমন কোন রায় বা মত প্রকাশ করার অবকাশ নেই, অনুরূপ নেই কোন মতবিরোধ হবার অবকাশ। এ ব্যাপারেও সেই শাসনের পানে ফিরে যেতে হবে। আর জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্ব ব্যাপারে একমাত্র তাঁরই নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী সকল সমাধান গ্রহণ করতে হবে। অন্য কোন দিকেই দৃষ্টি ফিরাতে পারবে না।

তার ফয়সালা ও সমাধান সমূহ বাস্তব জীবনে গ্রহণ করার সাথে সাথে তার প্রতি আন্তরিকভাবে রাজী ও খুশী থাকাও আবশ্যক। এর নামই হচ্ছে দ্বীনে কায়েম এবং এর নামই হলো পূর্ণ আত্মসমার্পণ যা আল্লাহ তায়ালা মানুষের নিকট দাবী করেন। আমরা যখন আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত দ্বীন ইসলামের এ ব্যাখ্যার আলোকে বর্তমান জগতের হিসাব করতে বসি, তখন কোথাও এ দ্বীনের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না। মুসলমানের সেই শেষতম জামায়াতটি যারা মানব জীবনে সার্বভৌম শাসনত্বকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন; এ জগত থেকে সেই জামায়াতটির বিদায় হবার সময় থেকেই এ দ্বীনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ যখন মুসলমানরা নিজদের জীবনের সমুদয় ব্যাপারে শুধু আল্লাহর শরীয়াত মোতাবিক আমল করার পথ পরিত্যাগ করে তখন থেকেই সত্যিকার অর্থে এ দ্বীনের বিলুপ্ত ঘটে।

আমাদের দায়িত্ব হলো এহেন বেদনাদায়ক মর্মান্তিক সত্যটিকে জনগণের সামনে তুলে ধরা এবং তার ঘোষণা দেয়া। আর যে সকল লোক মনে-প্রাণে মুসলমান হয়ে বাঁচতে চায় ও মরতে চায়, এ ঘোষণার দ্বারা যে তাদের মধ্যে দুঃখ বেদনা ও নিরাশার সৃষ্টি হবে এ সম্ভাবনাকে মনে আদৌ স্থান না দেয়া। কেননা এ ধরণের লোকদের জন্য এ কথা ভালরূপে বুঝে লওয়া প্রয়োজন যে, মুসলমান অবস্থায় থাকার উপায় কি? কোন পথে গেলে মুসলমান রূপে বাঁচতে পারবো এবং মরতে পারবো, সে পথটি সম্পর্কে তাদের সম্যক জ্ঞান থাকা চাই। নতুবা মনের ইচ্ছা ও বাসনার পরিপন্থি কাজ নিজের দ্বারা হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে বলেই আসল পথটি আমাদের বেছে নেয়া উচিত।

এ দ্বীনের শত্রুরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিম জন সাধারণকে প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা দানের কাজে লিপ্ত রয়েছে। এহেন তিক্ত সত্যের অভিজ্ঞতা এবং বার

বার তার মোকাবিলা করণের দ্বারা ইসলাম পছন্দ লোকদের মধ্যে যে চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা বিস্তার লাভ করে, তার দ্বারা তারা নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে প্রয়াসী। যখন থেকে মুসলিম সমাজ নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে প্রয়াসী যখন থেকে মুসলিম সমাজ নিজেদের সকল বৈষয়িক ব্যাপারে শুধু আল্লাহর শরীয়াতকে শাসক নির্বাচন করাকে পরিত্যাগ করেছে, তখন থেকেই সত্যিকার অর্থে এ দ্বীনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কারণ এটা করার অর্থই হচ্ছে হাকেমিয়াত অর্থাৎ শাসনাত্ব আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করণকে পরিত্যাগ করা। কেন আল্লাহ তায়ালাকে শাসক মেনে নেবার অর্থ হচ্ছে এটাই যে, তার আইন-কানুন ও বিধানকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে কার্যকরি করা। আর এটাই হচ্ছে তার ন্যূনতম দাবী।

ইসলামের এ দুষ্ট প্রকৃতির শত্রুরা ইসলাম পছন্দ লোকদের সন্দেহ ও অস্থিরতার দ্বারা হীন স্বার্থ অর্জন করে সেই সকল অগণিত সকল প্রাণ মানুষকে ইসলাম থেকে অমনোযোগী ও অনুভূতিহীন করে দিতে চায়, যারা মনে–প্রাণে মুসলমান হয়ে বাঁচা ও মরার প্রয়াসী। তারা তাদেরকে এ ভূলের মধ্যে নিপতিত রাখতে চায় যে আসলে তারাই মুসলমান, ইসলাম মেনে তারা খুব ভালই আছে এবং মানুষ নিজেদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে এ দ্বীনের আইন-কানুন বাস্তবায়িত না করেও মুসলমান রূপে বেঁচে থাকতে পারে। আর শাসনত্বের একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট থাকবে এবং যদি কোন মানুষ নিজে শাসনত্বের দাবীদার হয়, তবে সে যে এ দ্বীন থেকে আপন থেকে বের হয়ে কাফির হয়ে যায়, এ বিশ্বাস ও অন্তরে স্থান দেয়া তাদের জন্য জরূরী নয় বলে মনে করে।

এ চক্রান্তজাল এতদুর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে যে ইউরোপীয় দার্শনিক বেলফোর্ড কনট্রোল স্কীম "বর্তমান যুগে ইসলাম" শীর্ষক পুস্তকে মৌলিকভাবে এ কথা প্রমাণ করার জন্য ব্যর্থ প্রায়াস চালিয়েছে। সে লিখেছে তুরস্কর কামাল আতার্তুক যে সিকুলারিজমের প্রবক্তা ছিলেন তা ইসলামী শাসন। শুধু তাই নয় বরং বর্তমান যুগে ইতিহাসে সিকুলার ইজমই হচ্ছে একমাত্র সাফল্যজনক "ইসলামী আন্দোলন" যা মুসলমান এবং ইসলামের অস্তিত্ব স্থিতিশীল রাখতে সক্ষম। সুতরাং তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা উচিত। কেননা এটাই হচ্ছে একমাত্র সঠিক কর্মপন্থা।

আমাদের সমাজের অবস্থা এতদুর পর্যন্ত গিয়ে পৌছেছে। সুতরাং এর মোকাবিলায় এ দ্বীনের অস্তিত্ব জগতে বিলুপ্ত এ সত্যটিকে ঘোষণা দেয়া আজ একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। যারা মুসলমান হয়ে থাকতে চায় তারা এটাকে খুবই ভয় করে এবং এটাকে সমর্থন করতেও তারা ইতস্ততঃ বোধ করছে।

সুতরাং আমাদের এ ঘোষণাটি এ জন্য আবশ্যক যে আমাদের শত্রুরা এ দ্বীনের প্রেমিক ও এর জন্য যারা সর্বপ্রকার ত্যাগ কুরবানী দিতে প্রস্তুত; এমন লোকদেরকে ভুলের ভিতর নিপতিত রেখে যে তাদেরকে প্রতারিত করে চলেছে, সেই গোপন তথ্য ফাঁস করে দেয়া একান্ত আবশ্যক। আসল ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারলে তারা প্রতারিতও হবে না এবং আল্লাহর বিধান কোথাও প্রতিষ্ঠিত নেই সে কথা জেনে ভয়ও পাবে না। এ ঘোষণার ফলে নৈরাস্য ও অনুশোচনার যে তিক্ততা আমাদের সামনে প্রকাশ পায় তা অবলোকন করে কিংকর্তব্য বিমূঢ় ও বিহ্বল হয়ে পড়া উচিত নয়। কেননা আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস যে, ভবিষ্যৎ এ দ্বীনেরই অনুকূলে হবে। এর অস্তিত্ব যে বর্তমানে বিলুপ্ত মনে হচ্ছে তা সর্বকালের জন্য নয়। বরং এখন আর বেশী দিন বাকী নেই; খ্রীষ্টান ও কমিউনিষ্ট সাম্রাজ্যবাদীরা জগতের বুকে যতই চাকচিক্য ছড়াক না কেন আর তা যতই মোহনীয় ও আকর্ষণীয় হোক না কেন অনতিবিলম্বে তা পানির উপর উত্থিত বুদবুদের ন্যায় বিলীন হয়ে যাবে।

এ দ্বীনকে অস্থায়ীরূপে যে আমরা জগতে অনুপস্থিত দেখছি তার মূল শিকর এ ভুখন্ডের গভীর তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। তার চেয়েও অধিক পরিমাণে বিস্তৃত মানব স্বভাবের অভ্যন্তরে। বারোটি শতাব্দী ধরে ভূপৃষ্ঠের উপর বাস্তব ক্ষেত্রেও এ দ্বীনটি বর্তমান থাকা এ কথারই নিশ্চয়তা দিচ্ছে যে, আল্লাহর এ যমীন থেকে তাকে মিটিয়ে দেয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তায়ালাই প্রকৃতিকে তার অনুকূল করে তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। খ্রীষ্টান আর কমিউনিষ্ট সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত সর্বদা তাকে দমিয়ে রাখতে পারবে না। আল্লাহর এ যমীনে যেখানে বারোটি শতাব্দীর চেয়েও অধিককাল পর্যন্ত বাস্তব জগতে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, মনে রাখতে হবে ভবিষ্যত এ দ্বীনেরই অনুকূলে। জগতের অন্যান্য দেশসমূহে যেখানে তাদের ধর্ম আইন-কানুন ও সভ্যতা সংস্কৃতি তার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, তার সাথে এ দ্বীন বর্তমানে সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে। সুতরাং এ কথা ঐ সকল দেশের ব্যাপারেও সঠিক মনে করতে হবে।

বস্তুতঃ এ হচ্ছে এ দ্বীনের বর্তমান অবস্থা– সে আসল অর্থে আজ বিলুপ্ত। কেননা এ দ্বীনকে জগতের বুকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে হলে সেই অর্থেই দেখতে হবে, যা আল্লাহ তায়ালা আমাদের থেকে কামনা করে অর্থাৎ মানব জীবনে একমাত্র তাঁরই অনুশাসন চলবে আর কারো নয়। আর তার দ্বারা যমীনের বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। অর্থাৎ তার বিধানের আনুগত্য শরীয়াতের অনুকরণ দ্বারা কর্ম জগতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে যেরূপ তাঁর ইচ্ছা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আছেন! মোটকথা আসমান এবং যমীনে আল্লাহর এ ঘোষণা অনুরূপ সার্বভৌম শাসনতন্ত্র

প্রতিষ্ঠা করিয়ে দেখাতে হবে। তাই তিনি এরশাদ করেছেন–"তিনি যেমন আসমানের সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন শাসক ও মাবুদ তেমনি দুনিয়ায়ও সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন শাসক ও মাবুদ।"

এ হচ্ছে এ দ্বীনের ভবিষ্যৎ, দ্বিতীয়বার অতিসত্বর এ দ্বীনটি সত্যিকার অর্থে প্রতিষ্ঠা লাভ করার দৃঢ় আশা রয়েছে। এমন আশা যে তার অস্তিত্বের দীর্ঘতম ইতিহাস তাকে আরো অধিকতর সুদৃঢ় করে তুলছে। আরো অধিক পরিমাণে দৃঢ় সংকল্পতা ও দৃঢ়তা দান করেছে মানব প্রকৃতিতে তা মজবুত অবস্থায় বর্তমান থাকায়।

অবশ্য দৃঢ়তম আশা পোষণ করার অর্থ এ নয় যে অস্থায়ী রূপে এ দ্বীনের প্রদীপ নির্বানোম্মুক হয়ে যাবার ঐতিহাসিক কারণাবলী সম্পর্কে আমরা কোন আলোচনা তর্কে বসবো না। আজ এ দ্বীন প্রতিষ্ঠা লাভ করার পথে যে বিরাট বিরাট বাঁধা বিপত্তি রয়েছে সে সম্পর্কেও কোন আলোচনা পর্যালোচনা করবো না। আর তাকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করার যে প্রাথমিক ত্যাগ-তিতিক্ষা অনিবার্য্য রূপে প্রয়োজন, সে বিষয়ও ভেবে দেখব না, এমন নয়? বরং দৃঢ় আশা পোষণের সাথে সাথে এগুলো ভালরূপেই জানতে হবে বুঝতে হবে, করতে হবে।

মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠাকালীন প্রথম যুগে যে চরম আঘাত পেয়েছিল, সে বিষয় আমি বিগত অধ্যায় কিছুটা আলোকপাত করেছি। বনী উমাইয়াদের কঠোরতম আঘাত সেই মহান মানদন্ডের উপরই পতিত হয়েছিল, যার উপর এ সমাজটি নবী করীম (সাঃ) এবং খোলাফায় রাশেদার শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

এখন আমরা অতি সংক্ষিপ্ত রূপে সেই আঘাত গুলোর প্রতি এক এক করে আঙ্গুলি নির্দেশ করতে চাই, যা মাঝে মাঝে এ দ্বীনটির উপর এসে মরণ আঘাত হানে, এবং সেই মরণ আঘাতের সাথে মোকাবিলা করে এ দ্বীন দীর্ঘ দিন পর্যন্ত দৃঢ়তার সাথে পর্বত সম অটল অবস্থা দন্ডায়মান রয়েছে।

সর্বপ্রথম ইসলামের উপর যে আঘাত এসেছিল তা হচ্ছে আব্বাসীয়দের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব চলে যাওয়া। তারা নিজ বংশীয় লোকদেরকে নিয়ে নতুন হুকুমত প্রতিষ্ঠা করলো এবং তারা রাজ্য প্রতিষ্ঠাকালে এমন সব লোকদের উপর নির্ভরশীল হয়েছিল, যারা ছিল ইসলামের ভিতর সম্পূর্ণ নতুন। সবেমাত্র তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের থেকেও সে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। এ সকল লোকেরা ইসলামের বেলায় সম্পূর্ণ একনিষ্ঠ চিত্ত হতে পারছিল না। সম্প্রদায়িক গোড়ামী তাদের স্বভাবে বদ্ধমূল হয়েছিল। আর তাদের এ সম্প্রদায়িক গোড়ামী দ্বারা ইসলাম মারাত্মক রূপে প্রভাবিত হয়েছিল। যাদের প্রচেষ্টা ও সহায়তায় আব্বাসীয়রা নিজ বংশীয় হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং যারা পরবর্তীকালেও

নিজেদের জীবনে ইসলামের কিছুটা রং মাখিয়ে চলতো, তাদেরকে তারা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে তুর্কী সরাকাহ, দীয়ালম সহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপর অধিক আস্থাবান ও নির্ভলশীল হয়েছিল।

অথচ তারা ইসলামের সঠিক রূপরেখার বেলায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও মুর্খ ছিল। ক্রমান্বয় এ পর্যায় গিয়ে পৌছলো যে, রাষ্ট্র সম্পূন রূপে ইসলাম বিদ্বেষী লোকদের উপর নির্ভর করে অগ্রসর হতে লাগলো এবং তারই প্রভাব গিয়ে পড়লো রাষ্ট্রের উপর। আর রাষ্ট্র তা গ্রহণ করতেও আরম্ভ করলো। এ সকল লোকদের এবং রাষ্ট্রের এহেন কার্যের মোকাবিলা করা এবং ইসলামকে বাঁচিয়ে রাখার মত তখন যদি কোন বস্তু পাওয়া যেত, তবে তা ছিল ইসলামের আধ্যাত্মিক শক্তি। কেননা সে হচ্ছে বিরাট গোপন জীবনী শক্তির আঁধার ও বাহক।

এরপর আসলো তাতারীদের ধ্বংসাত্মক আক্রমণ। তারা ইসলাম জগতটিকে বর্বর হামলা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ইসলাম স্বয়ং নিজেই তাতারীদেরকে আলিঙ্গন করে এমনভাবে জড়িয়ে ধরলো যে তাই তাদের শক্তি সামর্থ শৌর্য-বীর্য্যের উপকরণে পরিণত হলো। কিন্তু এ পূর্ণতায় উপনীত হবার পূর্বেই এ আক্রমণ দ্বারা ইসলামের জাগরণী শক্তি ও স্প্রীটে কঠোরতম আঘাত লেগেছিল। আর গভীর প্রভাব বিস্তার করে ছিল ইসলামের সংগঠনিক সংস্থা এবং রসম রেওয়াজগুলোর উপর। যদিও ইসলামী হুকুমত তাতারীদের আক্রমণের মুখে দন্ডায়মান থাকতে পারছিল না; তথাপি মুসলিম জাতি পরস্পর দৃঢ় ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে শক্তিশালী ছিল। জাতি তখন কতিপয় বিশেষ আইন-কানুনের ক্ষেত্রে ইসলামের নীতি থেকে দুরে সরে পড়েছিল বটে, কিন্তু মোটামুটি রূপে তারা ধর্মীয় ভিত্তির উপর দন্ডায়মান ছিল।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে রোমন সাম্রাজ্য, যে মৌলিক রূপে দৃঢ়তা অর্জন এবং উন্নতি সমৃদ্ধি লাভের জন্য প্রায় এক হাজার বছর সুযোগ পেয়েছিল, সেই সাম্রাজ্য হুন এবং গাথ সম্প্রদায় দ্বয়ের তীব্র আক্রমণের মুখে একটি শতাব্দীও টিকে থাকতে সামর্থ হয়েছিল না। সেখানে কিছুটা পৌরানিক নিদর্শন ছাড়া সবই ধ্বংস স্তুপে পরিণত হয়েছিল। সুতরাং এর পরিপন্থী ইসলামী হুকুমতের পানে লক্ষ্য করুন। সে এ পাক যমীনে শিকর গাড়তে, দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে বড় জোড় অর্দ্ধশতাব্দীর কিছুটা বেশী সময় নিয়েছিল। কিন্তু সে শাসকদের বংশীয় পারস্পরিক কলহ বিবাদে এবং তাতারীসহ অন্যান্য জাতির প্রচন্ড হামলার মুখে এ ভূপৃষ্ঠের বিরাট এক এলাকা জুড়ে প্রতিনিয়ত দন্ডায়মানই ছিল। ইসলাম অসহযোগ অবস্থার মোকাবিলা করতে যে কতখানি বিরাট শক্তি রাখে, এটা তারই উজ্জ্বল প্রমাণ।

সামনে অগ্রসর হলে পাশ্চাত্যের ত্রিপলির মর্মন্তুদ ঘটনালী এবং প্রাচ্যের ক্রুশেডের যুদ্ধের চেহারাটি আমাদের নজরে পড়ে। ইসলাম প্রথম আঘাতটি বরদাস্ত করতে পারছিল না। কিন্তু অন্যের দ্বারা সে বিজয় মুকুটে সুশোভিত হয়েছিল। আর আজ পর্যন্তও ক্রুশেডের যোদ্ধাদের মানসিক বর্বরতাপূর্ণ শত্রুতা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্যে প্রতিনিয়তই প্রতিহত করে চলছে।

কিন্তু যে মর্মন্তুদ ঘটনা ইসলামের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে তা আবার বর্তমান যুগে নেকাব উন্মোচন করে মুখ তুলে দাঁড়িয়েছে। ইউরোপ যখন সমগ্র জগতের উপর প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করে ফেললো এবং খ্রীষ্টান কারিগর বৈজ্ঞানিক সাম্রাজ্যবাদীদের অভিশপ্ত ছায়া ইসলাম জগতের উপর পতিত হতে লাগলো, তখন সে ইসলামের প্রাণ শক্তি ও মূল স্প্রিটকে সমূলে ধ্বংস করার মানসে নিজের সমগ্র শক্তি একত্রিত করলো। ক্রুশেডের যোদ্ধাদের থেকে উত্তরাধীকার সুত্রে ইসলামের প্রতি শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণের যে অনুপ্রেরণা পেয়েছিল, তা দ্বারাই চেতনা ও আন্দোলন গড়ে তুলছে। আর ছিনিয়ে নিয়েছে বস্তুগত শক্তি এবং তামদ্দুনিক সমৃদ্ধিকে। অপরদিকে মুসলিম জাতি যে আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও বিচ্ছন্নতার শিকারে পরিণত হয়েছিল, সেই দীর্ঘ সময়টিতে আস্তে আস্তে দ্বীন ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা ও হেদায়েত থেকে তারা দুরে সরে গিয়েছিল। তার এ সময়টি কারিগরি বৈজ্ঞানিক সাম্রাজ্যবাদীদের জন্যই সুযোগ এনে দিয়েছিল।

ইসলাম ও পাশ্চাত্য জগত

ইউরোপীয়দের স্বভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুশ মানসিকতা সম্পন্ন যে গভীর শত্রুতা নিহিত রয়েছে, বাহিরের আড়ম্বরতা ও জাকজমক দেখে সে বিষয়টি থেকে আমাদের গাফিল থাকা উচিত নয়;–উচিত নয় আমাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বাহানা অবলোকন করে ভুলের মধ্যে নিপতিত হওয়া। আর বিগত যুগের ন্যায় এমন কোন মুসলিম বিদ্বেষী আন্দোলন নেই, যা ইউরোপীয়দেরকে ইসলামের প্রতি শত্রুতা পোষণের জন্য অনুপ্রাণিত করতে পারে। সুতরাং ক্রুশেডের যুদ্ধের সময় খ্রীষ্টানদের স্বার্থের জন্য যেরূপ তারা কোমর বেঁধে উঠে পড়ে মুলসমানদের বিরুদ্ধে লেগেছিল, এখন আর অনুরূপ খ্রীষ্টানদের স্বার্থের খাতিরে কোমর বাঁধা নেই–এহেন ধারণা ও গোড়ামীর শিকারেও আমাদের পতিত হওয়া থেকে সজাগ থাকা উচিত।

বাহ্যিক সৌভ্রাতৃত্ব ও উদারতা এগুলো সবই হচ্ছে প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা। বিগত মহাযুদ্ধের সময় ইউরোপীয়দের মনের গোপন কথাই ঝঙ্কারিত হয়েছিল লর্ড এলেনবাই (Allen by) এর কণ্ঠে। তিনি বলেছিলেন,–"প্রকৃত পক্ষে ক্রুশেডের যুদ্ধ আজ শেষ হলো। তাই সুদানের ইংরেজ গভর্ণরও এ সময় সেই

মনোবৃত্তিরই পরিচয় দিয়েছেন। সে দক্ষিণ সুদানের ভিতর রাষ্ট্রের সমগ্র উপকরণাবলী ও শক্তিসমূহ কলকারখানার অনুগত বানিয়ে ছিল এবং সে এলাকা থেকে মুসলিম ব্যবসায়ীদের যাতায়াত ও গমনাগমন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে ছিল। এ ব্যাপারে নিম্নের ঘটনাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। একজন মুসলিম সরকারী কর্মচারী দীর্ঘ দিন যাবৎ দক্ষিণ সুদানে চাকুরী করতেন। সে উত্তর সুদানে বদলী হয়ে যাবার জন্য বহুবার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত পেশ করেও কৃতকার্য হতে পারলো না। অতঃপর অতি ছোট একটি কাজ তাকে তৎক্ষণাৎই সেখান থেকে বদলী করে উত্তর সুদানে পাঠিয়ে দিয়েছিল। আর সে কাজ হচ্ছে, নামাযের জন্য খুব উচ্চৈঃস্বরে আযান দেয়া। এ আযান দেয়াটাই তার বদলীর প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

প্রকাশ থাকে যে স্পেনে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ সমূহের তুলনায় অন্যান্য ধর্মাবলীর সাথে রাষ্ট্রীয় আচরণ বিধির বেলায় খুব সহিষ্ণুতা ও উদারতা প্রর্দশন এবং নিজদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য তীক্ষ্মদৃষ্টির সাথে গোপন পথ অবলম্বন করা হয়েছে। কতিপয় লোক হয়তো এটা অবলোকন করে আশ্চার্যবোধ করতে পারে যে, ইউরোপীয়গণ যখন নিজেরাই খ্রীষ্টান মতবাদ থেকে দুরে সরে পড়েছে এবং সেই যুগটিরও অবসান হয়েছে, যে যুগটিতে গীর্জা ও পাদরী যাজক শ্রেণীদের দর্শন থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে যেত। তাদের কর্ণ কুহরে তার প্রতিধ্বনি শুনা যেত, যেমন হতো ক্রুশেডের যুদ্ধের যুগে। এমতাবস্থায় ইসলামের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতা ইউরোপীয়দের মনে ও স্বভাব প্রকৃতিতে এত গভীররূপে কিভাবে এখানো অবশিষ্ট থাকতে পারে? কিন্তু নিম্নের সত্য দু'টির প্রতি নিরীক্ষিয়ে চিন্তা করলে সেই আশ্চার্যবোধ করার আর কিছুই থাকে না।

ক্রুশেডারগণ যে ধ্বংসাত্মক দুর্নীতি মুসলমানদের মধ্যে বিস্তার করেছে, তা শুধু কেবল তলোয়ারের ঝনঝনানীর মধ্যই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং মূলতঃ তা ছিল প্রাথমিক একটি তাহজীব ও সভ্যতা সংস্কৃতি বিস্তারের যুদ্ধ। ইউরোপীয়দের চিন্তাধারা বিষাক্ত হবার পিছনে যে কারণটি কার্যকরি ছিল, তা হলো ইউরোপীয় নেতৃবর্গ ইসলামের শিক্ষাবলী ও অনুশীলন সমূহ এবং তার উন্নত মূল্যবোধসমূহ পাশ্চাত্যের অশিক্ষিত জাহেল জন সাধারণের সামনে তার রূপ বিকৃত করে এমনভাবে তুলে ধরেছে, যার ফলে তখন থেকে ইউরোপীয়দের অন্তরে এ হাস্যকর ধারণাটি স্থান করে নিয়েছে যে, ইসলাম হচ্ছে একটি পশুসূলভ মত্ততা উন্মাদনা এবং কামুক মনোবৃত্তির উপর নির্ভরশীর একটি কর্মধারা। এ ধারণা যেভাবে বদ্ধমূল হয়েছে ঠিক অনুরূপভাবে অবশিষ্টও রয়েছে। সেই যুগেই হযরত মুহম্মদ (সাঃ) কে "আমার কুকুর" (নাউজুবিল্লাহ) নাম রেখে অসম্মানিত করা হয়েছিল।

হিংসা বিদ্বেষ এবং ঈর্ষার এ বিষাক্ত বীজ ইউরোপের সর্বত্রই বপন করে ছিল। ক্রুশেডারদের জাহেলী উগ্রতা ইউরোপের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। আর এহেন উন্মত্ত মানসিকতাই স্পেনের খ্রীষ্টানদেরকে এ বলে উত্তেজিত করে তুলেছিল যে, স্বীয় মাতৃভূমিকে প্রতিমা পূজারকদের জুয়া খেলার আড্ডা থেকে মুক্ত করার জন্য কয়েকটি শতাব্দী সময় লেগেছিল। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত এ যুদ্ধ অসহযোগ ও অবরোধ রূপে প্রচলিত ছিল। আর এ সময়ই ইউরোপে ইসলাম বিদ্বেষীতার শিকর গেড়ে Mahomed আর Mahound এই দুইটি শব্দের তুলনা করে দেখুন। M. A. হচ্ছে বক্তার দিকে ইঙ্গিতসহ সর্বনাম আর Hound হচ্ছে জার্মান শব্দ Hound থেকে উৎপত্তি। আর এর অর্থ হচ্ছে কুকুর-এ দু'টি শব্দ দিয়ে সেই পাপিষ্ঠরা মুহম্মদ (সাঃ) কে লক্ষ্য করে হাসি-তামাসা করতো। (মহম্মদ আসাদ লিউ পলুডরিস লিখিত "ইসলাম দো রাহপর" পুস্তক দ্রষ্টব্য।)

বিস্তার লাভ করেছিল। যুদ্ধের পরিণাম ফল এই হলো যে স্পেনে ইসলামী শাসনকে পাশবিক বর্বরতাপূর্ণ অমানুষিক অত্যাচারের দ্বারা তার মূল শিকর থেকে উৎপাটিত করে এমনভাবে দুরে নিক্ষেপ করেছিল, যার নজীর দুনিয়ার ইতিহাসে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। এ যুদ্ধে বিজয় লাভ করে ইউরোপীয়দের হৃদয় সাগরে আনন্দ উচছ্বাসের ঢেউ দোলা খাচ্ছিল। আর মনের মাঝে এনে দিয়েছিল ভরপুর জোয়ার।সজীব হয়ে উঠেছিল নব আশা উদ্দীপনায় তাদের মন–প্রাণ। কিন্তু তারা এ কথাও ভালরূপে অবগত ছিল যে, এ যুদ্ধের পরিণাম ফলে সেখানের বিদ্যায়াতনগুলো এবং তামুদ্দনকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছে। আর তার স্থানে মধ্যযুগের বর্বরতা ও নিরক্ষরতা আসন করে নিয়েছে। তথাপিও তারা তাতে বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ ও দুঃখ অনুভব করেনি।

স্পেনের এ উত্তাল তরঙ্গমালা থেকে পূর্ণরূপে শান্তি ফিরে আসার পূর্বেই তৃতীয় আর একটি বিরাট ঘুর্ণিঝড় দেখা দিল যা পাশ্চাত্য জগত এবং ইসলামের মধ্যকার সম্পর্ককে অবর্ণনীয়ভাবে খারাপ করে ছিল। সে ঘটনাটি হলো কনষ্টান্টিপল তুর্কীয়দের হস্তগত হয়ে যাওয়া। ইউরোপীয়দের নিকট "বিষমতুত" গ্রীক ও রোমকদের পুরানো কীর্তি ও শৌর্য-বীর্যের সর্বশেষ প্রদর্শনী ছিল তাকে তারা এশিয়ার বর্বর জাতির মোকাবিলায় ইউরোপীয়দের একটি রক্ষিত নিরপদ দুর্গ মনে করতো। এখন কনষ্টান্টিপল হস্ত ছাড়া হয়ে যাবার কারণে মনে হচ্ছে যেন ইসলামের রেল গাড়ীটির জন্য ইউরোপের দরওয়াজা খুলে দেয়া হয়েছে। এর পরের শতাব্দীগুলো ইসলামের জন্য একটি বিরাট সংকটপূর্ণ সময়। এ সময় সমগ্র দেশ যুদ্ধ-বিগ্রহে ভরপুর ছিল। ইসলামের প্রতি ইউরোপীয়দের শত্রুতা শুধু কেবল সভ্যতা সংস্কৃতিগত শত্রুতা ছিল না, রং বর্তমানে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ

রাজনৈতিক সমস্যার রূপে পরিগ্রহ করেছে। আর নবতর পর্যায়টি ইসলামের প্রতি তাদের শত্রুতা পোষণকে আরো অধিক মাত্রায় কঠোর ও তীব্র করে তুলেছে।

এ সব কথার সাথে সাথে এটা একটি ধ্রুব সত্য কথা যে, এ যুদ্ধ ও ঝগড়া-বিবাদ থেকে ইউরোপীয়রা বেশ স্বার্থ কুড়িয়ে ছিল। ইউরোপের নব জাগরণ অর্থাৎ ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প কলার নব জাগরণ ও উন্নতি সমৃদ্ধিকে পাশ্চাত্য প্রাচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার নব জাগরণ ও উন্নতি সমৃদ্ধিকে পাশ্চাত্য প্রাচ্যের মধ্যে জাগতিক ও বস্তুতান্ত্রিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে তারই অবদান মনে করা হয়। কেননা এ ব্যাপারে ইসলাম থেকে বিশেষ করে আরবীয়দের জ্ঞান ভান্ডার থেকে তারা অনেক উপকৃত হয়েছে।' আসলে এ থেকে ইসলাম জগত যতটুকু স্বার্থ কুড়াতে না পেরেছে, তার চেয়ে অধিক স্বার্থ কুড়িয়েছে ইউরোপীয়গণ। কিন্তু ইউরোপীয়গণ এ অবদানের স্বীকৃতি দিতে রাজী নয়। সুতরাং এর পরিণতি এ হওয়া উচিত ছিল যে, ইউরোপীয়দের মন থেকে ইসলাম বিদ্বেষীতার উষ্ণতা কিছুটা প্রশমিত হবে। কিন্তু বাস্তবে ফল দেখা দিল বিপরীত। যুগ যতই অতিবাহিত হয়, তাদের শত্রুতার মাত্রাও যেন ক্রমান্বয়ে ততোই বৃদ্ধি হয়। পরিশেষে ইসলামের প্রতি শত্রুতা পোষণ তাদের মজ্জাগত স্বভাবজাত বিশেষত্বে পরিণত হয়েছিল। "মুসলিম", শব্দটির প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে ইউরোপ জাতির চেহারা রক্তিম হয়ে উঠে। ইউরোপীয় প্রত্যেকটি নর-নারীর দিল-দেমাগে ও মনে-প্রাণে ইস্‌লাম বিদ্বেষীতার বিষাক্ত ভাবধারা বিস্তার লাভ করেছিল। এর চেয়েও আশ্চার্যের কথা হচ্ছে যে, সভ্যতা সংস্কৃতির পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও তাদের এ স্বভাব সাবেক রূপে বর্তমান রয়েছে। পরবর্তীকালে যখন ধর্ম সংস্কারের যুগ আসলো। আর ইউরোপীরা বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভক্ত হয়ে পড়ে একে অপরের বিরুদ্ধে হাতিয়ার নিয়ে যখন লড়াইয়ের ময়দানে অবতীর্ণ হলো, তখনো ইসলাম বিদ্বেষীতার বেলায় সকলেই একমনা–ভাবাপন্ন ছিল। তারপর আগমন হলো সেই যুগটির যে যুগে ধর্মীয় অনুভূতি ও ভাবধারার উপর দরদমী ছেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখনো ইস্‌লামের প্রতি বিদ্বেষ ভাব সমানরূপেই বর্তমান ছিল। এ কথাটির সবচেয়ে প্রকৃত প্রমাণ হচ্ছে যে, বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক কবি ভোল্টিয়ার (Voltair) যিনি অষ্টম শতাব্দীতে খ্রীষ্টান ধর্ম এবং গীর্জার কঠোরতম বিরোধী সমালোচকদের মধ্যে একজন অন্যতম দার্শনিক ছিলেন। তিনি ইসলামের নবী (সাঃ)-এর বেলাও জঘন্য শত্রুতা পোষণ করতেন। এ যুগের ত্রিশ বছর পর আর একটি এমন যুগ দেখা দিল, যখন পাশ্চাত্য পন্ডিতেরা বিজাতীয়দের সভ্যতা সংস্কৃতি সম্পর্কে গভেষণা আরম্ভ করেছিল এবং তার পানে কিছুটা সমবেদনার মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হলো বটে। কিন্তু

ইসলামের বেলায় ঘৃণা ও অবজ্ঞা বিমিশ্রিত যে চিন্তাধারা ও রীতিনীতি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিল, তা তখনো তাদের সাহিত্যের পৃষ্ঠায় অস্বাভাবিক সাম্প্রদায়িকতার রূপে ঝঙ্কারিত হচ্ছে। ইতিহাস ইউরোপ এবং ইসলামের মধ্যে যে বিরাট সাগর সম ব্যবধান সৃষ্টি করে দিয়েছিল, তা এখন বলবৎ রয়েছে। ইসলামের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন ইউরোপীয়দের চিন্তাধারার একটি মৌলিক বিশেষত্বে পরিণত হয়ে গিয়েছে। বর্তমান যুগ পর্যন্ত পাশ্চাত্যের প্রাচ্য জ্ঞান বিশারদগণের মধ্যে তারাই অগ্রগামী, যারা ইসলামী দেশসমূহ কর্মতৎপরতার সাথে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রচারক হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন। তারা ইসলামের শিক্ষাবলীর রূপান্তরিত যে চেহারাটি পেশ করে তাকে এমন কায়দায় ঢালাই করে সাজানো হয় যেন মূর্তি পূজারকদের পক্ষ থেকে ইউরোপীয়দের দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবিত করে ফেলতে পারে। এহেন বক্র চিন্তাধারা এখনো বর্তমান রয়েছে–যদিও প্রাচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান (Ariental studises) আজ মেশিনাররীর প্রভাব থেকে মুক্ত। আর এ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভ্রান্তিমূলক ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও গোড়ামীর কারণে মেশিনারীর সাথে যে সম্পর্ক বিজরিত রয়েছে, এ আপত্তি উত্থাপন করার অবকাশ আর এখন নেই। প্রাশ্চাত্য জ্ঞান বিশারদ ও বৈজ্ঞানিকদের "ইসলাম বিদ্বেষীতা" একটি উত্তরাধিকারী এমন স্বভাব ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, যা তারা ক্রুশেডের যুদ্ধ এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট লোকদের সেই প্রভাব বিস্তারের পরিণতি, যা ইউরোপের আদি বাসিন্দাদের মন, মগজে ও দেল-দীমাগের উপর বসিয়ে দিয়েছিল।

কতিপয় লোক এ প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, এত দীর্ঘ দিনের পুরাতন ঘৃণা ও শত্রুতা, যা নিছক ধর্মীয় শত্রুতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আর এটা খ্রীষ্টান গীর্জাসমূহের আধ্যাত্মিক প্রভাবের কারণে হয়তো সে যুগে সম্ভব হতো। বর্তমানে যখন ধর্মীয় সমস্যাটিই ইউরোপীয়দের নিকট বিগত দিনের অবাঞ্ছিত কথা ছাড়া কোন মূল্য নেই; তখন তা এখনো ইউরোপীয়দের মনে বিরাজমান থাকতে পারে কিরূপে?এ ছাড়া ইসলাম এবং খ্রীষ্টান ধর্মমতের মধ্যে মৌলিকভাবে বিরাট পার্থক্য বিরাজমান। ইসলাম সর্ব প্রকার জাগতিক প্রস্তুতি নিতে, দৃঢ় ভাবে যমদূতের ন্যায শত্রুর মোকাবিলা করতে এবং সর্বপ্রকার কোরবানী বরণ করতে অনুপ্রাণিত করে। আর দুর্ববলতার শিকারে পরিণত হয়ে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে কাপুরুষের ন্যায় বসে থাকা লোকদেরকে দুনিয়া আখেরাত উভয় ক্ষেত্রে মারাত্মক পরিণামের ধমক দেয়। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ -

"যতদুর তোমাদের সম্ভাব্য শক্তি সামর্থ্য রয়েছে সেই সর্বাধিক শক্তি নিয়ে এবং যুদ্ধের জন্য শক্তিশালী ঘোড়া সাজিয়ে তাদের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকো। কারণ এর দ্বারা তোমরা আল্লাহর দ্বীনের দুশমন এবং তোমাদের দুশমনদেরকে ভীত শঙ্কিত করে তুলতে পারবে।" (সূরা আনফাল-৬০)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَاتَتَّخِذُوا الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

"হে ঈমানদারগণ! মুমিনদেরকে ছেড়ে দিয়ে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করো না।" (সূরা নিসায়া-১৪৪)

فَلْيُقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ـ

"যারা পরকাল দ্বারা এ জগতকে খরিদ করতে চায়, আল্লাহর পথে তাদের লড়াই করা উচিত।" (সূরা নিসারা-৭৪)

وَلَاتَهِنُوْا وَلَاتَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ـ

"তোমরা ভীত ও চিন্তিত হয়ো না, যদি তোমরা সত্যিকার অর্থে মুমিন হও তবে তোমরাই বিজয় লাভ করবে। যদি তোমরা আঘাত পাও, (তবে মনে রেখ) এমনি আঘাত তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরাও পেয়েছে"" (সূরা আলে এমরাণ-৩৯)

উপরেবর্ণিত আয়াত দ্বারা এ কথাই প্রমাণ হয় যে, ধর্ম একটি বিরাট রুহানী শক্তি। আর জাগতিক শক্তি সঞ্চয়ের আহ্বানকারী বিশেষ। প্রত্যেকটি হামলাকারীর মোকাবিলায় তার নিজে একটি কঙ্কারময় শিলাভূমি বিশেষ এবং দৃঢ়ভাবে দন্ডায়মান হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার অনুপ্রেরণা দায়ক।

সুতরাং আমেরিকা ও ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক কারিগরদের ও সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য এ দ্বীনের শত্রু না হয়ে থাকার কোন উপায়ই নেই।

ইস্‌লামের প্রতি তাদের শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ বিভিন্ন জাতির উন্নয়ন পদ্ধতির সাথে বিভিন্নরূপে হয়। আর স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী নব নব-রূপ গ্রহণ করে। যেমন, ফ্রান্স পশ্চিমের সমগ্র আরব দেশসমূহে সেই শত্রুতার বশবর্ত্তি হয়েই নিরক্ষর ও বর্বর জাতিগুলোর হেফাজত বা অন্য কোন টালবাহানা দেখায়ে প্রকাশ্য

ভাবে ইস্‌লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে রেখেছে। সিরিয়ায় তাদের প্রতিনিধি দিন দুপুরে এ ঘোষণা করে বেড়াচ্ছে যে, তারা ক্রুশেডের যোদ্ধাদের বংশধর। তারা মিসরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার নিমিত্ত গোপনে গোপনে সেখানে শিক্ষা প্রষ্ঠিান এবং সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলোর মাধ্যমে পথ খুঁজে নিচ্ছে যেন, তারা শিক্ষার মধ্য দিয়াই সেখানে ছাত্রদের মধ্যে এমন একটি মানসিকতা সৃষ্টি করতে পারে, যা শুধু কেবল ইস্‌লামী জীবনময় বরং প্রাচ্যের জীবন পদ্ধতির সমুদয় মূল্যবোধ সমূহকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে অবলোকন করবে। যখন তারা এহেন মানসিকতা ও মনোবৃত্তি সম্পন্ন শিক্ষকদের একটি শ্রেণী ও গোষ্ঠী সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়, তখন তাদেরকে বিভিন্ন স্কুল কলেজ ইউনিভারর্সিটি ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ জন্য প্রবেশ করিয়ে দেয়, যেন তারা ভবিষ্যৎ বংশধরদের এবং আগত নবীনদের মন-মগজ দিল দিমাগকে তাদের নিজস্ব চিন্তাধারা ও সভ্যতা সংস্কৃতির ছাঁচে ঢালাই করে সাজিয়ে নিতে পারে। সাথে সাথে তারা শিক্ষা দফতরে যে সকল উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের উপর জাতীয় শিক্ষা-নীতি রচনা করার দায়িত্ব থাকে, সেই সকল পদ থেকে ইস্‌লামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি কৃষ্টি কালচারের সত্যিকারের প্রতিনিধিত্বশীল লোকদেরও দুরে সরিয়ে রাখে। সুতরাং এহেন প্রয়োজনীয় কাজ এমন একটি শ্রেণীর উপর দায়িত্ব অর্পণ করে, যারা মিসরের সাধারণ মানসিকতা সৃষ্টি করতে খুবই কার্যকরি ও অধিক মাত্রায় ফলপ্রসু প্রমাণ হয়। তখন ইংরেজদের এবং দ্বীনী ভাবধারা ও ধর্মীয় চেতনাবোধের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ করার প্রয়োজন থাকে না। দক্ষিণ সুদান সম্পর্কে বলতে হয় যে, সেখানে তাদের এ ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজন পড়েনি। সেখানে তারা যে কর্মনীতি গ্রহণ করেছিল, তা খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারক এবং মুসলিম ব্যবসায়ীদের বেলায় সেই কর্মনীতিই ছিল, যে বিষয় আমি ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। আর আমেরিকা এমন অবস্থা সৃষ্টি করে এবং এমন মত পথ ও কর্মনীতি প্রচরণ করে, যাতে ইস্‌লামী আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস স্তুপে পরিণত হয়। কয়েক শতাব্দী ধরে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও করিগরিতে উন্নত দেশগুলো ইস্‌লামের প্রতি শত্রুতা এবং ধ্বংস করার ব্যাপারে একই নিয়মের কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে চলে আসছে। আর এখনো জেনে শুনে এবং তাদের এহেন চক্রান্ত উপলব্ধি করে ও পূর্ণমতৈক্য ও সহযোগীতার সাথে চলে আসতেছে। আমরা এ গভীর সত্যটিকে পরিষ্কারভাবে সেই কর্মনীতির মধ্যে অবলোকন করতে পারি যা পাশ্চাত্যের জাতিসমূহ সেই সব বিষয় গ্রহণ করে থাকে, যার সাথে ইস্‌লামের সাথে দুর ও নিকটতম কোন সম্পর্ক বলতে কিছু নেই।

যারা এ কথা মনে করতেছে যে, আমেরিকা এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশসমূহের ভিতর ইয়াহুদীদের অর্থনৈতিক প্রভাব পাশ্চত্যকে এ দিকে নিয়ে যাচ্ছে অথবা যাদের মতে ইংরেজদের উদ্দেশ্য এবং ইংলিশ জাতিসমূহের

ছলচাতুরী তাদেরকে এ পথ মতে পরিচালনা করতেছে কিম্বা যাদের নিকট পাশ্চাত্য ব্লক এবং প্রাচ্য ব্লুকের পারস্পরিক ঝগড়া-বিদাই এ পথে অগ্রসর হবার কারণ, তারা সকলেই মূল সমস্যাটির এমন একটি দিক দৃষ্টির আড়ালে ফেলে যাচ্ছে, যা ঐ সকল উপাদানের সাথে সংযোজন হওয়া আবশ্যক। আর সেই দিকটি হচ্ছে ক্রুশেডের মানসকিতা ও মনোবৃত্তি, যা পাশ্চাত্যের লোকদের শিরা-উপশিরায় ও ধমনিতে প্রবাহমান এবং তাদের দিল-দীমাগ ও মানসিকতায় দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল। বৈজ্ঞানিক কারিগর ও সাম্রাজ্যবাদীদেরকে ইসলামের প্রাণ শক্তি ও আধ্যাত্মিক শক্তির ব্যাপারে যে ভীত শঙ্কিত দেখা যাচ্ছে, তার কারণেই ইস্‌লামের শক্তিকে দমন করে দেয়ার প্রচেষ্টা সমগ্র পাশ্চাত্য জগতকে ইস্‌লামের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে একই কাতারে দন্ডায়মান করিয়েছে।

ইস্‌লাম বিদ্বেষীতা এবং তার ধ্বংস কামনা–এ একটি নীতিই সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া এবং পুঁজিবাদী আমেরিকাকে এক কাতারে এনে দাঁড়-করিয়েছে। আন্তর্জাতিক খ্রীষ্টান আন্দোলন ইস্‌লামের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণের ব্যাপারে এবং তার বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টান বৈজ্ঞানিক জগত এবং প্রাচ্যের বস্তুতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক জগত উভয় ইস্‌লাম বিরোধী শক্তিগুলোকে একত্রিত করার ব্যাপারে যে ভুমিকা নিয়েছে তা আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। রাসূরে করীম (সাঃ) এর হিজরত করে মদীনায় আগমন এবং সেখানে ইস্‌লামী হুকুমত প্রতিষ্টাবদি আজ পর্যন্ত ইয়াহুদীরা পরস্পর এ কাজই করে চলে আসছে।

আশ্চার্য্যের কথা হচ্ছে যে, এত বড় বিরাট বিরাট বিপদ-আপদ-ঝড়-ঝঞ্ঝা থাকা সত্ত্বেও নৌকাখানাকে প্রথম থেকে যাদের সাথে মোকাবিলায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে, সেই সকল প্রভাব সমূহের দ্বারা এত শীঘ্র এ আক্রমণের কবলে পতিত হবার দরুণ তা নবাগত বিধানের উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতঃপর বর্তমান নব সভ্যতায় যুগে পাশ্চাত্যে সভ্যতা স্বীয় বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত শক্তি সমেত প্রভাব বিস্তার করায় এবং বহু মুসলমানকেও ইস্‌লামকে ধ্বংস করার কাজে সাম্রাজ্যবাদীর হাতিয়ার স্বরূপ ব্যবহার করা সত্ত্বেও ইস্‌লামের প্রাণ ও রূহুটি আজ পূর্ণ অক্ষত অবস্তায় নিরাপদে রয়েছে। তার ভিতর যে শক্তি নিহিত রয়েছে তা সমগ্র মানব জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে চলছে। আর চৌদ্দশত বছর ধরে আমাদের বর্তমান যুগ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং তার বিবর্তনশীল গতিধারার উপর ও ক্রমাগতভাবে প্রভাব বিস্তার করছে। বর্তমান যুগে ইসলাম জগতের সামাজিক অর্থনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবন মারাত্মকভাবে উশৃঙ্খল বিশৃঙ্খলা ও বিক্ষিপ্ততা এবং বিজাতীয় সভ্যতার খপ্পরে পড়লেও পৃথিবীতে এমন কোন রাজনৈতিক ও সামরিক আন্দোলনের অভ্যুত্থান ঘটেনি, যার মধ্যে ইসলামের কোন কার্যকরি ভূমিকা ও অংশ ছিল।

ইসলামী জগতের পূর্ণজাগরণ

অমানিশার ঘোর অন্ধকার দুরীভূত হয়ে দিবা চক্রবালের পূর্ব প্রান্তে প্রভাতের লালিমা ফুটে উঠার সময় আজ প্রত্যাসন্ন। ঘুমের নেশা এবং অলসতা কেটে যাচ্ছে। বৈরাগ্য এবং মনের কালিমা দুরীভূত হয়ে আবার হৃদয় কানায় কানায় জোয়ারে ভরপুর হয়ে উঠেছে। ইসলামের প্রতি এত বড় বিরাট হামলা আসা সত্ত্বেও প্রত্যেকটি স্থানে ইসলামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার যে নিরলস প্রচেষ্টা ও আন্দোলন উঠেছে, মনে হচ্ছে যেন, ইসলাম সয়লাবের ন্যায় আবার উচ্ছাসিত ঢল নিয়ে সমগ্র বিশ্ব জগতকে সজীব করে তুলবে। ইসলামের ভিতর এমন একটি জীবনী শক্তি নিহিত রয়েছে, যা দৃষ্টির আড়ালে ফেলে যাওয়া চলে না। ইসলাম শক্তির এমন একটি ভান্ডার যে তা দ্বারা আবার নতুন করে সম্পূর্ণরূপে এমন একটি ইসলামী জীবন-বিধান বাস্তবায়িত করা যায়; যে জীবন–বিধান শুধু আশা-আকাঙ্খা এবং শুভ স্বপ্নের দ্বারাই নয়, বরং তা বাস্তব জগতের এমন সুকঠিন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, যা দেখা যায় অবলোকন করা যায়। ইসলামী জীবনের পুর্ণবিন্যাস আজ বিচ্ছিন্ন লোকদেরকে একত্র করণে এবং তাদেরকে পুনর্গঠনের ও অন্যান্য প্রস্তুতির বিভিন্ন পর্যায়গুলো অতিক্রম করে চলছে। যে সকল বাধা-বিপত্তি ও ঘাত-প্রতিঘাতের সাথে তার মোকাবিলা হওয়া সত্ত্বেও কখনো কখনো তার আন্দোলনের গতিধারা থেমে যেতো অথবা কয়েক কদম পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু এ সকল বাঁধা বিপত্তি পানির উপরের বুদ্ধুদের ন্যায় আপন থেকেই বিলীন হয়ে যাবে। এ হচ্ছে গ্রীষ্মকালের মেঘমালা, একে দক্ষিণা মৌসুমী মলয় উড়িয়ে নিতে বেশী সময়ের প্রয়োজন হবে না।

আমি এটা মনে-প্রাণে পূর্ণ আন্তরিকতা নিয়ে শর্তহীনভাবে বিশ্বাস করি যে, ইসলাম জগতে ইসলামী জীবনের পুনরুজ্জীবন খুবই সহজ। আর আগত ভবিষ্যতে ইসলাম শুধু কয়েকটি দেশেই নয়-বরং সমগ্র দুনিয়ার জীবন বিধানে পরিণত হবার পূর্ণ যোগ্যতায় অধিকারী। কিন্তু মনের এহেন অটল বিশ্বাসে বশীভূত হয়ে খেয়ালী জোস উচ্ছাসের খরস্রোত প্রবাহিত হয়ে এ দাবি করে বসতে পারি না যে, এ কাজটা খুবই সহজ কাজ। বরং এ পথে বিভিন্ন প্রকার বিরাট বাধা বিপত্তি পাহাড় সম প্রতিবন্ধক হয়ে দন্ডায়মান রয়েছে। এমন এমন বিরাট বিরাট কাজ রয়েছে, যা সম্পন্ন করা ব্যতিরেকে আমরা ইসলামী সোসাইটিতে সত্যিকার ইসলামী আর্দশ পুনরুজ্জীবনের আশা করতে পারি না।

এ সকল বিরাট বিরাট বাধা-বিপত্তিগুলোর সঠিক নিরূপণ ও পরিসংখ্যাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমরা যে উদ্দেশ্য সাধন করার প্রয়াসী, তার উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত প্রস্তুত থাকা প্রতিটি ব্যক্তির উপর যে দায়িত্বাবলী অর্পিত হয় তার গুরুভারের চেতনা বোধই এ কাজের মূলদাবি।

আশা-আকাঙ্খাকে বাস্তবায়িত করে এবং ইচ্ছা বাসনাকে কর্ম জগতে রূপদান করার জন্য শুধু জোড়ালো তাকবীর ধ্বনিই যথেষ্ট নয়। বরং এ পথে পূর্ণ সাফল্য অর্জনের জন্য; এ পথের বাঁধা-বিপত্তিগুলো এবং তার মোকাবিলায় দায়িত্বাবলীর সঠিক নিরূপণ করা, যাদেরকে তাকবীর ধ্বনি অনুপ্রাণিত করা উদ্দেশ্য তাদেরকে এ মহান সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করা একান্ত আবশ্যক।

স্বাভাবিক ভাবেই দীর্ঘ দিন যাবৎ ইসলামী প্রাণ শক্তি রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে দুরে রয়েছে। আর এর কারণেই ইসলামী রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করাটা মুস্কিল ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিধান, জীবনের বিভিন্ন মূল্যবোধ ও নিয়ম পদ্ধতি এবং আধ্যাত্মিক ও মানসিক গতিধারা এমন কয়েকটি নির্দিষ্টতম মৌলিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, যা দীর্ঘ দিন পরিশ্রম ও আন্দোলন পরিচালনা করার পর পরিবর্তন করা সম্ভব। সময় যতই অতিবাহিত হবে অসুবিধা আরো অধিক মাত্রায় প্রকট হয়ে দেখা দেবে। আর ততো বেশী দিনই পরিশ্রম ও আন্দোলন পরিচালনা করতে হবে।

যুগের দুরত্ব ছাড়াও একটি কারণ কার্যকরি রয়েছে। আমরা এ জগতে একা নয়। আর জগতের অন্যান্য দেশ থেকেও আমরা এক ঘরে হয়ে থাকতে পারি না। আমাদের বহু কাজ ও সমস্যা জগতের সেই সকল অন্যান্য দেশের সাথে জড়িত রয়েছে, যে দেশসমূহের উপর এমন একটি সভ্যতা সংস্কৃতি বিস্তার হয়ে আছে যা ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতি ও মানুষের ভাবধারার সম্পূর্ণ পরিপন্থী একটি মানসিকতা। এগুলোই সত্যিকার ইসলামী জীবন পদ্ধতি পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারে আমাদের চলার গতিধারাকে যেমন স্তিমিত করে দেয়, তেমনি বাড়িয়ে দেয় আমাদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যকে।

পাশ্চাত্য জগতের সাথে আমাদের নানাবিধ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রয়েছে, তারা আমাদের তুলনায় যে অধিক শক্তিশালী এ সত্যটিই এ শেষতম কারণটির অধিক পরিমাণে গুরুত্ব বাড়ায়। ইসলামের প্রথম যুগের ন্যায় এখন আর আমরা তার উপর যেমন প্রভাবশালী নই। তেমনি আমাদের নিকট এমন শক্তিও নেই যে আমরা তার সাথে মোকাবিলা করবো। এ ছাড়া আমাদের বিশেষ করে আমাদের

ধর্মের যে বিরাট শত্রু তাতে তো কোন সন্দেহই নেই। আমরা যে সম্পূর্ণভাবে নতুনরূপে ইসলামী জীবন বিধান বাস্তবায়িত করবো এবং সত্যিকার ভাবে ইসলামী জীবন আরম্ভ করবো তা তারা কোন ক্রমেই পছন্দ করতে পারে না। এখন আমাদের উদ্দেশ্যকে সাফল্যের তোরণে উপনীত করতে হলে অসাধারণ চেষ্টা তদবীর ও বিরামহীন সংগ্রাম ছাড়া সম্ভব নয়। পাশ্চাত্যের উপর যদি আমরা প্রভাবশালী হতাম, তখন আমাদের মধ্যম শ্রেণীর চেষ্টা তদবীরে করা প্রয়োজন হতো। কিম্বা তারা যদি আমরা যে শাসনের পানে যেতে ইচ্ছুক তার শুভাকাংখী হতো, তখনো মধ্যম শ্রেণীর চেষ্টা তদবীর ফলপ্রসু হতো।

কিন্তু এ সকল কথার অর্থ এ নয় যে, ইসলামী জীবন-বিধানকে দ্বিতীয়বার গ্রহণ করা অসম্ভব। বরং এর অর্থ হচ্ছে এ কাজটি একটি মহান দায়িত্বপূর্ণ ও বিরাট সুকঠিন কাজ। আর তার বিরামহীন সংগ্রাম এবং নিরবিচ্ছিন্ন আন্দোলনে একান্ত আবশ্যক। এ কাজ আরম্ভ করার পূর্বে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে তার প্রতি পূর্ণ আন্তরিকতা ও উদ্দাম উৎসাহের সাথে বিশ্বাস স্থাপন করা, যেন এ পথে যত প্রকার জুলুম অত্যাচার বিপদ-আপদ দুঃখ-কষ্ট এসে উপস্থিত হয়, তাকে খুশীতে বরণ করে নেয়ার মত শক্তি সাহস ও মনোবৃত্তি সৃষ্টি হয়। এর জন্য হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম এবং নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম করতে হবে। তাকে দৃঢ়ভাবে আকড়িয়ে ধরতে হবে।

আর এ কথার প্রতি যেন গভীর বিশ্বাস সৃষ্টি হয় যে বর্তমানে ইসলাম জগত এবং সমগ্র মানবতার জন্য এ জীবন বিধানটি একান্ত জরূরী, যা বর্তমান মানব রচিত বিধানগুলোর মধ্যে জোড়াতালি দিয়ে কাজ করতে ইচ্ছুক নয়। বরং নতুনভাবে প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত একটি পূর্ণ নব জীবন বিধান প্রতিষ্ঠান করতে বদ্ধপরিকর হয়।

এ পরিপ্রেক্ষিতে এ সত্যটিকে উল্লেখ করা অসংগত হবে না যে বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা পঁচিশ বছরের নাতিদীর্ঘ সময় জগতকে দ্বিতীয়বার আর একটি বিশ্ব যুদ্ধের মুখে ফেলে দিয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সে সমগ্র জগতটিকে প্রাচ্য পাশ্চাত্য দুটি ব্লকে বিভক্ত করে ফেলেছে। এখন আবার তৃতীয় আর একটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা অনুভব হচ্ছে। প্রত্যেকটি স্থানে চাঞ্চল্যতা ও অশান্তি সাধারণভাবে বিরাজমান। বিশ্বের তিন চর্তুর্থাংশের মধ্যে ক্ষুধা বুভুক্ষতা দুর্ভিক্ষ এবং দারিদ্রতার অভিশাপ ব্যাপৃত। বিশ্বের ব্যবস্থাপনাও টলটলময়ান। বিশ্ব আজ তার পুর্ণগঠনের নিমিত্ত একটি নবতম ভিত্তিমূল অনুসন্ধান করে চলছে। এর এমন একটি নবতর আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজন, যা একবার মানুষকে মানবতার নীতি শিক্ষা দিতে পারে।

বস্তুতঃ এতকিছু প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও আমাদের পাশ্চাত্য জগতকে ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতির মৌলিক বুনিয়াদগুলো গ্রহণ করার যোগ্যতার ব্যাপারে খুব বেশী ভাল-ধারণার মধ্যে নিপতিত হওয়া উচিত নয়। এ সমস্যাটি সম্পূর্ণ একটি ভিন্নতর সমস্যা। লর্ড বার্ণাডস'র উক্তি মতে দেখা যায় যে, পাশ্চাত্য জগতের গতিধারা এই দিকেই। তার মতে পাশ্চাত্য জগত ইসলামের পানে অগ্রসর হয়ে আসতে দেখা যায়। তিনি বলেন–"আমি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম যে, অনাগত ভবিষ্যতে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রদত্ত জীবন বিধানই সমগ্র ইউরোপ জগতে বাস্তব স্বীকৃতি লাভ করবে। আসলে এ ধর্মটি আজ তাদের নিকট পছন্দনীয় ধর্ম বলে বিবেচিত হতেছে। মধ্যযুগে খ্রীষ্টান ধর্মযাজক সম্প্রদায় নিজেদের অজ্ঞতার এবং স্বকীয়তার গোড়ামীর কারণে ইসলামের আসল রূপরেখাটি খুব ভয়ানক চিত্র অঙ্কন করে জনসাধারণের সামনে পেশ করেছিল। তারা মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তার প্রবর্তিত ধর্মের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্দেষ পোষণের বেলায় সীমা অতিক্রম করে।

তারা তাঁকে হযরত ইসা (আঃ)-এর দুশমন মনে করতো। আমার মতে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে মানবতার মুক্তিদাতা আখ্যা দেয়া কর্তব্য। আমার পূর্ণ বিশ্বাস যদি এ ধরণের কোন লোক আজ সমগ্র দুনিয়ার নেতৃত্ব ও শাসনভার হাতে নেয়, সে নিশ্চয়ই সমগ্র বাধা-বিপত্তি ও দুঃখ-দুর্দশার সমাধানে সাফল্য লাভ করবে। আর জগতের বুকে নিয়ে আসবে বেহেস্তের শান্তি সওগাত, মানুষ পাবে সত্যিকারের মুক্তি, দেখতে পাবে তারা শান্তি আর শান্তি।

বিংশ শতাব্দীর কতিপয় নিরপেক্ষ দার্শনিক ও চিন্তাবিদ মুহম্মদ (সাঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মটির আসল মান মর্যাদা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছিল। কারলাইল, গেট্রে এবং গাবন প্রমুখ মণীষীরাও তাদের অন্তুর্ভূক্ত। তাদের এই নিরপেক্ষতার ফলেই ইসলামের ব্যাপারে ইউরোপীয়দের দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছুটা সন্তোষ জনক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ এ ব্যাপারে যথেষ্টই অগ্রসর হয়েছে। তারা মুহম্মদ (সাঃ)-এর পোষণকৃত বিশ্বাস ও প্রবর্তিত জীবন বিধানকে সুদৃষ্টিতে অবলোকন করে আসতেছে। হতে পারে আগত শতাব্দীগুলোতে তারা এ ব্যাপারে আরো অগ্রসর হবে, আার নিজেদের সমস্যা সমাধানে ঐ মতবাদের মান মর্যাদার পূর্ণ স্বীকারোক্তি দিবে। আমার জাতি এবং ইউরোপের বহু লোক বর্তমানে মুহাম্মদের ধর্মকে গ্রহণ করে নিয়েছে। আমাদের এ ঘোষণা সেই সত্য কথারই প্রতিধ্বনি হচ্ছে যে, ইসলামের পানে ইউরোপের বিপ্লব কার্যতঃ আরম্ভ হয়েছে।"

কিন্তু আমরা দেখছি সে বার্ণাডস'র এ ভবিষ্যদ্বাণী, ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবেই থেকে যাচ্ছে। যদিও এ সন্দেহ অবশ্যই থেকে যায় যে, এ কথাগুলো

মসূলমানদের চেতনা অনুভূতিকে নিস্তব্ধ করে দেয়ার বেলায় আফীমের ভূমিকা না নেয়। কারণ হয়ত তারা এ আশ্বাসবাণী শুনে হাত পা ছেড়ে ইউরোপীয়রা কখন এ দ্বীনটি গ্রহণ করবে সেই আশায় অপেক্ষা করতে থাকবে। যা হোক এ ধরণের অবস্থা হবার আশা কমপক্ষে সময় আসার পূর্ব হতে পারে এটা হবার দু'টি কারণও রয়েছে।

প্রথম কারণটি হচ্ছে ইউরোপ ও আমেরিকানদের উত্তরাধীকার সুত্রে প্রাপ্ত ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ ও বৈরীভাব পোষণ, যা তাদের স্বভাবে গভীরতলে শিকর গজিয়ে রয়েছে। বর্তমানে এ শত্রুতার সাথে আর একটি বস্তু সংযোজন হয় যে, এই মনের গাড়ীটির মধ্যে আর একটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়া প্রাচ্য প্রাশ্চাত্য উভয় স্থানের সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের পরিপন্থি।

আর দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে রোমান সভ্যতার যুগ হতে আরম্ভ করে আধুনা যুগ পর্যন্ত ইউরোপীয়ানদের মানসিকতা বস্তুগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব তার উপর খুবই ক্ষীণ। এ বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনায়র প্রয়োজন। তার স্বার্থই কল্যাণ কারিতা শুধু এ বিষয়টি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর দ্বারা আমাদের সামনে এ গুরুত্বপূর্ন প্রশ্নেটির জবাবও দাবি করে যে, ইসলাম আর পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগীতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব কি না? যদি সম্ভব হয়, তবে তা কতদুর পর্যন্ত এবং তার সীমা রেখা কতটুকু।

ইউরোপীয়গণ যে, এক দিনের জন্যও খ্রীষ্টান ধর্মের উপর ছিল না, সে বিষয়টি আমরা প্রথম অধ্যায়ে আলোকপাত করেছি। এর কারণ হলো যে, ইউরোপীয়ানদের একটি স্বল্প পরিসর কম উৎপাদনশীল এলাকায় বসতি হবার কারণ। সেখানের সামাজিক জীবনে যে টানা-হেঁচড়া প্রবাহমান ছিল তা খ্রীষ্টান মতবাদের মহান উদারতার নীতিকে এ শিলাভূমিতে শিকড় গজাবার সুযোগ দেয়নি। খ্রীষ্টান ধর্মের ভিতর যে বৈরাগ্যবাদ ও বাস্তব জগত থেকে দুরে সরে থাকা এবং জীবন সমস্যার সমাধান থেকে পশ্চাদপসারণের বিশেষত্ব খুঁজে পাওয়া যায়, তার জন্য তারা খুবই সন্তুষ্ট এবং এর চেয়ে এক কদম তারা অগ্রণী। এখন আমরা এ কারণ দু'টির সাথে আর একটি কারণ সংযোজন করে দিতে চাই, যে বিষয়ে আমি প্রথম অধ্যায় যৎকিঞ্চিৎ আলোকপাত করেছি। আর সে কারণটি হচ্ছে সদাসর্বদা রোমান সাম্রাজ্য খ্রীষ্টান ধর্মের গতিপথে বিরাট প্রতিবন্ধক রূপে দন্ডায়মান থাকা। ইউরোপ খ্রীষ্টান মতবাদ গ্রহণ করা সত্ত্বেও রোমান সাম্রাজ্যের শিক্ষানীতি ও আদর্শাবলীই ইউরোপের নব সভ্যভার ভিত্তিমূলে পরিণত হয়েছিল। কখনো গভীর তলদেশে গিয়ে পৌঁছিতে পারেনি। এখানে আমি "ইসলাম দু'টি

পথে" (ইসলাম দো-রাহ পর) শীর্ষক পুস্তক থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি, যা আমাদের বক্তব্য প্রকাশের জন্য যথেষ্ট হবে বলে মনে করি।

"রোমান সাম্রাজ্য যে মতবাদ ও চিন্তাধারার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তা ছিল অন্যান্য জাতিকে শক্তির দ্বারা ধ্বংস করা অথবা নিজ মাতৃভূমির খাতিরে তাদেরকে উচ্ছেদ করণের চিন্তাধারা। বিশেষ শ্রেণীর আরাম-আয়েশ সুখ শান্তির জন্য অন্যান্যদের উপর জুলুম অত্যাচার করণ রোমানদের নিকট না কোন খারাপ কাজ বলে মনে হতো আর না নৈতিক অধঃপত বলে তারা মনে করতো। রোমানদের ন্যায় বিচার বলতে সমাজ যা কিছু বুঝতো তা কেবল রোমানদের জন্য খাছ ছিল। আর এ কথা পরিষ্কার যে, জীবনের এ ধরণের গতিবিধি ও সভ্যতা নিছক বস্তুগত ধ্যান–ধারণার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এহেন বস্তুগত ধ্যান–ধারণাকে যদিও বৈজ্ঞানিক বোধজ্ঞান কিছুটা এমন শ্লীলতা অবশ্য দান করেছিল, যার উপরই তারা বেশ জোড় দিত। কিন্তু এ ধ্যান ধারণা সর্বদাই সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ থেকে দুরে সরে ছিল। আসলে রোমানগণ ধর্মের মূল স্বাদই আস্বাদন করতে পারিনি। তাদের কথিত দেব-দেবতা ও গ্রীকদের আজেবাজে কদাকার কথাগুলো ভাঁরামির চেয়ে বেশী কিছু ছিল না। এটা এমন একটি খেয়ালী মনোভাব ছিল, যা সমাজ ও জনসাধারণের মধ্যে প্রচলন থাকার খাতিরেই পছন্দ করা হতো। তাদের জন্য জীবনের বাস্তব সমস্যার মধ্যে হস্তক্ষেপ করার অনুমতিই ছিল না তাদের কাজশুধু এটাই ছিল যে যখন তাদের নিকট কিছু জিজ্ঞেস করা হতো, তখন তারা নিজেদের পীর-পুরোহিতদের অছিলা দিয়া তার উত্তর দান করতো। কিন্তু তারা মানবতাকে নৈতিক মূল্যবোধ ও আইন-কানুন বলতে কিছু দান করবে; তাদের থেকে এমন আশা পোষণ করার সম্ভানাই ছিল না। এমনিরূপেই পাশ্চাত্যে নব সভ্যতার বীজ বপন হয়ে তা থেকেই শক্তি আহরণ করে লালিত-পালিত হতেছিল। স্বীয় লালন-পালন ও বিকাশের যুগেই সে অন্যান্য উপকরণের প্রভাব গ্রহণ করে ছিল। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবে সে উত্তরাধীকার সুত্রে প্রাপ্ত সেই সভ্যতায় বিভিন্ন ধরণের বিবর্তন এনেছিল যা সে রোমানদের থেকে পেয়েছিল। কিন্তু এ বিবর্তন আনা সত্ত্বেও পাশ্চত্যের নৈতিক গতিধারা এবং তাদের জীবনের উদ্দেশ্য বর্তমানে তাই রয়েছে, যা তাকে রোমান সভ্যতা দান করেছিল। যেহেতু আদিম রোমান সমাজ এবং তাদের চিন্তা জগতের পরিমন্ডল শুধু ধ্যান জগতেই নয়, বাস্তব জগতেই নিছক জাগতিক স্বার্থ ও কল্যাণমূলক ছিল; –ধর্মীয় ছিল না?

সুতরাং নব পাশ্চাত্যের পরিমন্ডলটি তদ্রুপই রয়ে গিয়েছে। বর্তমান ইউরোপের লোকদের নিকট ধর্ম নির্ঘাত একটি আজেবাজে নিরর্থক বস্তু হবার

কোন দলিল প্রমাণই নেই। আর দলিল প্রমাণের প্রয়োজনও তারা মনে করে না। কিন্তু আপনারা লক্ষ্য করতেছেন যে, নব ইউরোপীয়ান চিন্তাধারা সাধারণতঃ নৈতিক ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধকে বস্তু জগতের সমস্যাবলী ও তর্ক-বিতর্কের গন্ডীর সীমারেখার বহির্ভূত বিষয় মনে করে। যদিও তারা দ্বীনের ব্যাপারে সহিষ্ণুতা ও উদারতার পরিচয় দেয় এবং কখনো কখনো তারা এ বিষয়ের প্রতি খুব বেশী জোর দেয় যে, দ্বীন ধর্ম সাধারণের নিকট পরিচিত খ্যাতি লাভ করেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা আল্লাহর অস্বীকৃতির ব্যাপারে পরিষ্কার ভাবে যেমন কোন মতবাদ গ্রহণ করেনি, তেমনি কঠোর ভাবেও নয়। কিন্তু তাদের মতে তাদের বর্তমান চিন্তা পদ্ধতির মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্বের ধ্যান-ধারণার যেমন কোন উপকারিতা নেই; তেমনি তার কোন স্থানও নেই। পাশ্চাত্য মানব বুদ্ধি জ্ঞানের সেই দুর্বলতাকে একটি মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দান করেছে যে সে জীবনকে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে অবলোকন করতে এবং তাকে সীমাবদ্ধ করতে অসমর্থ। সুতরাং নব ইউরোপীয়ান লোকেরা কেবলমাত্র সেই ধারণা ও মতবাদকেই বাস্তব গুরুত্ব দিতে প্রায়াসী যা বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার সীমার মধ্যে থাকে, অথবা কমপক্ষে তা মানুষের সামাজিক সম্পর্ককে অনুভূতির সীমারেখা পর্যন্ত প্রভাবিত করতে পারে–এমন মতবাদই তাদের নিকট মূল্যবান বলে বিবেচিত। যেহেতু আল্লাহর অস্তিত্বের বিষয়; এ দু'টির কোনটির মধ্যে নেই। সুতরাং ইউরোপীয়ানদের মন-মগজ ও বুদ্ধি জ্ঞানের গতি প্রথম থেকেই এ দিকে ছিল যে, আল্লাহকে বাস্তব জগতে কোন গুরুত্ব না দেয়া হোক"।

"প্রশ্ন হতে পারে যে, জীবনের এহেন গতিধারা খ্রীষ্টান মতবাদের চিন্তাধারার সাথে কিরূপে বিজড়িত হতে পারে? এটা কি সত্য নয় যে, খ্রীষ্টান মতবাদ যাকে পাশ্চাত্য সভ্যতার আধ্যাত্মিক বিধানের মূল ভিত্তি মনে করা হয়, তা ইসলামের ন্যায়ই এমন একটি ধর্ম, যা নৈতিকতার সাধারণ ধ্যান-ধারণায় উপর প্রতিষ্ঠিত? কথাটা নিঃসন্দেহে সত্য কথা। কিন্তু পাশ্চাত্যের নব সভ্যতাকে খ্রীষ্টান মতবাদের লালন-পালন কর্তা নিরুপন করা, এর চেয়ে মারাত্মক ভুল আর কিছুই হতে পারে না। পাশ্চাত্যের আসল চিন্তাধারার মৌলিক বুনিয়াদ সেই পুরানো রোমান ধ্যান–ধারণার ভিতর খুঁজে পাওয়া যায়, যা জীবনকে সাধারণ ধ্যান-ধারণা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রেখে নিছক জাগতিক স্বার্থ উন্নতি ও সমদ্ধির বিষয় নিরূপণ করে। এই দিক দর্শনটির ব্যাখ্যা আমরা এভাবে বলতে পারি–যেহেতু মানব জীবনের সুচনা এবং দৈহিক মৃত্যুর পর তার পরিণতি সম্পর্কে কোন নিশ্চিত জ্ঞান; এমন জ্ঞান লাভ হয় না। তাই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট পথ হলো যে আমরা আমাদের সকল শক্তি জাগতিক এবং মানসিক সম্ভাবনা সমূহ পুর্ণতার জন্য একত্রিত করবো।

আমাদের সেই সকল সাধারণ নৈতিক মূল্যবোধ সমূহ তথ্য ও প্রমাণাদি থেকে মুক্ত হয়ে নিছক মৌখিক বুলির উপর প্রতিষ্ঠিত। এতে বিন্দু বিসর্গ সন্দেহের কারণ নেই যে এহেন গতিধারা যা পাশ্চাত্য সভ্যতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য, তা যেমন খ্রীষ্টান মতবাদের চিন্তাধারার নিকট গ্রহণযোগ্য নয় তেমন ইসলাম সহ অন্যান্য ধর্মের নিকটও অগ্রহণ যোগ্য। কারণ এ গতিধারা মূলতঃ লা-দ্বীনী তথা নাস্তিকতার গতিধারা। নব পাশ্চাত্য সভ্যতার বাস্তব জগতের কর্মময় ইতিহাসকে খ্রীষ্টান মতবাদের শিক্ষা ও মূল্যবোধ সমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট করা বিরাট একটি ঐতিহাসিক ভ্রান্ত বৈ কিছু নয়।

বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা যা সায়েন্টিফিক জাগতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যান্য সমগ্র সভ্যতার উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে এর ভিতর খ্রীষ্টান মতবাদের অংশ খুবই কম। আসলে এ উন্নতি সমৃদ্ধি সেই দীর্ঘ দিনের টানা হেঁচড়ারই বাস্তব ফল, যা ইউরোপকে খ্রীষ্টান গীর্জা হতে এবং জীবনের উপর তাদের শাসন দন্ড পরিচালনা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে জনসাধারণের অধিকাংশ লোকদের জন্য তা এমন একটি রোসমী বস্তুতে পরিণত হয়ে গিয়েছে। যেমন হয়েছিল আদি রোমানদের নিকট তাদের দেবতা; যাদের দ্বারা বাস্তব জীবনের উপর সত্যিকার কোন প্রভাব বিস্তারের আশা করতে পারত না-আর পারত না তারা তাদেরকে কোন অনুমতি দিতে। পাশ্চাত্য দেশে নিঃসন্দেহে আজো এমন কিছু লোক রয়েছে যারা ধর্মীয় নীতি অনুযায়ী চিন্তা গবেষণা করে। আর তাদের বিশ্বাসধর্মী মতবাদগুলো এবং তাদের সভ্যতার ভাবধারার মধ্যে সৌহার্দ ও নিবিড় সংযোগ স্থাপনের জন্য বিরামহীন সংগ্রাম করে আসছে। কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই কম এবং তারা সাধারণ সমাজ থেকে স্বতন্ত্রও বটে।

মধ্য ইউরোপের লোকেরা; গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী হোক বা পুঁজিবাদের সমর্থক হোক কিম্বা কারখানার মজদুর বা বৈজ্ঞানিক হোক না কেন; তারা সকলেই নব আবিস্কৃত একটি ধর্ম ধারণ করে। আর তা হচ্ছে জাগতিক উন্নতি সমৃদ্ধির পুঁজা। অর্থাৎ এ বিশ্বাস অন্তরে স্থান দেয়া যে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো জীবনকে অধিকতর সরল সহজ করা, আরাম-আয়েশ ও সুখী সমৃদ্ধিশালী করে তোলা। অথচ প্রচলিত সময়ের প্রবাদ বাক্য যেমন-"প্রকৃতির শক্তির দাপট থেকে মুক্ত করা।" এ ধর্মের মন্দির হলো সেখানের বড় বড় কল-কারখানা, সিনেমা ঘর, রাসায়নিক পরীক্ষা গৃহ, নাচ ঘর এবং বিজলীর ঘরগুলো আর পুজারী পুরোহিত হচ্ছে ব্যাঙ্কার ইন্‌জিনিয়ার, চিত্র তারকা এবং শ্রমিক নেতৃবর্গ ও রেকর্ড সৃষ্টিকারী হাওয়াই সকল লোক। অবস্থার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে শক্তি ও ক্ষমতা এবং আনন্দ ও খুশীর পারস্পরিক প্রতিযোগিতা। এর দ্বারা এমন একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি

হচ্ছে, যা আপদ মস্তক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। আর তারা এ নীতি করে নিয়েছে যে, যখন তাদের স্বার্থে আঘাত ঘটবে, তখনই তারা একে অপরকে ধ্বংস করে দিবে। সভ্যতার দিক দিয়ে এর পরিণতি এমন একটি মানব সৃষ্টি করা, যার নৈতিক দর্শন হবে বাস্তব জগত ও কর্ম জগতের অনুগত্য এবং যার নিকট ভাল-মন্দ 'সু' এবং 'কু' এ দু'য়ের মানদন্ড হচ্ছে জাগতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি"

আমাদের এ আলোচনার সংক্ষিপ্ত সার কথা হচ্ছে যে, আজকের ইউরোপীয়ানদের মন-মগজ ইস্‌লামের প্রাণশক্তিকে আকর্ষণ করে রাখতে এবং মানবতার জটিলতার সমস্যা সমূহের সমাধানের বেলায় তার থেকে সাহায্য গ্রহন করার যোগ্যতা রাখে না। যদিও বিভিন্ন প্রকার বিপ্লব ও বহু বিবর্তনের পর এমনটি হওয়া অসম্ভব বলে কিছু থাকবে না। বিশেষ করে যখন ইসলাম জগত আপদ মস্তক নতুনভাবে ইস্‌লামী জীন্দেগী পুনর্গঠনের কাজে এমনভাবে মনোনিবেশ করবে যেন তার প্রভাব ও প্রদর্শন পরিস্ফুট হয়ে উঠে, ভিত্তি দৃঢ় ও মজবুত হয়, এবং পাশ্চাত্যের সত্যানুসন্ধিৎসু লোকদের মন তার বাস্তব প্রদর্শন অবলোকন করে তাদের চেতনা অনুভূতিকে নিজেদের পানে টেনে নিয়ে আসত পারে। আর তাদের চিন্তাধারায় একটি নিরক্ষেপ দৃষ্টি সৃষ্টি করতে পারে। আমার ব্যক্তিগত মতে পাশ্চাত্য জগত ইস্‌লামের প্রাণশক্তির কোন একটি দিক দ্বারা প্রভাবিত হবার জন্য বর্তমানে আমাদেরকে কয়েক পুরুষ অপেক্ষা করতে হবে।

উপরের আলোচনা দ্বারা এ বিষয়টিও আমাদের সামনে প্রতিভাত হয় যে, ইস্‌লামের চিন্তাধারা পদ্ধতি, যা নৈতিক উদ্দেশ্যকে কর্মময় জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য নিরূপন করে, তার সাথে বর্তমান পাশ্চাত্য জগতের চিন্তা পদ্ধতির সাথে মিলন হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। কারণ তারা নৈতিকতাকে জাগতিক স্বার্থ কল্যাণকারীতার দিক থেকেই চরম লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করে।

বর্তমানে যখন আমরা একটি সত্যিকারের সুস্থ সাবলীল ইস্‌লামী জীবন গঠনের আন্দোলন নিয়ে দাঁড়িয়েছি, তখন এ সত্যটির পানে আমাদের পূর্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে যে, এ জীবন পদ্ধতির ভিতরে বহির্জগত থেকে কোন বস্তু উদ্ধার করে এনে জোড়াতালি যেন না দেয়া হয়। কারণ এ সংযোজন আমাদের চিন্তাধারার মূল বুননের সাথে বিন্দু বরাবরও সামঞ্জস্য রাখে না।

ইস্‌লামের পানে দাওয়াত দানকারী কতিপয় হযরত পাশ্চাত্য চিন্তা পদ্ধতিকে উদ্ধার করে এনে সামনে অগ্রসর হতে চায়। কিন্তু দর্শন ও চিন্তাধারা, মত ও পথের বেলায় পাশ্চাত্যের নিয়ম-নীতিকে উদ্ধার করে নিয়ে ইস্‌লামী জীবন পুনরুজ্জীবনের সংগ্রামে তাদেরকে প্রথম পদক্ষেপেই পরাজয় স্বীকার করে নিতে

হয়। তারা যে জীবন গঠনের জন্য পথ চলছে, পরিশেষে তাকেই ধ্বংসের মুখে ফেলে দিবার কারণে তারা পরিণত হয়। কারণ তারা সেই একমাত্র স্বাভাবিক কর্মপন্থাটিকে প্রথম পদক্ষেপেই পরিত্যাগ করে চলছে, যার দ্বারা ইস্‌লামী জীবনকে পুনরুজ্জীবন করা সম্ভব। অর্থাৎ ইস্‌লামী নীতিকেই স্বীয় পথ প্রদর্শক রূপে গ্রহণ হবে, জীবনের সৌধ এমারতের মূল বুনিয়াদ নৈতিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত করবে। আর নৈতিকতার সর্বশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জাগতিক স্বার্থ কল্যাণ নিরূপিত করণ ছাড়াই কর্মের নৈতিক উদ্দেশ্যকেই স্বীয় লক্ষ্য বস্তুকে পরিণত করবে।

এ পুস্তকের প্রাথমিক অধ্যায় সমূহে আমরা তা প্রমাণ করে দেখিয়েছি যে, ইসলাম জীবনের সমগ্র যুক্তিযুক্ত উদ্দেশ্যাবলীকে বাস্তবায়িত করার পূর্ণ সুযোগ দেয়। আর সাথে সাথে সে এ সকল বিষয়াবলীর বেলায় নৈতিক দিকটিকে সংরক্ষিত করণের প্রতিও পূর্ণ দৃষ্টি দেয়। আমরা এটাও আলোচনা করেছি যে, ইস্‌লামের মহান আন্দোলনী শক্তি তার সেই সৌন্দর্যের ভিতর নিহিত রয়েছে যা সে জীবনকে বিভিন্ন খানকার ভিতর বিভক্ত করে রাখে না। উদ্দেশ্য এবং তার উপকরণবলীর মধ্যে কোনরূপ দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষও সৃষ্টি হতে দেয় না। জীবনের জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক দিকগুলোর ভিতরে অথবা মানুষ এবং সৃষ্টি জগতের স্বাভাবিকতার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব ও প্রতিবন্ধকতায়ও বিশ্বাসী নয়। বরং এর পরিপন্থী জীবনকে এমন একটি অখন্ড বস্তুতে নিরূপণ করে যা পূর্ণ ঐক্য ও সহযোগিতার সাথে ঐ সকল উদ্দেশ্য সাধনের পথে অগ্রসর হয়ে।

বস্তুতঃ ইসলাম মানুষের নিকট জীবনের ব্যাপারে একটি পূর্ণাঙ্গ দর্শন পেশ করে। এ দর্শন বিভিন্ন অবস্থায় সামঞ্জস্যের সাথে প্রতিষ্টিত হতে এবং শাখা-প্রশাখা ও আনুসঙ্গিক বিষয় সমূহের বেলায় পথ প্রদর্শন করে সর্বদাই ক্রমোন্নতি ও সমৃদ্ধির যোগ্যতা রাখে। কিন্তু স্বীয় ভিত্তিমূল ও গতিধারার কোন প্রকার কাটছাট এবং উপযোগিতাকে আদৌ বরদাস্ত করে না।

এ পূর্ণাঙ্গ সামগ্রিক চিন্তাধারার স্বাভাবিক ফলশ্রুতিকে পূর্ণরূপে কাজে লাগানোর নিমিত্ত আবশ্যক হচ্ছে তাকে পূর্ণরূপে সর্বস্তরে প্রবর্তিত করা। নতুবা তার মৌলিক ভিত্তি এবং গতিধারার ভিতর সাধারণ একটু বিবর্তন এমন জটিলতার সৃষ্টি করবে, যারপর সেই জীবনের পূর্ণ সংগঠন আর সম্ভব হবে না;-যার নক্‌শা ও রূপরেখা ইসলাম পেশ করে।

যুগের বিবর্তনের সাথে সাথে এ সামগ্রিক চিন্তাধারার বুনিয়াদের উপর অনুকূল ও সামঞ্জস্যতার বেলায় ক্রমোন্নতির যে প্রশ্ন জড়িত রয়েছে, ইসলাম

তাকে অস্বীকার করে না। এটা একটি স্বাভাবিক বিষয় যে ইসলামের স্বীয় প্রকৃতিই তাকে একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করে এবং তার জন্য উৎসাহও দান করে। সে তার উপকরনাধি ও মাল মসল্লা ও সংগ্রহ করে দেয়। এ কাজকে সর্বান্তঃকরণে সে সমর্থনও করে। কিয়াস ইজ্‌তেহাদ, আর সেই অবাধ অধিকারগুলো, ইসলাম আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী রাষ্ট্রের শাসকদের দান করে থাকে। এ সবগুলো সর্বদা বাস্তব জীবনের সাথে চলতে এবং তার নিত্য নব চাহিদা ও দাবিকে মিটানোর জন্য অনুকূল ও সামঞ্জস্যতার ক্ষেত্রে ক্রমোন্নতিকে প্রবাহমান রাখার জীবন্ত কর্মমুখর উপায় ও মাধ্যম বিশেষ।

শুধু এ কাজ করা একান্ত আবশ্যক যে, এ সাঞ্জস্যতা এবং আনুসাঙ্গিক বিষয়গুলোর বেলায় ইসলামের মৌলিক ও নীতিগত চিন্তাধারা থেকে যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে। আর এমনো যেন না হয় যে তার গতিধারকে দৃষ্টির আড়ালে ফেলে অন্য কোন গতিপথে চলে যায় অথবা ইসলামের প্রাণ শক্তির সাথে প্রতারণা করে তার সরল সহজ ও শক্তিশালী প্রাণ আত্মার পরিবর্তে অন্য কোন শক্তিকে আপন করে নেয়।

যখন বাস্তব জগতে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে তখন সমাজ এ দ্বীনের আইন কানুনগুলো প্রতিষ্ঠা করতে এবং এর আওতায় ইজতেহাদ করার জন্য একটি বিশাল বিস্তৃত ময়দান সামনে খোলা হয়ে যাবে। কোন ছোট খাটো মাসয়ালা এবং আনুসঙ্গিক ব্যাপারে কোন কথা গ্রহণ করা না করাও সমর্থণ করা প্রত্যায়ন করার জন্য আমাদের মাপকাঠি এ হওয়া উচিত যে আমরা তাকে ইসলামের মেলিক চিন্তাধারা এবং তার সাধারণ স্বভাব প্রকৃতির উপর যাঁচাই করবো। ইসলামের মৌলিক চিন্তাধারা এবং তার প্রাণ শক্তি তথা আধ্যাত্মিকতার সাথে যা অনুকূল পরিদৃষ্ট হবে কেবল তাই আমরা গ্রহণ করবো। আর পরিপন্থিগুলো বর্জন করে চলব। কিন্তু শর্ত হচ্ছে যে আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে যেন এ কথা বদ্ধমূল হয় যে আমরা এমন একটি জীবন দর্শনের অধিকারী, যা দেশের অন্যান্য সমগ্র জীবন দর্শনের তুলনায় উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। যা অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বিজ্ঞান দর্শন ও সভ্যতার অনুগামীদের নিকট বিদ্যমান। কারণ এ দর্শনটি হচ্ছে আল্লাহর প্রদত্ত দর্শন, তিনি হলেন জীবনের সৃষ্টি কর্তা।

কিন্তু এটা হচ্ছে একটি সংক্ষিপ্ত কথা। আমাদের এ মহান উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত যে কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে তা পরিষ্কার রূপে পেশ করা আবশ্যক। এখন আমরা আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে সেই আলোচনার পানেই মনোনিবশ করছি আল্লাহ হাফেজ।

ইসলামী চিন্তাধারার পুনরুজ্জীবন

নতুনভাবে ইসলামী জীবন আরম্ভ করার জন্য এটাই যথেষ্ট নয় যে, ইসলামী শরীয়াতের ভিত্তির উপর নব আইন-কানুন রচনা করে দেয়া হোক এবং তার সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার জন্য নব নব সাংগঠনিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হোক। কেননা এ হচ্ছে সেই বুনিয়াদ দু'টির শুধু একটি মাত্র বুনিয়াদ, যার উপর ইসলাম তার দাবি মাফিক জীবন গঠনকে বাস্তবায়িত করে। এ বুনিয়াদটির মর্যাদা হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা, প্রথম বুনিয়াদটি হচ্ছে এই– সঠিক বিশ্বাস ও ধ্যান–ধারণাটি, যা আল্লাহর আল্লাহত্বকে একমাত্র তাঁর জন্যই নির্দিষ্টরূপে মনে করা হয় এবং এ দিক দিয়ে একমাত্র তাঁকেই শাসক বলে মেনে নেয়। আর আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে শাসক না মেনে নেয়। আর আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি সার্বভৌম শাসন ক্ষমতার দাবীদায় হয়ে বাস্তব ক্ষেত্রে স্বীয় শাসন চালায়ে আল্লাহত্বের দাবিদার হোক সে অধিকার আদৌ সে সমর্থন করে না।

সামাজিক সুবিচার হচ্ছে এ ইসলামী জীবনেরই অংশ বিশেষ। এটা তখনই পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে, যখন এ জীবনটি পূর্ণরূপে বাস্তব রূপ ধারণ করবে। তাকে স্থায়ীত্বের নিশ্চয়তা কেবল সেই অবস্থায়ই দেয়া যায়, যখন তাকে তার দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হবে। সুতরাং এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন এবং তার যোগ্যতার প্রতি পূর্ণ আস্থাবান হওয়া একান্ত আবশ্যক। যদি তা না হয়, তবে এ ইনসাফ তার স্বীয় ভিত্তি থেকেই বঞ্চিত হয়ে শুধু আইনের বাধ্যবাধকতা এবং সামাজিক নিয়ম-নীতির আনুগত্যের দাপটের বলে বলিয়ান হয়েই প্রতিষ্ঠাত হবে। আর এ বাধ্য বাধকতার বয়স সেই সময়টুকু পর্যন্তই থাকে, যখন তার গন্ডী থেকে বের হবার সুযোগ না পাওয়া যায়।

এ কারণেই ইসলামী আইন-কানুনের প্রতি খুব সহজেই আনগত্য প্রদর্শন সম্ভব হয়। কারণ সে একটি ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। সুতরাং এ বিশ্বাসকে নবরূপে জীবন দান করার জন্য আমাদের চিন্তাশক্তি ব্যয় করা একান্ত কর্তব্য। আর তার চতুষ্পার্শ্বে যে অপব্যাখ্যা ও সন্দেহবাদীতা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, তা এমন ভাবে দূর করতে হবে যেন এ বিশ্বাসটি এ আইনগত ব্যবস্থাকে পুরুষানুক্রমে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারে এবং একটি সত্যিকারের ইসলামী জীবনের প্রতিষ্ঠান লাভ সম্ভব হয়। এমনিভাবে এ জীবনটি যেন আইন ও হেদায়াত রূপে অনুপ্রেরণা দানের সেই বুনিয়াদ দু'টির উপর কায়েম হতে পারে, যাকে ইসলাম স্বীয় সমুদয় উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের উপকরণে পরিণত করে।

কিন্তু জীবনকে সংগঠিত করার জন্য ইসলামী আইন-কানুন রচনার চিন্তা করার পূর্বে আমাদেরকে মানুষের অন্তরে ইসলামী আকায়েদ ও বিশ্বাসগুলিকে দৃঢ়ভাবে বসিয়ে দেয়ার জন্য বিরামহীন চেষ্টা করতে হবে, যে বিষয় আমি এ অধ্যায়ের শুরুতেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে, আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতি, যা আমাদের ইসলামী চিন্তাধারার সম্পূর্ণ পরিপন্থী এহেন সংস্কৃতি ও সংগঠনমূলক উপকরণ চিন্তাধারায় সৃষ্টি করার কাজে কেমন করে ব্যবহার করতে পারি এবং তা দ্বারা কিরূপেই বা ইসলামী চিন্তাধারা সৃষ্টি করতে পারে? প্রথমতঃ আজকের শিক্ষা সংগঠন ও তালীম তরবীয়াতের ব্যবস্থাপনা এমন বস্তুগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, যা জীবন দর্শনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ ইসলামী দর্শন ও চিন্তাধারা পরিপন্থী। দ্বিতীয়তঃ ইসলামের প্রতি বৈরিতা ও শত্রুতা তার মূল স্বভাবের ভিতরই নিহিত রয়েছে, হয় এ উদ্দেশ্য প্রকাশ্যে থাকুক কিম্বা গোপন থাকুক।

ইতিপূর্বে আমি যে আলোচনা করেছি তাই হচ্ছে আসল কথা। ইসলামী চিন্তাধারাকে পুনরুজ্জীবন করণের নিমিত্ত পাশ্চাত্য চিন্তাধারাকে তার উপকরণে পরিবর্তন করতে গিয়ে আমাদের প্রথম কদমে ই পরাজয়ের কথা ঘোষণা দিতে হয়। সর্বপ্রথমেই আমাদের পাশ্চাত্য চিন্তাধারা থেকে মুক্তি অর্জন করা প্রয়োজন। আর এমন একটি নির্ভেজাল ইসলামী চিন্তা পদ্ধতি গ্রহণ করা একান্ত জরূরী যেন তা থেকে যা কিছু জন্ম নিবে, তা যেন জঘন্য ও কুৎসিত না হয়ে আসল বস্তু হয়।

ইসলামী চিন্তাধারা "হাকেমিয়াত" অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌম শাসন ক্ষমতা ধ্যান-ধারণা শুধু এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয় যে তার আইন-কানুন ও বিধান-সমূহ কবুল করে নেয়া হবে এবং সেই অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে বিচার ফয়সালা করা হবে। আল্লাহর বন্দেগী শুধু এ-ই নয় যে তার থেকে শরীয়ত গ্রহণ করা হবে। আর শরীয়াতকে সকল ব্যাপারেই এমন অবস্থায় ফলসালাকারী নিরূপণ করা হবে, যখন শরীয়াত শব্দটি রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার নীতি এবং তার আইন-কানুনের সীমিত অর্থে ব্যবহার করা হয়। কেননা ইসলামী চিন্তাধারায় শরীয়াতের অর্থ শুধু এই নয়। আল্লাহর শরীয়াতের অর্থ হচ্ছে সেই সকল সমূদয় হেদায়াতবলী, যা তিনি মানব জীবনের সংগঠনের নিমিত্ত দান করেছেন। এ হেদায়েত আকায়েদ ও বিশ্বাস, রাষ্ট্র শাসন পদ্ধতি, জীবনের আদান-প্রদান জ্ঞান অর্জনের নিয়ম-নীতি মোটকথা আকিদা দর্শন দর্শনের মুখবন্ধ, আইন-কানুন নৈতিক বিধান এবং আদান-প্রদান, লেন-দেন জীবনের সকল খুটিনাটি ব্যাপারের

সাথে সংশ্লিষ্ট। এ সকল হেদায়েতাবলী সেই মূল্যবোধ ও মানদন্ডের মধ্যে পাওয়া যায়, যা সমাজে শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে চায় এবং যার উপর সব বস্তু ও বাস্তব ঘটনাবলী ও ব্যক্তিত্বকে যাচাই করতে ইচ্ছুক। চিন্তাধারা বিজ্ঞান ও কৌশলবিদ্যা এবং জ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখা গুলোকেও এ হেদায়েতের ছাঁচেই ঢালাই করে সংগঠিত করতে হবে।

বস্তুতঃ যেরূপ আমরা শরীয়াতের ব্যাপারে আল্লাহর বিধান থেকে পথ প্রদর্শনীতা অর্জন করি অনুরূপ সকল ব্যাপারেই আল্লাহ তায়ালা থেকেই আমাদেরকে রাহনোমায়ী নিতে হবে। অর্থাৎ যতদুর পর্যন্ত তার সার্বভৌম ক্ষমতার সম্পর্ক রয়েছে, যা তার বিধান ও আইন-কানুনের সাথে সংশ্লিষ্ট, ঠিক ততদুর পর্যন্ত আমাদেরকে এ নীতি গ্রহণ করতে হবে। এবং কি ধরণের হবে তা ইতিপূর্বে উল্লেখ কৃত কুরআনে করীমের আয়াতসমূহের আলোকে নির্ধারিত হবে। নৈতিকতা এবং আদান-প্রদান ও লেনদেনের সাথে সংশ্লিষ্ট নীতিসমূহের ধরণ সামগ্রিক ইসলামী চিন্তাধারা পানে ধাবিত হয়ে এবং এ সকল ব্যাপারে আল্লাহর কিতাবে এবং রাসুলের সুন্নাতে যে বিস্তারিত হেদায়েত বিদ্যমান রয়েছে তার পর্যালোচনা দ্বারাই অনুধাবন করা যায়। আর একথা কোন একটা সীমা পর্যন্ত পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে এ ধরণগুলো সেই মূল্যবোধ ও মানদন্ডসমূহের বেলায়ও প্রযোজ্য, যা সমাজে প্রচলিত হতে চায় এবং যার উপর ঘটনাবলী ও মানুষকে যাঁচাই বাছাই করতে ইচ্ছুক। প্রত্যেক সমাজেরই প্রচলিত মূল্যবোধসমূহ সেই ধ্যান ধারণারই প্রতিচ্ছবি, বা সৃষ্টিজগত তার স্রষ্টার মধ্যকার বিরাজমান সম্পর্ক এবং এই সৃষ্টির বিভিন্ন দিকের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক জড়িত রয়েছে।

এ ছাড়া সেই সকল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বস্তুর বিষয় ও বর্তমান পাওয়া যায়, যাকে এ ধ্যান–ধারণা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বস্তুর মর্যাদার আসন দিয়েছে অথবা তাই মানব জীবনের মূল সামগ্রিক উদ্দেশ্য বলে অভিহিত করেছে। যেমন মনে করুন ইসলামী ধ্যান–ধারণা অনুযায়ী মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো ইবাদত! অর্থাৎ সৃষ্টির বন্দেগী থেকে মুক্ত হয়ে শুধু মাত্র আল্লাহর বন্দেগীতে লিপ্ত হওয়া। আর মানুষের মর্যাদা হলো যে আল্লাহর যমীনে তার প্রতিনিধিত্ব করবে খলীফা হবে। আর আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান অনুযায়ী তার গন্ডীর মধ্যে অবস্থান করে যমীনের শক্তিসমূহ তার উপকরণাদি ও গুপ্ত ভান্ডার থেকে উপকার লাভ করবে। আর তার মধ্যে বিভিন্ন প্রকার নিয়ম-কানুন নীতি এবং জাগতিক আবিস্কার উদ্ভাবন দ্বারা জীবনকে উন্নতি ও সমৃদ্ধির পানে এমনভাবে নিয়ে যাবে যেন তারা জাগতিক

জীবনে সেই সুন্দর ও সুস্বাদু বস্তুগুলো যা আল্লাহ্ তায়ালা তার বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করছেন, স্বাদ-আস্বাদন করে খুশী খোশালিতে জীবন কালাতিপাত করতে পারে। আর স্বীয় আধ্যাত্মিক জীবনে বস্তুগত চাপ ও প্রভাব এবং দারিদ্রতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে উন্নতি করতে পারে। ইসলামী ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী জীবনের উৎকৃষ্টতা এবং শ্রেষ্ঠত্বের মানদন্ড হলো তাকওয়া।

"তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি যিনি তাকওয়াধারী ও পরহেজগার।" (আল কুরআন) ইসলামে আখলাক ও মোয়ামেলাত অর্থাৎ নৈতিকতা ও ব্যবহারিক জীবনের বুনিয়াদ হলো তাক্ওয়া। কেননা তাক্ওয়া হচ্ছে আল্লাহর আল্লাহত্ব এবং মানুষের ইবাদতের বহিঃপ্রকাশ। আর এটাই মানুষের মধ্যে সেই অবস্থা ও গতিধারা সৃষ্টি করে যার উপর নৈতিকতার সমগ্র সৌধ এমারতটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিষয় আমি ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। তদুপরি এখানে আবার তা এজন্য আলোচনা করছি, যাতে করে পাঠকের নিকট এটা পরিস্কার হয় যে ইসলাম এমন কতকগুলো বিশেষ মূল্যবোধের অধিকারী যার উৎস হচ্ছে আকীদা ও বিশ্বাসেরই উৎস। অর্থাৎ আকীদার প্রস্রবণ থেকে মূল্যবোধগুলো নির্ধারিত। আর কোন বস্তুই এ মূল্যবোধ সমূহের উৎসমূল হতে পারে না। কেননা আল্লাহর আল্লাহত্বের সামনে বন্দেগী করার মূল দাবি হলো এটাই। আল্লাহর শরীয়াতের মূল তাত্ত্বিক দিক দিয়ে মূল্যবোধগুলোই হচ্ছে এ মূলতত্ত্বের অংশ বিশেষ। শরীয়াতের পরিভাষাটি আজ যে সীমিত অর্থে ব্যবহার করা হতেছে, আসলে এটার অর্থ এত সীমিত নয়।

আমাদের এ আলোচনা দ্বারা এটা প্রতিভাত হচ্ছে যে, মুসলমান কখনো নিজদের আকীদা বিশ্বাস চিন্তাধারা নৈতিককতা ব্যবহারিক জীবন এবং সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধ মানদন্ডসমূহকে আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতীত অন্য কোন উৎস কেন্দ্র হতে গ্রহণ করতে পারে না। এগুলোকে আল্লাহর থেকে গ্রহণ করা বিষয়টি হলো আকীদা ও বিশ্বাস সম্পর্কীয় বিষয়। কারণ আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কাহারো থেকে এগুলো গ্রহণ করা আল্লাহর এলাহীয়াত ও খোদায়ীত্বের সামনে পূর্ণ বন্দেগীর স্বীকারোক্তির পরিপন্থী কাজ বৈ কি। এ ব্যাপারে পথ প্রদর্শনের ধরণটাও হবে তাই যা আইনগত বিধানের বেলায় পথ প্রদর্শন করা হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশক আমরা বিস্তারিতভাবে ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

নৈতিক মূল্যবোধসমূহ কখনো কৃষিভিত্তিক বা শিল্প ভিত্তিক হয় না। কৃষক সমাজ শিল্প ও কারিগর সমাজের জন্য কখনো স্বতন্ত্র নৈতিক মূল্যবোধ থাকে না।

বর্জুয়া সমাজ এবং মজদুর সমাজের জন্য নৈতিকতার স্বতন্ত্র ও আলাদা–আলাদা ধ্যান–ধারণার কথা একটি নির্ঘাত উদ্ভট উক্তি ছাড়া কিছুই নয়। যেমন পুঁজিবাদী মূল্যবোধ বলতে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই, তেমনি নেই সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ বলতে কোন কিছুর অস্তিত্ব। নৈতিকতা হয় ইসলামী হবে, না হয় জাহেলী হবে। এমনিরূপে মূল্যবোধও ইসলামী হবে, না হয় জাহেলী হবে। তার তৃতীয় শ্রেণী বলতে কিছুই নেই। নৈতিকতা ও মূল্যবোধের একটি শ্রেণী এ ধ্যান–ধারণা থেকে জন্ম-লাভ করে যে একমাত্র একজনই প্রভু এবং প্রত্যেকটি বস্তু ও প্রত্যেকটি প্রাণী বন্দেগীর একই রশিতে গাঁথা। আর নৈতিকতা ও মূল্যবোধের দ্বিতীয় শ্রেণীটি বহু প্রভুত্বের ধ্যান ধারণা থেকে সৃষ্টি হয়। যার ভিত্তি হলো বিভিন্ন প্রভুর মধ্যে মানব আত্মার ব্যাকুলতা ও বিক্ষিপ্ততা এবং মানব জীবনটি বিভক্ত হয়ে যাবার উপর- যদিও প্রভুত্বের ধরণ বিভিন্ন হয়।

নৈতিকতা ও মূল্যবোধের একটি বিধান হচ্ছে তাই যা সৃষ্টি ও তার স্রষ্টার মধ্যকার সম্পর্ক, সৃষ্টি জগতে মানুষের স্থান ও পদ মর্যাদা-মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য তার পদ মর্যাদা ও মূলতত্ত্ব। এ ছাড়া বস্তুজগত, প্রাণী জগত এবং মাবন জাতির সাথে মানুষের সম্পর্কের সাথে তাদের সকলের আল্লাহর সাথে সম্পর্কের যে ধরণটা রয়েছে, তাই ইসলামী ধ্যান–ধারণা থেকে উৎসারিত হয়। আর নৈতিকতা ও মূল্যবোধের দ্বিতীয় বিধানটি তাই যা বিভিন্ন জাহেলী ধ্যান–ধারণা। এটা এমনই বিভিন্ন ও বহুরূপী বিক্ষিপ্ত পথ, যা কখনোই আল্লাহর পথে খুঁজে পাওয়া যায় না। আল্লাহ তায়ালা নিজে তার কিতাবে যে পথটি অঙ্কিত করে দিয়েছেন, সে পথের বোধজাত জ্ঞানও তা নয় যা কিছু লাকে নিজ খেয়াল খুশীমত বানিয়ে নিয়েছে। আর এ কারণেই এমন মনগড়া পথে পরিচালিত হয়ে কখনো আল্লাহর নিকট পৌছা যায় না।

সামাজিক বিধান রাজনৈতিক সংস্থা ও অর্থনৈতিক কাঠামো ইত্যাদি সমুদয়ই হচ্ছে বিশ্বাসগত ধ্যান–ধারণার শাখা-প্রশাখা ঐ ধ্যান ধারণা থেকে উৎসারিত মূল্যবোধসমূহের বাস্তব প্রতিষ্ঠারই ফলশ্রুতি বিশেষ। এ কারণেই তার উৎসকেন্দ্র ইসলামী ধ্যান-ধারণা ব্যতীত অপর কিছু হবে না। আর ধ্যান ধারণাকে শরীয়াত থেকেই গ্রহণ করতে হবে। শরীয়াত পরিভাষাটি যে আজ সীমিত অর্থে ব্যবহার করা হয় তাই তা আসল সীমারেখা নয়, বরং তার স্বীয় মূল অর্থের দিক দিয়ে তার সীমারেখা খুবই বিস্তীর্ণ।

আল্লাহ তায়ালাকে একমাত্র মাবুদ স্বীকার করে তার সামনে মস্তক অবনত করার মূল দাবি হচ্ছে যে আমরা ঐ সকল বিষয়ও একমাত্র তাঁর থেকেই পথের দিশা নিব। তার মর্যাদা তাই যা শরীয়াতকে সীমিত অর্থে অর্থাৎ আইনগত

বিধানে পরিণত হওয়া বুঝায়। বর্তমানে হাকেমিয়াত অর্থাৎ সার্বভৌম শাসন ক্ষমতার দ্বারা যা কিছু বুঝায় তাও আইনগত বিদান জারী করা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। অথচ শরীয়াতের গন্ডী এর চেয়ে অনেক প্রশস্ত এবং সার্বভৌম শাসন ক্ষমতার প্রয়োগ ও বর্তমান বিবর্তনীয় বোধজাত জ্ঞান থেকে অনেক প্রশস্ত। যদিও পাঠকবর্গের নিকট এটা নতুন কিছু বলে বিবেচিত হবে না, তথাপিও এ কথার প্রতি বিশেষ জোড় দেয়া উচিত যে এ সকল বিষয়াবলী আকীদার বিষয়ের মধ্যে শামিল। কেননা তার সম্পর্ক বিনা মধ্যস্থতায়ই সরাসরি আল্লাহর পূর্ণ বন্দেগী করার স্বীকারোক্তি করা না করার সাথে জড়িত।

পাঠকদের নিকট নতুন বলতে যা কিছু অনুমতি হবে, তা হচ্ছে সাহিত্য শিল্পকলা বিজ্ঞান এবং অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তাধারার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মতৎপরতা সম্পর্কে ইসলামী ধ্যাণ-ধারণা থেকে আলো গ্রহণ করা পথের দিশা নেয়া ।আর এ ব্যাপারে হেদায়াতে এলাহীর পানে মনোনিবেশ করা। এগুলোও আকীদা ও বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়। এগুলোকে স্বীকার করাটাই হচ্ছে আল্লাহকে একমাত্র মা'বুদ বলে স্বীকার করে তার পূর্ণ বন্দেগী গ্রহণ করার দাবি।

শিল্পকলা ও সাহিত্য বিষয়ের উপর এ দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটি পুস্তকও রচনা করে দেয়া হয়েছে। (যার নাম হলো নাহজল ফন্নেল ইসলামী) সেখান বলা হয়েছে যে সাহিত্য ও শিল্পকলার সাথে সংশ্লিষ্ট সমগ্র মানবিক কর্মতৎপরতা মানুষের ধ্যান-ধ্যারণা কার্যের ফলাফল ও প্রভাব এবং কর্মের প্রত্যাখ্যান ও গতিধারার মানবিক প্রদর্শন ছাড়া কিছু নয়। সাহিত্য শিল্পকলায় এগুলোই প্রতিভাত হয়ে উঠে। এগুলো সবই একজন মুসলমানের অন্তর দিলে -দেমাগের বদ্ধমূল ইসলামী ধ্যান-ধারণার শুধু অনুবর্তীই নয়, বরং তা থেকেই জন্ম লাভ করে। কেননা সৃষ্টিজগত মানুষের মন-মস্তিস্ক এবং মানব জীবনের বিভিন্ন দিকগুলো এবং জগত জীবন ও মানবাত্মা শ্রষ্টার সাথে তার সম্পর্কগুলো এ ধ্যান-ধারণার মধ্যেই শামিল। এগুলো মুসলমানদের সেই বিশেষ ধ্যান-ধারণারই প্রতিবিম্ব স্বরূপ যা মানুষের মূল রহস্য সৃষ্টিজগতে তার পদমর্যাদা, মানব অস্তিত্বের উদ্দেশ্য, তাদের কর্ম চাঞ্চল্যতা এবং তাদের জীবনের মূল্যবোধ সমূহের বেলায় পোষণ করে। ইসলামী ধ্যান-ধারণা শুধু দর্শনগত নয়, বরং তা এই সকল বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট মুল সত্যের ধারক ও বাহক। কেননা তা একটি পথ প্রদর্শনমূলক বিশ্বাসগত এমন একটি ধ্যান-ধারণা, যার কর্ম চাঞ্চল্যের প্রভাব মানুষের দ্বারা প্রত্যেকটি বিকশিত কাজ ও ফলাফলের উপর প্রভাব বিস্তার করে। আগত পষ্ঠাসমূহে এ বিষয় আমি আরো অধিক আলোচনার আশা রাখি।

একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে মাবুদ স্বীকার করে তাঁর পূর্ণরূপে বন্দেগী করার দাবি পূরণার্থে আকীদার দিক দিয়ে মুসলমানদের ইসলাম গ্রহণ সঠিক হবার নিমিত্ত সাইন্স ও অন্যান্য ধ্যান-ধারণাও খোদায়ী উৎসকেন্দ্র হতেই পথের আলো গ্রহণ করতে হবে। এ কথাগুলো এমন জরুরী যে এ বিষয়ের উপর আমাদের বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা কর্তব্য। কেননা বর্তমান যুগের পাঠকরা এমনকি মুসলমানদের নিকটও এটা নতুন ও অশ্রুত বলে মনে হবে। যারা এ কথা সমর্থন করে যে, ঈমান ও ইসলাম তখন পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হয় না, যত সময় না সার্বভৌম শাসন ক্ষমতা এবং আইন প্রণয়ন শুধু আল্লাহ তায়ালার জন্য বিশেষরূপে মনে না করা হয়। মুসলমানের কাহারো জন্য এটা বৈধ হতে পারে না যে, সেই সব ব্যাপারে হেদায়েতে এলাহী (কুরআন সুন্নাহ) ব্যতীত অন্য কোন উৎস কেন্দ্র থেকে পথের দিশা গ্রহণ করবে, যা আকীদা বিশ্বাস, সৃষ্টি জগতের দর্শন ইবাদত, আখলাক, সামাজিক মূল্যবোধ অথবা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিধান এবং তার মূল বুনিয়াদের সাথে সংশ্লিষ্ট। কিম্বা যার আলোচ্য বিষয় হবে মানব ইতিহাসের কার্যকরি শক্তি এবং মানবিক কর্ম তৎপরতার আন্দোলনকারী বস্তু কোন্‌টি তা। এগুলো একজন মুসলমান এমন একজন তাকওয়া পরহেজগার বিশিষ্ট মুসলমান থেকে শিক্ষা করতে পারে, যার প্রতি এ বিষয়ে পূর্ন আস্থাভাজন হওয়া যায় যে সে বাস্তব জীবনে স্বীয় বিশ্বাস ও আকীদার উপর পূর্ণরূপে দন্ডায়মান আছে।

অবশ্য মুসলমানের জন্য এটা করা সম্ভব যে, তারা শুধু বিজ্ঞানের বেলায় যেমন কেমষ্ট্রি, ফিজিস্ক বাইওলোজী, এষ্ট্রানোমী, শিল্প বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, এডমিনিষ্ট্রেশনের বিভিন্ন বিষয় ও সাংগঠনিক দিকগুলো, আর বিভিন্ন কাজ করার বাস্তব কর্মপন্থা। এছাড়া বিভিন্ন বিষয় বস্তুর দিকটির সীমারেখা পর্যন্ত যুদ্ধ বিদ্যা। এমনিভাবে অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান যার থেকে ইচ্ছে, তার থেকেই শিক্ষা করা যায়। তাই সে মুসলমান হোক কিম্বা অমুসলমান হোক তার কোন শর্ত নেই। যখন ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে, তখন এ ব্যাপারে সঠিক নিয়ম হচ্ছে যে, এ সকল বিষয়গুলো সামাজিক কর্তব্য মনে করে কয়েকটি ক্ষেত্রেই যথাসম্ভব প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। আর কিছু সংখ্যক লোকের প্রতি ক্ষেত্রে এবং প্রত্যেকটি বিষয় এমন ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে হবে যেন সমাজের অন্যান্য লোকদের উপর থেকে এই ফরজ-এ কেফায়া সুসম্পন্ন করার দায়িত্ব অপসারিত হয়। যদি এটা করা না হয়: তবে প্রয়োজন মাফিক এ সকল কাজ সুসম্পন্ন হবে না। আর এমন

পরিবেশও সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না যে, এ সকল ক্ষেত্রে পূর্ন উদ্যম কর্ম তৎপরতা চালু রেখে সমাজে উন্নতি ও সমৃদ্ধি এবং নিত্য নতুন ফল লাভ করা যায়। সুতরাং এমতাবস্থায় সমগ্র সমাজের লোকই গুনাহগার হবে। কিন্তু যখন পর্যন্ত এ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা না হবে, তখনপর্যন্ত মুসলমানদের উচিত এ সব বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলো বাস্তব ও হাতে কলমে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের থেকে শিক্ষা করা, মুসলমান অমুলসমান সকলের চেষ্টা সাধনা থেকে উপকার লাভ করা এবং সকলের থেকেই কাজ লওয়া। কেননা এ বিষয়গুলো হচ্ছে তার ভিতরই শামিল যে সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেনঃ

"নিজেদের পার্থিব ব্যাপারে তোমরা আমার চেয়ে বেশী জ্ঞান রাখো।" জীবন, জগত, মানুষ, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং মানুষের পদ মর্যাদা ও কর্ম তৎপরতা এবং জগত ও জগতের স্রষ্ঠার সাথে তার সম্পর্কের ধরণের সাথে এর কোন সম্পর্কই নেই। এ জ্ঞান বিজ্ঞান জীবন বিধান, জীবনের আইন-কানুন এবং সেই সকল সংস্থাসমূহ ও সাংগঠিক ব্যবস্থাপনার বেলায় কোন আলোচনাই করে না, যার ভিত্তির উপর ব্যক্তিগত জীবন এবং সামাজিক জীবনের সংগঠন বাস্তবায়িত হয়। সুতরাং তার দ্বারা মুসলমানদের আকীদা বিশ্বাস নষ্ট হওয়া জাহেলিযাতের পানে ধাবিত হওয়ার কোন আশঙ্কা নেই।

যে জ্ঞান বিজ্ঞান ব্যক্তি ও সমষ্টি তথা সমাজের কার্যাবলী ও অবস্থার পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দানই স্বীয় বিষয় বস্তুতে পরিণত করে অর্থাৎ যার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষের "আত্মা" তার ঐতিহাসিক কার্যাবলী এবং সৃষ্টিজগত, জীবন ও মানব সৃষ্টির সেই দিকটি, যার সম্পর্ক সাইন্স বিজ্ঞান যথা কেমেষ্টি ফিজিক্স এষ্ট্রনমী বাইওলোজী ও তিব্বীর সাথে সংশ্লিষ্ট নয়; অর্থাৎ এ বিষয় কোন আলোচনা করে না। তার ধরণ ও তাই হবে যা আইনগত বিধান, জীবন বিধানের নীতি মালার কাঠামো ও বুনিয়াদের বেলায় রয়েছে। এ জ্ঞান-বিজ্ঞানও আকীদা বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট।

একজন মুসলমান এ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপারে শুধু কেবল সেই মুসলমান থেকেই পথ প্রদর্শনীতা অর্জন করতে পারে; যার দ্বীনদারা ও পরহেজগারী সম্পর্কে আস্থা স্থাপন করা যায়। আর এ-ও অবগত হওয়া যায় যে এ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বেলায় হেদায়াতে এলাহী থেকেই পথের দিশা সে নেয়। গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে যে, এ বিষয়গুলোও যে আকীদা বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট মুসলমানের ভিতর সে

চেতনা অনুভূতি থাকা উচিত। তাদের আল্লাহর বান্দা হবার অর্থাৎ ইসলামের দাবি হলো যে, এ ব্যাপারে হেদায়াতে ইলাহীর দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। এই বিজ্ঞানের একজন শিক্ষার্থী জাহেলিয়াতের সৃষ্ট লিটারেচারও সাহিত্যাবলীও সে অধ্যানয় করবে। এ জন্য নয় যে তা অধ্যায়ন করে সে ঐ সকল ব্যাপারে স্বীয় চিন্তাধারা তৈয়ার করবে। বরং জাহেলিয়াত কিরূপে পথভ্রষ্ট হলো এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ইসলামী চিন্তাধারার বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত করে মানবতার এ পথ ভ্রষ্টতাকে কিরূপে দূরীভূত করা যায় কেবল শুধু এ উদ্দেশ্যেই অধ্যয়ন করবে।

নতুন পুরাতন অনৈসলামিক জাহেরি চিন্তাধারার লালিত-পালিত এ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সামাজিক গতিধারার উপর জাহেলী ধ্যান-ধারণা গভীর প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে। আর তা সেই ধ্যান-ধারণার উপরই প্রতিষ্ঠিত। এ কথাটি বিজ্ঞান ইতিহাস বিজ্ঞান প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ও নৈতিক বিজ্ঞান এবং ধর্মের তুলনামূলক গবেষণার বেলায় যেমন সত্য, অনুরূপ সত্য সমাজতত্ত্বের বেলায়। এ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের বেলায় কমপক্ষে তার অধিকাংশের ক্ষেত্রে গবেষণার প্রতি প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে শত্রুতা নিহিত রয়েছে। এ ধরণের বৈজ্ঞানিক ও চিন্তাধারাগত চেষ্টা সাধনা বিষয় কেমিষ্ট্রি, ফিজিক্স, এষ্ট্রনমী ও তিব্বির ন্যায় অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান তখন পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, যখন এই শেষোক্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানগুলো বাস্তব অভিজ্ঞতার সীমারেখার ভিতর অবস্থা করে এবং বাস্তব অভ্জিতালব্ধ ফলগুলো রেকর্ড করেই ক্ষান্ত হয়। আর এর চেয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। আর এ ধরণের সীমা অতিক্রম করার একটি উদাহরণ হচ্ছে এটাই যে বাইয়োলজীর ভিতর প্রত্যক্ষ গবেষণা ও তার নিয়ম কানুনের পথ অতিক্রম করে কোন জ্ঞান প্রসুত প্রমাণাদি ছাড়াই বিশেষ গতিধারায় প্ররোচিত হয়ে এ মতবাদ প্রকাশ করে যে জীবনের ক্রমবিকাশ ও উন্নতির পানে দৃষ্টি দেয়ার জন্য প্রকৃতি জগতের বাহির থেকে কোন বহির্গত অস্তিত্বকে মেনে নেয়ার প্রয়োজন মনে করে না। আর আল্লহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী হবারও প্রয়োজন নাই।

একজন মুসলমানের জন্য এ সকল ব্যাপারে তার প্রভুর ঘোষণাই যথেষ্ট। তার মোকাবিলায় এ সকল বিষয়ের উপর সমগ্র মানবিক চেষ্টা সাধনা মূল্যহীন ও হাস্যকর বৈ কিছুই নয়। উপরন্ত এ বিষয়গুলো সরাসরি এমন আকীদা ও বিশ্বাসের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে যেখানে প্রভূত্বকে একমাত্র আল্লাহর জন্য রাখা

হয় এবং তাঁরই পূর্ণ বন্দেগী করার বাসনা থাকে। এ আকীদাই হচ্ছে ইসলামী ধ্যান-ধারণার মূল বুনিয়াদ। বলা হয় যে, তমাদ্দুন ও সংস্কৃতি সমগ্র মানুষের মিরসী স্বত্ব। তার যেমন নেই কোন জাতীয়তা তেমনি নেই দেশ ও ধর্ম। এ কথাটি শুধু সাইন্স এবং তার বাস্তব ব্যবহারের সীমারেখা পর্যন্ত ঠিক হতে পারে। কিন্তু শর্ত হলো যে, এ জ্ঞান-বিজ্ঞান স্বীয় গন্ডীর সীমারেখা অতিক্রম করে স্বীয় গবেষণা লব্ধ অভিজ্ঞতার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রদান না করা। আর মানব আত্মা মানবিক কর্ম ও চাঞ্চল্যতা, ইতিহাস, সাহিত্য এবং চেতনা অনুভূতি প্রকাশের বিভিন্ন রূপরেখাগুলোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদানের দায়িত্ব স্বীয় কাঁধে না নেয়। কিন্তু এ গন্ডী সীমারেখার বহির্ভূত বিষয় ও সমস্যাসমূহের ব্যাপারে এ কথা বলা আসলে সেই আর্ন্তজাতিক ইয়াহুদীদের একটি চক্রান্ত বিশেষ যা দ্বারা প্রত্যেকটি প্রতিবন্ধকতাকে বিশেষ করে বিশ্বাস ও চিন্তাধারার ক্ষেত্রের প্রতিবন্ধকতাটিকে স্বীয় পথ থেকে হটিয়ে সমগ্র দুনিয়ায় ইয়াহুদীদের প্রবেশের নিমিত্ত পথ সমতল করতে চায়। ইয়াহুদী ধর্ম মানুষকে এ প্রবঞ্চনাটি দ্বারা নিজেদের শয়তানী উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে ইচ্ছুক। তাদের এ কাজের প্রাথমিক প্রোগ্রাম হলো সুদ ভিত্তিক কাজ করাবার। যার শেষ ফল হল যে সমগ্র মানুষের চেষ্টা তদবীর ও সাধনার লব্ধ ফল ইয়াহুদীদের প্রতিষ্ঠিত সুদ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহের পানে টেনে নিয়ে যাওয়া।

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে যে শুধু অভিজ্ঞতা প্রসুত জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং তার বাস্তব প্রয়োগ ব্যতীত তমাদ্দুন দুই প্রকার। একটি হচ্ছে ইসলামী তমাদ্দুন যার ভিত্তি হলো ইসলামী ধ্যান-ধারণা আর দ্বিতীয়টি বিভিন্ন মত পথের উপর নির্ভরশীল জাহেলী তমাদ্দুন। এর বুনিয়াদ হলো আল্লাহর পথ প্রদর্শনকে দৃষ্টির আড়ালে রেখে মানবিক চিন্তাধারাকে আল্লাহর স্থান দেয়া। ইসলাম তমাদ্দুন ও সংস্কৃতি মানুষের সমগ্র চিন্তাধারা ও বাস্তব কর্ম তৎপরতার জন্য এমন একটি উন্মুক্ত ময়দান খুলে দেয়। আর তা এমন মৌলিক কর্মপন্থা ও বিশেষত্বের অধিকারী, যা মানুষের সমগ্র চিন্তাধারা ও বাস্তব কর্মপন্থা ও বিশেষত্বের অধিকারী, যা মানুষের ঐ সকল তৎপরতাকে উন্নতি এবং সর্বদা সামনে অগ্রসর হবার নিশ্চয়তা দেয়।

এতটুকু অবগত হওয়াই যথেষ্ট যে, বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা অর্জনের গবেষণা পদ্ধতি যার উপর বর্তমান নব ইউরোপের শিল্পগত তমাদ্দুন প্রতিষ্ঠিত, প্রথমতঃ তা ইসলামী পাঠশালাই জন্ম লাভ করেছিল। সেখানে এ নিয়ম পদ্ধতির

নীতিমালা ইসলামী জীবনের ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি জগত, তার মূল পদার্থ, আসল প্রকৃতি এবং তার উপকরণ ও ভান্ডার থেকে এ ধ্যান-ধারণার সৃষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই গ্রহণ করা হয়েছিল। অতঃপর এ নীতির উপরই ভিত্তি করে ইউরোপের এমন একটি পুনর্জাগরণ এসেছিল, যা তাকে ক্রমাগতভাবে লালিত পালিত করে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে উপনীত করলো। কিন্তু ইসলাম জগতে তখন এ নিয়ম নীতি ব্যবহার করণের বেলায় প্রথম ইতস্ততঃ করতো, পরে তা সম্পূর্ণরূপে বর্জনই করেছিল। বর্জনের পিছনে বহুবিধ আভ্যন্তরীণ কারণও ছিল বৈকি। তাছাড়া বর্হিজগত থেকে খ্রীষ্টান মতবাদ এবং ক্রুশেডারদের তরফ থেকে ক্রমাগত হামলার চক্রান্তজাল বিস্তার করনের ফলে ইসলাম জগত ক্রমান্বয়ে নিজেদের মৌলিক আকীদা বিশ্বাস জীবনের ধ্যান-ধারণা এবং মৌলিক কর্ম পদ্ধতি থেকে বহু দুরে সরে পড়েছিল। আর এদিকে ইউরোপ তাদের থেকে তা শিক্ষা করে এ জ্ঞান গবেষণা পদ্ধতির সাথে তার বিশ্বাসগত ইসলামী সম্পর্কটিকে সম্পূর্ণরূপে কর্তন করে দিল। ইউরোপীয়রা গীর্জার সাথে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। কারণ গীর্জা এবং তার পীর পুরোহিতরা আল্লাহর নাম ভাঙ্গিয়ে মানুষের উপর নানাবিধ অত্যাচারমূলক হস্তক্ষেপ করে এসেছিল। কিন্তু তারা গীর্জা ও চার্চ থেকে দুরে থাকার কর্মপন্থা গ্রহণের সাথে সাথে এ গবেষণা পদ্ধতিটিকেও আল্লাহর থেকে সম্পর্ক কেটে বহু দূরে সরিয়ে নিয়ে ছিল।

সুতরাং প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক দেশের জাহেলী চিন্তাধারার পরিণতির ন্যায় ইউরোপীয়ান চিন্তাধারার পরিণাম ফলটিও সামগ্রিক দিক দিয়ে ইসলামী ধ্যান-ধারণা বুনিয়াদ থেকে সম্পূর্ণ রূপে ভিন্ন ও আলাদা গতি-প্রকৃতির অধিকারী। এমতাবস্থায় মুসলমানদের জন্য তাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণায় মৌলিক ভিত্তির পানে মনোনিবেশ করা আবশ্যক। নতুবা এমন কোন দ্বীনদার মোত্তাকী মুসলমান থেকে তা চিকিৎসা করা উচিত, যার দ্বীনদারী ও তাক্ওয়ার প্রতি তার এ আস্থা থাকে যে, তার থেকে সে বিনা চিন্তায়ই তা থেকে শিক্ষা করতে পারে।

জীবনের ধ্যান-ধ্যারণার মৌলিক বুনিয়াদের সাথে সংশ্লিষ্ট জ্ঞান-বিজ্ঞানের যতদুর সম্পর্ক রয়েছে তার শিক্ষার্থীকে ইসলাম কখনো জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে স্বতন্ত্ররূপে অবলোকন করে না। এ বুনিয়াদগুলোর প্রভাব এমন দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর পড়ে যার দ্বারা মানুষ, জীবন জগত, মানবিক কর্মতৎপরতা, মূল্যবোধ মানদন্ড স্বভাব অভ্যাস এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট মানব জীবনের প্রত্যেকটি দিকের প্রতি দৃষ্টিদান করে। একজন মুসলমান কোন একজন অমুসলিম অথবা মোত্তাকী

পরহেজগার নয় এমন একজন মুসলমান থেকে কেমিষ্ট্রী, ফিজিক্স, এষ্ট্রনমী, তিব্বী, শিল্পনীতি, কৃষিনীতি অথবা এডমিনিষ্ট্রেশনের জ্ঞান ও গণিত বিদ্যা অর্জন করাকে অবৈধ মনে করে না। আর এটা সেই অবস্থায়ই সার্বিক হবে, যখন তাদেরকে শিক্ষা দেবার জন্য কোন দ্বীনদার মোত্তাকী পরহেগার লোক পাওয়া না যায়। যেমন বর্তমান যুগের অবস্থা। এ অবস্থা সৃষ্টি হবার কারণ হলো যে, আমরা আমাদের দ্বীন-এবং কর্মপন্থা এবং যমীনের বুকে আল্লাহর নির্দেশে তাঁর প্রতিনিধিত্বের পদমর্যাদা এবং তার মূলদাবি থেকে দুরে চলে গিয়েছি। আর সেই দায়িত্বকে আমরা ভুলে গিয়েছি, যা এ প্রতিনিধিত্ব পাবার কারণে এ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের বেলায় আমাদের উপর অর্পিত হয়েছিল। ইসলাম কখনো এ কথার অনুমতি দান করে না। যে আমরা অনৈসলামী সাহিত্য থেকে অথবা দ্বীনদার পরহেজগার মুসলমান ব্যতীত অন্য কোন লোকদের থেকে ইসলামী আকীদা ও মৌলিক বিশ্বাসের নীতিমালা, জীবনের ধ্যান ধারণার মূল বুনিয়াদ, কুরআনের তাফ্সীর নবীর হাদীস ও তার জীবন চরিত্র কিম্বা ইসলামের ইতিহাস আর ইসলামী সমাজের জীবন পদ্ধতি, রাষ্ট্র নীতি ও রাজনীতির ধরন অথবা শিল্পকলা ও সাহিত্যের বেলায় তার নির্দেশকৃত জ্ঞান অর্জন করা যেতে পারে। এমন অনুমতি ইসলাম কখনোই দিতে পারে না।

যে ব্যক্তি এ কথাগুলো আপনাদের নিকট বলে যাচ্ছে, সে সুদীর্ঘ চল্লিশটি বছর এ অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজে অতিবাহিত করে দিয়েছে। এ দীর্ঘ সময় তার আসল কাজ ছিল মানবিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকাংশ শাখা প্রশাখাগুলো নিয়ে অধ্যাপনা গবেষণা পরিচালনা করা। তার ভিতর কোন বস্তুগুলো শুধু বিশেষ জ্ঞানের পর্যায়ভূক্ত হয় আর কোন বস্তুগুলো সভ্যতাগত গতিধারার দর্শন বিশেষ তাই অবগত হবার উদ্দেশ্যেই এ অধ্যাপনা ও গবেষণার নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা। অতঃপর সে নিজের আকীদ বিশ্বাস এবং জীবন দর্শন ও তার ধ্যান-ধারণার মূল উৎসকেন্দ্রের উপর গবেষণা ও অধ্যাপনা করে এ বিরাট ভান্ডার থেকে যা কিছু অর্জন করেছে তা খুবই সামান্য। এটাই হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সে যে জীবনের চল্লিশটি বছর এ কাজে ব্যয় করলো সেজন্য তার কোন লজ্জার কারণ নেই। কারণ সে জাহেলিয়াতকে ভালরূপে অনুধাবন করতে পেরেছে। তার মূল রহস্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেছে, আর কার ভিতর কতখানি অনৈতিক্যতা বক্রতা হীনতা-নীচতা নিহিত রয়েছে এবং তা কতদূর গিয়ে পৌছেছে সে বিষয় সে সম্যক আপলক্ষ্য অর্জন করেছে জাহেলিয়াত তার নিজের বেলায় যে কতখানি

ভুলের ভিতর নিপতিত এবং তার বড় গলার দাবি কতখানি অসার ও ভিত্তিহীন, তাও সে পূর্ণরূপে অবগত হয়েছে। তার ব্যক্তিগত জ্ঞান গবেষণার ফলে তার মনে এ দৃঢ় বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছে যে, একজন মুসলমানের জন্য জ্ঞান অর্জন ও পথের দিশা নেয়ার জন্য ইসলামী এবং অনৈসলামী এ দুটি উৎসমূলকে একত্রে গ্রহণ করা কোন ক্রমেই সম্ভভ নয়।

এ কথাগুলো আমার স্বভাবজাত কথা নয়। কেননা বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, এ ব্যাপারে স্বীয় ব্যক্তিগত মতবাদকে ফয়াসালাকরী মনোনীত করা বৈধ নয়। আল্লাহর নিকটেও এ বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ যে কোন মুসলমান এ ব্যাপারে কাহারো মতবাদের ওপর নির্ভর করতে পারে না। এ ব্যাপারে আমরা আল্লাহর ফরমান এবং নবী করীম (সাঃ) এর হাদীসকেই ফয়সালাকরী মনোনীত করছি। ঈমানদারের তরীকা হল যে যদি আল্লাহ তায়ালা এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তবে যে ব্যাপারে তাদের মতানৈক্য দেখা দেয় সে বিষয় আল্লাহ এবং রাসুলের কি নির্দেশ রয়েছে,তার পানে মনোনিবেশ করা উচিত। সুতরাং এখন আমি এ ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসুলের পানে মনোনিবেশ করছি।

আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের বেলায় ইয়াহুদ নাসারাদের সর্বশেষ মনোভাব সম্পর্কে এরশাদ করেছেন–

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا - حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

–"আহলে কিতাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই যে কোন প্রকারে তোমাদেরকে ঈমান ও ইসলামের পথ থেকে কুফর ও জাহেলিয়াতের পানে নিয়ে যেতে চায়। যদিও সত্য তাদের নিকট পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। তথাপি মনের হিংসা বিদ্বেষের বশবর্ত্তি হয়ে তোমাদের জন্য তারা এটাই চায়। তোমরা এর জবাবে সহনশীলতা এবং ক্ষমা প্রদর্শনের পথ অবলম্বন করো: যথক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা নিজে এ বিষয় কোন ফয়সালা না করে দেন। (নিশ্চিন্ত থাক) আল্লাহ সব কিছু করতে সক্ষম। *সূরা বাকারা–১০৯)

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى - وَلَئِنْ

اتَّبَعْتَ اَهْوَاۤءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَاۤءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ -

—“ইয়াহুদ নাসারাগণ তোমাদের প্রতি কখনোই সন্তুষ্ট হতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তাদের মত পথ ও ধর্ম গ্রহণ না করো। হে নবী। আপনি বলে দিন যে, পথ একমাত্র এটাই, যা আল্লাহ তায়ালা বলে দিয়েছেন। নতুবা তোমাদের নিকট যে অহীর জ্ঞান এসেছে এর পরও যদি তোমরা তাদের ইচ্ছার আনুগত্য করো, তবে মনে রেখ। আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করার নিমিত্ত তোমাদের কোন সাহায্যকারী বা বন্ধু থাকবো না: —পাবে না।” (সূরা বাকারা—১২০)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ -

“হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আহলে কিতাবদের একটি সম্প্রদায়ের কথাও মেনে নাও, তবে তোমাদেরকে আবার ঈমান থেকে কুফরের পানে নিয়ে যাবে।” (সূরা আলে এমরাণ—১০০—)

মুসলমানদের বেলায় ইয়াহুদ নাসারাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যখন এত নিশ্চয়তার সাথে স্থির হল, তখন একটু সময়ের জন্য তা ধারণা করা আহাম্মকী বৈ কিছু নয়। তারা ইসলামী আকীদা ইসলামী ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে কোন কল্যাণকর এবং সঠিক কথা বলবে, যা যথাযোগ্য পথের সন্ধান দিবে। আল্লাহ তায়ালার এহেন পরিষ্কার বর্ণনা থাকার পরেও যদি কোন ব্যক্তি তাদের ইচ্ছা উদ্দেশ্য এবং কর্মতৎপরতার বেলায় সু ধারণা পোষণ করি, তবে তাকে আসলে গাফেল অলস ছাড়া কিছুই বলা যায় না। কুরআনে করীমের আয়াত কুল ইন্নাহুদাল্লাহে হুয়ালহুদা দ্বারা একটি মাত্র উৎসমূলই নিরূপিত হয়, যার দিকে একজন মুসলমানকে তার সমুদয় ব্যাপারেই মনোনিবেশ করা কর্তব্য। কেননা আল্লাহর পথ প্রদর্শন ব্যতীত যা কিছুই হবে তা গোমরাহী বৈ কিছু নয়। আর কোন হেদায়েত অন্য কোন উৎসমূল থেকে পাওয়া যাবে না। অত্র আয়াতে অবরোধ বিশেষ সম্বলিত শব্দ ব্যবহার দ্বারা এ আয়াতের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা পরিষ্কার হয়ে যায়, দ্বিতীয় কোন ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না।

এমনিরূপে নিশ্চিত ও কঠোরভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার স্বরণ থেকে ঘাড় ফিরিয়ে নিবে এবং যার সমুদয় কর্মতৎপরতা পার্থিব জীবনের সমস্যা ও বিষয়াবলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, তা থেকে দুরে থাকা আবশ্যক। আর এ কথাও প্রমাণিত যে, এ ধরণের লোকেরা ধারণা করা ছাড়া কিছুই জানে না বুঝে না। অথচ মুসলমানদেরকে ধারণা ও অনুমানের আনুগত্য করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর এ কথাও বলা হয়েছে যে, এ ধরণের লোকেরা পার্থিব জীবনে উন্নতি লাভের বিষয়গুলোই কেবল অবগত, সত্যিকারের জ্ঞান থেকে তারা বঞ্চিত। আল্লাহ বলেনঃ

فَاَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ـ ذَالِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى ـ

"সুতরাং, (হে নবী) যে ব্যক্তি আমার স্বরণ থেকে ঘাড় ফিরিয়ে নিয়েছে এবং পার্থিব জীবনকে একমাত্র উদ্দেশ্য করে নিয়েছে: তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিন। তাদের জ্ঞানের দৌরাত্ম শুধু এ পর্যন্তই। আল্লাহর পথ থেকে কে সরে পড়েছে এবং কে কায়েম আছে সে বিষয় তোমার প্রতিপালকই বেশ ভাল অবগত আছে।" (সূরা আন্ নজম ২৯-৩০)

"এরা জাগতিক জীবনের বাহিরের দিকটা সম্পর্কেই অবগত রয়েছে আখেরাতের বেলায় এরা সম্পূর্ণ গাফেল।' (সূরা রূম - ৭)

"তারা আল্লাহর হেদায়েত থেকে গাফেল থাকে এবং পার্থিব জীবনকেই একমাত্র উদ্দেশ্য করে নেয়, যেমন বর্তমান যুগের পারদর্শি বৈজ্ঞানিকদের অবস্থা, তারা শুধু বাহ্যিক দিকটার বিষয়ই জ্ঞান রাখে। এটা সে বিদ্যা নয় যার পারদর্শীদের প্রতি মুসলমানরা আস্থা স্থাপন করতে পারে এবং নিজেদের সমগ্র ব্যাপারে তার থেকে পথের সন্ধান নিতে পারে। এমন ব্যক্তিদের থেকে শুধু তার জাগতিক বস্তুগত জ্ঞানের সীমারেখা পর্যন্ত কিছু শিক্ষা করে নেয়া যেতে পারে। জীবনের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যাখ্যার বেলায় অথবা তার দার্শনিক বিষয়সমূহের বেলায় তাদের থেকে পথের সন্ধান নেয়া যায় না। পবিত্র কুরআন মজীদে যে সম্পর্কে ইঙ্গিত দান করা হয়েছে, এবং যার পারদর্শী ব্যক্তিদের প্রশংসা করা হয়েছে, এ জ্ঞান ও ইলম সে জ্ঞানও নয় সে এলমও নয়। যে ইলম ও জ্ঞান

আল্লাহর থেকে হেদায়াত পাওয়ার শিক্ষা দেয় না এবং যে জ্ঞান মানুষের মনে এ অনুভূতি জাগিয়ে তুলে না যে, সে যা অবগত ছিল না সেই বিষয় আল্লাহ তায়ালা তাকে জ্ঞান দান করেছে, তাকে চেতনা অনুভূতি ও জ্ঞান দান করেছে, এবং তাকে প্রকৃতি জগতের বহু বস্তুকে অধীনস্ত করে রাখার যোগ্যতা দান করে তার প্রতি কতই না দয়া করেছে। সে জ্ঞানও আসল জ্ঞান নয়। তা পথভ্রষ্টকারী জ্ঞান, তা দ্বারা মানুষ আল্লাহ থেকে দুরে সরে যায়। কুরআনে করীমে যে জ্ঞান সম্পর্কে ইঙ্গিত দান করা হয়েছে যার প্রশংসা সে করে তা এমন নয় যেমন কতিপয় লোক ধারণা করে। তারা কুরআনের আয়াতের অগ্র পশ্চাত পর্যবেক্ষণ না করে তা থেকে ভ্রান্ত মতবাদ প্রমাণ করার অপচেষ্টা করে।

এটা ধ্রুব সত্য কথা যে আকীদা বিশ্বাস ও ধর্মীয় কর্তব্যবলী সম্পর্কীয় জ্ঞানের নামই ইলম নয়। বরং তার গম্ভীর ভিতরে সকল বস্তুই ইসলামে রয়েছে। ইলম এর সম্পর্ক প্রাকৃতিক নীতিমালা এবং পৃথিবীর প্রতিনিধিত্বের সাথে তার ব্যবহারের বেলায় এতটুকই রয়েছে, যতটুকু আকীদা ও ধর্মীয় কর্তব্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। তা এমন ইলম নয়, যা ঈমাণের ভিত্তির থেকে সম্পর্কচ্ছেদ হয়। এষ্ট্রনমী, বায়ওলোজী, ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রি, তিব্বী এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় নীতিমালার সাথে সংশ্লিষ্ট জ্ঞান এবং ঈমানের ভিত্তির সাথে একটি সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। এ সকল জ্ঞান মানুষকে আল্লাহর পানই নিয়ে যায়। কিন্তু শর্ত হচ্ছে যে, ভ্রান্তপূর্ণ গতিধারা তাদেরকে আল্লাহর থেকে দুরে সরিয়ে নেয়ার জন্য যেন ব্যবহার করা না হয়। পরিতাপের বিষয় যে ইউরোপীয়ানরা নিজেদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি লাভের বেলায় এ দৃষ্টিভঙ্গিই গ্রহণ করে নিয়েছে। যার কারণ হলো সেই অভিশপ্ত দ্বন্দ্ব ও টানা হেঁচড়া, যা আমরা বিশেষভাবে ইউরোপীয়দের ইতিহাসে পাই। সামাজিক জীবনের এহেন দ্বন্দ্ব ও টানা হেঁচড়াই ইউরোপীয়দের চিন্তাধারা পদ্ধতির ভিতর গভীর প্রভাব বিস্তার করে তাকে একটি বিশেষ স্বভাবের অধিকারী বানিয়েছে। ফল এ হয়েছে যে, শুধু কেবল ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার ভিত্তির উপরই নয়, এবং চার্চ ও গীর্জার ধ্যান-ধারণার ভিত্তির উপরও নয়; এ বিষাক্ত হাওয়া ইউরোপীয় চিন্তাধারার সৃষ্ট সমগ্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখা প্রবাহিত হয়েছে। তাই তা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হোক কিম্বা সেই বৈজ্ঞানিক গবেষণার বেলায় হোক, যা বাহ্যিকভাবে ধর্মীয় বিষয়ের সাথে কোন সম্পর্কই রাখে না।

পাশ্চাত্য চিন্তাধারার গতি প্রকৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল ময়দানে এ চিন্তাধারার পরিণাম ফল ধর্মী ধ্যান ধারণার ভিত্তির উপর বিষাক্ত হায়নার ন্যায় যে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এ কথা পরিষ্কার হবার পর এটা আমাদের ভালরূপে উপলব্ধি করা উচিত যে, এ গতিধারা এবং তার বাস্তব পরিণাম ফল ইসলামী ধ্যান-ধারণার পরম শত্রু। কারণ এটা তাদের বিশেষ লক্ষ্য বস্তু হয়ে আছে। অধিকাংশ সময় স্বজ্ঞানে তারা ইসলামী আকীদা ও ধ্যান-ধারণা এবং ইসলামী জ্ঞানলব্ধ বস্তুকে ধ্বংস করার অবিরত চেষ্টায় লিপ্ত। আর সেই ভিত্তিগুলোকে বিলীন করে দেয়ার কাজে ব্যস্ত, যার উপর মুসলিম সমাজের স্বাতন্ত্রতা ও বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত। এ কারণেই ইসলামের অধ্যায়ন ও গবেষণার বেলায় পাশ্চাত্য গবেষণা পদ্ধতির এবং পাশ্চত্যের চিন্তাধারার ফলশ্রুতির উপর নির্ভর করা বোকামী বৈ কি। এমনিভাবে শুধু সাইন্স অধ্যায়নের বেলায়ও যে বিষয় আমরা বর্তমানে পাশ্চাত্যের উৎসমূল থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারি নি আমাদের পূর্ণ সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত এবং তার দর্শনগত দিকটিকে আমাদের বর্জন করা অপরিহার্য কর্তব্য। কেননা এ দর্শনগত প্রভাবেই মৌলিক ভাবে ধর্মীয় ধ্যান ধারণার বিশেষ করে ইসলামী ধ্যান–ধারণার চরম দুশমন। তার সাধারণ একটু দুর্গন্ধই ইসলামের স্বচ্ছ সলীল প্রস্রবনটিকে বিষাক্ত করে তোলার জন্য যথেষ্ট।

এখন আমরা সাহিত্য এ ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষভাবে আমাদের মনোভাব ব্যক্তি করবো। আর তা অধ্যায়ন করার সঠিক নির্বিঘ্ন পথ কোন্‌টি যা মুসলমান হতে এবং মুসলমানের অন্তরকে জাহেলিয়াতের প্রভাব থেকে পবিত্র করার কাজ করতে পারে। সেই সম্পর্কেও আলোচনার আশা রাখি। এ সাহিত্যই আজ সমগ্র দুনিয়াকে প্রভাবিত করে ফেলছে।

ইসলামী সাহিত্য

সাহিত্য হলো জীবনের সেই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যা আমাদের চেতনা অনুভূতিকে প্রকাশ করে। তা এমনই একটি প্রশ্রবণ থেকে বাহির হয়, যেখানে বিশেষ একটি পরিবেশের মধ্য দিয়ে সমুদয় জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শণ ফালসফা ধর্ম মাযহাব বাস্তব অভিজ্ঞতাসমূহ এবং অন্যান্য উপকরণগুলোর স্রোতধারা এসে মিলিত হয়েছে। জীবন সম্পর্কে একটি এলাহী ধ্যান ধারণার পূর্ণগঠন এবং মানুষের স্বভাবকে একটি বিশেষ ছাচে ঢালাই করে গঠন করার ব্যাপারে সাহিত্য একটি ফলপ্রসু ও কার্যকরী উপকরণের পরিণত হয়ে আছে। এ কারণেই

আমাদের নিকট এমন একটি সাহিত্য থাকা আবশ্যক, যা ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তাধারায় ভরপুর ও সমৃদ্ধ। এখানে আমরা ইসলামী সাহিত্যের গঠন প্রকৃতি ও তার গতিধারার উপর আলোচনা করবো।

অন্যান্য সুক্ষ্ম বিষয়সমূহের ন্যায় সাহিত্য সেই জীবন্ত মূল্যবোধ সমূহের ভাষ্যকার বিশেষ, যার দ্বারা সাহিত্যিকদের মন-প্রাণকে প্রভাবিত করে। এ মূল্যবোধগুলো বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন অবস্থায় ও বিভিন্ন যুগে বিচিত্র রূপে হয়। কিন্তু তার মূল উৎস সর্বাবস্থায়ই জীবনের কোন বিশেষ ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারার আলোকে সৃষ্ট সেই দৃঢ় সম্পর্কের মধ্যে পাওয়া যায়, যা মানুষ সৃষ্টিজগত এবং মানুষ মানুষের ভিতর বর্তমান।

সাহিত্য বা এমনি কোন সুক্ষ্ম বিষয়কে সেই সকল মূল্যবোধ ব্যতীত অবলোকন করার চেষ্টা নিরর্থক বৈ কিছু নয়, যা সরাসরি সে ব্যাখ্যা করে অথবা সেই প্রভাবগুলো প্রকাশ করার চেষ্টা করে, যা মানুষের অনুভূতি ও চেতনাবোধ গ্রহণ করে নেয়। যদি আমরা এহেন অসম্ভব সাফল্য লাভ করার ইচ্ছায় তাকে এ মূল্যবোধগুলো ব্যতিরেকে অবলোকন করি, তবে অন্তঃসার শূন্য বাক্যাবলী, নিরস নিরর্থক বাক্য বিন্যাস এবং অর্থহীন জনিত স্বরধ্বনি এবং প্রাণহীন দেহ ছাড়া কিছুই আমাদের নজরে আসবে না।

এমনিভাবে বিশেষ করে এ সকল মূল্যবোধগুলোকে জীবন সম্পর্কে একটি সামগ্রিক চিন্তাধারা এবং তার আলোকে প্রতিষ্ঠিত সেই দৃঢ় সম্পর্কগুলোকে আলাদা করে দেখার চেষ্টাও একটি অর্থহীন কাজ। যা মানুষ ও সৃষ্টি জগত মানুষ এবং বাস্তব ঘটনাবলী অথবা মানুষের ভিতর পাওয়া যায়। মানুষের কোন চেতনাবোধ ও অনুভূতি আছে কি নেই জীবন সম্পর্কে তারা কোন বিশেষ ধ্যান-ধারণা রাখে কি রাখে না সে কথা নয়। কেননা এ ধ্যান-ধারণা সর্বাবস্থায়ই তাদের মধ্যে বর্তমান থাকে। আর তাই তার দৃষ্টিতে মূল্যবোধগুলোকে নির্বাচন করে নির্দিষ্ট করে, আর মানুষ এ সকল মূল্যবোধগুলো থেকে যে ফলাফলগুলো গ্রহণ করে তাও তারই রংয়ে রঙ্গিন হয়ে উঠে।

ইসলাম হচ্ছে জীবনের একটি বিশেষ দর্শন ও ধ্যান-ধারণা। তার এ ধ্যান-ধারণা থেকেই কতকগুলো বিশেষ মূল্যবোধ জন্ম নেয়। স্বাভাবিকভাবে এ মূল্যবোধগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অথবা শিল্পীর ভিতরগত প্রভাবকে রূপদান করার একটি বিশেষ গতিধারার অধিকারী।

ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব হলো যে, সে একটি বিরাট নিবিড় স্পন্দনশীল ও সৃজনশীল এমন একটি শক্তি সম্পন্ন আকীদা বিশ্বাসের অধিকারী যা ব্যক্তির অভ্যন্তরে এবং তার কর্ম জীবনের উপর পূর্ণরূপে প্রভাব বিস্তার করে। আর মানুষের সমগ্র কর্মশক্তি অনুপ্রেরণা ও চেতনাশক্তিকে নিজের অনুগত করে নেয়। এরপর আর এমন কোন স্থান শূন্য পড়ে থাকে না, যেখানে চাঞ্চল্য ব্যস্ততা অস্থিরতা স্থান করতে পারে অথবা এমন কোন নিরর্থক ও কর্মহীন চিন্তা গবেষণা গিয়ে ঢুকতে পারে, যার পরিণাম ফল স্বপ্ন জগতে বিচরণ করা এবং মনের খেয়ালী পূর্ণ ধারণা ছাড়া কিছুই হয় না। ইসলামের মধ্যে সবচেয়ে জাজ্বল্যমান বস্তুটি হচ্ছে তার সর্বাঙ্গীন বাস্তব সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, যা চিন্তা গবেষণা ও গতিধারাকে পরিবেষ্টিত করে। ইসলামের প্রত্যেকটি মানবিক চিন্তা গবেষণা এবং জাগতিক সম্পর্কের একটি বোধজ্ঞান অথবা সেই বোধজ্ঞানের একটি চেষ্টা সাধনা অবশ্যই বর্তমান থাকে। আর তাই স্রষ্টা ও সৃষ্টি অথবা সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন বস্তুগুলোর বিভিন্ন প্রাপ্ত সম্পর্কগুলো শক্তি সম্পন্ন হওয়ার ও দৃঢ়তা অর্জনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তার প্রতিটি গতি প্রবণতা একটি লক্ষ্যের মুখবন্ধ অথবা কোন লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা সাধনায় পরিণত হয়, সে লক্ষ্যবস্তু যতই উন্নত হোক না কেন।

জীবনকে ক্রমবর্ধমান রূপে উন্নতির পানে ধাবিত করে নেয়ার উদ্দেশ্যেই ইসলামের আগমন। কোন বিশেষ স্থানে বিশেষ যুগের মধ্যে জীবনকে কোনাঠাসা করে রাখা বাস্তব জগতে যা কিছু হোক না কেন, সে উদ্দেশ্য তার নয়। আর এ জন্য সে আসেও নি। মাবন জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে যে কর্ম চাঞ্চল্যতা অথবা নিষিদ্ধ কারণতা কিম্বা গতি প্রবণতা ও বাধ্যবাধকতার গোপন করাই তার উদ্দেশ্য নয়। যা কোন বিশেষ সময় বা দীর্ঘ একটি সময়ের মধ্যে পাওয়া যায়।

ইসলাম সর্বদাই জীবনকে উন্নতি সমৃদ্ধি এবং নতুন ধরণ পদ্ধতি গ্রহণ করার পানে নিয়ে যায়। সে মানবিক শক্তিগুলোকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করে তাকে উত্তেজিত ও উদ্বেলিত করে উন্নতির দিকে নিয়ে যায়। এ কারণেই ইসলামী জীবন দর্শন ও ধ্যান-ধারণা থেকে উজ্জীবিত সাহিত্য বা শিল্প কলা মানবিক দুর্বলতা সমূহের প্রতিবিম্বগুলোর প্রতি বেশী গুরুত্ব প্রদান করে না। আর তা তুলে ধরার ব্যাপারেও বেশী বর্ণনা দেয় না। এ দুর্বলতাগুলো যে কার্যতঃ বর্তমান রয়েছে, এ যুক্তি প্রমাণের উপর ভিত্তি করে তা যতই পছন্দসই করে পেশ করা হোক না কেন-এগুলোকে বৈধতার সার্টিফিকেট দানের জন্য চেষ্টাও সে করে না। সুতরাং তা গোপন করা বা তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করার প্রয়োজনও করে না।

মানুষে ভিতর যে দুর্বলতা রয়েছে সে সত্যটিকে ইসলাম অস্বীকার করে না। তবে মানবতা যে সৌন্দর্য সুষমার অধিকারী সে অনুভূতি জ্ঞানটি তার রয়েছে। তার অনুভূতি জ্ঞান হচ্ছে যে, মানবিক দুর্বলতাগুলোর উপর সৌন্দর্যগুলোকে বিজয়ী করা, মানবতাকে উন্নতির পানে নিয়ে যাওয়া এবং ক্রমবর্ধমান রূপে তাকে উন্নত করাই তার আসল কাজ। এ দুর্বলতাগুলোকে বৈধতার সার্টিফিকেট দিয়ে, তাকে আকর্ষণী ও মোহনীয় করা তার কাজ নয়।

ইসলামী জীবন দর্শন থেকে নির্ঝরিত সাহিত্য ও শিল্পকলাগুলোর গতি কখনো কখনো মানবিক দুর্বলতাগুলোর কারণে থেমে যায়। কিন্তু বেশী দিন স্থায়ী থাকে না। বরং তার পানে সে এতটুকুই দৃষ্টি দেয় যতটুকু মানবতাকে সেই দুর্বলতাগুলোর গহীন কুয়া থেকে বাহির করে আনতে এবং বাধ্যবাধকতা ও অপরাগতার বেড়াজাল এবং প্রবল চাপের থেকে মুক্ত হবার জন্য প্রয়োজন। এ জন্য ইসলামী সহিত্য সীমিত অর্থে আখলাক ও নৈতিকতার অনুগত হবার নাম নয়। বরং ইসলামী জীবন দর্শন ও ধ্যান-ধারণার স্বাভাবিক গতি প্রকৃতির এবং সে যে জীবনকে ক্রমবর্ধমানশীল উন্নতি দান করে তারই বাস্তব ফলশ্রুতি। যে কোন যুগে কোন সময়ই জীবনের বাস্তব অবস্থার উপর সন্তুষ্ট হয়ে থাকার কথা জানে না বুঝে না। বিবর্তশীল ক্রমোন্নতিই তার চূড়ান্ত লক্ষ্য।

ইসলামী দর্শন এ পৃথিবীতে মানুষের শক্তিহীনতা ও দুর্বলতার কথা এবং জীবনকে সামনে অগ্রসর করে নিয়ে যাবার ব্যাপারে ব্যক্তির ভূমিকার অসত্যতার প্রবক্তা নয়। সুতরাং ইসলামী জীবন দর্শন থেকে নির্ঝরিত সাহিত্য শিল্পকলার কাজ এ নয় যে, সে মানুষকে তাদের দুর্বলতা অপরিপক্কতা এবং নীচতা হীনতার কথা স্মরণ করিয়ে দিবে। আর তাদের জীবনে ও অনুভূতি জগতে যে শূন্যতা বিরাজমান করেছে তাকে পঞ্চ ইন্দ্রীয়ভূত সুস্বাদু বস্তুর স্বপ্ন বিলাস এবং এমন লোভ-লালসা ও বাসনার দ্বারা পূরণ করে যা মানুষকে ব্যাকুলতা হিংসা বিদ্বেষ এবং শোষণশীল ও ভক্ষণশীল চেতনা অনুভূতি ছাড়া কিছুই দান করে না। এ গুলোও এ সাহিত্য শিল্পকলা উজ্জীবিত করে না। এ সাহিত্য ও শিল্পকলা মানুষকে তার এমন গতি প্রবণতার কথাগুলো স্মরণ করিয়ে দেয়, যা মানুষকে উন্নতির পান আকৃষ্ট করে। সে তাদের জীবন ও চেতনাবোধের শূন্য স্থানগুলো এমন একটি মানবিক উদ্দেশ্য দ্বারা পুরণ করে, যা এ জীবনকে সম্মুখ পানে উন্নতির দিক এগিয়ে নিয়ে যায়। এ উদ্দেশ্যগুলো ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ জগতের সাথে যেমন থাকে সংশ্লিষ্ট তেমনি থাকে তার কর্মময় জগতের সাথে বিজড়িত।

ইসলামী চিন্তাধারা থেকে নির্ঝরিত সাহিত্য ও শিল্পকলাগুলোর প্রকাশের নাম ওয়াজ-নছীহত নয়। মনোভাব প্রকাশের এহেন সকল সহজ পদ্ধতিটিকে যে শিল্পগত বিষয় নিরূপণ করা যায় না, তা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট কথা।

এ সাহিত্য শিল্পকলার কাজ এ নয়, যে মানবিক ব্যক্তিত্ব অথবা সামাজিক জীবনকে একটা কিছু না কিছু বানিয়ে পেশ করবে এবং মানবিক জীবনের এমন একটি কল্পিত চিত্র তুলে ধরবে, যার আসল কোন অস্তিত্বই নেই। সে পূর্ণ সততার সাথে মানুষের ভিতরগত বাহিরগত উভয় দিকের যোগ্যতাবলীকেই সামনে পেশ করে। সে জীবনের এমন মহান উদ্দেশ্যাবলীর সঠিক চিত্র অঙ্গন করে, যা মানুষের জন্য জাগতিক জীবনের উপযোগী; ভেড়ার পালের জন্য নয়।

ইসলামী চিন্তাধারা থেকে উজ্জীবিত সাহিত্য বা শিল্পকলা দ্বারা সর্বদাই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে থাকে। কেননা ইসলাম হচ্ছে জীবনকে পর্যায়ক্রমে সম্মুখে এগীয়ে নেয়ার জীবন্ত আন্দোলন। সে কোন বিশেষ যুগে বা বিশেষ সময়ের ভিতর বাস্তব ক্ষেত্রে যে অবস্থাই বর্তমান থাকুক না কেন, তার উপর সন্তুষ্ট হওয়ার কথা সে জানে না– জানে না সে এজন্য সেই বর্তমান অবস্থার পরিবেশটাকে বৈধ করতে অথবা আকর্ষণীয় করে পেশ করতে যে বাস্তব ক্ষেত্রে সে বর্তমান আছে। তার আসল কাজ হচ্ছে বাস্তব ক্ষেত্রে যা কিছু বর্তমান রয়েছে তার মধ্যে বিবর্তন আনা এবং তাকে উন্নত করে তোলা। এর ভবিষ্যত প্রোগাম হলো যে জীবনের পূর্ণগঠন ও পুর্ণবিন্যাসের কাজ সর্বদাই প্রচলিত রাখা।

স্বীয় এ বিশেষত্বের দিক দিয়ে এটা এমন একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ সাহিত্য ও শিল্পকলার ন্যায় ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে উজ্জীবিত হয়। কিন্তু এ সামঞ্জস্যতা ও মিলন আসল মিলন নয়। বরং একটি আকস্মিক মিলন! এ ছাড়া এ দু'টির পথও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও আলাদা পথ। কেননা বস্তুবাদের মধ্যে জীবনকে সামনে অগ্রসর করে নেয়ার শক্তির একমাত্র ভিত্তি হলো শ্রেণী সংগ্রাম। ইসলাম শ্রেণী সংগ্রামকে এতখানি গুরুত্ব দেয় না। কেননা মানবিক উদ্দেশ্যের ব্যাপারে তার দর্শন ও ধ্যান ধারণা তার তুলনায় অনেক উন্নত মহান ও উদার। সে সামাজিক জুলুম অত্যাচারকে যেমন পছন্দ করে না, তেমনি তাকে বৈধও বলে না। মানুষকে তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে এবং তা থেকে লাভবান হতেও শিক্ষা দেয় না। এ জুলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করা এবং তা নিরসনের নিমিত্ত সংগ্রাম করা এবং তার সমুদয় সংগ্রামী কার্যতালিকার অন্তর্ভূক্ত কাজ। তবে পার্থক্য হলো যে, সে তার নিজের বিপ্লবী আন্দোলনকে শ্রেণী বিদ্বেষের ভিত্তির

উপর নয় বরং মানুষকে উপরে তুলে ধরতে এবং প্রয়োজনে গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্তি দিয়ে সম্মান ও মহত্বের মালিক করে দেয়ার আকাঙ্খার উপর চালায়। আর সেই আকাঙ্খাটি হচ্ছে মানুষের নজীরবিহীন মানবতাকে কেবলমাত্র পানাহার ও দৈহিক প্রয়োজন পুরণের মধ্যে নিমজ্জিত থাকার বেড়াজাল থেকে মুক্ত করা এবং স্বাধীন মানুষরূপে বাঁচার সুযোগ দেয়া।

ইসলামী দর্শনে জীবনকে সামনে আগিয়ে নেবার আন্দোলনের ভিত্তি হলো সমগ্র মানবতাকে আগিয়ে নেয়ার, উপরে তুলে ধরার মুক্ত করণের এবং নব সৃজনশীল কর্মতৎপরতায় লাগিয়ে দেয়ার লৌহ কঠিন দৃঢ় সংকল্পের উপর। এ পথে এ চিন্তাধারা বিভিন্ন শ্রেণীর দুঃখ-দুর্দশা আপদ বিপদ বাধা-বিপত্তির পানে এ জন্য দৃষ্টি দেয় যে, এ বিপদ আপদ ও দুঃখ দুর্দশাগুলো বিদূরীত করা হবে। সে মানুষের দুঃখ দুর্দশা ও বিপদ আপদকে সাধারণ কোন বস্তু বলে মনে করে না। কিন্তু সে তা দূরীকরণের নিমিত্ত হিংসা ও বিদ্বেষকে হাতিয়ার রূপে ব্যবহারও করে না। কারণ সে জানে যে, হিংসা-বিদ্বেষ এমনই একটি পায়ের জিঞ্জির, যা অধিকাংশ মানুষকে উন্নতির পানে ধাবিত হওয়ার পথে বাঁধা হয়ে দন্ডায়মান হয় এবং মানুষকে তা থেকে ফিরিয়ে রাখে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, শুধু দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গিগত আলোচনা এবং ওয়াজ নছীহতের ময়দানে নয়, বরং বাস্তব জীবনে এ দুঃখ-দুদর্শা ও আপদ-বিপদকে কার্যতঃ দুর করার উপায় কি? এ ব্যাপারে আমি অন্যত্র বিশদ আলোচনা করেছি। এখানে শুধু এ কথাটির উপরই জোর দিচ্ছি যে, ইসলামী সাহিত্য বা শিল্পকলা একটি উদ্দেশ্য পূর্ণ সাহিত্য উদ্দেশ্যপূর্ণ শিল্পকলা। জীবন এবং মানসিক সম্পর্কের বেলায় ইসলামী চিন্তাধারার মূল স্বভাবগত দাবি হচ্ছে যে, তা উদ্দেশ্যপূর্ণ হতে হবে। এ স্বভাবটি হচ্ছে এমন একটি আন্দোলনী স্বভাব, যা সৃষ্টি ও সংগঠনের পানে নিয়ে যায়, উন্নত হবার তালীম দেয়। এখানে উদ্দেশ্য কথাটা দ্বারা এ কথা বুঝান উদ্দেশ্য নয় যে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ব্যাখ্যার উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীদের ন্যায় এ উদ্দেশ্যকে জবরদস্তীমূলক প্রচলিত করা হোক। বরং আমার মতে তার একমাত্র পথ হচ্ছে ইসলামী জীবন দর্শন মানুষের মধ্যে এমন একটি বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি করবে যার তাগিদে তার থেকে শিল্পকলার এমন এমন নব নব কায়দা-কানুন জন্ম নিবে, যা বস্তুবাদী জীবন দর্শন বা অন্য কোন জীবন দর্শন কর্তৃক সৃষ্ট শিল্পকলা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের হবে।

ইসলাম আসলে সূক্ষ্ম বিজ্ঞানতত্ত্ব বিষয়ের শত্রু নয়। অবশ্য সে সেই সকল

মূল্যবোধ ও ধ্যান-ধারণার কতিপয়ের বিরোধী, যার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আজ সূক্ষ্মতত্ত্ব বিশিষ্ট বিজ্ঞান দ্বারা করা হচ্ছে। সে তাদের স্থান আভ্যন্তরীণ জগতে এমন কিছু কিছু অন্য ধরণের ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধ এনে আমদানী করে, যা সৌন্দর্য সুষমামন্ডিত ধ্যান-ধারণার শিল্পগত নিপুণতা, প্রকাশ করবে এবং অধিকতর স্বাধীনতা ও সুন্দর কর্মদক্ষতার সাথে শিল্পের এমন নব প্রদর্শনী উপস্থিত করবে যা ইসলামী দর্শন ও ধ্যান-ধারণার স্বভাব থেকে উৎসারিত হয় এবং তার পার্থক্য জনিত সম্মানিত বিশেষত্বেরও অধিকারী হয়।

এ কথা দ্বারা যেন কেহ এ অর্থ গ্রহণ না করে যে নবাগতদের জন্য ইউরোপীয় লিটারেচার অধ্যায়ন করা হারাম। আমরা শুধু ভাল শালীন ও সুন্দরকে নির্বাচন করে নেয়া এবং কুৎসিত অশালীন ও খারাপকে বর্জন করার দাওয়াত দিচ্ছি। কেননা সে সব লিটারেচারের মধ্যে এমন এমন বস্তু নিহিত রয়েছে যা ইসলামী মূল ভাবধারার সাথে সামঞ্জস্যশীল। এ জন্য তা অধ্যায়ন করাকে বর্জন করতে বলছি না যে, তাতে সৎ চরিত্রের উপদেশ এবং অসৎ চরিত্রের অপবাদ বর্ণনা হইয়াছে। কেননা সাহিত্য মিম্বরের উপর বা জন সভায় দন্ডায়মান হয়ে ওয়াজ নছীহত করার নাম নয়। বরং সে জীবনকে বস্তুবাদীতা থেকে উন্নত হয়ে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে অবলোকন করে। আর জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ আসল মূল্যবোধগুলোকেও সমর্থন করে। এ ধরণের সাহিত্যাবলী স্বীয় আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে ইসলামী জীবন দর্শনের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। সুতরাং নিয়ম-নীতির মাধ্যমে তা নির্বাচন করে অধ্যয়ন করা যায়।

ইতিহাস

ইতিহাস আসলে সাহিত্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বিশেষ। তবে তা একটি বিশেষ স্বভাব ও বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। জীবনের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের নাম হচ্ছে ইতিহাস। দর্শন এবং জীবন সম্পর্কে সাধারণ ধ্যান–ধারণা দ্বারা তা অনিবার্য রূপে প্রভাবিত হয়। এ ভিত্তিগুলোর উপর কৃত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জীবন সম্পর্কে এমন ধ্যান-ধারণা দান করে, যা জীবন এবং ঐতিহাসিক গতিধারা সম্পর্কিত বিষয়ের বেলায় ইসলামী দর্শন ও ধ্যান ধারণা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ।

উপরন্ত কথা হচ্ছে যে, ঐতিহাসিকদের অধিকাংশই হচ্ছে ইউরোপীয়ান। সুতরাং ইউরোপকেই তারা বিশ্ব ইতিহাসের অক্ষরেখা ও মেরুদন্ডে পরিণত করে রেখেছে। যদি আমরা পাশ্চাত্যের আত্মগর্ব এবং আত্মতুষ্টিকে দৃষ্টির আড়ালে রেখে

যাই, তবে মানুষের স্বভাবগত দুর্বলতার দিক দিয়ে তাদের এমন করাটাকে ওজর অপারগতা মনে করবো। এ ধরণের আধ্যাত্মিকতার অধিকারী এবং এমন মত পথ গ্রহণকারী ইতিহাস অধ্যায়নের ফলে আমাদের নবাগতরা দু'টি ভ্রান্তিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সামনে অগ্রসর হয়।

প্রথমটি হলো-যুগের চলমান গতিধারা এবং ইতিহাসের উপর আধ্যাত্মিক উপকরণাবলীর বিন্দু পরিমাণও প্রভাব পড়ে না, কিছু পড়লেও তা খুব ক্ষীণ।

আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে যুগকে সামনের দিকে আগিয়ে নেয়া এবং তার গতিধারা নির্দিষ্ট করে দেয়া শুধু ইউরোপীয়দেরই কাজ। এর ভিতর ইসলামের দখল খুবই নগণ্য।

এ দর্শন দু'টির কার্যকরী ফল খুবই ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক হয়। জীবন, জগত, এবং জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে একটি সর্বাঙ্গীণ ধ্যান-ধারণা সৃষ্টির উপরও ইউরোপীয়দের ধ্বংসাত্মক পদক্ষেপের তুলনায় ইসলামী মান সম্মান ও মহত্ত্বের উপর তার সুদুর প্রসারী মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে।

আমাদের নবাগত বংশধরদর মন-মানসকে এর ভয়াবহতা হতে রক্ষা করে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ দু'টি গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক।

সর্বপ্রথম কাজ হলো আমাদের সমগ্র জগতের ইতিহাস, ঘটনাবলী ও বিবতর্নশীল ঘটনাচক্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আরম্ভ করতে হবে যাতে, এ মহান কাজটি ইউরোপীয়দের একচেটিয়া ইজারাদারীতে পরিণত না হয়। এ ইতিহাসে ইউরোপীয়দেরকে তাদের যথাযথ স্থানেই রাখতে হবে। দ্বিতীয়তঃ তাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব না দিয়ে ঐতিহাসিক আন্দোলনে সাধারণভাবে সমগ্র মানুষ বিশেষ করে ইসলামের যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে তাকে জগতবাসীর সামনে তুলে ধরতে হবে।

ইসলামী ইতিহাসের নব সম্পাদনা

ঘটনাবলীর বিবরণ দেয়ার নাম ইতিহাস নয়; বরং ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের নাম হচ্ছে ইতিহাস। ইসলামের কাজ হলো-সেই গোপন ও প্রকাশ্য সূত্র ও সম্পর্কগুলো নির্ধারণ করা; যা বিভিন্ন ঘটনাবলীকে পরস্পর সংযোজিত করে একই শিকলে গেঁথে পরিবর্তন করে দেয়। এ শিকলের বিভিন্ন অংশগুলো একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং একে অপরের উপর প্রবাব বিস্তার করে। আর এটা যুগ ও পরিবেশের বিবর্তনের সাথে সাথে এমন রূপে বিস্তৃত হয়ে

বাড়তে থাকে যেমন ক্রমবর্ধমান রূপে বাড়তে থাকে একটি দেহ বিশেষ কোন যুগ ও স্থানের মধ্যে অবস্থান করে।

কোন ঘটনাকে উপলব্ধি করা বা বুঝা এবং তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা এবং তার পূর্বপর সংগঠিত ঘটনাবলীর সাথে জড়িত করে দেখার নিমিত্ত এটা একান্ত আবশ্যক যে, মানুষের আভ্যন্তরীণ সমুদয় আধ্যাত্মিক ও চিন্তাধারাগত জীবনের মূল্যবোধগুলো এবং পুনর্গঠনের শক্তিগুলো আয়ত্তাধীন করার নিমিত্ত ব্যক্তির যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। আর মানব জীবনের কার্যকরি আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত সাংগঠনিক শক্তিসমূহকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করারও যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। তার ভিতর স্বীয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞা মন-মস্তিক এবং অনুভূতি চেতনাবোধের প্রশস্ত বাতায়নগুলো ঘটনাবলীর প্রভাব ও ফলাফলের নিমিত্ত উন্মুক্ত রাখার যোগ্যতা থাকাও একান্তরূপে বাঞ্ছনীয়।

এ সকল ঘটনাবলী হতে তার প্রজ্ঞা যে ফলাফলগুলো গ্রহণ করে, তা থেকে কোন একটিকে বর্জন করার পূর্বে তাকে যথেষ্ট পরিমাণে যাচাই বাছাই এবং সর্তকতার সাথে কাজ করা উচিত।

ইসলামী ইতিহাসে সম্পূর্ণরূপে নব ভিত্তির উপর নতুন ছাচে ঢালাই করে পুনঃ সম্পাদন করা প্রয়োজন। ইসলামী জীবনকে একটি নবতর দৃষ্টিভঙ্গি এবং সম্পূর্ণ নতুন আলোকে অবলোকন করা এ জন্য উচিত যাতে তার সমুদয় তত্ত্ব রহস্য প্রতিভাত হয়। তার গোটা আলোক রশ্মি দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। আর তা স্বীয় গোটা উপাদান ও সাংগঠনিক শক্তি সমেত বিকাশ লাভ করতে পারে।

এ নতুন পর্যায়ে গবেষণা পরিচালনা করার বেলায় সর্বপ্রথম ইসলামী উৎস কেন্দ্রকেই গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। বিশদ বিবরণ দানের কাজ আয়ত্ত করার পূর্বে একান্ত জরুরী যে, গবেষক স্বীয় মন-মস্তিস্ক প্রাণ-আত্মা এবং চেতনা অনুভূতিকে সেই পরিবেশের সাথে সম্পূর্ণরূপে পরিচয় করিয়ে নিয়ে তার মধ্যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে হবে। ইসলাম একটি আকীদা, একটি আন্দোলন, একটি দর্শন এবং একটি জীবন বিধাব হিসেবে পরিচিত। আর এ পরিবেশটি সেই ইসলামী জীবনের পরিবেশ, যা বাস্তব জগতে মানব জীবনের এক অধ্যায় বিশেষ। এ পরিবেশটির ভিতর প্রবেশ করা, তার জ্ঞান ও অনুভূতির সমগ্র বাতায়নগুলো খুলে দেয়া এ জন্য জরুরী যে সে যেন শুধু কেবল এ জীবনটিকেই উপলব্ধি না করে। বরং তার জীবন্ত দেহ অবয়বকেও উপলব্ধি করতে পারে এবং তার ভিতর

বিভিন্ন ঘটনাবলীর যে মর্যাদার স্থান রয়েছে তাও যেন পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। যে কোন দার্শনিকের জন্য মানব জীবনের কোন যুগের গভীরতত্ত্ব জ্ঞান অর্জন করার জন্য এটা একান্ত আবশ্যক যে তার ব্যক্তিত্বকে তার নিকট পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দিতে হবে, তার শূন্যময় পরিমন্ডলের ভিতর গিয়ে প্রবেশ করতে হবে। আর তার প্রতিটি ইশারা-ইঙ্গিত এবং তার প্রতিটি প্রভাবকে গ্রহণ করতে হবে। এ শর্ত ইসলামী জীবনের গবেষণা পরিচালনার জন্য খাছ নয়। কিন্তু ইসলামী জীবনের বেলায় তার প্রয়োজন সর্বাধিক সুস্পষ্ট। কেননা এ জীবনের সাংগঠনিক শক্তিগুলো স্বীয় ধরণ ও গতি প্রকৃতির দিক দিয়ে নব যুগের সাংগঠনিক শক্তিগুলো থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও আলাদা।

আমাদের মতে ইসলামী জীবনের পূর্ণরূপে গবেষণা তখন পর্যন্ত সম্ভব নয়। যখন পর্যন্ত ইসলামী আকীদা, বিশ্বাস, আল্লাহত্ব জীবন জগত মানুষ সম্পর্কে ইসলামী ধ্যান-ধারণার গতি প্রকৃতির সঠিক জ্ঞান অর্জন না হয়। এ আকীদা বিশ্বাসের পরিপন্থী কাজ মুমিনের অন্তরে কিরূপ উদয় হয় এবং তার অধীনে মুসলমানদের জীবনের বিভিন্ন উপকরণের জবাবে কি কর্মপন্থা গ্রহণ করে তা যত সময় পর্যন্ত পূর্ণরূপে উপলব্ধি না করা যায় তত সময় তা সম্ভব নয়। এ বিশেষত্ব শুধু এমন একজন মুসলমানের মধ্যে পাওয়া যায়, যিনি ইসলামী আন্দোলনের নিশান বরদার হবেন। ইসলামী ইতিহাসের নব সম্পাদনার মধ্যে বিশেষত্বগুলো পূর্ণরূপে বর্তমান থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

জীবন ইতিহাসের সেই ইসলামী যুগে মানুষের কর্মতৎপতার মূল আন্দোলনকারী বস্তুটি কি ছিল এবং সে যুগে প্রকাশিত বিবর্তনশীল ঘটনাবলী ও বিপ্লবসমূহের সাথে এ আন্দোলনের কি সম্পর্ক বিরাজমানা রয়েছে, সে বিষয়ও অনুসন্ধান করা উচিত। এগুলো অবশ্যই ইসলামী ধ্যানধারণার গতি প্রকৃতির সাথে সম্পর্কযুক্ত পরিলক্ষিত হবে। ইসলামের বৈপ্লবিক প্রাণ আত্মা তার বর্হিগত ও কর্মজীনের মধ্যেই শুধু পরিব্যাপ্ত নয়, বরং ব্যক্তিগত সামাজিক এবং জাগতিক সম্পর্কের মধ্যেও নিহিত রয়েছে। তার সাথেও সে বিজড়িত ও সম্পৃক্ত থাকবে। ইসলামী রাষ্ট্রীয় বিধান জীবন পদ্ধতি, আইন প্রণয়নের নিয়ম এবং তার প্রয়োগ করণের উপকরণাবলীও মাধ্যম সম্পর্কে যে রূপরেখা পেশ করেছে, তার সাথে এ ঘটনাবলীও সম্পৃক্ত ও সংযুক্ত হবে। জীবনের এ সকল বিষয়াবলী এ বিশেষ জীবনের ইতিহাস রচনার বেলায় যথেষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে।

যুদ্ধ বিগ্রহ রাজনৈতিক সন্ধি এ বং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদির বেলায় ইতিহাস যে অন্যান্য বিষয় থেকে অধিক গুরুত্ব দেয় তা এমন কতগুলো উপকরণের অনুবর্তি, ইতিহাস রচনাকালে সেগুলো তুলে ধরা আবশ্যক। ঐতিহাসিকদের মধ্যে ঐ সকল উপকরণগুলো নির্ধারণ এবং তার সঠিক প্রভাব ও ফলশ্রুতি নির্ণয় করণের বেলায় মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। প্রত্যেকেই তা নিজ নিজ দার্শনিক চশমার আলোকে অবলোকন করে, যা তাদের চিন্তাপদ্ধতি অর্থাৎ জীবন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রভাবশালী হয়। মুসলমান দার্শনিক ঐতিহাসিকগণ ইসলামী জীবন অধ্যয়ন ও গবেষণার বেলায় একটি স্বতন্ত্র বিশেষত্বের অধিকারী হয়। কেননা জীবন সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি ইতিহাসের কর্মক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারকারী সেই সকল উপকরণবালীর সাথে কোন না কোন প্রকার একটি সম্পর্ক অবশ্যই বিজড়িত থাকে। তার গভীরতায় উপনীতি হওয়া, তার ধরণের পরিচয় নেয়া এবং তার সঠিক প্রভাব গ্রহণ করণের যোগ্যতা অন্যের তুলনায় অনেক বেশী রাখে।

ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের গতিপ্রকৃতি এবং সেই প্রভাবের বোধগম্যতার আলোকে, যা মুসলমান তার থেকে গ্রহণ করে, ইতিহাস গবেষকগণ সেই বিশেষ যুগটিতে ইসলামী জীবনের আন্দোলীয় বস্তুগুলো, তার ভিতরকার নিহিত মানবিক মূল্যবোধগুলো, এবং বিভিন্ন পর্যায় তার জয় পরাজয়ের কারণসমূহ সঠিকরূপে নির্ধারণ করতে পারে। আর ইসলামের প্রাথমিক শিশুকালের দোলনায় এবং যে সব দেশসমূহে সে পরবর্তীকালে বিস্তার লাভ করেছে সেখানে মানব গোষ্ঠীর বাহ্যিকা ও আভ্যন্তরীণ জীবনধারা কিরূপ ছিল সে বিষয়েও মোটামুটি একটি ধারণা নিতে পারে। অতঃপর ঐ বাহ্যিক দিকটির সেই আধ্যাত্মিক দিকগুলোকে সে সংযোজন করে নিতে পারে, যা ইসলাম ঘটনাবলীর মূল বৃত্তান্তের একটি অংশরূপে নিরূপণ করে। এ বিষয়টি যুগের চলমান গতিকে নির্দিষ্ট করণে এবং বিভিন্ন যুগে ও স্থানে জীবন সংগঠন করণের বেলায় কি ভূমিকা নিয়েছিল সে বিষয়ও সম্যক উপলব্ধি নিতে পারবে।

ইসলামী ইতিহাসকে মানবিক ইতিহাস থেকে আলাদা করে দেয়া যায় না। কেননা ইসলামী জীবন হচ্ছে মানব জীবনের একটি বিশেষ যুগের নাম। মুসলমান বিশেষ যুগে ও বিশেষ স্থানে বসবাসকরী মানুষ ছিল। আর ইসলাম হচ্ছে যুগ যমানা স্থান কাল ও পাত্রের বেড়াজাল থেকে মুক্ত একটি সামগ্রিক মানবিক পয়গাম। নিঃসন্দেহে ইসলাম যে জাহিলিয়াতের সাথে মোকাবিলা

করেছে এবং সে সময় যে অসুবিধাগুলো কার্যকরি রূপে দন্ডায়মান ছিল, তার সাথেও যে তার লড়াই করতে হয়েছে, তার প্রভাব এ যুগের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছিল। অতঃপর ইসলাম নিজেই মানবিক জ্ঞান গবেষণার অংশ নিয়ে সে তার যুগটিকে বিশেষ করে সেই সকল এলাকাসমূহে যেখানে সে পা রেখেছিল এবং যার নিকটে পৌছেছিল তার উপর প্রভাব বিস্তার করে ছিল। অতএব ইসলামী ইতিহাস রচনায় সময় এ কথাগুলো আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন যে ইসলামের আগমনের পূর্বে মানুষের জ্ঞান গবেষণার অভিজ্ঞতা কতদুর পর্যন্ত পৌছে ছিল। জগতের বিভিন্ন যুগে সমাজের অবস্থা তখন কিরূপ ছিল, বিশেষ করে ধর্মীয় বিশ্বাস এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি কি ধরণের ছিল, বিভিন্ন সময়ের রাষ্ট্রীয় বিধান, অর্থনৈতিক কর্মসূচী, সামাজিক সম্পর্ক এবং আমল আখলাক ও স্বভাব প্রকৃতির বর্ণনাও উল্লেখ করা উচিত। এ বিষয়গুলোর আলোকে ইসলাম ইতিহাসের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা নিয়েছিল তার ধরণ ও মূলগত ভাবধারা কিরূপ ছিল, তাও প্রকাশ হয়ে যাবে। এ নব বিধানটি গ্রহণ করা এবং তাকে বর্জন করার বেলায় জগতে কেনই বা বর্জন ও প্রত্যাখ্যান করণের কর্মসূচীর উদ্ভব হলো; এবং এই টানা হেঁচড়ার দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের কারণই বা কি? আর জয়-পরাজয় কোন্ উপকরণের ভিত্তিতে হয়েছিল, এ বিষয়গুলো পটভূমিকায় এটা প্রতিভাত হবে যে, যুগের অতিবাহিত হবার সাথে সাথে গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের প্রভাব ও ফলাফল, সহযোগীতা, দ্বন্ধ ও টানা হেঁচড়া কিরূপে নিজ গতিধারায় প্রবাহমান থাকে।

যদি সেই যুগের আন্তর্জাতিক অবস্থা বর্ণনার প্রয়োজন হয়, তবে জাজিরাতুল আরবের অবস্থাটি বিবৃত করা এবং আরবের জীবন দর্শনের প্রত্যেক দিকের আলোচনা করা তার চেয়ে অধিক প্রয়োজন। আরব হলো ইসলামের সর্ব প্রথম লালানভূমি। অতঃপর তাই তার শক্তির কেন্দ্ররূপে ছিল, আর সেই কেন্দ্র থেকেই ইসলাম অন্যান্য দেশে বিস্তার লাভ করেছে।

রাসুলে করীম (সাঃ) যে দ্বীন নিয়ে পৃথিবীর একটি বিশেষ এলাকায় একটি বিশেষ যুগের আবির্ভাব হয়েছিলেন, এটা হঠাৎ কোন বিষয় ছিল, না প্রথম থেকেই এটা মহৎ উদ্দেশ্যের অধীনে একটি বিশেষ ইচ্ছার সাথে এবং একটি নিয়মতান্ত্রিক প্রোগ্রাম মোতাবিক এসেছিলেন? যাতে করে সমগ্র উপকরণগুলো যেরূপ একত্র হয়েছিল অনুরূপ একত্র হয়ে মানব ইতিহাসে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। পরিণতি ফল দুনিয়ার মানচিত্রে এবং মানুষের মন-মগজে

ঠিক অনুরূপতি ফলিত হয়েছিল যেমন পরবর্তি ইতিহাসে দেখা যায়।

এ কথাগুলো আমাদেরকে ইতিহাসের চির সত্য সেই উজ্জ্বল ভাস্কর মুহম্মদ রাসুলুল্লার (সাঃ) ব্যক্তিত্বকে পর্যালোচনার পানে নিয়ে যায়। হয়ত তাঁর ব্যক্তিত্ব জাতি কুল বংশ পারিপার্শ্বিকতা সেই সমাজের কিংবদন্তী এবং সেই উকরণবলীর ভিতর, প্রথম থেকেই একটি উদ্দেশ্যের অধীনে অনুকূলতা সৃষ্টি করে যাচ্ছিল যা একজন ব্যক্তিরূপে তার আশেপাশে কাজ করে। তিনি দন্ডায়মান হয়ে এমন একটি মহান সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন যার উদাহরণ তাঁর পূর্বে যেমন পাওয়া যায় না তেমনি ভবিষ্যতেও পাওয়া যাবে না। এই মহান ঘটনাপঞ্জীর ভিত্তিতে আগত বিপ্লবসমূহ ও আশ্চার্য ঘটনাসমুহ পর্যালোচনার পূর্বে আমাদেরকে এ ঘটনাবলীর ধরণ ও তার সামগ্রিক ধ্যান-ধারণাটি সম্পর্কেও আলোচনা করতে হবে, যা এ ঘটনার ধারক ও বাহক ছিল।

এমনিভাবে যদি ইসলামী ইতিহাস রচনা করা যায়, তবে পাঠকদের সামনে ইসলাম প্রকাশকালীন এবং পরবর্তি যুগের ঘটনাবলীর একটি পূর্ণাঙ্গ সামগ্রিক চিত্র ফুটে উঠবে এবং সেখানের অবস্থা ও ঘটনাবলীর দ্বারা যে প্রতিহতমূলক কার্যাবলী সেখানের সমাজে দেখা দিয়েছিল তাও ভালরূপে অবগত হওয়া যাবে। আর এগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং তা সম্পর্কে সঠিক মতবাদও পোষণ করা সম্ভব হবে।

এ অনুসন্ধান ও গবেষণা পদ্ধতির দিক দিয়ে বস্তুসমূহের, ব্যক্তিবর্গের এবং যুগের গভীর তলদেশে অবর্তীণ হয়ে তার ফলাফলগুলো গ্রহণ করার কাজের নামই ইতিহাস নামে অভিহিত হবে। ইতিহাস প্রাকৃতিক বিধান ও মানবতার পদক্ষেপের সাথে জড়িত হয়ে একটি জীবন্তরূপ এবং জীবনের একটি শক্তিতে পরিণত হয়।

আমাদের উপরোল্লেখিত অনুসন্ধান ও গবেষণার প্রশস্ত পথটি যদি গ্রহণ করা হয়, যার ফলে কয়েকটি মৌলিক শক্তি ও মূল্যবোধ সামনে এসে যায়, তবে ইতিহাসের জ্ঞান তা গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের কার্যাবলী এবং তার পর্যায়ক্রমিক উন্নতি পর্যালোচনা সহজ হয়। এগুলো হলো সেই মৌলিক মূল্যবোধ, যা ইসলামী দাওয়াতের গতি প্রকৃতি রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর স্বভাব প্রকৃতি এবং সেই পরিবেশটির মূল প্রকৃতির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যিনি এ দাওয়াতকে কবুল করে নিয়েছে এবং রাসুলের আগমনকে জানিয়েছে খোশ আমদেদ। এটা সেই মূল্যবোধ এবং সেই সাংগঠনিক শক্তি, যা ইসলামের সুপ্রভাত কালে মানবিক ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের বেলায় কার্যকরি ভূমিকা নিয়েছিল এবং সেই চিন্তাধারা ও

আকীদাসমূহকে আবেষ্টন করে রেখেছিল, যা তখন মনুষ্য সমাজে প্রচলিত ছিল। এ সকল মূল্যবোধ ও শক্তিসমূহের সাথে পরিচয় লাভের পর নবী করীম (সাঃ) এর যমনায় ইসলামী দাওয়াতের বিভিন্ন মনযিলগুলো অতিক্রম করার সঠিক রূপরেখা অঙ্কন করা এবং তার সঠিক ধ্যান ধারণা নেওয়া সম্ভব হয়। এ মনযিলগুলোই সাংগঠনিক শক্তি।

এমনিভাবে আমরা এবং অন্যান্য যুগের মানুষই নবী করীম (সাঃ) ও তাঁর হুকুমতের কর্মীবৃন্দকে কিরূপে নির্বাচন করেছিলেন? তারা কোন মাটির সৃষ্টি ছিল? তিনি তাদেরকে কিরূপে তরবীয়ত-ট্রেনিং দিয়ে এ মহান মিশনের কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য কিভাবে প্রস্তুত করেছিলেন, তা সব কিছুই অবগত হতে পারবো।

এছাড়া এটাও অবগত হতে পারবো যে, নবী করীম (সাঃ)-এর জীবনের সংগঠন কিরূপে করেছিলেন, এবং কিসের উপর ভিত্তি করে করেছিলেন। তার জাজীরাতুল আরবের এ নব দ্বীনটিতে অথবা নব জীবন বিধানটির দোলনায় কিভাবে নিজেদের রূপ পরিবর্তন করে নিয়েছিলো। আরবীয়দের স্বভাব প্রকৃতি পরিবেশ অবস্থা অর্থনৈতিক অবস্থা সেখানের লোক গোত্র ও বংশসমূহ, এ ছাড়া তাদের সামাজিক জীবনের সম্পর্ক অর্থনৈতিক অবস্থা , ভৌগোলিক অবস্থানের এবং জীবনত্বের ছাচে কোন লোকগুলো ছিল, যারা তাদের এ নব জীবন বিধানটির আহ্বানে সাড়া দিতে অথবা তার বিরোধীতার জন্য ময়দানে অবতীর্ণ হতে প্রেরণা দিয়েছিল। এমনিরূপ অন্যান্য বিষয়গুলো সর্ম্পকেও অবহিত হতে পারবো। যার উপর আলোকপাত করে আমরা ইসলামী জীবন অথবা ইসলামী ইতিহাসের প্রথম যুগটির পূর্ণ চিত্রটি উপস্থিত করি। উপরোলেখিত অনুসন্ধান পদ্ধতি গ্রহণ করার পরই এ বিষয়গুলো সরল সহজভাবে অবগত হওয়া যায়। ইসলামী ইতিহাসের এ প্রথম মনযিলটিকে "নবুয়াতের যুগে ইসলাম" নামকরণ করা হলেই যুক্তিযুক্ত হবে।

এ মনযিলটির পর যে যুগটি আসে তাকে "ইসলামের প্রসারতার স্তর" নামে অভিহিত করা উচিত। এ যুগটি হলো সেই যুগ, যে যুগে ইসলাম প্রাচ্যে পাশ্চত্যে প্রসার লাভ করেছিল। সেই অমূল্য বস্তুটি সকলের ঘরে ঘরে গিয়ে পৌছেছিল, যার শক্তি-সামর্থ ও শৌর্য-বীর্যের নজীর জগতে কোথাও খুজে পাওয়া যায় না। এ

কথাগুলো শুধু সামরিক বিজয়ের ক্ষেত্রেই সত্য প্রমাণিত হয় না বরং আধ্যাত্মিকগত চিন্তাধারাগত এবং সামাজিক প্রভাবের দিক দিয়েও তা সঠিকরূপে প্রমাণ হয়। সমগ্র মানবতা এটা অবলোকন করতে পেরেছিল যে এ নব দ্বীনটির প্রকাশ এবং তার ধারণাতীত প্রসারতার ফলে ইতিহাসের গতি কিভাবে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল।

আমাদের প্রস্তাবিত গবেষণা পদ্ধতির আসল মূল্যমান ইতিপূর্বেই পর্যালোচনা দ্বারাই অনুমান করা যায়। ইসলাম তার প্রভাবধীনের দেশগুলোর ভিতর যে সাংগঠনিক ও ধ্বংসাত্মক কার্যাবলী আঞ্জাম দিয়েছে তার দ্বারা তার পর্যালোচনাও করা সম্ভব। সেই সকল উৎপাদনাশীল দেশসমূহে এবং সেই যুগে সব চেয়ে উন্নত দেশসমূহে যে চিন্তাধারা বিশ্বাস আকাযেদ বিরাজমান ছিল, সামাজিক জীবনে যে বিধান কায়েম ছিল, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে অবস্থা বলবৎ ছিল, অতীতের থেকে তারা উত্তারাধীকার সূত্রে যা কিছু পেয়েছে এবং তারা যে মানবিক সম্পর্কের দ্বারা বিজড়িত ছিল, তার এবং ইসলামের দ্বারা প্রভাবিত করা ও প্রভাবিত হওয়ার কি কি কাজ আঞ্জাম পেয়েছিল, তাও আমরা এ আলোচনা পদ্ধতির দ্বারা সুচারুরূপে অবগত হতে পারবো।

যতদুর পর্যন্ত ইসলামের সামরিক বিজয় সুচিত হয়েছিল, ততদুর পর্যন্তই ইসলাম বিস্তার লাভ করা সীমারেখা আবদ্ধ নয়। বরং তার সৃষ্ট সভ্যতা তাহজীব তমাদ্দুন এবং চিন্তা জগতের আন্দোলন ইসলামী দুনিয়ার সীমারেখা পেরিয়ে বর্হিজগতেও পৌছেছিল। ইসলামী দুনিয়ার বাহিরে ইসলাম বিস্তার লাভ করার ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা পর্যালোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এর ফলাফলগুলো প্রতি উত্তরে ইসলাম জগতের জীবনকেই বা কিরূপে প্রভাবিত করে ছিল সে বিষয়ও আমাদের অবহিত হতে হবে। জগত ইসলাম থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছে এবং অনেক কিছুই তাকে দান করেছে। তার দ্বারা প্রভাবিত যেমন হয়েছে, অনুরূপ তাকে নিজ প্রভাবের নাগপাশে আবদ্ধও করেছে। আমাদের নির্ধারিত নীতিমালা এ প্রভাবিত হওয়া ও প্রভাবিত করার আলোচনা দ্বারা এমন একটি ইতিহাস সৃষ্টি করে দিবে, যা কখনো রচিত হয়নি। এ ইতিহাসটি হবে বিশেষ ধরণের প্রাণশক্তি সম্পন্ন এবং বিশেষ চরিত্র সম্পন্ন ইতিহাস। তার দ্বারা মানব জগতের এবং তাদের জীবনের মনযিলগুলোর এমন একটি নতুন চিত্র

আমাদের সামনে ফুঠে উঠবে, যা পশ্চাত্যদের পেশকৃত এবং আমাদের অভ্যস্ত চিত্র থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও স্বতন্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

এর পর আসে ইসলাম বিস্তার লাভের গতিধারা স্তিমিত ও রুদ্ধ হওয়ার যুগ। উপরোল্লেখিত অনুসন্ধান ও গভেষণা পদ্ধতি এবং ইসলামী ইতিহাসে বিগত মনযিলগুলোর আলোচনার আলোকে আমাদের জন্য এ অবনতির কারণ সমুহ বর্ণনা করা এবং তার আভ্যন্তরীণ ও বর্হিগত উপকরণগুলোর পরিচয় নেয়াও সম্ভব। এ সকল উকরণগুলোর কোন উপরকণগুলো ইসলামী আকীদা এবং ইসলামী জীবন বিধানের স্বভাব প্রকৃতির অন্তর্ভূক্ত, কোন উপকরণগুলো মুসলমান নিজেরা সৃষ্টি করেছে, আর কোন উপকরণগুলো প্রতিহত কার্যের ফলে অনৈসলামী জগতে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, এ অবনতি আংশকি ছিল না সামগ্রিক; মানব ইতিহাসে এ অবনতির কি প্রভাব বিস্তার করেছে, মানবিক সমস্যাবলীর উপর ইসলামের প্রভাব বিস্তার করণে কি পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে, চিন্তা ও কর্মনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বেলায় তার কি পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। সে সব চিন্তাধারা আকায়েদ ও বিশ্বাসসমূহ এবং তার বিধানসমূহের মূল্যমানই বা কি? যা মানুষ ইসলামী চিন্তাধারা আকায়েদ ও বিশ্বাসসমূহ এবং তার বিধানবলীর প্রতিযোগিতায় নিজেরা সৃষ্টি করে নিয়েছে। ইসলামী প্রভাবের অবনতি এবং সেই ইউরোপীয়ান প্রভাবের উন্নতির দ্বারা, মানুষ কি পেল এবং কি হারালো যার ছায়াতলে আজ আমরা শরণার্থী এসব বিষয়গুলোও এই পর্যালোচনা পদ্ধতি অনুসরণ দ্বারা আমাদের অবগত হওয়া সম্ভব হবে।

এরপর স্বাভাবিকভাবেই "বর্তমান যুগে ইসলাম জগত" এ বিষয়ের উপর আলোচনা করা উচিত। এ আলোচনা চেতনা, ভাব প্রবণতা সাম্প্রদায়িকতা এবং পক্ষপাতিত্বের দৃষ্টিতে দুষ্ট হবে না। বরং বাস্তব ভিত্তির উপর করা উচিত। আমাদের অনুসন্ধান পদ্ধতির ফলে মানব ইতিহাস, পরাম্পরা রূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়ে উঠবে। এ ইতিহাসে অতীতে এবং বর্তমানে ইসলামের ভূমিকা বিষয়টিও আলোচনায় স্থান পাবে। আর অতীত ও বর্তমানের আলোকে তার ভবিষ্যতের উপরও একটি আলোক রেখাফুটে উঠবে। ইসলামকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুতি হিসেবে চিন্তাধারাগত যে কাজ করতে হবে, তার পরিপেক্ষিতে আমার এ বাক্য ক'টি ইঙ্গিত ইশারা বৈ কিচু নয়। কিন্তু তার ভিতর কোন বস্তুর ই তখন পর্যন্ত মূল্য হবে না, যতসময় পর্যন্ত আল্লাহর এ

যমীনে বসবাসকারী মুমিনগণ এ সত্যটিকে ধরতে না পারবে যে, এ দ্বীনটি এমন একটি বিশ্বাসগত বস্তু যা আল্লাহত্ব ও শাসনত্তকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই বিশেষরূপে জ্ঞান করে। সুতরাং তাকেই সার্বভৌম শাসনকর্তারূপে সমর্থন করে এমন একটি জীবন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে যা সেই বিধানেরই ব্যাখ্যা স্বরূপ; এবং যা এ আকীদা বিশ্বাসেই তরজমান রূপে প্রমাণিত হয়। এর সাথে এ সত্যটিকেও উপলব্ধি করতো হবে যে, ইসলামের অস্তিত্ব বর্তমানে মুলতবী হয়ে আছে। আর সর্বপ্রথম কাজ হলো ইসলামকে আকীদা ও বিশ্বাস হিসেবে-নতুনভাবে পূর্ণরূপে মানুষের অন্তরে দৃঢ়ভাবে বসিয়ে দেয়া তা একটি জীবন বিধানরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। তাদের এ বিশ্বাস যেন দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয় যে, ভবিষ্যত এ দ্বীনেরই অনুকূলে। আল্লাহ আমাদের সাহায্যকারী। তাঁর সাহায্যের প্রার্থনা করছি। আমীন!

নবম অধ্যায়

দু'টি কথা

এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা যাবো কোন্ দিকে?

একটু সময় নীরবতা অবলম্বন করে এ প্রশ্নের জবাবটি আমাদের বিবেকের নিকট থেকেই গ্রহণ করা উচিত এবং যে দিকে আমাদের মন চায় সেই দিকেই মন ফিরিয়ে দেয়া উচিত। পর পর দু'টি বিশ্ব যুদ্ধের পর সমগ্র দুনিয়া দু'টি স্বতন্ত্র ব্লকে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রাচ্যে সমাজতান্ত্রিক ব্লকে আর পাশ্চাত্যে পুঁজিবাদী ও ধনতান্ত্রিক ব্লকে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ অবস্থায়ই পরিলক্ষিত হচ্ছে, আর সকলের মূলে এ একই কথা এবং প্রত্যেকের চিন্তাধারায় তারই চিত্র অংকিত হয়ে আছে। কিন্তু আমাদের নিকট এ ভাগ-বাটরা সম্পূর্ণ বাহিক্য ব্যাপার, আসলে কোন ভাগ হয়নি। এ ভাগগুলো নিজেদের স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। নীতির উপর নয়। তা শুধু ব্যবসায়ী দ্রব্যাবলী এবং পররাষ্ট্রে বাজার সৃষ্টির জন্য। যুদ্ধ; চিন্তাধারা ও মৌলিক বিশ্বাসের জন্য নয়; নিজেদের মূলগত দিক দিয়ে আমেরিকা ইউরোপের চিন্তাধারা পদ্ধতি রাশিয়ান চিন্তাধারা পদ্ধতি থেকে ভিন্নতর কিছু নয়। তারা উভয় জীবনের ব্যাপারে বস্তুবাদী দর্শন ধ্যান-ধারণার প্রতি ঈমান রাখে। যদিও রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র কায়েম হয়েছে, কিন্তু আমেরিকা ইউরোপও এ পথে চলে যাচ্ছে। এটা নিশ্চিত সত্য কথা যে যদি বিশেষ কোন গন্ডগোলের সৃষ্টি না হয়, তবে তারাও এ মনযিলে গিয়ে উপনীত হবে।

আজ বস্তুবাদী চিন্তাধারা সমগ্র পাশ্চাত্য জগতকে ঘিরে ফেলেছে। এ চিন্তাধারা স্বার্থকেই চরিত্রের ভিত্তি নিরূপণ করে। নিজেদের জাগতিক স্বার্থ ও উন্নতির এবং ব্যবসায়ী বাজার সৃষ্টির জন্য একে অপরের গলা কাটাবার শিক্ষা দেয়। এ চিন্তাধারা জীবনের উপর থেকে আধ্যাত্মিক উপকরণগুলোকে সম্পূর্ণরূপে বেদখল করে। আর তা অভিজ্ঞতার থেকে জ্ঞান লাভ করার বিশ্বাসেরও বিরোধী। এ যেমন শুধু উন্নত উদ্দেশ্যের প্রবক্তা নয়, তেমনি কর্ম দর্শনে ভিতর (function) দিকেই দৃষ্টি রাখে। এ চিন্তাধারাও মাক্সবাদী বস্তুবাদের একটি বিবর্তণীয় রূপ।

রাশিয়া এবং আমেরিকার চিন্তাধারার মধ্যে প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার ভিতর বিদ্যমান। আজ যে বস্তুটি আমেরিকানদেরকে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ গ্রহণ থেকে বিরত রাখে, সেটা

এমন কোন দর্শন নয়, যা জীবন জগত এবং মানুষ সম্পর্কে বস্তুগত ধ্যান-ধারণা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে ভ্রান্ত বলে নিরূপণ করতে পারে। বরং এর সামনে ধনী ও বিত্তশালী হবার পথ ও সুযোগগুলো উন্মুক্ত রয়েছে। আর মজদুর শ্রেণীর পরিশ্রমিক তাদের নিকট অনেক উন্নতমানের।

বস্তুতঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ব্লকের ভিতরকার প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ দ্বারা আমাদের প্রতারিত হওয়া উচিত নয়। তারা উভয়েই বস্তুবাদী জীবন দর্শনের পুজারী এবং উভয়ই একই ধরণের চিন্তাধারা পোষণ করে। তাদের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ কোন নীতিগত বা দর্শনগত নয়। বরং জগতে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার এবং নিজেদের অনুকূলে বাজার গঠনের নিমিত্তই এ যুদ্ধ। আর সেই বাজার হলাম আমরা এবং আমাদের দেশ।

আসল শক্রতা এবং আদর্শগত দ্বন্দ্ব ইসলাম এক সব ব্লকের ভিতর। ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, রাশিয়া যে বস্তুবাদী চিন্তাধারা ও মতবাদের প্রতি ঈমান রাখে ইসলামী শক্তিই হচ্ছে তাদের একমাত্র আসল প্রতিদ্বন্দ্বী। ইসলামই জীবন জগত ও মাবন সম্পর্কে একটি সামাজিক পূর্ণাঙ্গ ও সমঝোতা ভিত্তিক চিন্তাধারা পোষণ করে। সে মানব সমাজে দ্বন্দ্ব-ঝগড়া কলহ বিবাদের স্থানে সামাজিক সহযোগিতা ও সাহায্য সহানুভূতির পরিবেশ সৃষ্টি করে। সে জীবনকে এমন একটি আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা দান করে , যা আসমানে অবস্থিত সৃষ্টিকর্তার সাথে গিয়ে মিলিত হয় এবং সাথে সাথে যমীনের উপর তার গতি প্রবণতাও নির্দিষ্ট করে। এ ধ্যান-ধারণা জীবনকে শুধু বস্তুগত উদ্দেশ্যাবলীর পূর্ণতার মেশিন বানিয়ে ছেড়ে দেয় না। বরং উৎপাদনশীল কর্মতৎপরতাকে ইসলামের ইবাদতের মধ্যে একটি ইবাদত রূপে সমর্থন করে।

আসল সব আধ্যাত্মিক ধর্মাবলীই যার ভিতর খ্রীষ্টান ধর্ম অগ্রণীয় রয়েছে আমেরিকা ও ইউরোপের বস্তুবাদকে ঠিক অনুরূপই বাতিল মনে করে; যে রকম মনে করে থাকে, রূশীয় সমাজতান্ত্রিক বস্তুবাদকে। কেননা উভয়ের গতি-প্রকৃতি একই ধরণের এবং তা জীবনের আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কিন্তু আমাদের মতে খ্রীষ্টান ধর্মকে এমন কোন প্রতিষ্ঠিত শক্তির মধ্যে গণ্য করা যায় না যা নব বস্তুবাদী চিন্তাধারার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীয় অবতীর্ণ হতে পারে।

খ্রীষ্টানিজম একটি ব্যক্তি গোষ্টি ও বৈরাগ্যবাদী ধর্মে পরিণত হয়ে গিয়েছে। তার ছায়াতলে অবস্থান করে জীবনের স্থায়ীরূপে ক্রমবর্ধমান উন্নতির শীর্ষে

উপনীত হবার সৌভাগ্য হয় না। বহু দিন ধরে সে বাস্তব জীবনকে সাহায্য করতে এবং তার উপর তার শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ থেকে অপরাগ হয়ে রয়েছে। কারণ পাদরীও গীর্জার এবং তাদের পবিত্র কনফারেন্সসমূহ তাকে যেরূপ দান করেছে, সে রূপ নিয়ে সে জীবনের বাস্তব চাহিদার পুরণ করতে এবং তার সাথে সমঝোতা করতে অক্ষম।

একথা আমরা নির্ভীক চিত্তে বলতে পারি যে, খ্রীষ্টান মতবাদকে যে সর্বশেষ রূপটি দেয়া হয়েছে, সে রূপ নিয়ে প্রতিটি মুহূর্তে বিবর্তশীল অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিধানাবলীর কদম-বকদম পথ অতিক্রম করতে সে অক্ষম। কেননা স্বীয় মূলগত ভাবধারার দিক দিয়ে সে বাস্তব জীবন সম্পর্কে কোন পূর্ণাঙ্গ দর্শন ও ধ্যান-ধারণা পোষণ করে না। অপর দিকে ইসলাম হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ সামগ্রিক জীবন দর্শন। যার ভিতর যেমন বিবৃত হয়েছে মূল আকীদা বিশ্বাসের কথা, অনুরূপ হয়েছে সামাজিক অর্থনৈতিক এক কথায় আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রের আইন-কুনুসের কথা। সে সামাজিক জীবন এবং অর্থনৈতিক জীবনের সংগঠন মাবাত্মা ও আইন কানুনের কথা। এ দু'য়ের সমন্বয়ে দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত করে শান্তি। তার এ বিধান মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখার সমঝোতা প্রতিষ্ঠার বেলায় ক্রমবর্ধমান উন্নতি লাভের পূর্ণ যোগ্যতা রাখে।

সে মানবতাকে জীবন জগত সম্পর্কে একটি সামগ্রিক পূর্ণাঙ্গ দর্শন ও চিন্তাধারা দান করে। আর সমাজকে দান করে এমন একটি বাস্তব বিধান ও এমন একটি বিশ্লেষণমূলক শরীয়াত, যা সমাজের বিবর্তশীল প্রয়োজন অনুযায়ী নব নব শাখা–প্রশাখা মূলক বিধান পেশ করল পূর্ণ যোগ্যতার অধিকারী।

ইসলাম তার জীবনের বিধান ভিত্তি এমন একটি সামগ্রিক পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত করে, যা বস্তুবাদী দর্শন ও চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে। কর্মের ভিত্তি করে আধ্যাত্মিক ও চরিত্রগত উপাদানের উপর। আর নগদ লাভ ও স্বার্থের দৃষ্টিভঙ্গির ও ধ্যান ধারণাকে করে তাকে বাতিল নিরূপণ। এমনিভাবে সে একই সময় প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় ব্লকে ছেয়ে যাওয় বাস্তবাদী জ্ঞান তত্ত্বের মূলদেশে কুঠার আঘাত হানে। ইউরোপ, আমেরিকা এবং রাশিয়া সকলকে একাকার করাটাকে সে স্বীয় আদর্শ মনোনীত করে নিয়েছে। সে জীবনকে এহেন হীন ও নীচ মর্যাদার গোলামী থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে মহত্ব ও উন্নত মর্যাদাবোধের পানে ধাবিত করে।

আমাদের এ ভাসাভাসা আলোচনার দ্বারা এটাই প্রতিভাত হয় যে, ভবিষ্যতে সত্যিকারের দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ পুঁজিবাদও ধনতন্ত্রবাদ এবং সমাজতন্ত্রবাদের অথবা প্রাচ্য পাশ্চত্যের ব্লকের মধ্যে হবে না। বরং বিশ্বব্যাপী বস্তুবাদ এবং ইসলামের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ সংগঠিত হবে না বলে এই কথা বলাই ঠিক হবে যে, এ দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ বন্দেগী শুধুমাত্র আল্লাহর পাওনা অধিকার নিরুপণ করে মানুষকে মানুষের গোলামীর জীঞ্জির থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে আল্লাহর বান্দা বানানোর বিধান এবং সেই সকল মানব রচিত বিধানাবীল মধ্যে সংগঠিত হবে, যা সৃষ্টির বন্দেগী করার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় ব্লকই এ সত্যটি সম্পর্কে বেশ ভালরূপেই অবগত হয়েছে। তাদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক মতদ্বৈত্যতা ও ঝগড়া-বিবাদ থাকা সত্ত্বেও উভয় মিলে সর্বত্র ইসলামী জীবন পূনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বানচাল করে দিতে এবং ইসলামের উপর চর্তুদিক থেকে হামলা চালাবার কাজে লেগে রয়েছে। আল্লাহর পথে দাওয়াত দানকারীদের এ কথাগুলো জেনে নেয়া উচিত যে, তারা যেন বিভিন্ন ব্লক এবং জীবন বিধানসমূহের ভিতরকার দ্বন্দ্ব ও কলহ দ্বারা প্রতারিত না হয়। ইসলামই হচ্ছে একমাত্র সেই সত্যিকারের শক্তি, যাকে প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় ব্লকই বিশেষ গুরুত্ব দেয়। ইসলামপন্থীদেরকে এ সত্যটির জ্ঞান উপলব্ধির সাথে নিজেদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

বর্তমানে ইসলামকে পুনরুজ্জীবন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন একটি দ্বিমুখী বিশিষ্ট পথের মোড়ে দন্ডায়মান। বাস্তব ক্ষেত্রে ইসলামের অস্তিত্ব আছে কি নেই সেই মৌলিক শর্তটি পরিষ্কার হয়ে যাবার উপরই সঠিক পথে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। ইসলামের অস্তিত্ব বাস্তব ক্ষেত্রে যে মওকুফ ও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, সে কথাটি এ আন্দোলন সমূহকে মেনে নেয়া উচিত। আর তাকে যে আজ মানুষ দেখতে পারে না, তাকে সমর্থনের কথা অস্বীকার করে, তা দেখে তাদের ভীত সঙ্কিত হওয়া উচিত নয়। এ আন্দোলনগুলোকে ভালরূপে জেনে লওয়া উচিত যে, ইসলামকে বাস্তব জগতে নতুনভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠাই হচ্ছে তাদের চরম ও পরম লক্ষ্য। অথবা এ কথা বলা ঠিক হবে যে, ইসলাম সামায়িকভাবে আজ বিলুপ্ত; সুতরাং তাকে দ্বিতীয়বার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই এ আন্দোলন সমূহের উদ্দেশ্য।

একটি পথ গেল এই, আর দ্বিতীয় পথটি হচ্ছে একটি মুহূর্তের জন্য এ আন্দোলনের মনে এ ধারণা নেয়া যে, ইসলাম কায়েম রয়েছে এবং যারা ইসলামের ভক্ত বলে জোড় গলায় দাবি করেছে এবং নিজেদের মুসলমান নাম

দিয়ে পরিচয় দিচ্ছে, তারাও বাস্তবিক পক্ষে মুসলমান নাম দিয়ে পরিচয় দিচ্ছে, তারাও বাস্তবিক পক্ষে মুসলমান। এছাড়া সমগ্র জগতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ তথা সেকুলার রীতি-নীতি যা প্রচলিত রয়েছে যেমন, কামাল আতাতুর্কের প্রচার কৃত বিধান অথবা এ ধরণের অন্য কোন বিধানকে ইসলামী রীতি-নীতি মনে করা। বিলফর্ড স্মীত এবং তার মত অন্যান্য লেখক এবং তাদের দ্বারা প্রতারিত লোকেরা, তাদের ন্যায় প্রতারক বা জনসাধারণকে এ নীতি ইসলামী নীতি বলে বিশ্বাস করাতে চায়।

ইসলাম পুর্ণজাগরণ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন আজ এ দু'টি পথের মোড়ের উপর দন্ডায়মান। যদি সে প্রথম পথের পানে অগ্রসর হয়, তবে আল্লাহর এবং হেদায়াতে ইলাহীর পথে সামনে অগ্রসর হবে। আর এই কথা মনে করে সামনে অগ্রসর হবে যে, বর্তমানে ইসলামের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ মওকুফ হয়ে আছে। সুতরাং তাদেরকে ঠিক সেই কাজই করতে হবে যা রাসুল (সাঃ)-এবং পহেলা ইসলামী সমাজের দৃষ্টির সামনে ছিল। তাদের এ কথাও অবগত হতে হবে যে আল্লাহর রাসুল এবং সাহাবায়ে কেরামদের প্রতি যেরূপ নির্মম জুলুম অত্যাচার চালান হয়েছিল, তাদেরকেও অনুরূপ নির্মম জুলুম অত্যাচার হাসি মুখে বরণ করেতে হবে। তাদেরকে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা এবং সহনশীলতার দ্বারা কাজ আদায় করতে হবে। অতঃপর অনুরূপভাবেই আল্লাহর সাহায্যে ও মদদ আসতে থাকবে। পরিশেষে আল্লাহর যমীনে তাদেরই বিজয় কেতন "আল-হিলাল" পৎ পৎ করে উড়তে থাকবে।

আর এ আন্দোলন যদি দ্বিতীয় পথটি অনুসরণ করে, যা মিঃ বিলফার্ড স্মীত এবং তার দ্বারা প্রতারিত লোকেরা এবং তাদের ন্যায় প্রতারণাকারীরা দেখিয়ে যাচ্ছে, তবে সে শুধু একটি মায়া মরীচিকার পিছনেই দৌড়াতে থাকবে। এ মায়া মরীচিকার ভিতর দুর থেকে এমন কতক পাগড়ীধারী লোক দেখা যাবে, যার কথাকে মূল উদ্দেশ্যের অন্য দিকে ফিরিয়া নেয় এবং আল্লাহর আয়াতসমূহকে খুব অল্প মূল্যের বিনিময়ই বিক্রি করে। তারা 'মসজিদে জরার' এর ন্যায় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে তার উপর ইসলামের ঝান্ডা উড্ডীয়ন করে। আর 'ফেজর'ও শরীয়ত গর্হিত কার্যের আড্ডাখানায় বাতাসের সাথে তা হেলতে দুলতে থাকে।

আজ ইসলামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন যমীনের কোনায় কোনায় বিস্তার লাভ করে আছে। খ্রীষ্টানইজম এবং ক্রশেডের যুদ্ধবাদীরা এ আন্দোলনকে

বানচাল করার উদ্দেশ্যে যে অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছে এবং যে সকল সংস্থা স্থাপন করেছে তার নাকের ডগার উপর এ আন্দোলন আজ ইউরোপ আমেরিকায় খ্রীষ্টানইজমের কেন্দ্রভূমে চ্যালেঞ্জ প্রদান করে চলেছ। কিন্তু এ আন্দোলন মায়া মরীচিকার ধোকাজালে নিপতিত হবার যেমন সম্ভাবনা রয়েছে, তেমনি তা সঠিক পথ অনুসরণ করার সম্ভাবনাও সমধিক্ আল্লাহর নিকট আশা এবং কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা এই যে তিনি আমাদের মানব চক্ষুকে মূল বিষয় অবলোকন করার এবং অন্তরকে হক্ কথা অনুধাবন করার তাওফীক দান করুক। আল্লাহই পথ প্রদর্শনকারী ও তাওফিক দাতা এবং তিনিই আমাদের সহয় সম্বল ও মদদগার।